ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

সর্বসেবা সংঘ প্রকাশন
॥ সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি ॥
কলিকাতা

প্রকাশক ঃ

পরমেশ বসু
সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি-৫২ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২

प्रकाशक :

परमेश वसु
सर्वोदय प्रकाशन समिति
सि-५२ कलेज स्ट्रीट मार्केट
कलिकाता १२

সংস্করণ ঃ

প্রথম ঃ অক্টোবর, ১৯৫৩—৩৩০০
দ্বিতীয় ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪—৭৫০০
তৃতীয় ঃ ডিসেম্বর, ১৯৫৫—৭৫০০
চতুর্থ (পরিবর্ধিত) ঃ

संस्करण :

प्रथम: अक्टुबर, १९५३-३३००
द्वितीय: सेप्टेम्बर, १९५४-७५००
तृतीय: दिसम्बर, १९५५-७५००

মূল্য ঃ দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

मूल्य: दो रुपये पचास नये पैसे

মুদ্রক ঃ

প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী
লোক-সেবক প্রেস
৮৬-এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা ১৪

भुदानयज्ञ कि आ केन
श्रीचारुचन्द्र भंडारी

পুস্তকখানি (দ্বিতীয় সংস্করণ) সম্পর্কে সন্ত বিনোবার আশীর্বাদ

তাং ১—১০—৫৪

श्री चारूबाबु

पत्र मिला। 'भूदान-यज्ञ कि ओ केन' दूसरा संस्करण मिल गया। देख लिया। पुस्तक मुझे सर्वाङ्ग परिपूर्ण मालूम हुआ। मैं आशा करता हूँ यह पुस्तक बंगालमें पढ़े लिखे हर घर में पहूँचेगी। दाम तो नाम मात्र ही है। जो यह पुस्तक लेगा उसके हृदयसे दान-धारा नित्य बहती रहेगी।

শ্রীচারুবাবু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। "ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ আমি পাইয়াছি। উহা আমি দেখিয়া লইয়াছি। আমার মনে হয়, পুস্তকখানি সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমি আশা করি, এই পুস্তক বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত ঘরে পৌঁছিবে। মূল্য তো নামমাত্র রাখা হইয়াছে। যিনি এই পুস্তক লইবেন তাঁহার হৃদয় হইতে দান-ধারা নিত্য প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

বিনোবার প্রণাম

পুস্তকখানি (প্রথম সংস্করণ) সম্পর্কে পূজ্য বিনোবাজীর পত্র

ता १९—१०—५३

श्री चारुबाबु,

"भूदान-यज्ञ कि ओ केन" यह आपकी किताब मिली। कुछ तो मैं देख गया। सब देखनेके लिये समय नहीं मिलेगा। लेकिन आपने हमारे आंदोलन के बुनियादी विचारों का बहुत ही अच्छे ढंगसे विवरण किया है इतना मैं समझ सका हूँ। मैं मानता हूँ आपकी यह किताब बंगालमें लोक-प्रिय होगी। मूल्य भी ज्यादह नहीं रक्खा है।

শ্রীচারুবাবু,

আপনার বই "ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন" আমি পাইয়াছি। কিছু কিছু তো আমি পড়িয়াছি। বইখানি সমস্ত পড়িবার মত সময় আমি পাইব না। তবে যতটা পড়িয়াছি তাহাতে আমি এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনি আমাদের আন্দোলনের বুনিয়াদী সমস্যাসমূহকে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। আমি আশা করি, আপনার এই পুস্তক বাংলাদেশে জনপ্রিয় হইবে। ইহার মূল্যও বেশী করা হয় নাই।

বিনোবার প্রণাম

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

কোন গতিশীল, জীবন্ত বিষয় সম্পর্কে পুস্তক রচনা করিয়া উহাকে অধিক দিন অদ্যতন করিয়া রাখা যায় না। "ভূদানযজ্ঞ কি ও কেন" সম্পর্কে তাহাই হইয়াছে। উহা ১৯৫৩ সালের গান্ধী জয়ন্তীর দিন প্রথম প্রকাশিত হয়। ১১ মাসের মধ্যে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ এবং অতঃপর ১৪ মাসের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ২রা ডিসেম্বর) উহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐ পর্যন্ত উহাকে অদ্যতন রাখা গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর ৬ বৎসর অতীত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে আর কোন নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তাহার ফলে পুস্তকের ভূদান আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভাগ পুরাতন হইয়া যায়। উপরন্তু আন্দোলনের বিকাশ ও সর্বোদয়-বিচারের বিকাশের ফলে যে-সব নূতন বিচার ও দৃষ্টি উদ্ঘাটিত হয় তাহাও পুস্তকে সন্নিবেশিত করা যায় নাই। যাহা হউক, এখন পুস্তকখানিকে অদ্যতন (১৯৬১ সালের জুন পর্যন্ত) করা হইয়াছে ও উহাতে বহু নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। কয়েকটি অধ্যায় নূতন করিয়া লেখা হইয়াছে। আশা করা যায়. এই নূতন সংস্করণ হইতে ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয় আন্দোলন ও সর্বোদয়ের বিচারধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হইবে এবং এই একখানি পুস্তকের দ্বারা ঐ-বিষয়ে বহু পুস্তক পাঠের কাজ হইবে।

আমাদের প্রিয়তম সহকর্মী শ্রীপরমেশ বসুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহা যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব হইল। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

জলপাইগুড়ি হাসপাতাল

২১-৪-৬২

ধ্যানের ভারত

॥ আমি সেই ভারতের জন্য কাজ করিয়া যাইব যে-ভারতের দীনতম ব্যক্তিও মনে করিবে যে, দেশ তাহারই দেশ। এই দেশ গড়িয়া তুলিতে তাহাদেরও অভিমত কার্যকরী হইবে। সেই ভারতে উচ্চনীচ শ্রেণীরূপে মানুষের কোন সমাজ থাকিবে না। সেই ভারতে সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে শ্রেষ্ঠপ্রীতির সম্পর্ক রাখিয়া বাস করিবে। সেই ভারতে অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপের কোন স্থান থাকিবে না, উত্তেজক পানীয় অথবা অন্য কোনরূপ মাদকদ্রব্য গ্রহণেরও কোন প্রশ্রয় থাকিবে না। নারীসমাজ পুরুষসমাজেরই মত সমান অধিকার ভোগ করিবে। ইহাই আমার ধ্যানের ভারত ॥

—গান্ধী

প্রস্তাবনা

"মানবসমাজ বহু হাজার বৎসর পুরাতন। কিন্তু পৃথিবী এত বড় যে, পুরাকালে পৃথিবীর একদিকের মানুষের সহিত অন্যদিকের মানুষের কোন পরিচয় বা সম্পর্ক ছিল না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইতে লাগিল এবং ক্রমশ মানসিক, ধার্মিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল দিকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু বন্ধুত্বের বা মিলনের সম্পর্ক প্রথমে হইল না। বহুক্ষেত্রে সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া প্রথম এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই কখন প্রথম সম্পর্ক মধুর আবার কখন তাহা তিক্ত হইয়াছিল। তবে মোটের উপর পারস্পরিক সম্পর্কের ফল ভালই হইয়াছে।

"পুরাকালে উত্তর-ভারতে আর্যজাতি বাস করিতেন এবং দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় জাতি বাস করিতেন। যদিও একই দেশ, তথাপি এই বিশাল দেশের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে বিরাট দণ্ডকারণ্যের ব্যবধান থাকায় হাজার-হাজার বৎসর যাবৎ ইঁহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না। আর্যগণের পাহাড়ী সংস্কৃতি এবং দ্রাবিড়দের সামুদ্রিক সংস্কৃতি ছিল। উত্তরের মনুষ্য জ্ঞান-প্রধান ছিলেন এবং দক্ষিণের মনুষ্য ভক্তি-প্রধান ছিলেন। ক্রমশ দেশের এই উভয় অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হইল। উভয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ সাধিত হইল। উত্তর-ভারতে বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাব হইল এবং তাঁহাদের বাণী ও আত্মজ্ঞানের বিচারধারা দক্ষিণে রামেশ্বর পর্যন্ত পৌঁছিল। তৎপূর্বেও বৈদিকগণ তাঁহাদের নিজস্ব ধারায় দক্ষিণ-ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন। অন্য-দিকে দক্ষিণ-ভারতে শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মাধবাচার্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। উত্তর-ভারত হইতে যে-আত্মজ্ঞানের বিচারধারা দক্ষিণ-ভারতে গিয়াছিল, দক্ষিণ-ভারত তাহাতে নিজের বৈশিষ্ট্য দান করিল অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা তাহাকে সমৃদ্ধ করিল। শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রভৃতি তাহা উত্তর-ভারতে লইয়া গেলেন। দক্ষিণ-ভারতে আরও বহু জ্ঞানবান, ভক্তিমান সন্তপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং তাঁহারাও সমগ্র ভারতে ভক্তিমার্গ প্রচার করিয়াছিলেন। পরিণাম-

স্বরূপ বৈচারিক দৃষ্টিতে উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারত একই রাষ্ট্রে পরিণত হইল। যদিও ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে বহুসংখ্যক রাজ্য ছিল তথাপি বিচারের রাজ্য কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

"অতঃপর মুসলমানগণ বাহির হইতে আসিলেন। তাঁহারা এক নূতন সংস্কৃতি সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ইসলাম সকলকে সমান বলিয়া মানিতেন। উপনিষদ প্রভৃতিতে সাম্যের কথা ছিল বটে, কিন্তু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় বা সামাজিক আচরণে ইহার কিছুমাত্র ছিল না; বরং ইহার বিপরীতই ছিল। অসাম্যমূলক জাতিভেদ-প্রধান এই সমাজ-ব্যবস্থা। তাই মুসলমানদের সংস্কৃতির সহিত এখানকার সংস্কৃতির সংঘর্ষ বাধিল। মুসলমানেরা তাঁহাদের সংস্কৃতির বিকাশের জন্য হিংসার পথ ও প্রেমের পথ—এই উভয় পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই দুইটি পথ দুইটি ধারার মত একসাথে চলিয়াছিল। গজনী, ঔরংগজেব প্রভৃতি হিংসা-পথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ তরবারির বলে-যে এই দেশ জয় করিয়াছিলেন অথবা এই দেশের লোক-যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন—একথা কেহ বলিতে পারে না। তবে যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পূর্বে মুসলমান ফকিরগণ এদেশে আসিয়া ইসলামের সাম্যের বাণী গ্রামে-গ্রামে পেঁৗছাইয়া দিয়াছিলেন। এই জাতিভেদের দেশে তাঁহাদের প্রচারের দ্বারা লোকে খুবই প্রভাবিত হইয়াছিল। এইভাবে এই দুই সংস্কৃতি পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসিল। ইহার পর এই দেশে বহু ভক্তের আবির্ভাব হইল। তাঁহারা জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন এবং একই পরমেশ্বরের উপাসনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। ইহাতে-যে ইসলামের বৃহৎ অবদান ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর্য-সংস্কৃতি ও দ্রাবিড়-সংস্কৃতির যে-সংমিশ্রণ হইয়াছিল তাহাতে এইভাবে ইসলামের সংস্কৃতির রসায়ন যুক্ত হইল।

"ভারতে যে-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে বিজ্ঞানের অভাব ছিল। ভারতে এক সময়ে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে তাহার অভাব হইল। ঠিক সেই সময়ে ইউরোপে নূতন-নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়া তথায় অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইল ও ইউরোপীয়গণ তখন এখানে আসিয়া পেঁৗছিলেন। ভারত ইংরাজগণের নিকট পরাধীনতা-

পাশে আবদ্ধ হইল। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকিল। সংঘর্ষের মাধ্যমে সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল। এই মিশ্রণের ফলে এক নূতন সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে। তাহা হইতেছে সামূহিক অহিংসা। পূর্বে অহিংসার প্রয়োগ যাহা হইত তাহা ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে হইত। সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ হইতে পারিত না। কারণ বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য আজ মানবসমাজ একে অন্যের সহিত যেরূপ সম্পর্কযুক্ত হইতে পারিতেছে পূর্বে তাহা সম্ভব ছিল না। আজ যেখানে যে-সংঘর্ষ আসুক না কেন অথবা যে-সম্পর্ক স্থাপিত হউক না কেন, উহা সামাজিক হইয়া পড়িতেছে। তাই বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে কোন আন্দোলন কোন এক দেশে সীমাবদ্ধ থাকে না। উহা বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হইয়া পড়ে। আজকাল এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের এবং এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে—সংঘর্ষও হইতেছে।"*

ইংরেজ ভারতকে কেবলমাত্র পরাধীন করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন না। পরন্তু উহাকে একেবারে নিঃশস্ত্র করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ভারতে জাগৃতি আসিল এবং স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিল। কিন্তু প্রচলিত উপায়ে অর্থাৎ হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিবার কোন অবকাশ আর থাকিল না। হিংসা প্রয়োগ করিবার যেটুকু প্রচেষ্টা করা হইল তাহাও নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। হৃদয়ে স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার জ্বালা; বাহিরে ব্যর্থতা ও নিরাশার ঘোর অন্ধকার। ভারতের অন্তরাত্মা এক কার্যকরী পন্থার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। পরিস্থিতির প্রয়োজনের দাবীতে ভারতের অধ্যাত্ম ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সংযোগের ফলে সাম্প্রদায়িক অহিংসার উদ্ভব হইল। যুগের দাবীতে যখন এইভাবে আত্মার কোন গুণের বিকাশের প্রয়োজন হয় তখন এক যুগ-পুরুষের মাধ্যমে ঐ গুণের বিকাশ ও প্রচার সাধিত হইয়া থাকে। সামূহিক অহিংসার বিকাশ ও প্রচারকল্পে আবির্ভূত সেই যুগ-পুরুষ হইতেছেন—মহাত্মা গান্ধী।

সামূহিক অহিংসার প্রয়োগের ফলে রাজনৈতিকক্ষেত্রে আমরা স্বাধীনতা

* বিনোবা

লাভ করিলাম। অহিংসা জীবনের এক আধ্যাত্মিক বিচার। আত্মার একত্ব অর্থাৎ সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান এই বিশ্বাস হইতেছে অহিংসা-বিচারের উৎস। উহা জীবনের মূলদেশে প্রবেশ করে। জীবনের মূলদেশে প্রবেশলাভ হইলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উহার ক্রিয়া না হইয়া থাকিতে পারে না। তাই আজ ভারতে আর্থিক, সামাজিক প্রভৃতি জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রে সামূহিক অহিংসার সম্প্রসারণ ও বিকাশের সাধনা চলিতেছে। ভারতের পরিস্থিতিতে তাহাই আজ প্রয়োজন। সামুদায়িক অহিংসার চরম পরিণতি সর্বোদয়-প্রতিষ্ঠায়। উহাই চরম ও পরম ধ্যেয়।

"এখন ভারত তথা প্রতীচ্যের পালা আসিয়াছে। এখন ভারত এক নূতন সংস্কৃতি, নূতন বিচারধারা অর্থাৎ সামূহিক অহিংসা, পশ্চিমের নিকট পেঁৗছাইয়া দিবে। মনু বলিয়াছেন—"স্বং স্বং চরিত্রং, শিক্ষেরণ, পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ"—'পৃথিবীর সকল লোক চরিত্রের শিক্ষালাভ করিবে ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিকট হইতে।' এই যে মনুর ভবিষ্যদ্বাণী উহা মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে।

"আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংযোগে যে পরিণাম সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোক ভারতের মাধ্যমে সারা বিশ্বে বিকীর্ণ হইবে—ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রায়।"* ইহার লক্ষণও দেখা যাইতেছে। ভারতের পক্ষ হইতে শান্তির জন্য আবেদনের বাণী কোরিয়ায় পেঁৗছিল আর সেখানে রণ-বিরতি হইয়া গেল। ভারত ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পূর্ণভাবে সফল করিতে পারিবে কি? সামূহিক অহিংসার পূর্ণ বিকাশের জন্য যে ত্যাগ এবং ঐকান্তিক ও অক্লান্ত তপশ্চর্যার প্রয়োজন, ভারত যদি তাহা করিতে পারে তবে এই যুগে ভারত সারা জগতকে আলোক দান করিতে পারিবে।

* বিনোবা

সূচীপত্র

অধ্যায় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় | পৃষ্ঠা

অধ্যায় | পৃষ্ঠা

লেখকের অন্যান্য বই :

গ্রামদান

যাত্রার পথে

শান্তিসেনা

আমাদের জাতীয় শিক্ষা

॥ ১ ॥ ভূদানযজ্ঞ কি

"যজ্ঞ"—এই কথার সহিত আমরা সকলে পরিচিত। "যজ্ঞ" কি—তাহা আমরা সকলেই কমবেশী জানি। "যজ্ঞ" একপ্রকার পূজাপদ্ধতি। "যজতি যজতে বিষ্ণুং সুধীঃ পূজয়তীত্যর্থঃ"। 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের কথা আমরা জানি। 'রাজসূয়' যজ্ঞের কথাও আমরা জানি। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদি যজ্ঞের উল্লেখ আছে। উপরন্তু গারুড় শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, মহাব্রত, সর্বোত-মুখ, পৌণ্ডরীক, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, আঙ্গিরস ইত্যাদি বহুবিধ যজ্ঞের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। কিন্তু 'ভূদানযজ্ঞে'র উল্লেখ কোথাও নাই। ইহা নূতন শব্দ ও নূতন যজ্ঞ। নূতন শব্দ বলিয়া আমাদের মনে যেন আশঙ্কা না আসে। কারণ যুগান্তকারী শব্দসৃষ্টির সহিত বাঙ্গালী বিশেষভাবে পরিচিত। 'দরিদ্রনারায়ণ' ও 'বন্দেমাতরম্'—এই দুই শব্দের স্রষ্টা বাংলার দুই মহান্ মনীষী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দ সৃজন করেন এবং ঐ শব্দ ধর্ম ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে। 'বন্দেমাতরম্'এর স্রষ্টা ও দ্রষ্টা ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতের জাতীয়তার উন্মেষ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই শব্দ-মন্ত্রের স্থান যে কোথায় তাহা সকলে অবগত আছেন। 'ভূদানযজ্ঞ' এই শব্দও ভারতে অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্রান্তিকারক হইবে সন্দেহ নাই। আলোচনা যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই ভূদানযজ্ঞের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য ক্রমশ স্পষ্টতর হইবে। তবে সংক্ষেপে উহার অর্থ এই যে—যে-ব্যক্তি ভূমি-হীন দরিদ্র—যে ভূমি চাষ করিতে জানে ও ভূমি চাষ করিতে চাহে কিন্তু অন্যের ভূমিতে চাষ করা বা কৃষি-শ্রমিকবৃত্তি ছাড়া যাহার অন্য কোন জীবিকা নাই, তাহার জন্যই ভূমিদান এবং এই ভূমিদান হইবে ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জনের জন্য, মালিকানাবোধ নিরসনের জন্য। অর্থাৎ বায়ু, জল, আলোর ন্যায় ভূমির মালিক একমাত্র ভগবান এবং প্রত্যেকেরই নিজ হাতে চাষ করিবার সমান অধিকার আছে—এই বোধ হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া দাতা নিজের

মালিকানাবোধ বিসর্জনের জন্য ভূমি ভূদানযজ্ঞে অর্পণ করিবেন—যাহাতে গ্রামের ভূমি গ্রামের হইয়া যায় অর্থাৎ—ভূমির গ্রামীকরণ সাধিত হয়। ভূদান-যজ্ঞের উদ্দেশ্য হইতেছে—ভূমির এবম্প্রকার গ্রামীকরণকে ভিত্তি করিয়া কুটীরশিল্পপ্রধান অহিংস-সমাজ রচনা করা।

ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবসমূহের জীবনধারণ ও পোষণের জন্য যাহা-কিছু মৌলিক প্রয়োজন তাহা দান করিয়াছেন এবং তাহা প্রয়োজনানুযায়ী সকলের পক্ষে সমভাবে প্রাপ্য। তাহা হইতেছে পঞ্চভূত—"ক্ষিত্যপ্‌তেজ-মরুৎব্যোম্"—ক্ষিতি (ভূমি), অপ্ (জল), তেজ (আলো), মরুৎ (বাতাস), ব্যোম্ (শূন্যদেশ)। বাতাস সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ভোগ করিতে পারে। বাতাসে সকলের সমান অধিকার। আলোতেও সকলের সমান অধিকার এবং সকলে তাহা নিজ নিজ প্রয়োজনমত ভোগ করিতে পারে। জলেও সকলের সমান অধিকার। আকাশের জল যখন বর্ষিত হয়, তখন তাহা উচ্চ-নীচ বা ধনী-দরিদ্র ভেদ জ্ঞান করে না। নদীর প্রবহমান জলে সকলের সমান অধিকার। ভগবানের সৃষ্টির কৌশল এমন যে, মানুষ তথা তাঁহার সৃষ্ট অন্য জীবের জন্য যে জিনিসের যত বেশী প্রয়োজন তাহাকে তিনি ততই সহজপ্রাপ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন বায়ু না হইলে মানুষ অল্পক্ষণও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এজন্য তিনি বায়ুকে সর্বাপেক্ষা সহজপ্রাপ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন ঈশ্বরের দান বায়ু, আলোক ও জলে সকলের সমান অধিকার তেমনি ঈশ্বরের দান ভূমিতেও সকলের সমান অধিকার। ভগবানের দানে একজনের অধিকার থাকিবে আর অন্যের অধিকার থাকিবে না— ভগবানের এমন বিধান হইতে পারে না। এই সম্পর্কে বিনোবাজী তাঁহার অনুপম ভাষায় বলিয়াছেন—"সূর্য ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায়। উহার রশ্মি রাজা যতটুকু পায় মেথরও ততটুকু পাইয়া থাকে। ভগবান কখনও নিজের জিনিসকে অসমানভাবে বিতরণ করেন না। যদি ভগবান হাওয়া, জল, আলো ও শূন্যদেশের বিতরণে ভেদাভেদ না করিয়া থাকেন, তবে ইহা কিরূপে হওয়া সম্ভব যে, তিনি জমি সকলকে সমানভাবে না দিয়া মাত্র কতিপয় লোকের হাতে থাকিতে দিবেন?" এখানে এই আপত্তি উঠিতে পারে যে ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সুতরাং ভূমি প্রকৃতির দান হইলেও

জল ও বাতাসের সহিত তাহার তুলনা চলিতে পারে না। এরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ভূমি স্বল্পপরিমিত বলিয়াই উহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়া উচিত নহে। কারণ যে বস্তু না হইলে কাহারও চলিবে না অথচ যাহা পরিমিত তাহা যদি কিছু লোকের নিজস্ব হইয়া যায় তবে অন্য লোকের চলিবে কেমন করিয়া? কিন্তু যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী সমাজের অর্থনৈতিক অপব্যবস্থার ফলে সেই ভূমি হইয়া গিয়াছে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। একজনের আছে আর এক-জনের নাই। একজনের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত, আর একজনের কাছে প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। তাই দেশে এত হাহাকার! দেশের তীক্ষ্ম ধনবৈষম্যের মূলে রহিয়াছে এই অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত ভূমিব্যবস্থা! যাঁহার হৃদয় আছে তিনি অন্তরে অনুভব করিতে পারেন যে, ভারতের অন্তস্তল ভেদ করিয়া অহরহ দরিদ্র ভূমিহীনের আকুল ক্রন্দনরোল উত্থিত হইতেছে। মায়ের কোল ফিরিয়া পাওয়ার জন্য মাতৃহারা শিশুর যেমন আকুল আগ্রহ, ভূমি পাওয়ার জন্য ভূমিহীন দরিদ্রের তেমনি আগ্রহাকুল প্রতীক্ষা। যেমন নিঃসন্তান রমণী অন্যের সন্তানকে লালনপালন করিলেও নিজ গর্ভজাত সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিবার যে স্বাভাবিক ক্ষুধা তাহা তৃপ্ত হয় না, তেমনি অন্যের ভূমি চাষাবাদ করিলেও ভূমিহীন দরিদ্রের ভূমি-ক্ষুধা তৃপ্ত হয় না।

গ্রাম-সংগঠনের কাজ সফল হইতেছে না কেন? গঠনমূলক কর্মীদের অভিজ্ঞতা কি? ভূমিহীনকে চরকা দেওয়া হইয়াছে—তাঁত দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে অন্যান্য গৃহশিল্প দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহা সে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই—তাহাতে তাহার অন্তর তৃপ্ত হয় না। কারণ সে সর্বপ্রথমে চাহে ভূমি—ভূমিকে সে আপনার করিয়া পাইতে চাহে। ভারত তথা এশিয়া মহাদেশের যেখানে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহার মূলগত কারণ এই ভূমি-সমস্যা। এজন্য ভূমি-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর ভারতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ।

কেন এই নিদারুণ ভূমিক্ষুধা? উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মধ্যেই উহার কারণ নিহিত রহিয়াছে। সকলের সমানভাবে পাওয়ার অধিকার দিয়া ভগবান যে 'পঞ্চভূত' দান করিয়াছেন ভূমি তাহাদের অন্যতম। মানুষের জীবনধারণের জন্য পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন অপরিহার্য। মানুষের চলাফেরার জন্য ব্যোমের (space) প্রয়োজন। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু, পানের জন্য জল ও তাপ সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য আলোর প্রয়োজন। এই চারিটি তো মানুষ প্রয়োজনমত সমান অধিকারে পাইয়া থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র ইহাতেই মানুষ বাঁচিতে পারে না। জীবনধারণের জন্য ইহা ছাড়া তাহার খাদ্য, পরিধেয় ও আবাস গৃহের প্রয়োজন। খাদ্য-সামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্রাদির উপাদান ও আবাসের যাবতীয় সরঞ্জাম উৎপাদনের একমাত্র ক্ষেত্র ও উপকরণ ভূমি বা ভূগর্ভ। সুতরাং ভূজাত বা ভূমিগর্ভজাত উৎপাদনের উপর মানুষের খাদ্য, পরিধেয় ও আবাসের যাবতীয় ব্যবস্থা নির্ভর করে। ভূমি বা ভূগর্ভ ব্যতীত আর কিছু হইতে ঐ সকলের উৎপাদন সম্ভব নহে। মানুষ হাতে বা যন্ত্রে অনেক কিছু দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু খাদ্যশস্য, শাকসব্জী ও ফলমূলাদি একমাত্র ভূমিতেই উৎপন্ন হয়। আমাদের পরিধেয় বস্ত্রাদির জন্য তুলা এবং চরকা ও তাঁতের কাঠ ভূমি হইতে উৎপন্ন; বস্ত্র-কলের লোহও ভূগর্ভ হইতে উৎপন্ন। বাসগৃহাদি মৃত্তিকা, ইষ্টক বা প্রস্তর নির্মিত যাহাই হউক তাহার যে-কোন উপাদান ভূমি বা ভূগর্ভ হইতে উৎপন্ন। এইভাবে একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমাদের জীবন-ধারণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যাহা কিছু দ্রব্য-সামগ্রী সকলেরই মৌলিক উৎপত্তি-স্থল ভূমি বা ভূগর্ভ। বায়ু, আলো ও জলের সহিত ভূমির পার্থক্য এই যে, উহারা সরাসরিভাবে ভোগ্য অর্থাৎ বায়ু, আলো ও জল ভোগ করিবার জন্য পরিশ্রম করিয়া উহাদের উৎপাদন করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খাদ্য, পরিধেয় ও আবাসস্থল পাইতে হইলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিয়া উৎপাদন করিতে হয়। ভগবান মানুষকে খাইবার জন্য যেমন এক মুখ দিয়াছেন, তেমনি উৎপাদন করিবার জন্য দুই হাত দিয়াছেন। ভূমি মানুষের জীবিকা অর্জনের মৌলিক ক্ষেত্র এবং খাদ্য, পরিধেয় ও আবাসস্থল উৎপাদনের মৌলিক উপকরণ। এজন্য বাতাস, জল ও আলোর ন্যায় ভূমিতে

মানুষের সমান অধিকার অব্যাহত রাখা আবশ্যক। নচেৎ মানুষের জীবন অন্যের হাতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং মানুষকে বিশেষত যে মানুষ ভূমিতে দুই হাত খাটাইয়া উৎপাদন ও জীবিকার্জন করিতে চায়—শ্বাসরোধের ন্যায় অবস্থা অনুভব করিতে হয়। আজ যদি এমন হইত যে বায়ুর উপর মানুষ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে এবং বায়ু মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, অধিকাংশ বায়ু কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হইয়াছে, বায়ুতে জমিদারী ও জোতদারী ধরণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বায়ুর বিঘার মূল্য ২০০৲ টাকা ও বায়ুর বিঘার খাজনা ১০৲ টাকা হইয়াছে তাহা হইলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত? তাহা হইলে যাহার অধিকারে বায়ু নাই সে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বায়ুর জমিদার ও বায়ুর জোতদারের কাছে ছুটাছুটি করিত। সে মনে করিত যে বায়ুর জমিদার ও জোতদারের নিকট তাহার জীবন-মরণ বাঁধা আছে। যেমন রূপকথার রাক্ষসীর হাতে মানুষের জীবন-কাঠি ও মরণ-কাঠি থাকে; সেরূপ যে ব্যক্তি ভূমি চাষ জানে ও ভূমি চাষ করিতে চায় এবং ভূমি চাষ ছাড়া আজ যাহার স্বাধীন জীবিকাব ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে, অথচ যাহার নিজের ভূমি নাই—সে ব্যক্তি অনুভব করে যে তাহার জীবন ও মরণ জমিদার ও জোতদারের হাতে বাঁধা—তাহার জীবন-কাঠি ও মরণ-কাঠি জমিদার ও জোতদারের হাতে। কারণ তাহার জীবনধারণের জন্য বায়ু, জল ও তাপ ব্যতীত আরও যে তিনটি জিনিস অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন সেই খাদ্য, বস্ত্র ও আবাস-গৃহ উৎপাদনের উপকরণ যে ভূমি তাহা তাহার হাতে নাই। তাহার জন্য তাহাকে নির্ভর করিতে হয় অন্যের খেয়াল-খুশীর উপর। তাই সে রুদ্ধশ্বাস মানুষের ন্যায় অনুভব করিতে থাকে। এই হইতেছে তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের অনুভূতি। তাহার অন্তরের ভাষা এই। সে মূক। এখন সে ক্রমশ মুখর হইয়া উঠিতেছে। যদি শীঘ্র এবং শান্তির পথে ভারতে ভূমির সুসম-বণ্টন না হয় তবে ভারতের প্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে, ভারতকে এক অভাবনীয় দুর্দৈবের সম্মুখীন হইতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় কথা বুঝিয়া রাখিতে হইবে। যাহার শ্বাস গ্রহণ করার প্রয়োজন সে বায়ু পায়। বায়ু পাইবার মৌলিক অধিকার

তাহার আছে। যাহার পিপাসা লাগিয়াছে সে জল পাইয়া থাকে। জল পাইবার মৌলিক অধিকার তাহার আছে। সেরূপ যাহার ক্ষুধা পাইয়াছে খাদ্য পাইবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু খাদ্য পাইবার অধিকার তাহার তখনই জন্মিবে যখন সে পরিশ্রম করিয়া খাদ্য উৎপাদন করিতে প্রস্তুত হইবে। নচেৎ খাদ্য পাইবার নৈতিক অধিকার তাহার নাই, কারণ ভূমিতে পরিশ্রম না করিলে খাদ্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। ঐ একই কারণে কর্ষণ-যোগ্য ভূমি পাইবার অধিকার তখনই কোন ব্যক্তির হইতে পারে যখন সে নিজ হাতে জমি চাষ করিতে প্রস্তুত থাকে। নচেৎ এ অধিকার দাবি করিবার নৈতিক অধিকার তাহার নাই।

এই ভূমিক্ষুধা মিটিবে কিরূপে? সাধারণভাবে এরূপ মনে করা হয় যে ভূদানযজ্ঞের ভিত্তিতে অহিংস সমাজ-রচনার কল্পনা এখন স্থগিত রাখা হউক। তাড়াতাড়ি ভূমির পুনর্বণ্টন হওয়া আবশ্যক এবং একমাত্র আইনের পথেই তাহা সম্ভব। এরূপ মনোভাবের কারণ এই যে, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর এ দেশের লোকের মন নিতান্ত শাসনাভিমুখী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে দেশের বর্তমান অবস্থায় আইনের দ্বারা ভূমি-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব নহে। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, একমাত্র হিংসার পথে ভূমি-সমস্যার দ্রুততর সমাধান হওয়া সম্ভব। পরের আলোচনায় ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে যে, এ দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহাও সম্ভব নহে। শান্তি ও প্রেমের পথ একমাত্র পথ যাহাতে এদেশের ভূমি-সমস্যার সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে। ভূদানযজ্ঞ শান্তি ও প্রেমের পথে এই ভূমিক্ষুধা তৃপ্ত করিবার ভারতব্যাপী প্রচেষ্টা। সকলের হৃদয়ে ভগবান বিরাজমান। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন—মানুষের হৃদয়স্থিত সেই ভগবানের কাছে প্রেমপূর্ণ আকুল আবেদন। "ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। সে-অধিকার হইতে যে বঞ্চিত, সে আজ ধূলায় লুণ্ঠিত—সে আজ সর্বহারা। সে ক্ষুধার জ্বালায় মরিতেছে। তাহার জীবিকা অর্জনের অন্য কোন উপায় নাই। তাহার সে-হৃত অধিকার তাহাকে প্রত্যর্পণ কর। তাহার প্রাপ্য ভূমি তাহাকে ফিরাইয়া দাও। ভূমির মালিক ভগবান। ভূমি সকলের মাতা। সকলেই ভূমির সন্তান। কিন্তু তুমি

নিজেকে ভূমির মালিক বলিয়া গণ্য করিতেছ। মাতাকে দাসী করিয়াছ। আজ সেই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার দিন আসিয়াছে। ভূমির মালিকানা বিসর্জন দেওয়ার দীক্ষা গ্রহণ কর। সন্তানকে ভূমিমাতার বুক হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। মায়ের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ও বঞ্চিত সন্তানের উষ্ণ অশ্রুজল দেশের আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কেহই শান্তি পাইতেছে না। মাকে বঞ্চিত সন্তানের কাছে ফিরাইয়া দাও। শান্তি ফিরিয়া আসিবে। ধনীর কল্যাণ হইবে, দরিদ্রের কল্যাণ হইবে এবং দেশেরও কল্যাণ হইবে। মানুষের অন্তরস্থিত সুপ্ত ভগবান! তুমি আজ জাগ্রত হও, তুমি প্রসন্ন হও। জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, যে-অন্যায় ভূমিহীন দরিদ্রের প্রতি যুগ-যুগ ধরিয়া করা হইয়াছে, আজ তাহার প্রতিকার হউক। বঞ্চিতের ভগবান আজ জাগ্রত।”

॥ ২ ॥ ভূদানযজ্ঞের সফলতায় আশংকা

এই আবেদনে কি মানুষ সাড়া দিবে? যে-জগতে মানুষ পাঁচ কাঠা ভূমিও অন্যকে এমনি দেয় না, পাঁচ কাঠা ভূমি লইয়াও লোকে যেখানে মারা-মারি কাটাকাটি করে—হাইকোর্ট-সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত লড়াই করে সেখানে মানুষ কি এইরূপ আবেদনে স্বেচ্ছায় সাড়া দিবে? ভারতের কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩০ কোটি একর। ইহার এক-ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ৫ কোটি একর ভূমি যদি আজ যাহাদের হাতে ভূমি আছে, তাহাদের হাত হইতে ভূমিহীন দরিদ্রের হাতে আসিয়া যায় তবেই ভূমি-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এত বড় বিরাট সমস্যার সমাধান কিভাবে হওয়া সম্ভব?

গত ১৯৫২ সালের মে মাসে ২৪-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী হটুগঞ্জ গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ ভূদানযজ্ঞ সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের প্রবর্তন করা হয়। উহার অব্যবহিত পরে ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচার ও ভূদান সংগ্রহ করিবার জন্য ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় লেখক পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন। একদিন বৈকালে এক গ্রামে ভূদানযজ্ঞ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার সময় জনসভায় উপস্থিত সেই অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লেখককে বলিলেন—“দেখুন, এই আন্দোলন

পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নহে। জমি পাইতে হইলে আইন করিয়া লইতে হইবে— নচেৎ বলপ্রয়োগ করিয়া লইতে হইবে। জমি চাহিলে লোকে স্বেচ্ছায় জমি দিবে—এ' আশা করা পাগলামি ছাড়া আর কি হইতে পারে? বিনোবাজী এক পাগল, আর তাঁহার পিছনে আপনারা কিছু পাগল জুটিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্র, আমাদের মহাভারত এই শিক্ষা দান করিয়াছে যে—বিনা লড়াই-এ কেহ কাহাকেও ভূমি ছাড়িয়া দেয় না—শান্তির পথে কেহ ভূমি প্রত্যর্পণ করে না।" লেখক উহার উত্তরে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"আমি কিন্তু মহাভারত হইতে ইহার বিপরীত শিক্ষালাভ করিয়াছি। পাণ্ডবদের ন্যায্য ভূমি কৌরবেরা ফেরৎ দিলেন না। শান্তির পথে সূচ্যগ্র ভূমিও দিলেন না। লড়াই বাধিল। তদানীন্তন ভারতবর্ষে যেখানে যত রাজা ছিলেন, তাঁহারা হয় পাণ্ডব পক্ষে না হয় কৌরব পক্ষে যোগদান করিলেন। কৌরবেরা সকলে নিহত হইলেন, পাণ্ডবদের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ হইল। কুলে বাতি দিবার মত কয়েকজন মাত্র জীবিত রহিলেন। এতদূর মর্মান্তিক পরিণতি ঘটিল! মহাভারত এ সম্পর্কে যদি কোনো শিক্ষা দিয়া থাকে, তবে তাহা হইতেছে এই যে, যাহার প্রাপ্য ভূমি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়, নচেৎ সর্বনাশ অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী।"

কিন্তু তথাপি মন হইতে সংশয় দূরীভূত হয় না। এইরূপ বলা হয় যে, ইতিহাসে ইহার নজীর নাই। যাহা ইতিপূর্বে কখনও সংঘটিত হয় নাই, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে?—এইরূপ আপত্তি বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ইতিহাসে কোন্ বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়? যাহা কখনও ঘটে নাই তাহা সংঘটিত হইলে তবেই তাহা ইতিহাসে স্থানলাভ করে। যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিয়া থাকে, তাহা তো ইতিহাসই নহে। ফরাসী-বিপ্লব সংঘটিত হইবার পূর্বে ইতিহাসে কি তাহার কোন নজীর ছিল? নিঃশস্ত্র সংগ্রাম করিয়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বে কি কখনও ইতিহাসে ঐরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল? অতএব এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। তথাপি মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হয় না। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের উৎপত্তি, বিকাশ ও অদ্যাবধি পরিণতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এবং ভূদানযজ্ঞের অন্তর্নিহিত ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করিলে এই সংশয় দূরীভূত হইবে আশা করা যায়।

॥ ৩ ॥ কে এই বিনোবা?

ভূদানযজ্ঞের স্রষ্টা ও প্রবর্তক আচার্য বিনোবা ভাবে। কে এই বিনোবা? তিনি আজীবন সেবাব্রতী সন্ন্যাসী, মহাত্মা গান্ধীর পরম অনুগামী, গান্ধী-মন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম ধারক ও বাহক। তাঁহাকে মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী বলা হয়। সেই উত্তরাধিকারীই যোগ্য উত্তরাধিকারী যিনি পিতৃপুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন এবং সেই শিষ্যই যোগ্য শিষ্য যিনি গুরুকে ছাড়াইয়া যাইতে সক্ষম হন। সেই অর্থে বিনোবা মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক যোগ্য উত্তরাধিকারী ও যোগ্য শিষ্য। তিনি এই যুগের যুগপুরুষ। স্বাধীনতালাভের পর ভারতে রামরাজ্য বা 'সর্বোদয়' প্রতিষ্ঠা করা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্তির অল্পদিনের মধ্যে তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন এমন কোন মহাপুরুষ তখন দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না এইজন্য দেশ হতাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বিনোবা বহুদিন যাবৎ একান্ত সাধনায় লীন হইয়া ছিলেন। সেই একান্তবাস ত্যাগ করিয়া বিনোবা বাহির হইয়া আসিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার আলোক-ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অল্পদিনের মধ্যেই দেশের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে এক নবীন জাগৃতি আসিল। আজ সারা ভারত আশাভরা দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। বর্তমানে সমগ্র জগৎ শান্তি-পিপাসু। সুতরাং জগতের অন্যান্য দেশও অতীব আগ্রহে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত শান্তির বাণী শুনিতেছে—তৃষ্ণার্ত যেমন পিপাসা শান্তির জন্য জল গ্রহণ করে। ১৯৪০ সালে শ্রীমহাদেব দেশাই বিনোবা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"লোকে আজ নহে—কয়েক বৎসর পরে বিনোবার প্রভাব বুঝিতে পারিবে।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত কোলাবা জিলার গাগোদা গ্রামে ১৮৯৫ খৃীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে চিৎপাবন ব্রাহ্মণকুলে বিনোবার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নরহরি ভাবে ও মাতা রুক্মিণী দেবী বা রখুমাঈ। পিতামহ শম্ভুরাও ভাবে।

বিনোবার পিতামহ শম্ভুরাও উদার, ধর্মপরায়ণ ও তেজস্বীপুরুষ ছিলেন। তখনকার দিনেও তিনি অস্পৃশ্যতা মানিতেন না। সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবও তাঁহার ছিল না। কোনও নিন্দাকে গ্রাহ্য না করিয়া একবার এক মুসলমান সংগীতজ্ঞকে তিনি পাটেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট হইতে ভজন শুনিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রায়ন ব্রত পালন করিতেন। ইহা অতি কঠোর ব্রত। শম্ভুরাওয়ের তিন পুত্র—নরহরি, গোপালরাও ও গোবিন্দ। জ্যেষ্ঠপুত্র নরহরি বুদ্ধিমান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি কলেজের পড়া ছাড়িয়া দিয়া বয়ন-শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বরোদার এক কারখানায় কিছুদিন কাজ করেন। রঞ্জনের (ডাইইং) কাজ শিক্ষা করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কারখানার কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি বরোদার মহারাজার ব্যক্তিগত অফিসের হেডক্লার্কের কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু রঞ্জন-বিদ্যার গবেষণা তাঁহার অতীব সখের বিষয় (হবি) হইয়া থাকে।

নরহরের প্রথম সন্তান বিনোবা। বিনোবার পুরা নাম—বিনায়ক নরহর ভাবে। বাড়ীতে তাঁহার ডাক-নাম ছিল 'বিন্যা'। মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে আসার পর হইতে গান্ধীজীর দেওয়া নাম হইয়াছিল—বিনোবা। বিনোবার তিন ভ্রাতা—বালকৃষ্ণ, শিবাজী ও দত্তাত্রেয়। এক ভগিনী শান্তা। কিশোর বয়সে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তাত্রয়ের মৃত্যু হয়। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে ভগিনী শান্তারও মৃত্যু হয়। বিনোবা গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে যোগদান করার পর ভ্রাতা বালকৃষ্ণ ও শিবাজী জ্যেষ্ঠভ্রাতার পদাংক অনুসরণ করিয়া তথায় চলিয়া অসেন এবং আশ্রমের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। বালকৃষ্ণ (বালকোবা) এক্ষণে মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত উরুলিকাঞ্চন প্রাকৃতিক চিকিৎসালয় কেন্দ্রের দায়িত্ব লইয়া আছেন। শিবাজী একজন বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও সন্ত-সাহিত্যে প্রগাঢ় পন্ডিত। ভারতের লিপি-সংশোধনের কাজে তিনি ব্যাপৃত আছেন।

বিনোবার বাল্যকাল পাহাড় পরিবেষ্টিত গাগোদা গ্রামে অতিবাহিত হয়। পিতামহের ধর্মনিষ্ঠা, ভক্তিভাব ও তেজস্বিতা বিনোবার সুকুমার মনে গভীর ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেয়। তাঁহার মাতা পরম ধর্ম-পরায়ণা ও পরম ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় উচ্চ ও উদার ছিল। মাতা ছিলেন

বিনোবার শ্রেষ্ঠ গুরু। তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে অনেক কিছু পাইয়াছেন। মা কোন গহনা পরিতেন না। যতই ঠাণ্ডা পড়ুক না কেন তিনি প্রত্যহ ভোরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতেন। তাঁহার পিতার নিকট হইতে শেখা বহু মারাঠী-ভজন তাঁহার মুখস্থ ছিল। রান্না করিবার সময়ও তিনি গুন-গুন সুরে ভজন গাহিতেন। এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তরকারীতে দুইবার লবণ দিলেন কি আদৌ দিলেন না তাহা খেয়াল থাকিত না। পুত্র বিনোবাও তন্ময় হইয়া মায়ের ভজন শুনিতেন। ধর্মভাব বিকাশের জন্য মা পুত্র-বিনোবাকে সাধু-সন্তদের কাহিনী শুনাইতেন। উহা হইতেই ধর্মগ্রন্থ পাঠের প্রতি বিনোবার মনে প্রবল আগ্রহ জন্মে। মার নির্দেশে বিনোবাকে খাওয়ার পূর্বে তুলসীগাছে জল দিতে হইত এবং ঐরূপে মা পুত্রকে শিখাইতেন যে, অন্যকে না খাওয়াইয়া নিজে খাইতে নাই—এমন কি বৃক্ষ-জগৎকেও না খাওয়াইয়া নিজে খাইতে নাই। মা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া শিব-মন্দিরে গিয়া শিবের মস্তকে জলাভিষেক দেখাইতেন এবং তদ্দ্বারা বিনোবাকে শিখাইতেন যে, বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া নিরন্তর যে অভিষেক হইতেছে উহাই সাধনার নিদর্শন। বাল্‌তিভরা জল একসঙ্গে ঢালিয়া দিলে তাহাতে অভিষেক তথা সাধনা হয় না। নিতান্ত বাল্যকাল হইতেই বিনোবার মনের গতি ভোজন-সুখের প্রতি বীতরাগ ছিল। মা-ও তাঁহাকে শিখাইতেন যে, জিনিসের প্রতি 'আরও চাই' রূপ আকাঙ্ক্ষা করিলে তাহাতে সুখ পাওয়া যায় না। একমাত্র সংযমের দ্বারাই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। মা একবার পুত্রকে আম কিনিয়া খাইবার জন্য পয়সা দিয়াছিলেন। কিন্তু বিনোবা আম খাইতেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন এবং পরে একদিন সেই পয়সা মাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মা ছিলেন উদার ও সমদর্শী। তাঁহাদের বাড়ীতে এক আশ্রিত অন্ধ থাকিতেন। বিনোবা প্রভৃতি তাঁহাকে 'অন্ধ-কাকা' বলিয়া ডাকিতেন। মা আশ্রিতের প্রতি এমন উদার ব্যবহার করিতেন যে, তিনি যে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ নন তাহা বিনোবা প্রভৃতি তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই 'অন্ধ-কাকা'র মৃত্যুর পর যখন বাড়ীতে অশৌচ পালন করা হইল না তখন তাঁহারা মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেহ ছিলেন না।

মায়ের স্বভাব ছিল সত্যিকারের সেবিকার। কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে অসুখ হইলে মা তাহাদের বাড়ীতে গিয়া রান্না করিয়া দিয়া আসিতেন। একবার মা নিজেদের রান্না শেষ করিয়া পরে অন্য এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে রান্না করিতে যাইতেন বলিয়া বিনোবার মনে সন্দেহ হইল যে, মায়ের মনে হয়ত কিছু স্বার্থপরতার ভাব থাকিবে। কিন্তু তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, উহাতে কোনরূপ স্বার্থপরতা নাই, বরং পরার্থপরতা রহিয়াছে। কারণ অন্যের বাড়ীতে পরে রান্না হয় বলিয়া সেই বাড়ীর লোকেরা গরম গরম খাইতে পান। বাড়ীতে সবল সুস্থ ভিক্ষুক আসিলে মা তাহাকেও বিমুখ করিতেন না। কিন্তু বিনোবা ভাবিতেন যে, কার্যক্ষম, সবল সুস্থ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিলে অন্যায় করা হয়, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। একদিন বিনোবা মাকে একথা বলেন। কিন্তু মায়ের নিকট হইতে তিনি যে উত্তর শুনেন তাহা খণ্ডন করিবার মত যুক্তি বিনোবা আজ পর্যন্তও খুঁজিয়া পান নাই। "ভিক্ষা করিবার জন্য যে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায় সে তো ভিক্ষুক নয়—সে যে সাক্ষাৎ ভগবান। ভগবানকে কি অপাত্র ভাবিতে আছে?" মা-র এইসব মহৎ আচরণ দেখিয়া বিনোবার তরুণ মনে সমভাব ও ভক্তির বীজ উপ্ত হইয়াছিল।

ধর্মগ্রন্থ পাঠের প্রভাব এবং মায়ের সরল সহজ পরিশুদ্ধ জীবনের ঘনিষ্ঠতম সাহচর্য বিনোবার তরুণ মনকে সাধনার দিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। ক্রমে-ক্রমে বিনোবা কঠোর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মা একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "বিন্যা, গৃহস্থাশ্রম-ধর্ম ঠিকমত পালন করিতে পারিলে এক পুরুষ উদ্ধার হয়, কিন্তু উত্তম ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পারিলে সাত পুরুষ উদ্ধার হয়।" এরূপে মা পুত্রের হৃদয়কে ব্রহ্মচর্য পালনের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তখন বিনোবার বয়স মাত্র দশ বৎসর। তৎপূর্বে রামদাস স্বামীর "দাসবোধ" নামক পুস্তক পড়িয়াও তাঁহার মন ব্রহ্মচর্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। মাতার আশীর্বাদ পাইয়া ঐ দশ বৎসর বয়স্ক বালক আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন।

এহেন পিতামহ! এহেন মাতা! সহজাত বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস প্রবৃত্তি লইয়া যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার এইরূপ কুলেই জন্ম হইবার কথা।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ১১ বৎসর বয়সে বিনোবা মা-র সঙ্গে তাঁহার পিতার কর্মস্থল বরোদায় আসিলেন এবং বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম হইতে বিনোবা কুশাগ্রবুদ্ধি ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ। সম্প্রতি তিনি নিজে একস্থানে বলিয়াছেন যে, একসময়ে তাঁহার বিশ-পঁচিশ হাজার শ্লোক কণ্ঠস্থ থাকিত। বাল্যকল হইতেই তিনি অতীব অধ্যয়নশীল ছিলেন। বিনোবা ১৩।১৪ বৎসর বয়সের মধ্যেই বরোদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা খুবই আশ্চর্যের কথা। কারণ বরোদা সেন্ট্রাল লাইব্রেরী তখনকার দিনে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরী ছিল। যখন লাইব্রেরীতে আর কোনও পুস্তক পড়িতে বাকি থাকিল না তখন তিনি সাথীদের সহযোগিতায় "বিদ্যার্থী-মণ্ডল" নামে এক অধ্যয়ন-সংস্থা সৃষ্টি করিলেন। নানাস্থান হইতে ১৬০০ পুস্তক সংগ্রহ করা হইল। উহার প্রত্যেক পুস্তকই সেই সেই বিষয়ের শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলিয়া পরিগণিত ছিল। বিনোবার বেড়াইবার খুব সখ ছিল। একসঙ্গে ৫।৭ মাইল বেড়াইলেও তাঁহার কিছুই মনে হইত না। কোন-কোন দিন বেলা ১২টার সময় তাঁহার বেড়াইবার ঝোঁক আসিত। সাথীরা মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। কিন্তু তাঁহারা না যাইয়া পারিতেন না। তাঁহার বক্তৃতা দিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। যখন তিনি বলিতে আরম্ভ করিতেন তখন তাঁহার বক্তৃতা অখণ্ড প্রবাহের মত চলিতে থাকিত। সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া বন্ধুদের সঙ্গে যখন আলোচনাক্রমে বক্তৃতা দিতে থাকিতেন তখন রাস্তায় ভীড় জমিয়া যাইত।

বিনোবা স্কুলে সর্বদা প্রথম হইতেন। মারাঠী-ভাষায় বালককাল হইতেই তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা। কিন্তু প্রথমে পিতার আদেশে সংস্কৃত ছাড়িয়া তাঁহাকে ফরাসী-ভাষা লইতে হইয়াছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করা তাঁহার পক্ষে কিছু কঠিন ছিল না. কিন্তু এজন্য তিনি কোন চেষ্টা করিলেন না। কারণ তাঁহার মনের গতি ছিল অন্যদিকে। ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া তিনি কলেজে ভর্তি হন। গণিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় ছিল। গণিতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতার খ্যাতি ছাত্র ও বিদ্যার্থী মহলে ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ সাধারণ শিক্ষার প্রতি ও গতানুগতিক জীবন-যাত্রার প্রতি তিনি বীতরাগ হইয়া আসিতেছিলেন। স্কুলে পড়িবার সময় তাঁহার কঠোর জীবনযাপন চলিতেছিল। —চাটাইয়ের উপর শুইতেন এবং বালিশ ব্যবহার করিতেন না। কলেজ-জীবনেও ঐরূপ চলিতে থাকিল। অন্যদিকে স্কুলে পড়িবার সময়ই তাঁহার মন রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তখন স্বদেশী-আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গের যুগ। কলেজে পড়িবার সময় তাঁহার মন ক্রমশ বাংলার বিপ্লবী দলের কার্যকলাপের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। এরূপে তাঁহার মন দুইদিকে ঝুঁকিতেছিল—(১) আধ্যাত্মিকতা ও (২) দেশের স্বাধীনতালাভ। এই দুইভাবে ভাবিত হইয়া তিনি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া গৃহত্যাগ করিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিলেন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে একদিন তিনি উনানের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সার্টিফিকেট-গুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন তিনি ঐরূপ করিতেছেন। তিনি বলিলেন—"আমি আর পড়াশুনা করিব না এবং কোনদিন চাকুরীও করিব না। এইজন্য সার্টিফিকেটগুলি পোড়াইয়া ফেলিতেছি।" মা বলিলেন—"সার্টিফিকেটগুলি রাখিয়া দিলে কখনও কোন কাজে লাগিয়া যাইত।" বিনোবা তাহার উত্তরে বলিলেন, "যদি ঐগুলি রাখিয়া দিই তবে কোনদিন হয়তো ইহার বন্ধনে পতিত হইব। সুতরাং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দড়ি কাটিয়া ফেলাই ঠিক।" কিরূপ দৃঢ় সংকল্প লইয়া তিনি কোন কার্যে ব্রতী হন ইহা তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইন্টার-মিডিয়েট পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি বোম্বাই রওনা হইলেন। তাহা হইল ১৯১৫ সালে। তখন তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। কিন্তু বোম্বাইয়ে না গিয়া তিনি কাশী চলিয়া আসিলেন এবং পথ হইতে বাড়ীতে পত্র লিখিয়া তাঁহার গৃহত্যাগের কথা জানাইয়া দিলেন।

কাশী আসিয়া তিনি ভালভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং কাশীর বিখ্যাত মুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে গভীরভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠে মগ্ন হইলেন। ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আসন, প্রাণায়ামাদিও করিতে লাগিলেন। ২ ঘণ্টা করিয়া ছাত্র পড়াইয়া তিনি মাসে ২৲ টাকা উপার্জন করিতেন এবং ঐ ২৲ টাকায় তাঁহাকে জীবনযাপন করিতে হইত। এইজন্য ঐ

সময়ে তিনি দই ও রাঙাআলু খাইয়া থাকিতেন। দুইটি উদ্দেশ্য লইয়া তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন—ব্রহ্ম ও বিপ্লবের সন্ধান। বিপ্লবের জন্য তাঁহার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বাংলাদেশে আর ব্রহ্মের জন্য হিমালয়ে। কিন্তু এই দুইএর কোথাও তাঁহার যাওয়া হয় নাই।

তখন ১৯১৬ সাল। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী কাশী আসিয়াছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে বড়লাট, বহু দেশীয় রাজা-মহারাজা ও দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী এনি বেসান্ট্ সভানেত্রী ছিলেন। সেখানে মহাত্মা গান্ধী এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি বলেন (১) হীরা-মণিমুক্তা খচিত বহুমূল্যে পোষাকে ভূষিত হইয়া গরীবের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা দিলে গরীবকে পরিহাস করা হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গ যদি গরীবদের হিতাকাঙ্ক্ষী হন তবে তাঁহাদের বিপুল ধনসম্পদ দরিদ্রের সেবায় নিয়োজিত করা প্রয়োজন। (২) যে দেশে শতকরা ৭৫ জন কৃষক, সে দেশের মুক্তি মুষ্টিমেয় আমীর-ওমরাহ বা ডাক্তার-উকিলের হাতে নয়। ভারতের মুক্তি কোটি কোটি দরিদ্র চাষীর হাতে। (৩) দেশ-প্রেমের জন্য বিপ্লবীদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা আছে কিন্তু হিংসার পথে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া বিশেষ কোন লাভ হইবে না। ভারতের মুক্তি অহিংসা ও নির্ভয়তার পথে হইবে।

বিনোবাজীর জীবনের এই সময়কার কাহিনী তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন এবং কিরূপে তাঁহার জীবনের প্রথম দীক্ষা-গ্রহন হয় তাহাও ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"১৯১৬ সালের কথা। আমি তখন বরোদা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়িতেছিলাম। ঐ সময় আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা হয়। এইজন্য কলেজ-জীবন আমার আর ভাল লাগিতেছিল না। আমি কলেজ ও ঘর ছাড়িবার সিদ্ধান্ত করিলাম। গৃহত্যাগ করিয়া ভাবিলাম যে আমি হিমালয়ে চলিয়া যাইব। কিন্তু পরে ঠিক করিলাম, কাশীতে কিছুদিন থাকিয়া হিমালয়ে যাইব। কাশী পৌঁছাইলাম। তখন সেখানে বাপুর এক বক্তৃতা সম্পর্কে খুব আলোচনা চলিতেছিল। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাত্মা গান্ধীর এক বক্তৃতা হইয়াছিল। ঐ বক্তৃতায় তিনি অহিংসা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়া ছিলেন। প্রধান কথা ছিল যে নির্ভয়তা ছাড়া অহিংসা

চলিতেই পারে না। মনে-মনে হিংসার ভাব পোষন করা অপেক্ষা খোলাখুলি-ভাবে হিংসা করা কম হিংসা। অর্থাৎ মানসিক হিংসাই প্রধান হিংসা। আর নির্ভয়তা ছাড়া অহিংসা আসিতে পারে না। যে সব রাজা-মহারাজা নানাবিধ বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি তাঁহাদেরও খুব কড়া সমালোচনা করেন। তাঁহার ঐ বক্তৃতা খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এইজন্য সেখানে ইহা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছিল। আমি যখন কাশী পৌঁছাইলাম, তাহার একমাস পূর্বে ঐ ঐতিহাসিক বক্তৃতা হইয়া গিয়াছিল। তথাপি সহরে তাহা লইয়া আলোড়ন চলিতেছিল। আমি ঐ বক্তৃতা পড়িলাম। তাহাতে আমার মনে কতই না সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগিল! এইজন্য আমি বাপুকে এক চিঠি লিখিলাম। আমার মনে যে সব প্রশ্ন জাগিয়াছিল তাহা আমি তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি আমার ঐ চিঠির খুব ভাল উত্তর লিখিয়াছিলেন।

"আপনারা শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন যে, এ যাবৎ যাহা কিছু পত্র ব্যবহার হইয়াছে তাহা সবই আমি অগ্নিনারায়ণকে অর্পণ করিয়া দিয়াছি। বাল্যকালেও আমি খুব ভাল ভাল কবিতা রচনা করিয়া তাহা অগ্নিনারায়ণকে সমর্পণ করিতাম। আমার এই বিধ্বংসক বৃত্তি বাল্যকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এখনও তাহা রহিয়াছে। আমার কাছে আর একটিও চিঠি নাই। বাপু প্রথম চিঠির উত্তরে আমার সন্দেহের জবাব বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রত্যুত্তরে ১০।১৫ দিন পরে আমি আবার তাঁহাকে আরও কিছু সন্দেহের কথা জানাইয়া চিঠি দিই। এইবার তাঁহার এক কার্ড আসিল। তাহাতে তিনি লিখিলেন—'তুমি অহিংসা সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন তুলিয়াছ চিঠির মাধ্যমে তাহার কোন সমাধান হইতে পারে না। তাহার জন্য জীবনের সংস্পর্শে আসা আবশ্যক। তুমি আশ্রমে আসিয়া কিছুদিন আমার সঙ্গে থাক। তাহা হইলে ধীরে ধীরে কথাবার্তা হইতে পারিবে।' সমাধান কথার দ্বারা নয়, জীবনের দ্বারা হইবে—তাঁহার এই কথা আমার ভাল লাগিল। হিমালয় অভিমুখে আমার যাওয়ার কথা ছিল। হিমালয় কাশীর উত্তরদিকে আর এই আশ্রম ছিল আহ্‌মদাবাদের কাছে কোচরব-এ। হিমালয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আমার বাপুর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা হইল।

"আর, ঐ চিঠির সঙ্গে বাপু তাঁহার আশ্রমের এক নিয়মপত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় হইয়াছিল। তখন পর্যন্ত কোনও সংস্থার ঐরূপ কোন নিয়মপত্র পড়িবার সুযোগ আমার হয় নাই। তাহাতে লেখা ছিল—'এই আশ্রমের লক্ষ্য বিশ্বহিত-অবিরোধী দেশসেবা। এই জন্য আমরা নিম্নলিখিত ব্রত আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করি।' নীচে সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ শরীরশ্রম ইত্যাদি একাদশ ব্রতের নাম লেখা ছিল। আমার কাছে তাহা খুবই আশ্চর্য বলিয়া মনে হইল। এমন কোন দেশ আছে কি যেখানে দেশ উদ্ধারের জন্য সত্য ও অহিংসার আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজন হয়? আমি বহু ইতিহাস পড়িয়াছি কিন্তু কোথাও এইরূপ পড়ি নাই যে দেশ উদ্ধারের জন্য ব্রত পালনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। এইজন্য আমার কাছে ইহা খুবই আশ্চর্যজনক বলিয়া বোধ হইল। এইসব জিনিস যোগশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র বা ভক্তিমার্গের বিষয় হইতে পারে কিন্তু দেশসেবার জন্যও যে এইসবের প্রয়োজন হয় তাহা ঐ নিয়মপত্রে লেখা ছিল। এই ধরনের কথা আমার জানা ছিল না। আমার মন ঐদিকে আকৃষ্ট হইল। ভাবিলাম—একবার দেখিয়া লওয়া যাউক ব্যাপারটা কি! দেশ-সেবার সঙ্গে ব্রত-নিয়মের সম্বন্ধ কেমন করিয়া জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে এই জিজ্ঞাসু বৃত্তি লইয়া সত্যের সন্ধানে আমি সেখানে যাইলাম।

"আমার যাওয়ার কথা ছিল হিমালয়ে, কিন্তু আমি ঐভাবে পৌঁছিয়া যাইলাম আহ্‌মদাবাদে! ঐদিন ছিল ১৯১৬ সালের ৭ই জুন। ভোরে আহ্‌মদাবাদ স্টেশনে নামিলাম। সঙ্গে যাহা কিছু জিনিসপত্র ছিল তাহা নিজেই বহিয়া লইয়া চলিলাম। বেশী মালপত্র ছিল না। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পায়ে হাঁটিয়া চলিলাম। লোকে এলিস ব্রিজের উপর দিয়া রাস্তা দেখাইয়া দিয়াছিল। ঐ রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে ৮টার সময় আশ্রমে পৌঁছাইলাম। বাপুকে খবর দেওয়া হইল যে, 'এক নূতন ভাই আসিয়াছে।' তিনি বলিলেন, 'ঠিক আছে, স্নানাদি সারিয়া আমার কাছে আসিতে বল।' আমি স্নানাদি শেষ করিয়া তাঁহার কাছে গেলাম। দেখিলাম তিনি বসিয়া বসিয়া তরকারি কুটিতেছেন, কাজ করিতেছেন। আমার পক্ষে ইহাও এক নূতন দৃশ্য ছিল। রাষ্ট্রনেতা তরকারি কোটেন এই কথা আমি কোথাও পড়ি

নাই। দেশের নেতা লেখেন, ধর্মগ্রন্থ পড়েন অথবা বক্তৃতা করেন। বাপু আমাকে তাঁহার পাশে বসাইলেন আর আমার হাতে একটা ছুরি দিলেন। সেখানে আর যে দুই-চারিজন বসিয়াছিলেন তাঁহাদের হাতেও ছুরি ছিল। ইহার পূর্বে আমি কখনও ছুরি ব্যবহার করি নাই। আপনাদের ইহাও একটি হাসির ব্যাপার বলিয়া মনে হইবে যে, আমার পেন্সিলও অদ্ভুত ধরনের ছিল, তাহা বেশী ক্ষয় হইত না। পেন্সিলটা আমি ৭।৮ শত পৃষ্ঠার এক 'নোট-বুকে' বাঁধিয়া রাখিতাম। ঐ একটি মাত্র পেন্সিল দিয়া আমার চারি বৎসরের শিক্ষার কাজ চলিয়াছিল। ক্ষয় হইতে হইতে তাহা একদম ছোট হইয়া গিয়াছিল। আমি ছুরি দিয়া পেন্সিল কাটিতে পারিতাম, কিন্তু তরকারি কি করিয়া কাটিতে হয় তাহা জানিতাম না। অবশ্য আমি তরকারি খাইতে জানিতাম। রাষ্ট্রনেতা তরকারি কুটিতেছেন ইহা আমার কাছে খুব অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। কারণ আমি তরকারি কুটিবার কাজকে স্ত্রীলোকদের কাজ বলিয়াই জানিতাম। আমি সেইখানে বসিয়া যাইলাম আর কাজ করিতে-করিতেই সব কথাবার্তা হইল। এইভাবে আমার প্রথম দীক্ষা লাভ হইল।

"ঐদিন হইতে আমার অন্তরের প্রশ্নসমূহের সমাধান হইতে লাগিল। আমি প্রায় প্রত্যেক মাসে মৌন থাকিতাম। কেহই জানিত না যে আমি কিছু জানি বা কিছু পড়িতে পারি। সারাদিন প্রায় মৌন থাকিয়া কাজ করিতাম। ক্বচিৎ কোন ভাই-এর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হইত। তবে তাহাও বেশী নয়। আমি কাজেই মগ্ন হইয়া থাকিতাম। যদিও কাজ করার দিকে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না তথাপি এক পারমার্থিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি ইহা মনে করিয়া আমি কাজ করিয়া যাইতাম। বাপু যখন কথা বলিতেন তখন তাহার মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, অহিংসাশক্তি, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা থাকিত সঙ্গে সঙ্গে তরকারি কোটাও চলিত। কোন্ তরকারি আনা হইয়াছে, তাহা কত দামে পাওয়া গিয়াছে ইত্যাদি কথাও অর্থাৎ রান্না করা, আচরণ-বিধি, রাষ্ট্রনীতি, স্বাস্থ্য ও পরমার্থ প্রভৃতি সব বিষয়ের খিচুড়ি হইত। সব বিষয়ে মিলাইয়া দেখিলে তাহা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী বলিয়া দেখাইত। কিন্তু শরীরে নখ হইতে শিখা পর্যন্ত বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকা সত্ত্বেও যেমন তাহা শরীরই থাকে, তেমনি এইসব বিচার পৃথক-পৃথক হাওয়া

সত্ত্বেও একই জীবনের অংগ হইয়া থাকে। পারমার্থিক জীবনের যে মূল্য সাধারণ কাজেরও সেই মূল্য—এইভাবে সমস্ত কাজ চলিত। আর আমার আকর্ষণ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিল। এর পরে আমার মূল কল্পনা ছিল কিছু সংস্কৃত অধ্যয়ন করার। এইজন্য এক বৎসরের ছুটি লইয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যাইলাম।”

আশ্রমের সহজ সরল জীবনযাত্রা, কথায় ও কাজে অভেদভাব, দেশভক্তি এবং ত্যাগ ও তপস্যার জীবন দেখিয়া বিনোবা বিশেষভাবে অভিভূত হন। যে-উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন সেই বিপ্লব ও আধ্যাত্মিকতা এই উভয়ের সমাবেশ তিনি মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে দেখিতে পান। অতঃপর মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে তিনি আশ্রমে যোগদান করেন।

আশ্রমে যোগদান করায় বিনোবাজীর জীবনধারা নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হইবার সুযোগ পাইল এবং মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় পরিচালক পাইয়া তিনি ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন। তিনি আশ্রমে জড়-ভরতের ন্যায় পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। জল তোলা, সাফাই করা, রান্না করা, সুতাকাটা ও বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি আশ্রমের যাবতীয় কাজে তিনি অংশ গ্রহণ করিতেন। অধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভংগ হইল। স্বাস্থ্যোদ্ধার ও সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্যে তিনি এক বৎসরের জন্য ছুটি লইলেন এবং ওয়াই নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া নারায়ণ শাস্ত্রী মারাঠী নামক একজন আজন্ম ব্রহ্মচারী পণ্ডিতের নিকট উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র ও শংকর-ভাষ্য, মনুস্মৃতি, পাতঞ্জল, যোগ-দর্শন, বৈশেষিক দর্শন ও যাজ্ঞবল্ক-স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। উপরন্তু তিনি বহু শিক্ষার্থীকে গীতা অধ্যয়ন করান। এরূপে তিনি সংস্কৃতে ও ধর্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নিজের জীবনকে আশ্রমের আদর্শ অনুসারে আরও সুদৃঢ়ভাবে গঠন করিয়া তুলিবার জন্য ঐ প্রবাসেও তিনি কঠোর শৃংখলার সহিত জীবনযাপন করিতে থাকেন। প্রবাস হইতে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে এক দীর্ঘ পত্রে তাঁহার কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ দেন এবং লেখেন যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীকে পিতৃস্বরূপ মনে করেন। ঐ পত্র পাইয়া মহাত্মা গান্ধীর মনে হয় যে, পুত্র পিতাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে। তিনি খুশী হইয়া মন্তব্য করেন—“ভীম হ্যায় ভীম।” এক বৎসরের মধ্যে

তাঁহার কাজ সমাপ্ত হয় নাই বলিয়া তিনি আর দুই মাসের ছুটি লইলেন। যেদিন চৌদ্দ মাস পূর্ণ হয় ঠিক সেইদিন সেই সময়ে বিনোবা চুপচাপ আশ্রমে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। এইরূপ তাঁহার নিয়মনিষ্ঠা ও সত্যনিষ্ঠা! উহা মহাত্মা গান্ধীর মনের উপর গভীর রেখাপাত করিল। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"ইহাতে তিনি বুঝিয়া লইলেন যে এই ছেলেটি যাহা কথা দেয় তাহা ঠিকভাবে পালন করে এবং ইহার মধ্যে কিছু সত্যনিষ্ঠা আছে। এজন্য তিনি খুব প্রেমের সঙ্গে আমার দোষ সহ্য করিতেন আর শেষ পর্যন্ত আমাকে ছাড়িয়া দিয়া নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর চার বৎসর আমি সবরমতী আশ্রমে ছিলাম।" কিছুদিন পরে আশ্রমে পায়খানা সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়। বিনোবাজী সর্বাগ্রে ঐ কাজ গ্রহণ করেন এবং অবিরত তিনমাসকাল অতিশয় নিষ্ঠা ও তন্ময়তার সঙ্গে ঐ কাজ করেন। কিছুদিন তিনি গুজরাট বিদ্যাপীঠে অধ্যাপনা এবং আশ্রমে ব্যবস্থাপকের কাজও করেন।

বরোদায় ১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দেয়। বিনোবার মা ঐ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। মা মৃত্যুশয্যায়। সংবাদ পাইয়া বিনোবা আশ্রম হইতে আসিয়া মায়ের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়া এবং বহুদিন পরে প্রিয়তম পুত্রের সহিত শেষবারের মত মিলিত হইয়াও মা বলিয়াছিলেন—"কাজকর্ম ফেলিয়া কেন চলিয়া আসিলে?" ধন্য মাতা! মা চলিয়া গেলেন। বিনোবা শ্মশানের ব্রাহ্মণদের দ্বারা মায়ের মুখাগ্নি ক্রিয়া করাইতে রাজী হইলেন না। তিনি মায়ের শবানুগমনও করিলেন না, মায়ের আত্মার শান্তির জন্য গীতা-উপনিষদ পাঠ করিতে থাকিলেন।

১৯২১ সালে শেঠ যমুনালাল বাজাজের অনুরোধক্রমে মহাত্মা গান্ধী বিনোবাকে ওয়ার্ধায় সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পাঠান। প্রথম হইতেই যমুনালালজীর সবরমতী আশ্রমে যাতায়াত ছিল। তাঁহার তীব্র ইচ্ছা ছিল যে, মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ধায় আসিয়া আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। এখন বিনোবাকে পাইয়া তিনি ধন্য হইলেন। বিনোবা তথায় আশ্রম স্থাপন করিলেন। তখন হইতে ওয়ার্ধার সমস্ত গঠনমূলক কর্ম-প্রচেষ্টা বিনোবাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে।

সবরমতী আশ্রমে তিনি ছিলেন একজন মৌন-সাধক। ওয়ার্ধায় তিনি হইলেন আশ্রম-পরিচালক। আশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল অহিংসাব্রতী জীবন-ব্যাপী দেশসেবক সৃষ্টি করা। সেই উদ্দেশ্যে আশ্রমবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। গভীর চিন্তার পর তিনি আশ্রমবাসীদিগের পক্ষে পালনীয় একাদশ ব্রত স্থির করিয়া উহা শ্লোকবন্ধ করেন। আশ্রমের প্রাতঃকাল ও সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় উহার আবৃত্তি চলিতে লাগিল এবং তদনুসারে আশ্রমবাসীদিগের জীবনগঠনের প্রযত্নও চলিতে লাগিল। একাদশ ব্রত এই—সত্য, অহিংসা, অস্তেয় (অচৌর্য), ব্রহ্মচর্য, অসংগ্রহ, শরীর-শ্রম, অস্বাদ, অভয়, সর্বধর্মে সমভাব ও অস্পৃশ্যতা পরিহার।

ওয়ার্ধায় যমুনালালজী ও তাঁহার পরিবারের সকলের সহিত বিনোবার অত্যন্ত আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। যমুনালালজী তাঁহাকে আধ্যাত্মিক গুরুরূপে গ্রহণ করেন। বিনোবার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রভাবে যমুনালালজীর জীবন উত্তরোত্তর ত্যাগশীল হইতে থাকে। যমুনালালজীর পুত্র কমলনয়ন ও কন্যা মদালসার শিক্ষা এবং জীবনগঠনের কাজ বিনোবাজী নিজহস্তে গ্রহণ করেন। ঐ সময়ের এক ঘটনা বিনোবার জীবনের গভীরতম অন্তস্তলে আলোক সম্পাত করে। বিনোবা তাঁহার পত্রগুলি পাওয়ামাত্র একবার পড়িয়া লইয়া তখনকার মত রাখিয়া দিতেন এবং বহুপত্র জমা হইলে একদিন একসঙ্গে সবগুলির উত্তর পাঠাইয়া ঐগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। একদিন তিনি একখানি পত্র পাইয়া উহা পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ইহা কমলনয়নের কাছে আশ্চর্য লাগিল। তিনি পত্রের ছিন্ন-খণ্ডগুলি কুড়াইয়া ও গুছাইয়া লইয়া দেখিলেন যে, উহা মহাত্মা গান্ধীর একটি পত্র এবং তাহাতে লেখা আছে—'তুম্ সে বঢ়্কর্ উচ্চ আত্মা মেরী জানকরী মে নহী হ্যায়।'—অর্থাৎ তোমার চেয়ে উচ্চাত্মা কেউ আছে বলিয়া আমার জানা নাই। বাপুর এত বড় প্রশংসা-পত্র আর তাহার এই অবস্থা! কমলনয়ন সবিস্ময়ে বিনোবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন কেন?" বিনোবা সহজভাবে উত্তর দিলেন—"ইহা আমার কাজে লাগিবে না। তাই ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।" কমলনয়ন বলিল—"ইহা তো রাখিয়া দিবার মত জিনিস!"

বিনোবা পুনরায় সহজভাবে উত্তর দিলেন—"যাহা আমার কোন কাজে লাগিবে না তাহা কেন ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিব? বাপু নিজের মহত্ত্বে আমাকে ঐরূপ ভাবিয়াছেন। আমার দোষগুলি তো তিনি দেখেন নাই?" এই সহজ কথাকয়টিতে সমগ্র বিনোবা ফুটিয়া উঠে। বিনোবা কিরূপ অন্তর্মুখ এবং তাঁহার প্রকৃতি কত গভীর আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ—ইহা তাহার এক নিদর্শন। বিনোবা যে কত উচ্চস্তরের অপরিগ্রহী তাহার একটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্বে তিনি পুস্তকের উপর নিজের নাম লিখিতেন। পরে তাঁহার মনে এই ভাব আসিল—পুস্তকের উপর নিজের নাম লিখিব কেন, পুস্তক তো সম্পত্তি। পুস্তক পড়া হইয়া যাইবার পর উহা সংগ্রহ করিয়া রাখাও পরিগ্রহ। নিজের বই পড়া হইয়া যাইবার পর অন্যকেহ উহা পড়িবার জন্য লইতে চাহিলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত।—তৎক্ষণাৎ তিনি বইয়ের উপর নাম লেখার অভ্যাস পরিত্যাগ করেন। এমন কি ১৯১৮ সালে তিনি যখন নিজের বোঝা মাথায় লইয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন তখনও নূতন পুস্তক লইবার আবশ্যক হইলে পুরাতন পুস্তকগুলি অন্যকে দিয়া বোঝা হাল্কা করিয়া লইতেন।

১৯২৩ সালে বিনোবাজী ওয়ার্ধার আশ্রম হইতে নাগপুর যাইয়া পতাকা-সত্যাগ্রহে যোগদান করেন এবং তাহাতে তাঁহার কয়েক মাসের জেল হয়। জেল হইতে বাহির হইবার পর ১৯২৪ সালের প্রারম্ভে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে তিনি কেরলের অন্তর্গত ভাইকম সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব করেন। সেখানকার সনাতনী ব্রাহ্মণগণ মন্দিরের আশেপাশের রাস্তা দিয়াও হরিজনদের চলিতে দিতেন না। কিছুকাল সত্যাগ্রহের পর সরকার-পক্ষ ও সনাতনীরা নীতি স্বীকার করেন। বিনোবাজী আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় মৌন-সাধনায় রত হইলেন। বিনোবা ১৯৩০ সালের লবণ-সত্যাগ্রহে যোগদান করেন এবং দুর্বল শরীর সত্ত্বেও স্বয়ং তালগাছ কাটার কাজ করিতে থাকেন। ১৯৩২ সালের আন্দোলনে তিনি ধূলিয়া প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দেন এবং গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হন। সে-সময় তিনি ধূলিয়া জেলে ছিলেন এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজ, প্যারেলালজী প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন।

জেলে তাঁহারা একসঙ্গে সূতা কাটিতেন, একসঙ্গে গম পিষিতেন এবং একসঙ্গে বসিয়া বহু বিষয়ের চর্চা করিতেন। জেলও আশ্রমে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। ধুলিয়া জেলে বিনোবাজীর সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হইয়াছিল—(১) গীতা সম্বন্ধে ভাষণ দান ও (২) গীতাঈপ্রণয়ন। তিনি ১৮টি রবিবারে গীতার ১৮টি অধ্যায়ের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়া ঐ জেলের রাজনৈতিক বন্দীদিগকে শুনাইয়াছিলেন। 'সানে গুরুজী' উহা লিপিবদ্ধ করিয়া জগতের এক মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন। উহাই পরে পুস্তকাকারে 'গীতা-প্রবচন' নামে সারা ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তখন বিনোবাজীর বয়স ছিল মাত্র ৩৭ বৎসর। এই বয়সেই আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি কত উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলেন তাহা গীতা-প্রবচন পাঠ করিলে বুঝা যায়। মূল মারাঠী হইতে বহু ভারতীয় ভাষাতে গীতা-প্রবচন অনূদিত হইয়াছে এবং লক্ষ-লক্ষ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। উহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। গীতা-প্রবচন একটি অপূর্ব গ্রন্থ। তিনি উহাতে গীতার আধারে এক পূর্ণ জীবন-দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যিনি উহা শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিবেন তাঁহার জীবন সেবা, ত্যাগ ও ভগবানের অভিমুখী না হইয়া যায় না। ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ হইবার বিশ বৎসর পূর্বে ঐসব প্রবচন দেওয়া হইয়াছিল। অথচ উহা অধ্যয়ন করিলে ভূদানযজ্ঞের ভাবধারাও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে প্রেরণা আসে। বিনোবাজী গীতা-প্রবচন সম্পর্কে বলেন —ভগবদ্‌গীতা বলা হইয়াছিল কুরু-ক্ষেত্রের রনাঙ্গনে। এইজন্য তাহার এক অদ্ভূত স্বরূপ হইয়াছে। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের এইরূপ গৌরব নাই। ভগবান আর একবার গীতা শুনাইয়াছিলেন। তাহাকে অনুগীতা বলা হয়। কিন্তু ভগবদ্‌গীতাতে যেইরূপ যাদু আছে তাহাতে সেইরূপ নাই। সুতরাং আমি যদি গীতার ব্যাখ্যা জেলখানায় না শুনাইয়া অন্যত্র স্বতন্ত্রভাবে শুনাইতাম বা লিখিতাম তাহা হইলে 'গীতা-প্রবচনে' আজ যে যাদু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেইরূপ কিছু তাহাতে অনুভব করা যাইত না। আমরা মনে করিতাম যে, এই জেল পূর্ণরূপে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন ও আমরা সকলে সেখানকার সৈনিক। মনে করিতাম, আমরা এক যুদ্ধের জন্য এখানে আসিয়াছি আর এই 'গীতা-প্রবচন' সৈনিকদের

সমক্ষে প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহারা ঐ প্রবচন শুনিয়াছিলেন তাঁহারা তাহা কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

বাল্যকালে গাগোদা থাকিবার সময় মাতা রুক্মিণী দেবীর গীতা পড়িবার তীব্র ইচ্ছা হয়। মারাঠী-অনুবাদে গদ্য বা পদ্য যাহা পাওয়া গেল তাহা এত কঠিন যে উহা পড়িয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি সহজ সরলভাবে বিনোবাকে গীতার পদ্যানুবাদ করিয়া দিতে বলিলেন। পুত্রের উপর মাতার এতই গভীর বিশ্বাস ছিল। পুত্রের উপর মাতার এই গভীর বিশ্বাসই বিনোবার জীবনে অশেষ শক্তিদান করিয়াছে। যাহা হউক, মায়ের জীবদ্দশায় বিনোবা মাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ১৯৩২ সালে ধুলিয়া জেলে তিনি গীতা-শ্লোকের অনুরূপ ছন্দে গীতার এক অপূর্ব 'সমশ্লোকী' মারাঠী-অনুবাদ রচনা করেন। তিনি উহার নাম দেন 'গীতাঈ'। উহাই বোধ হয় —'গীতার' প্রথম 'সমশ্লোকী' অনুবাদ। গীতাঈ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেন যে উহা পড়িলে মনে হয় না যে উহা অনুবাদ। উহা মূল গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়। উহারও লক্ষ-লক্ষ কপি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রে উহা খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে। বিনোবাজী বলেন—"একবার একজন জেলখানার ডাক্তার আমাকে বলিয়াছিলেন যে জেলের কয়েদীরা তাঁহাকে দিয়া আমাকে তাহাদের এই শুভাকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছে যে, আমি যেন দীর্ঘজীবী হই। এই ঘটনা মধ্যপ্রদেশের সিউনী জেলের। ফাঁসীর সাজা হইয়াছে এমন কয়েদী "গীতাঈ" চাহিয়াছিল। কয়েক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা গিয়াছে যে যাহারা অন্তিম সময়ে "গীতাঈ" চাহিয়াছে তাহাদের তাহা খুব কাজে আসিয়াছে। এইজন্য ফাঁসীর কয়েদীদের পক্ষ হইতে আমাকে ঐ শুভাকাঙ্ক্ষা জানান হইয়াছিল। ইহাতে আমার যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না।" মারাঠীভাষায় 'আঈ' শব্দের অর্থ 'মা' সুতরাং 'গীতাঈ' অর্থাৎ গীতা-মা। গীতা বিনোবার জীবনে একমাত্র পথপ্রদর্শক। তিনি গীতার শিক্ষা অনুসারে নিজের জীবন গঠন করিয়াছেন। এজন্য গীতা তাঁহার কাছে মাতৃ-স্বরূপ। বিনোবা তাঁহার 'বিচার-পোথী' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"যখন আমি গীতার অর্থ বুঝিতে শিখিলাম তখন মা চলিয়া গিয়াছেন। আমার এরূপ মনে হইল মা যেন আমাকে গীতা-মার

ক্রোড়ে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতা-মা, আমি আজও তোর দুধে পালিত হইতেছি এবং ভবিষ্যতেও তুই আমার আধার হইয়া থাকিবি।" 'গীতাঈ' মহারাষ্ট্রে এত জনপ্রিয় হইয়াছে যে, উহার লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

ধুলিয়া জেলে থাকার সময় বিনোবাজী গ্রাম-সংগঠনের কাজ করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। জেল হইতে বাহির হইয়া তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রামবাসীদের সুতাকাটা, সাফাই প্রভৃতির কাজে দীক্ষিত করিতে থাকেন। ওয়ার্ধার মগনওয়াদিতে প্রথমে সত্যাগ্রহ-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর উহা বাজাজওয়াদিতে শেঠ যমুনালালজীর 'ঘাসের বাংলা' নামক বাংলোতে স্থানান্তরিত হয়। বাংলোতে আশ্রমের উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তোলা সম্ভব হইতেছিল না। তাই ১৯৩৩ সালের প্রথম ভাগে ওয়ার্ধা হইতে ২ মাইল দূরে নলওয়াদিতে গ্রাম-সংগঠনের কাজের উপযোগী করিয়া নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া 'গ্রাম-সেবা-মণ্ডল' স্থাপন করা হয় এবং সেখানে গ্রামসেবার কাজ ব্যবস্থিতভাবে আরম্ভ হয়। ২ লক্ষ লোক অধ্যুষিত ওয়ার্ধা-অঞ্চলকে ছয় ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক এলাকার দায়িত্ব এক-একজন আশ্রম-বাসীর উপর দেওয়া হয়। কর্মীরা দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কেন্দ্রে ফিরিতেন, কাজের বিবরণ দিতেন এবং পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতেন। পরের দিনই আবার গ্রামে চলিয়া যাইতেন। সুতা-কাটার কাজে বিনোবা নিজে বহুরকমের পরীক্ষাকার্য চালাইয়াছিলেন। সুতা-কাটিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি তকলীকাটার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতাকাটাকে ব্যাপকতর করিবার জন্য তিনি তুনাইয়ের নূতন পদ্ধতি বাহির করিয়া তাহা প্রয়োগ করেন এবং উহা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। নিজের হাতে তুলার বীজ ছাড়াইয়া তিনি নিজেই তুলা ধুনিতেন। কাপড় বোনার কাজও করিতেন। প্রতিদিন ৮ ঘন্টা করিয়া তিনি এই সব কাজ করিতেন। সুতাকাটার আর্থিক বুনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ছয় মাস সুতা কাটিয়া যাহা আয় হইত তাহাতেই জীবন চালাইতেন। এই সমস্ত কাজে তিনি এমন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন যাহা ভারতবর্ষে আর কেহ করিতে পারেন নাই। সুতাকাটাকে মৌলিক

হস্তশিল্পরূপে গণ্য করিয়া তিনি ঐ বিষয়ে এক মৌলিক পুস্তকও লিখিয়াছেন।

ভবিষ্যৎ জীবনে যিনি সর্বোদয়ের ঋষি হইবেন তিনি গোড়া হইতেই কিরূপ ধাতুতে গঠিত ছিলেন তাহা তাঁহার তরুণ বয়সের একটি ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ১৯২৮ সালের কথা। তখন তিনি ওয়ার্ধা-আশ্রমে। আমের মরসুম। একদিন বাজার হইতে তিনি এক ঝুড়ি ছোট দেশী আম ছয় আনায় খরিদ করিয়া আনিয়াছিলেন। দুইদিন পরে তিনি আবার বাজারে গেলেন এবং যে-বৃদ্ধার নিকট হইতে পূর্বে আম খরিদ করিয়াছিলেন তাহাকে ঐ দিনও আম বিক্রয় করিতে দেখিলেন। কিন্তু ঐ দিন বৃদ্ধা এক ঝুড়ি আম দুই আনায় দিতে চাহিল। এত কম দাম কেন তাহা বিনোবা জানিতে চাহিলেন। বৃদ্ধা বলিল—পূর্বদিন ঝড়ে বহু আম পড়িয়াছে, তাই বাজারে প্রচুর আম আসিয়াছে। কিন্তু খরিদ্দার বেশী নাই বলিয়া দাম এত কম। বিনোবা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এক ঝুড়ি আমের জন্য পূর্বের মত গতকালও তাহার একই পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল কিনা। বৃদ্ধা উত্তর দিল—'হাঁ।' তিনি বলিলেন—'তবে কম দাম লইবে কেন?' এই বলিয়া তিনি এক ঝুড়ি আম লইয়া ছয় আনা পয়সা তাহাকে দিয়া গেলেন।

১৯৩৬ সালে মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ধার নিকটে সেবাগ্রাম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময়ে গ্রামোদ্যোগ সংঘের সৃষ্টি হয় এবং খাদি ছাড়া অন্যান্য গ্রামোদ্যোগের প্রচেষ্টা চলিতে থাকে। তখন হইতে নলওয়াদি আশ্রমে বিভিন্ন শিল্পের কাজ আরম্ভ হয়। সবরমতী আশ্রমের মহিলাকর্মিগণ ওয়ার্ধায় চলিয়া আসিবার পর তাঁহাদের জন্য সেখানে একটি মহিলাশ্রম স্থাপনা করা হয়। আশ্রমের ভার মহাত্মা গান্ধী বিনোবার হাতে অর্পণ করেন। বিনোবার পরিচালনাধীনে আশ্রমের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ১৯৩৬ হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর ওয়ার্ধা জেলার গঠনকর্মীদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হইত। তাহাতে কয়েকদিন ধরিয়া বিভিন্ন গঠনমূলক কার্য সম্পর্কে শিক্ষাপ্রদ আলোচনা হইত। বিনোবাজী উহার নাম দিয়াছিলেন "খাদিযাত্রা"। অন্য ধর্মের প্রতি সম-শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিবার জন্য তিনি

আরবী-ভাষা শিক্ষা করেন এবং মূল আরবীতে 'কোরাণশরীফ' গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। কোরাণ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান অগাধ। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা বা নঈ-তালিমের ব্যবস্থা সংগঠনাদি কাজে তিনি অনেক সহায়তা করিয়াছেন। কুষ্ঠ-সেবার কাজ তাঁহার অতি প্রিয় কাজ। তাঁহার একজন কর্মীকে এই কাজের জন্য গড়িয়া তুলিয়া তাঁহাকে তিনি কুষ্ঠ সেবাশ্রমের কাজে দিয়াছেন।

নলওয়াদি আশ্রমে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ১৯৩৮ সালে বিনোবাজীর স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙিগয়া পড়ে। মহাত্মা গান্ধী তাহাতে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করেন। বিনোবাজী বাহিরে যাইতে চাহিলেন না। নলওয়াদীর ৪ মাইল দূরে পওনার নদীতীরে যমুনালালজীর এক বাংলো ছিল। বিনোবা সেখানে আসিয়া আশ্রম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে ধাম নদী আর পওনার নদী মিলিত হইয়াছে এবং বাংলোটি ধাম নদীর অপর পারে বলিয়া তিনি আশ্রমটির নামাকরণ করেন—'পরমধাম'।

যাহাতে কেহ অর্থ বা লোক দিয়া যুদ্ধে সাহায্য না করে তাহার জন্য গত মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালের শেষ ভাগে মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। উক্ত সত্যাগ্রহে মহাত্মা গান্ধী বিনোবাজীকে প্রথম সত্যাগ্রহীরূপে মনোনীত করিলেন। সারা ভারত চমকিত হইয়া ইহা শুনিল এবং তখন হইতে তাঁহার নাম ও সুযশ সর্বত্র প্রচারিত হইতে থাকিল। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের দরুন প্রথমে তাঁহার তিনমাস জেল হয়। জেল হইতে মুক্ত হইবার পর আবার তিনি সত্যাগ্রহ করেন এবং পুনরায় তাঁহার জেল হয়। এরূপে ঐ আন্দোলনের দেড় বৎসরের মধ্যে তিনি তিন-বার গ্রেপ্তার হন এবং তিনবার জেলে যান।

অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের সময় বিনোবাজী কিরূপ খাদ্য গ্রহণ করিতেন তাহা জানিলে সকলেই মহান প্রেরণা লাভ করিবেন। তিনি নিজেই ঐ সম্পর্কে বলিয়াছেন—"১৯৪২ সালের কথা। আমি সবে অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্রের বেশী বই ছিল না। এইজন্য ঐ বিষয়ের বিবিধ ইংরেজী বই পড়িতেছিলেন এবং অধ্যয়নে

প্রেরণা লাভের জন্য ঐ সময়ে দৈনিক দুই আনায় আমার খাওয়া খরচ চালাইতাম।

"ঐ সময়ে আমি তিনবার খাইতাম। সাত পয়সার খাদ্য সামগ্রী ও এক পয়সার কাঠ—এই ছিল আমার রোজকার হিসাব। তখনকার দিনে সাত পয়সায় জওয়ারের কিছু রুটি, চীনাবাদাম, গুড়, ডাল, একটু তরকারি, একটু নুন ও তেঁতুল পাওয়া যাইত। ঐ সময়ে পূজ্য বাপুর উপবাসের জন্য আমাকে দিল্লী যাইতে হইয়াছিল। সেখানে জওয়ার পাওয়া যাইত না, গম কিনিতে হইত। তাহার দাম বেশী। এইজন্য সেখানে চীনাবাদাম বাদ দিতে হইয়াছিল। খাওয়ার এই ব্যবস্থা এক বৎসর চলিয়াছিল।

"যে কেউ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নের সংগে আট-পয়সার খাবার অর্থাৎ ঐরূপ তপস্যার কী সম্পর্ক আছে? কত লোক অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন আর সেই সংগে মোটা-সোটাও হইতে থাকেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা নিজেদের জীবনকে যখন অধ্যয়নের অনুকূল করিতে পারি, নিজেদের ইন্দ্রিয়-সমূহ ও প্রাণকে যখন সংযত করিতে পারি, কেবলমাত্র তখনই আমরা আমাদের অধ্যয়নকে হজম করিতে পারি। তাহা না হইলে হজম হওয়া সম্ভব নয়। অর্থশাস্ত্রের এই রকম অধ্যয়নের দ্বারা আমার খুব লাভ হইয়াছিল। অকেজো অর্থশাস্ত্রকে আমি আমল দিই নাই। টলষ্টয়, রাস্কিন প্রভৃতি বিশিষ্ট অর্থশাস্ত্রবিদ্‌দের গ্রন্থাবলী খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছিলাম।

"আমি খুব একাগ্র হইয়া দুই বৎসর বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। ঐ সময়ে আমার খাদ্য দুধ-ভাত ছিল। তখন দুধ-ভাত ছাড়া তৃতীয় কোন খাদ্যবস্তু আমি গ্রহণ করিতাম না। এইভাবে বিচারের সংগে জীবনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার অভ্যাস আমার আছে এবং আমি তাহা খুবই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।"

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মত তাঁহাকেও 'পরমধাম'-আশ্রম হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া অজ্ঞাত স্থানে রাখা হয় এবং আশ্রম বাজেয়াপ্ত করা হয়। এক বৎসর তাঁহাকে মাদ্রাজের ভেলোর জেলে রাখা হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহাকে মধ্যপ্রদেশের সিউনী

জেলে রাখা হয়। ভেলোর জেলে থাকাকালীন তিনি তেলেগু, কানাড়ী, তামিল, মলয়ালাম প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। বিভিন্ন ভাষা-রচনার তুলনামূলক পদ্ধতি তিনি বাল্যকাল হইতেই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি যে-কোন ভাষা অতি সহজেই শিখিয়া লইতে পারেন। তিনি ভারতের প্রায় সব-কয়টি প্রাদেশিক ভাষাই শিখিয়া লইয়াছেন। তন্মধ্যে বাংলা অন্যতম।

নোয়াখালীর বীভৎস সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি প্রশমন করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী যখন সেখানে পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বিনোবাজী পওনারে তাঁহার 'পরমধাম'-আশ্রমে গ্রাম-সেবার সাধনায় নীরবে মগ্ন ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে নোয়াখালী যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আদেশ ব্যতীত তিনি আশ্রম ছাড়িয়া এক পা-ও নড়িলেন না। তাঁহার শৃঙ্খলাবোধ এমনি দৃঢ়তম।

বিনোবাজীর মায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পিতা বহুদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিনোবাজী বলেন যে, তাঁহার মাতা ছিলেন মহান ভক্ত এবং পিতা ছিলেন যোগী। চাকুরী করিলেও তিনি সমগ্র জীবন রঞ্জন-বিজ্ঞানের সাধনায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ১৯৪৭ সালে ধুলিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। বিনোবাজী, বালকোবাজী ও শিবাজীজী—তিন পুত্রই সংসারত্যাগী। এইজন্য তাঁহারা পিতৃত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি সেবাকার্যের জন্য অর্পণ করেন। ব্যাঙ্কের ২৭ হাজার টাকা বিনোবাজীর প্রতিষ্ঠিত নলওয়াড়ী 'গ্রাম-সেবা মণ্ডল'কে দেওয়া হয় ও তাঁহার জন্মস্থান গাগোদায় যে ২৫ একরের মত জমি ছিল তৎসমস্তই গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী চলিয়া গেলেন। উহার দেড়মাস পরে সেবাগ্রামে সমগ্র দেশের গান্ধী আদর্শে বিশ্বাসী গঠনকর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। সম্মেলনে গান্ধীজী প্রদর্শিত আদর্শ ও পদ্ধতিতে গঠনমূলককার্য সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য নিখিল ভারত সর্ব-সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উহার পরিণামস্বরূপ কাটুনী সংঘ, তালীমী সংঘ প্রভৃতি মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান ক্রমে ক্রমে সর্বসেবা সঙ্ঘে বিলীন হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা হয়। উপরন্তু

সর্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসী সকলে যাহাতে পরস্পরের সহিত সংযোগ রাখিতে পারেন ও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি হইতে পারে তজ্জন্য সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। উহা কোন নিয়ম বা অনুশাসন-বদ্ধ সংগঠন নহে। উহা সর্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের এক ভ্রাতৃমণ্ডল (ব্রাদারহুড্)। প্রতিবৎসর 'সর্বোদয় সমাজের' বাৎসরিক সম্মেলন ("সর্বোদয় সম্মেলন" নামে) অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বিনোবাজী উহার নাম দিয়াছেন 'স্নেহ-সম্মেলন'। এরূপে গান্ধী আদর্শ রূপায়নের উদ্দেশ্যে গঠনকাজ পরিচালনার মহান দায়িত্ব বিনোবাজীর উপর অর্পিত হইল। তিনি পরম নম্রতা সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর উত্তরসাধকরূপে আশ্রমের নীরব সাধনা-ক্ষেত্র হইতে বহির্জগতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মহাত্মা গান্ধী-পরিকল্পিত শান্তি-প্রতিষ্ঠার কাজ তখনও অসমাপ্ত। শরণার্থীদের সমস্যা এক বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। তিনি দিল্লী আসিয়া শরণার্থীদের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। শিবিরে শিবিরে গিয়া শরণার্থীদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শিবিরে শিবিরে চরকা, যাঁতা প্রভৃতি প্রবর্তন করা হইল। মেও-দের সমস্যা সব চাইতে জটিল ছিল। মেও-রা দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমান কৃষক-সম্প্রদায়। পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহবশে তাহারা পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়ায় তাহারা আবার ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইতিমধ্যে তাহাদের বাড়ীঘর, জমি-জায়গা হিন্দু-শরণার্থীগণ অধিকার করিয়া বসিয়া গিয়াছিল। বিনোবাজী এই শুষ্ক কঠিন কাজ হাতে লইলেন এবং বহু পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে মেও-দের ঘরবাড়ী ও জমি কিছু ফিরাইয়া দিতে ও কিছু বদলে দেওয়াইতে সক্ষম হইলেন। সাম্প্রদায়িক শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিকানীর, আজমীর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন এবং তৎ-তৎ স্থানে তাঁহার নৈতিক প্রভাবে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।

অতঃপর তিনি 'পরমধাম'-আশ্রমে আসিয়া পুনরায় নীরব সাধনায় মগ্ন হন। উৎপাদক কায়িক-শ্রম ও স্বাবলম্বন সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার মূলকথা। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ঐ আদর্শ উপলব্ধি না করিয়া জনসাধারণকে

সর্বোদয় শিক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এরূপ ভাবনায় ভাবিত হইয়া বিনোবাজী ও তাঁহার আশ্রমের সাথীরা পরমধাম আশ্রমে 'কাঞ্চন-মুক্তি-যোগ' সাধনায় ব্রতী হন। কাঞ্চনমুক্তি-যোগ কি?

॥ ৪ ॥ কাঞ্চনমুক্তি-যোগ

অর্থ ও শ্রম—এই দুই শক্তি জগতে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। উৎপাদক শ্রমকে ছাড়িয়া লোকে অর্থের উপর উত্তরোত্তর অধিকভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় জগতে যত অনর্থ ঘটিয়াছে। অতীত সমাজে এমন এক সময় ও অবস্থার কল্পনা করা যায় যখন সকলেই দ্রোহরহিত উৎপাদক শ্রমে রত থাকিত এবং নিজ নিজ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নিজ শ্রমে উৎপাদন করিয়া লইত। সেই অবস্থায় সমাজে কেহ একেবারে নিঃস্ব থাকিত না। আবার কেহ অধিক ধনবানও হইতে পারিত না। সকলে সমান সঙ্গতিসম্পন্ন না হউক বৈষম্য অধিক থাকিত না ও থাকিতে পারিত না। কিন্তু ক্রমশ বহুলোক উৎপাদক শ্রম ত্যাগ করাতেই এত ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সংকট অবস্থায় পতিত ব্যক্তির অসহায় অবস্থার সুযোগে মানুষ তাহাকে নিজের প্রয়োজনে কায়িক শ্রম করাইয়া লইবার জন্য নিযুক্ত রাখিবার সুবিধা পাইল এবং তাহাতে নিজে উৎপাদক শ্রম ত্যাগ করিয়া আরাম ভোগ করিতে প্রলুব্ধ হইল। এরূপে তাহার হাতে ভূমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ যথা উৎপাদনের যন্ত্রাদি, পুঞ্জীভূত ও কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল।

এই শোচনীয় প্রক্রিয়ার আরম্ভ কিভাবে হইতে পারে তাহার এক দৃষ্টান্তের কল্পনা করা যাইতেছে। মনে করুন, সেই প্রাথমিক অবস্থা বিশিষ্ট সমাজে এক ব্যক্তি জমি আবাদের সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িল অথবা তাহার স্ত্রী বা পুত্রের অসুখের জন্য তাহাকে ঐ সময়ে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইল। এই কারণে সেই চাষের মরসুমে তাহার পক্ষে সব দিন জমিতে কাজ করা সম্ভব হইল না। জমি চাষের জন্য তাহার অন্য ব্যক্তির সাহায্য লইতে হইল। সেই ব্যক্তি সংকটাপন্ন ব্যক্তির জমিতে ১০ দিন কাজ করিয়া দিল। চুক্তি এই হইল যে পরবর্তী আবাদের মরসুমে সে উহার বদলে তাহার জমিতে ১৫ দিন কাজ করিয়া দিবে। পরবর্তী চাষের সময় সে তাহা করিল। ফলে সে

তাহার নিজের জমিতে সম্পূর্ণ সময় দিতে পারিল না। অন্যদিকে ঐ উত্তমর্ণ ব্যক্তি সেই ১৫ দিন নিজের জমিতে কাজ-না করিয়া অলস হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিল। এদিকে এই ব্যক্তি তাহার জমিতে সম্পূর্ণ সময় দিয়া ভালভাবে জমি চাষ করিতে না পারায় তাহার জমিতে ফসল ভাল হইল না। সুতরাং তাহার কিছুদিনের খাদ্যাভাব হইল এবং তাহাকে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য শস্য ঋণ করিতে হইল। ঐ ঋণের জন্য তাহার কিছু জমি ঐ ব্যক্তিকে দিতে হইল। উহার পরবর্তী মরসুমে তাহার অভাব আরও বাড়িল। তখন তাহাকে আরও কিছু জমি বিক্রয় করিতে হইল। উপরন্তু সেই ব্যক্তির জমিতে কিছু দিন কাজ করিয়া দিবার সর্তে তাহার নিকট হইতে পুনরায় কিছু শস্য ধার লইতে হইল। এইভাবে একব্যক্তি ক্রমশ নিঃস্ব হইতে থাকিল। অন্য দিকে অন্য এক বক্তি অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে প্রলুব্ধ হইল এবং তাহার হস্তে উত্তরোত্তর অধিক ভূমি পুঞ্জীভূত হইতে থাকিল।

এরূপে ক্রমশ বৈষম্য বৃদ্ধি পাইয়া উহা ব্যাপকতর ও গভীরতর হইতে থাকিল। অর্থের সাহায্যে মানুষ অন্যের শ্রমকে খরিদ ও নিয়োগ করিতে সুবিধা পাইল। অর্থ দিয়া অন্যের শ্রমার্জিত দ্রব্যাদি খরিদ করিবারও সুবিধা হইল। এইরূপে অর্থ ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার-রূপে ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। এজন্য শ্রমের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য লোকে অর্থ সঞ্চয় করিতে ব্যস্ত থাকে। জগতে কতিপয়ের হাতে ও অনুৎপাদকের হাতে যে ভূমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ কেন্দ্রীভূত হইতেছে উহার মূলগত কারণও ইহাই। এজন্য বর্তমান যুগে শ্রম এবং শ্রমিকের মর্যাদা নষ্ট হইয়াছে এবং অর্থের উপর মিথ্যা গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। উৎপাদক শ্রমকে তাহার মহান্ সম্মানের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূর করা যাইবে না এবং সমভাবে সকলের মঙ্গলসাধন করাও সম্ভব হইবে না। বিনোবাজী বলেন—"বর্তমানের বিকার-গ্রস্ত সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক জিনিসের মূল্য পয়সায় নির্ধারিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে জিনিসের প্রকৃত মূল্য নজরে পড়ে না। এরূপ বলা হয় যে, এখানে জমি খুব দুর্মূল্য কিন্তু কার্যত উর্বরতার দিক হইতে জমি সেই একরূপই হইয়া আছে। গত পরশু বক্সারের গেজেটিয়ারে পড়িলাম যে,

দেড়শত বৎসর পূর্বে সেখানে এক সের গম এক পয়সায় বিক্রয় হইত, আজ সেই স্থলে এক সের গম দশ আনায় বিক্রয় হইতেছে। তখন এক সের গমে যতটা পেট ভরিত এবং যতটা পুষ্টি হইত, আজও তাহাই হইতেছে। কিন্তু আজ আমরা পয়সার মায়াজালে পড়িয়া মরুভূমিকে জলাশয় বলিয়া মানিয়া লইয়াছি।" তিনি আরও বলেন, "লোকের হৃদয় শুদ্ধ আছে। যদি কিছু বিগড়াইয়া থাকে তবে তাহা হইতেছে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। উৎপাদনের সহিত পয়সার এবং শ্রমের সহিত পয়সার কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকিতেছে না। পয়সা সদাসর্বদা নিজের কথা পরিবর্তন করিতেছে। কখনও উহা এক টাকা বলে, কখনও দুই টাকা আবার কখনও চার টাকা বলে। পয়সা বদমাইস ও দুশ্চরিত্র। তাহাকে আমাদের কর্মচারী করিয়াছি। বদমাইসের কাছেই আমরা আমাদের চাবি রাখিয়াছি।" তাই বিনোবাজী কয়েকদিন উপবাসী থাকিয়া ভগবানের নামে সংকল্প গ্রহণ করেন যে, তিনি আর অর্থ গ্রহণ করিবেন না। অর্থ-বর্জনের সঙ্কল্প লইয়া বিনোবাজী ও তাঁহার সহকর্মিগণ পরমধাম-আশ্রমে কায়িক শ্রমের দ্বারা নিজেদের প্রয়োজনীয় সব-কিছু উৎপাদন করিতে রত থাকেন। এই কায়িক শ্রম করা হইত প্রধানত 'ঋষি খেতী' বা 'ঋষি কৃষিতে'। 'ঋষি খেতী' বা ঋষি কৃষি কাহাকে বলে জানা আবশ্যক। একমাত্র মানুষের শরীর শ্রমের সাহায্যে যে কৃষি করা হয় এবং যাহাতে পশুশক্তিরও সাহায্য লওয়া হয় না তাহাকে ঋষি খেতী বা ঋষি কৃষি বলা হয়। উহাতে হাল চালাইবার প্রয়োজন হইলে মানুষ নিজে হাল টানিবে অথবা কোদাল চালাইয়া হালের কাজ সম্পন্ন করিয়া লইবে। বিনোবা আশ্রমে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। যদি কেহ সাহায্য দিতে চাহিতেন, তবে তিনি মাত্র নিজের কায়িক শ্রমের দ্বারা সাহায্য দিতে পারিতেন। এই আদর্শ অনুসরণ সর্বোদয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তিনি ইহারই নাম দিয়াছেন—"কাঞ্চনমুক্তি-যোগ"। সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে 'কাঞ্চনমুক্তি-যোগ' সাধন অপরিহার্য।

॥ ৫ ॥ সর্বোদয় দর্শন ও সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা

অহিংসার পথে দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন চলিতেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন অহিংস-সমাজ প্রতিষ্ঠা করার কল্পনাও মহাত্মা গান্ধী সেই সময়েই করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং উহার জন্য তিনি ১৮ দফা গঠনমূলক কার্যের ব্যবস্থা করেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সংগে সংগে উহার সহিত অবিভাজ্য ও অভিন্নভাবে উক্ত গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টা দেশের বিভিন্ন স্থানে অল্পাধিকভাবে চলিতেছিল। উক্ত গঠনকর্ম তালিকা এইরূপঃ—(১) হিন্দু-মুসলমান বা সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা, (২) অস্পৃশ্যতা বর্জন, (৩) মাদকতা বর্জন, (৪) খাদি, (৫) অন্যান্য গ্রাম্যশিল্প, (৬) গ্রামের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, (৭) নূতন বুনিয়াদী শিক্ষা, (৮) পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা, (৯) স্ত্রী-জাতির উন্নয়ন, (১০) স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কীয় শিক্ষা, (১১) রাষ্ট্রভাষা প্রচার, (১২) মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার অনুশীলন, (১৩) অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রচেষ্টা, (১৪) কংগ্রেস সংগঠন (স্বাধীনতা-যুদ্ধের জন্য জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থা সংগঠন), (১৫) কৃষক সংগঠন, (১৬) শ্রমিক সংগঠন, (১৭) ছাত্র সংগঠন ও (১৮) কুষ্ঠরোগী সেবা ও কুষ্ঠরোগ প্রতিকার। অবস্থা-ভেদে ও প্রয়োজনানুসারে এই তালিকা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রাস্কিনের ইংরেজী গ্রন্থ "আন্ টু দিস্ লাষ্ট"-এর যে অনুবাদ মহাত্মা গান্ধী করিয়াছিলেন তিনি উহার নাম দিয়াছিলেন "সর্বোদয়"। উক্ত অনুবাদের ভূমিকায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—"আধুনিক সংস্কৃতি এবং উহার উপর আধারিত যে সমাজব্যবস্থা তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক লোকের যথাসাধ্য অধিক পরিমাণ সুখবিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই প্রধান সিদ্ধান্ত হইতে সহজেই এই উপসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যথাসম্ভব অধিক লোকের যথাসম্ভব অধিক সুখের ব্যবস্থা যদি করিতে হয় তবে সেই অবশিষ্ট কিছু লোকের দুঃখ-কষ্ট ঘটিলে কোন ক্ষতি নাই। দশ-জন লোকের মধ্যে নয়জন লোকের সুখের ব্যবস্থা করার সময় অবশিষ্ট এক ব্যক্তির জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু ইহাই নহে, বরং উহাদের

অনিষ্ট করা বা নাশ করা বিধেয়। এরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ-ব্যবস্থায় বিরোধ, ঝগড়া এবং অবশেষে ধ্বংস যে অনিবার্য হয় তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কারণ এইরূপ সমাজব্যবস্থায় যে বলবান হয় সে এরূপ মনে করে যে, দুর্বলের নাশ হউক, আর তাহার নাশসাধনের জন্য সেও চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু দুর্বল ইহা চাহে না যে, বলবানের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার নাশ হউক। দুর্বল হউক, তাহাতে কি? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে, যে চাহিবে তাহার মৃত্যু হউক অথবা সে না থাকুক। প্রত্যেকেই ইহা চাহে যে, সে থাকুক। কেন না এই 'থাকা' বা 'অস্তিত্বের' মধ্যে মানুষ একপ্রকারের আনন্দ বা সুখ অনুভব করিয়া থাকে। অতএব সংঘর্ষ ও সর্বনাশের প্রতিকারকল্পে সমাজে সকলেই শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিবে—এমন সমাজ যদি রচনা করিতে হয় তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, 'যথাসম্ভব অধিক লোকের অধিকতম সুখবিধান'—এই নীতির পরিবর্তে 'সকলেরই সর্বপ্রকারের কল্যাণসাধনে'র নীতির ভিত্তিতে সমাজজীবন গড়িয়া তোলা আবশ্যক। 'সকলেরই হিতসাধন' জীবনের তত্ত্বজ্ঞান হওয়া চাই।" অহিংস সমাজরচনার মূলে এই তত্ত্বজ্ঞান রহিয়াছে। এজন্য মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত অহিংস সমাজব্যবস্থাব নাম দেওয়া হইয়াছে "সর্বোদয়"। ভারতের প্রাচীন মুনিঋষিগণ সমাজব্যবস্থার এই আদর্শই প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং উহাকে এক সুন্দর কথায় প্রকাশ করিয়াছেন—"সর্বে সুখিনঃ সন্তু" (সকলেই সুখী হউক)।

রাস্কিনের উপরোক্ত "আন্ টু দিস্ লাষ্ট" নামক গ্রন্থ বাইবেলের (সেণ্ট্ ম্যাথুজ্ অধ্যায় ২০) একটি নীতিধর্মমূলক ছোট গল্পের ভিত্তিতে রচিত। উহা এইরূপঃ—এক ব্যক্তি কতিপয় শ্রমিককে তাঁহার আঙুর ক্ষেতে এক পেনি করিয়া মজুরী দিবার চুক্তিতে কাজ করিবার জন্য পাঠাইলেন। সেসময় সেখানে শ্রমিকের দৈনিক মজুরীর হার ছিল এক পেনি। ঐ ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের সময় শ্রমিকদের আড্ডায় গিয়া দেখেন যে, কিছু লোক কাজ না পাইয়া সেখানে বেকার বসিয়া আছে। তিনি তাহাদিগকেও তাঁহার ক্ষেতে কাজ করিতে পাঠাই-লেন। বৈকালে আবার যখন তিনি সেখানে গেলেন তখন আরও কয়েকজন বেকার শ্রমিককে তিনি সেখানে দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকেও তিনি তাঁহার

ক্ষেতে কাজ করিতে পাঠাইলেন। সন্ধ্যার পূর্বে যখন তিনি আবার সেখানে গেলেন তখন আরও কয়েকজন বেকারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ বেকার শ্রমিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা এখানে বেকার বসিয়া রহিয়াছ কেন?" শ্রমিকরা উত্তর দিল—"আমাদিগকে কেহ কাজে লয় না।" তিনি বলিলেন—"তোমরাও আমার আঙুর ক্ষেতে কাজ করিতে চল।" তাহারাও তাঁহার ক্ষেতে কাজ করিতে গেল। যখন রাত্রি হইল তখন ক্ষেতের মালিক তাঁহার কর্মচারীকে বলিলেন, "সকল শ্রমিককে ডাকিয়া প্রত্যেককে পুরা মজুরী দাও এবং সকলের শেষে যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগকে প্রথমে দিয়া শুরু কর।" সকলের শেষে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা যখন এক পেনি করিয়া পাইল তখন প্রথমে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা মনে করিল যে তাহাদিগকে তদপেক্ষা অনেক বেশী মজুরী দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন তাহাদিগকেও এক পেনি করিয়াই দেওয়া হইল তখন তাহাদের মধ্যে অভিযোগের সুরে কাণাকাণি আরম্ভ হইল। অবশেষে তাহারা মালিককে বলিল—"যাহারা সর্বশেষে আসিয়াছে তাহারা মাত্র এক ঘন্টা করিয়া কাজ করিয়াছে আর আমরা সারাদিন রৌদ্রে পুড়িয়া পুড়িয়া কাজ করিয়াছি। অথচ আমাদিগকে তাহাদেরই সমান মজুরী দেওয়া হইল?"

ক্ষেতের মালিক উত্তর দিলেন—"আমি তোমাদের প্রতি তো কোনরূপ অন্যায় করি নাই। তোমাদের সহিত এক পেনি করিয়া চুক্তি ছিল না কি? তোমাদের যাহা প্রাপ্য তাহা তোমরা লও এবং তোমরা ঘরে চলিয়া যাও। তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি ঠিক তাহাই সকলের শেষে যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগকেও দিব।" ("Friend, I do thee no wrong. Dist not thou agree with me for a penny? Take that thine is. And go thy way. I will give unto this last even as unto thee.") ইহার মূলগত নীতি হইতেছে 'প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহণীয় এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দেয়' (From each according to his capacity and to each according to his need.)—ইহাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের নীতি। তাই এই

নীতির ভিত্তিতে রচিত রাস্কিনের অমূল্য "আন্ টু দিস্ লাষ্ট" গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হৃদয়ে সর্বোদয়ের প্রথম প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন এবং উহা তাঁহার নিজের জীবনযাত্রার প্রণালীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল।

এই নীতিমূলক ছোট গল্পটির মধ্যে সমাজ গঠনের যে মূলনীতি নিহিত রহিয়াছে তাহা এখানে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। তবেই আমরা সর্বোদয় সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের চরম লক্ষ্য অনুধাবন করিতে পারিব। মানুষে মানুষে মূলত কোন ভেদ নাই। কারণ সকলের মধ্যে একই আত্মা রহিয়াছে। আত্মা অনন্তগুণে ভরা। আত্মার অনন্তদিকে অনন্ত বিকাশ হইতে পারে। আত্মার বিকাশের অর্থ মানুষের বিকাশ। সুতরাং সকল মানুষের সমান বিকাশ হইতে পারে। তবে একই জীবনে সকলের সমান বিকাশ হয় না। কাহারও বিকাশ কম, কাহারও বিকাশ বেশী। কাহারও বিকাশ একদিকে, কাহারও বিকাশ অন্যদিকে। কাহারও যোগ্যতা একদিকে বেশী, কাহারও যোগ্যতা অন্যদিকে বেশী। কাহারও বুদ্ধির বিকাশ বেশী, কাহারও দৈহিক শক্তির বিকাশ বেশী। কাহারও যোগ্যতা বেশী, কাহারও যোগ্যতা কম। বিনোবাজীর কথায়—"আমরা অনন্ত জন্মের যাত্রী। কেহ দুই পা আগাইয়া গিয়াছে, কেহ বা দুই পা পিছাইয়া রহিয়াছে—এইমাত্র পার্থক্য। মূলত সকলে সমান।" কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে বিভিন্ন প্রকারের ভেদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। কাহাকেও বড়, কাহাকেও ছোট, কাহাকেও উচ্চ, কাহাকেও নীচ বলিয়া গণ্য করা হয়। যে ব্যক্তি হাতের বা শরীর-শ্রমের কাজ করে তাহার যোগ্যতা কম বলিয়া মনে করা হয়। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র বুদ্ধির কাজ করে তাহার যোগ্যতা অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। উহার মধ্যেও বহুপ্রকার ভেদ করা হয়। যাহার যোগ্যতা অধিক বলিয়া গণ্য করা হয় তাহাকে অধিক পারিশ্রমিক দেওয়া হয় আর যাহার যোগ্যতা কম বলিয়া ধরা হয় তাহাকে কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় এই বিচার করা হয় না যে, যোগ্যতা কম থাকুক বা বেশী থাকুক যে ব্যক্তি তাহার যোগ্যতা অনুসারে সমাজকে সেবা করিতে প্রস্তুত আছে বা তদনুসারে সেবা করে, সে সমাজের নিকট হইতে যাহা

প্রয়োজন তাহা পাইবার অধিকারী। একজনের বুদ্ধির বিকাশ খুব বেশী হইয়াছে—খুব বড় বিদ্বান হইয়াছে। অন্যজনের বুদ্ধির বিকাশ তেমন হয় নাই কিন্তু সে শ্রমসাধ্য কাজ ভালভাবে করিতে পারে। পারিশ্রমিকের দিক হইতে এই দুই-এর মধ্যে খুব বেশী ভেদ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার যোগ্যতা অধিক, তাহার ভৌতিক প্রয়োজন কি বেশী হইবে? তাহার ক্ষুধা কি বেশী, তাহার শীতাতপ কি বেশী? তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারের আয়তন কি বড়? আর যাহার যোগ্যতা কম, তাহার ঐ সব ভৌতিক প্রয়োজন কি কম হইবে? একজন চক্ষুহীন এবং অন্যজন চক্ষুষ্মান। যাহার চক্ষু নাই সে ব্যক্তি যাহার দৃষ্টিশক্তি আছে তাহার ন্যায় কাজ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় তাহার ক্ষুধাবোধ হইবে না? অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারবর্গ থাকিবে না? উপরন্তু একজন কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিয়াও কাজ পাইল না বা পুরা কাজ পাইল না, কিন্তু সেজন্য সে বা তাহার পোষ্যবর্গ উপবাসী থাকিবে কেন? অবস্থাভেদে বিভিন্ন মানুষের ভৌতিক প্রয়োজনের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু যোগ্যতাভেদে ভৌতিক প্রয়োজনের পার্থক্য তো হয় না। এজন্য সমাজের ব্যবস্থা এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে সকলে নিজ নিজ প্রয়োজনমত পাইতে পারে। আর যদি সমাজের অবস্থা এমন হয় যে সমাজের পক্ষে সকলের ভৌতিক প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে মিটানো অসম্ভব হইয়া পড়ে তবে সকলের সমান-অনুপাতে কম করিয়া লওয়া উচিত। উপরন্তু যে সব কাজ সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাহাদের মধ্যে ছোট-বড় ভেদ করা এবং তজ্জন্য মানুষের মধ্যেও ছোট-বড় ভেদ সৃষ্টি করা অনুচিত।

॥ ৬ ॥ তেলঙ্গানার পরিস্থিতি ও বিনোবাজীর তেলঙ্গানা যাত্রা

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী শিব-রামপল্লী গ্রামে তৃতীয় বার্ষিক 'সর্বোদয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত তেলঙ্গানায় ভূমি-সমস্যা লইয়া হিংস্র হাঙ্গামা চলিতে-ছিল। কমিউনিষ্টদের হাতে বহু ভূম্যধিকারী নিহত হইয়াছিল। ভূম্যধি-

কারীদের নিকট হইতে বহু জমি কাড়িয়া লইয়া কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্যদিকে তাহাদিগকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া আবার সেই জমি তাহাদের হস্তচ্যুত করা হইতেছিল। সরকার সশস্ত্র উপায়ে হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা করিতেছিলেন। উভয় পক্ষেই হানাহানি কাটাকাটি চলিতেছিল। সেখানে ভীতি, আতঙ্ক, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ ব্যাপকভাবে চলিতেছিল। উভয় পক্ষের দ্বারা জনসাধারণ পীড়িত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হইতেছিল। দিবসে সশস্ত্র পুলিশের জুলুম—কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্টদের সহায়তাকারী সন্দেহে পুলিশের হাতে লাঞ্ছনা। রাত্রে জমিদার-জোতদারের সমর্থক বা পুলিশের সহায়ক সন্দেহে অন্য লোকের উপর কমিউনিষ্টদের অত্যাচার। দুই দিকের অত্যাচারে লোকে পাগলপ্রায় হইয়া গিয়াছিল।

বিনোবাজীর শরীর অসুস্থ ছিল। সেজন্য শিবরামপল্লী সর্বোদয় সম্মেলনে যাওয়ার বিশেষ অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। তৎপূর্ব বৎসর উড়িষ্যার অংগুল নামক স্থানে সর্বোদয় সম্মেলন হইয়াছিল। সেখানেও তাঁহার যাওয়া হয় নাই। শ্রীশংকররাও দেওজী তাঁহাকে বলিলেন—"যদি আপনি শিবরামপল্লী সম্মেলনে না যান তবে সকলের সেখানে গিয়া সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।" শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বিনোবাজী শিবরামপল্লী যাইতে সম্মত হইলেন এবং পদব্রজে যাইবেন স্থির করিলেন। ৮ই মার্চ রওনা হইয়া ৩০০ মাইল পথ হাঁটিয়া তিনি সেখানে পৌঁছিলেন। শিবরামপল্লীর সর্বোদয় সম্মেলনে সমবেত সর্বোদয় আদর্শে বিশ্বাসী কর্মীদের মনে তেলঙ্গানার ঘটনাবলী গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। অহিংস-পন্থায় বিশ্বাসী কর্মীদের নিকট তেলঙ্গানা এক চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ পরিগণিত হইল। শান্তি ও প্রেমের পথে দেশের ভূমি-সমস্যা তথা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে শুধু মুখে অহিংসার কথা বলা নিষ্ফল।

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর হইতে বিনোবাজী অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অহিংসা প্রয়োগের পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এক শান্তি সৈনিকের ভূমিকায় তিনি তেলঙ্গানায় ভ্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমি সর্বোদয়-সমাজের সেবক। সর্বোদয়ের নাম আমার

কাছে ভগবানের সমান। সর্বোদয় বলিতে সবাইকে বুঝায়; অতএব কমিউনিষ্টরাও আমার চিন্তার বহির্ভূত নহে।" তাই প্রথমেই তিনি হায়দ্রাবাদ জেলে আটক কমিউনিষ্ট বন্দীদের সহিত জেলে গিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং দুই-তিন ঘণ্টাকাল তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন—"কমিউনিষ্ট ভাইদের বিচারধারা কি তাহা জানিবার ও বুঝিবার জন্য আমি জেলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।" অতঃপর ১৬ই এপ্রিল তেলঙ্গানা ভ্রমণের জন্য তিনি কয়েকজন কর্মীসহ আবার পদব্রজে রওনা হইলেন। তেলঙ্গানা ভ্রমণের সংকল্পের পশ্চাতে যে-পটভূমিকা তাঁহার মনে ছিল এবং কেন তিনি পদব্রজে ভ্রমণের সংকল্প করেন সে-সম্পর্কে তেলঙ্গানা ভ্রমণকালীন ১৯৫১ সালের ২৬শে মে তারিখে বারঙ্গল (হায়দ্রাবাদ) নামক স্থানে তিনি তাঁহার প্রবচনে বলেন—"গান্ধীজীর তিরোভাবের পর আমি চিন্তা করিতেছিলাম—এখন আমার কি করা আবশ্যক। আমি উদ্বাস্তুদের সেবাকার্যে লাগিয়া গেলাম। কিন্তু এখানের (তেলঙ্গানার) কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে আমি বরাবর চিন্তা করিতেছিলাম। এখানকার হত্যা ইত্যাদি ঘটনা সম্পর্কে আমি সব সংবাদ পাইতেছিলাম। তাহা সত্ত্বেও আমার অন্তরে কোনরূপ নিরুৎসাহের ভাব আসে নাই। কেননা মানবজীবনের বিকাশের ধারা সম্পর্কে কিছু ধারণা আমার আছে। তাই আমি বলিতেছি—যে-যে সময় মানবজীবন নূতন সংস্কৃতি লাভ করে, সেই-সেই সময়ে কিছু-কিছু সংঘর্ষ ঘটিয়া থাকে, রক্তের ধারাও বহিয়া যায়। এইজন্য নিরুৎসাহিত না হইয়া শান্ত মনে চিন্তা করিতে হইবে এবং শান্তিপূর্ণ পথের সন্ধান করিতে হইবে।

"এখানে শান্তিস্থাপনের জন্য সরকার পুলিশ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পুলিশ বিচারক নহে। পুলিশ শস্ত্রধারী এবং অস্ত্রবলই তাহার একমাত্র উপায়। তাই জঙ্গলে ব্যাঘ্রের উপদ্রব প্রতিকারের জন্য পুলিশকে পাঠানো উচিত এবং পুলিশ ব্যাঘ্র শিকার করিয়া আমাদিগকে ব্যাঘ্রের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু কমিউনিষ্টদের উপদ্রব ব্যাঘ্রের উপদ্রব নহে—উহা মানুষের উপদ্রব। উহাদের কার্যপন্থা যতই ভ্রান্ত হউক না কেন উহাদের জীবনে কিছু-না-কিছু বিচারধারা আছে। সেক্ষেত্রে মাত্র পুলিশ

পাঠাইয়া প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে। সরকারের একথা অজানা নাই। তাহা সত্ত্বেও নিজের কর্তব্য বিবেচনা করিয়া সরকার পুলিশ পাঠাইয়াছেন। সেজন্য আমি সরকারকে দোষ দিতেছি না।

"আমি এইভাবে বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে ভাবিতেছিলাম। তাহাতে আমার মনে এই কল্পনার উদয় হইল যে, আমি এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিব। কিন্তু ভ্রমণ যদি করিতে হয় তবে কিভাবে ভ্রমণ করিব? মোটর প্রভৃতি যান বিচার-শোধক নহে, উহা সময়-সাধক—দূরত্ব ঘুচাইতে পারে মাত্র। যেখানে চিন্তাধারার শোধন করিতে হইবে সেখানে শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। পুরাকালে তো উষ্ট্র, ঘোটক ইত্যাদি ছিল। লোকে উহার ব্যবহার করিত এবং এক রাত্রির মধ্যে দুইশত মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিত। শঙ্করাচার্য, মহাবীর, বুদ্ধ, কবীর, নামদেব প্রভৃতি ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং পদব্রজেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দ্রুতগামী যানের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। কারণ বিচারধারা সংশোধন করা তাঁহাদের কাম্য ছিল এবং চিন্তাধারা শোধনের জন্য উত্তম উপায় পদব্রজে ভ্রমণ করা। বর্তমান কালে পদব্রজে ভ্রমণ আদৌ পছন্দ হয় না। কিন্তু যদি শান্তিপূর্বক চিন্তা করা যায় তবে বুঝিতে পারা যাইবে যে পদব্রজে ভ্রমণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।"

॥ ৭ ॥ ভূদানযজ্ঞের উদ্ভব

দুইদিন পরে ১৮ই এপ্রিল তারিখে বিনোবাজী নলগুণ্ডা জেলার অন্তর্গত পচমপল্লী গ্রামে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে দণ্ডকারণ্যের আরম্ভ। গ্রামবাসীগণ তাঁহাকে সাদরে ও সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিলেন। নলগুণ্ডা ও ওয়ারঙ্গল জেলা কমিউনিষ্ট উপদ্রবের জন্য কুখ্যাত হইয়াছিল এবং পচমপল্লী গ্রামকে কমিউনিষ্টদের কেন্দ্র বলা হইত। সেই অঞ্চলে দুই বৎসরের মধ্যে ২০ জন লোককে হত্যা করা হইয়াছিল। ঐ গ্রামে ১০।১২ জন কমিউনিষ্ট থাকিতেন। গ্রামে কমবেশী তিন হাজার লোকের বাস এবং আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ২৷৷৹ হাজার একর। তথাপি তিন হাজার লোকের মধ্যে দুই হাজার লোকই ভূমিহীন ছিল। পৌঁছিবার দুইঘন্টা পরে বিনোবাজী

গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। তিনি হরিজন-পল্লী দেখিতে গেলেন। হরিজনেরা অত্যন্ত গরীব। তাহাদের জমি তো ছিলই না, তাহারা পুরা কাজ পাইত না এবং পেট ভরিয়া খাইতেও পাইত না। ভূমিবানদের জমিতে মজুর খাটিত আর মজুরী বাবদ তাহার উৎপন্ন ফসলের কুড়ি ভাগের এক ভাগ, কম্বল ও একজোড়া করিয়া জুতা পাইত। বিনোবাকে দেখিয়া তাহারা মনে করিল, মহাত্মা গান্ধীর মত একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট অভাবের কথা জানাইলে হয়তো একটা ব্যবস্থা হইতে পারে। এই ভাবিয়া তাহারা বিনোবাজীর নিকট জমি চাহিল। তাহাদের কত জমি আবশ্যক তাহা বিনোবাজী জানিতে চাহিলেন। তাহারা বলিল যে ৪০ একর নীচু জমি ও ৪০ একর উঁচু জমি মোট ৮০ একর জমি পাইলে তাহাদের চলিয়া যাইবে। বিনোবাজী জানিতে চাহিলেন জমি পাইলে তাহারা মিলিত-ভাবে আবাদ করিবে কি না। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করিবার পর তাহাদের নায়ক জানাইল যে জমি পাইলে মিলিতভাবে চাষ করিবে। বিনোবাজী তাহাদিগকে সেই অনুসারে একটি দরখাস্ত দিতে বলিলেন। তিনি মনে করিতেছিলেন যে তিনি সরকারের নিকট হইতে জমি পাওয়াইয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। ইতিমধ্যে গ্রামের লোকজন সেখানে আসিয়া সমবেত হইলেন। বিনোবাজী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি সরকারের কাছ হইতে জমি পাওয়া না যায় অথবা জমি পাইতে বিলম্ব হয় তবে গ্রামের কেহ গরীবদের জন্য কিছু জমি দিতে পারেন না কি? সমাগত গ্রামবাসীদের মধ্য হইতে শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডি নামক এক ভাই বলিলেন যে, তিনি তাঁহার ও তাঁহার পাঁচ ভাইয়ের পক্ষ হইতে ৫০ একর উঁচু এবং ৫০ একর নীচু মোট ১০০ একর জমি গরীব ভাইদের জন্য দান করিতে চাহেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় প্রার্থনা-সভায় বিনোবাজী ঐ দানের কথা ঘোষণা করিলেন। তিনি জমি পাইলেন এবং তাহা ঐ দরিদ্র হরিজনদিগকে দিলেন। তাহাদের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু বিনোবাজী ভাবিলেন—এ কি হইল! যেখানে মানুষ ৩ কাঠা জমির জন্যও ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে, সেখানে চাহিতেই ১০০ একর জমি কিরূপে মিলিল! কত জমি চাই তাহাও তিনি বলেন নাই। তাঁহার আবশ্যক ছিল

৮০ একর জমির; কিন্তু পাওয়া গেল ১০০ একর। তবে কি ভগবান আজ শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডির মাধ্যমে ভারতে ভূমি-সমস্যা সমাধানের পথের ইঙ্গিত দান করিলেন? তবে কি মহাত্মা গান্ধীর আত্মা শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভূমি-সমস্যা সমাধানের শান্তিময় পথের সন্ধান তাঁহাকে দিলেন? এরূপে যাচ্ঞা করিয়া ভূমি-সংগ্রহ করত ভূমি-সমস্যা সমাধানের কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হইল। এরূপে ভূদানগঙ্গার গঙ্গোত্রীর সৃষ্টি হইল। তিনি ইহার নাম দিলেন 'ভূদানযজ্ঞ'। তিনি ভূদানযজ্ঞের বাণী বহন করিয়া সেই হিংসাবিধ্বস্ত রক্তস্নাত তেলঙ্গানার দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে এক আশংকার উদয় হইল। সেই সম্পর্কে তিনি তাঁহার এক প্রার্থনোত্তর ভাষণে বলিয়াছেন—"যেদিন আমি প্রথম দান পাই, সেদিন রাত্রে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম—এইরূপে ভূমি চাহিয়া চাহিয়া কি আমি সমস্ত দরিদ্র ভূমিহীনের সমস্যার সমাধান করিতে পারিব? আমি কোন সাহস পাইতেছিলাম না। কারণ ইতিহাসে এরূপ কাজের কোন নজীর ছিল না। কিন্তু ভিতর হইতে শক্তি পাইলাম। ভিতর হইতে বাণী আসিল—'ভীত হইও না; ভূমি চাহিতে থাক।' তখন আমার এরূপ মনে হইল যে, যখন তিনি আমাকে ভূমি চাহিবার প্রেরণা দিতেছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই অন্যকে ভূমি দান দিবারও প্রেরণা দিবেন; কারণ তিনি কখনও অসম্পূর্ণ কাজ করিতে পারেন না।" বিনোবাজী ১৯৫৫ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে অন্ধ্রের শ্রীকাকুলম জেলার পার্বতীপুরম্ গ্রামে প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেন, "যেদিন আমি প্রথম দান (একশত একর) পাইলাম সেদিন রাত্রে চিন্তা করিতে লাগিলাম—এই ঘটনার কোন অর্থ আছে কি? আমার মনে হইল, পৃথিবীতে মানুষ শুধু নিজের বিচারে কাজ করিতে পারে না। বিশ্বজগতে তাহার জন্য বিচার তৈয়ারী হইয়া থাকে। আজ জগতে আবহাওয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আমি আরও ভাবিতে লাগিলাম—এই কার্য সম্পন্ন করিবার শক্তি আমার আছে কি? তখন অন্তর হইতে সাড়া আসিল—আমি শক্তিশূন্য। কিন্তু শক্তিশূন্য হইলেও আমি বিশ্বাস-শূন্য নহি। তাই আমি যদি অভিমানশূন্য হইয়া যাই তবে রাম অবতারে যিনি বানরের দ্বারা কাজ করাইয়াছিলেন তিনি আমার দ্বারাও কাজ করাইয়া

লইবেন। দ্বিতীয় দিন আমি অন্য গ্রামে গিয়া বলিলাম, যদি আপনাদের চার পুত্র থাকে তবে আমি আপনাদের পঞ্চম পুত্র। আমাকে এক-পঞ্চমাংশ দিন। কেহ যে এমনভাবে চাহিতে পারে তাহার জন্য সেখানকার লোক প্রস্তুত ছিল না। হিরোসিমায় এ্যাটম্ বোমা পতনে যেরূপ ফল হইয়াছিল আমার কথার ফলও তাঁহাদের উপর সেরূপ হইল। আমি ২৫ একর জমি পাইয়া গেলাম এবং এরূপে ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গেল।" এইভাবে অতীব বিনয়ে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে তিনি ভূমিদান চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইলেন। জুন মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত দুই মাস তিনি তেলঙ্গানায় এরূপে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিলেন। এই দুই মাসের মধ্যে লোকে দরিদ্রনারায়ণের জন্য তাঁহাকে ১২ হাজার একর জমি দান করিল। বর্ষা আসিয়া পড়িল। তিনি চাতুর্মাস্য পালনের জন্য এবং 'কাঞ্চনমুক্তি' সাধনের কাজে অংশগ্রহণের জন্য তাঁহার পরমধাম-আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

অনেকের চক্ষু খুলিল।—ভারতের অর্থনৈতিক স্বরাজের ভিত্তি পত্তনের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়াছে, ভারতের ভূমি-সমস্যার শান্তিময় সমাধানের পথ মিলিয়াছে। কিন্তু আবার অনেকের মনে এই সন্দেহ থাকিল যে, তেলঙ্গানায় জোতদার-জমিদারগণ কমিউনিষ্টদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছে বলিয়া কিছু-কিছু জমি দিয়াছে। সাধারণ অবস্থায় এভাবে জমি পাওয়া সম্ভব নহে। বিনোবাজী ভাবিলেন, —জমি তো শুধু জমিদার-জোতদারেরা দান করেন নাই? বহুজমি তো সামান্য কৃষকের কাছ হইতে পাওয়া গিয়াছে। তবে এ সন্দেহ আসে কেন? উপরন্তু আশঙ্কাকারীদের কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রেমের পথে কাজ পাইতে হইলে প্রথমে হিংসার প্রয়োগ করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইহা তো অহিংসার পন্থা নহে। তিনি মনে করিলেন, যেখানে তেলঙ্গানার পটভূমিকা নাই অর্থাৎ যেখানে কোনরূপ হিংসাত্মক আন্দোলন হয় নাই এমনস্থানে ভূদানযজ্ঞের পরীক্ষা করা আবশ্যক।

॥ ৮ ॥ ভূদানযজ্ঞের ক্রমবিকাশ

ভগবান সে সুযোগ তাঁহাকে দিলেন। অহিংস সমাজরচনা সম্পর্কে তাঁহার বিচার জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিনোবাজীকে দিল্লীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বিনোবাজী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু পদব্রজে যাওয়া স্থির করিলেন। তাঁহার জন্মতিথি দিবসের পরদিন ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) তিনি মধ্যপ্রদেশ হইয়া উত্তরভারতের পথে দিল্লী রওনা হইলেন এবং ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচার করিতে করিতে ও ভূমিদান চাহিতে চাহিতে চলিলেন। দুই মাসে ৫৫০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি দিল্লী পোঁছিলেন। এই দুই মাসে তিনি ১৮ হাজার একর জমি পাইলেন। যে অঞ্চলের মধ্য দিয়া তিনি গিয়াছিলেন সেখানে কোনরূপ হিংসাত্মক আন্দোলন কোনদিন হয় নাই। সে অঞ্চলে তখন কোন হিংসাবাদী দলও কর্মতৎপর ছিল না। তিনি তেলংগানায় দুই মাসে পাইয়াছিলেন ১২ হাজার একর; আর এই শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে দুই মাসে পাইলেন ১৮ হাজার একর। আশঙ্কাকারীদের সংশয় দূর হইল।

বিনোবাজীর দিল্লীর কাজ শেষ হইলে উত্তরপ্রদেশের সর্বোদয়প্রেমী কর্মিগণ তাঁহাকে উত্তরপ্রদেশের ব্যাপক ক্ষেত্রে ভূদানযজ্ঞের পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিনোবাজী তাঁহার আশ্রমে আর প্রত্যাবর্তন না করিয়া উত্তরপ্রদেশে সেরূপ পদব্রজেই রওনা হইলেন এবং সেখানে পাদপরিক্রমা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সাধারণ নির্বাচন ছিল এবং সেখানকার অধিকাংশ কর্মী সাধারণ নির্বাচনে তিন মাস কাল ব্যস্ত ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে প্রভূত সাড়া ও সহযোগিতা পাইতে থাকেন এবং ছয় মাসে এক লক্ষ একর ভূমিদান পাইলেন। পরবর্তী (১৯৫২ সালের) সর্বোদয় সম্মেলনে তাঁহার উপস্থিত হওয়ার সুবিধার জন্য উহা তাঁহার পরিক্রমা-পথে বারাণসীর নিকটবর্তী সেবাপুরী আশ্রমে এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। তখন পর্যন্ত ছয় মাসে তিনি এক লক্ষ একর ভূমি

পাইয়াছিলেন। সেবাপুরী সম্মেলনে ইহা স্থির করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন সারা ভারতে প্রবর্তন করা হইবে এবং এই সংকল্প করা হয় যে, প্রথম কিস্তিস্বরূপ দুই বৎসরে সারা ভারতে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করা হইবে। ভারতের গ্রাম-সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। প্রতি গ্রামে একটি করিয়া ভূমিহীন কৃষক পরিবারকে পাঁচ একর করিয়া জমি দিয়া উহাকে 'সর্বোদয় পরিবার' নামে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ২৫ লক্ষ একর ভূমির আবশ্যক হয়। এই হিসাবের ভিত্তিতে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহের সংকল্প করা হয়। বিনোবাজীর অনুমোদনক্রমে সর্বসেবা সংঘ প্রতি প্রদেশে প্রাদেশিক ভূদানযজ্ঞ সমিতি গঠন করিয়া দিলেন। এইরূপে সারা ভারতে ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন প্রবর্তিত হইল।

বিনোবাজী তেলংগানা ভ্রমণের সময় দৈনিক গড়ে দুইশত একর, দিল্লী যাইবার পথে তিনশত একর, উত্তরপ্রদেশে সেবাপুরী সম্মেলন পর্যন্ত ছয় মাসে দৈনিক গড়ে পাঁচশত একর এবং সেবাপুরী সম্মেলনের পর দৈনিক গড়ে এক হাজার একর করিয়া ভূমিদান পাইয়াছিলেন। সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের লোক তাঁহাকে ভূমিদান দিয়াছিলেন। হিন্দুরা দেন, মুসলমানেরা দেন এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরাও দেন। স্ত্রীলোকেরাও অতীব শ্রদ্ধাভক্তির সহিত দেন। জমিদার ও বড় বড় জোতদার দেন, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কৃষকও দেন। এমন সব দরিদ্র কৃষক শ্রদ্ধার সহিত ভূদানযজ্ঞে তাঁহাদের ক্ষুদ্র আহুতি দান করেন, যাহা বিনোবাজীর কাছে মধুর স্মৃতিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। উহার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"এইযজ্ঞে কতিপয় 'শবরী' আপন-আপন 'কুল' দান করিয়াছেন এবং কতিপয় 'সুদামা' নিজেদের 'তন্ডুল' দান করিয়াছেন। ইহা আমার নিকট চিরস্মরণীয় ভক্ত-গাঁথা হইয়া রহিয়াছে।" কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক-মজদুর-প্রজা দল (বর্তমানে সম্মিলিত হইয়া প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টি) ও ভারতীয় জনসংঘ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলসমূহ ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন সমর্থন করেন।

বর্ষায় তিনি বারাণসীর কাশী-বিদ্যাপীঠে অবস্থান করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৫২) পুনরায় তিনি পরিক্রমা আরম্ভ করেন ও দুইদিন উত্তর-প্রদেশে ভ্রমণ করত উক্ত প্রদেশের পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর

প্রান্তে বিহারে প্রবেশ করেন। তখন পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে তিন লক্ষাধিক একর ভূমি সংগৃহীত হইয়াছিল। বিহারেও আশানুরূপভাবে ভূমি পাওয়া যাইতে লাগিল। দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সারা ভারতে যে ২৫ লক্ষ একর ভূমিদান প্রাপ্তির সংকল্প করা হয় তন্মধ্যে বিহারের ভাগে ছিল ৪ লক্ষ একর। কথা ছিল, বিনোবাজী বিহারে প্রায় ৬ মাস পরিভ্রমণ করিয়া ১৯৫৩ সালের ৭ই মার্চ তারিখে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের নিকটবর্তী স্থান দিয়া পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করিবেন এবং ৭০ দিন ভ্রমণের পর বাঁকুড়া জেলার প্রান্তে বাংলার ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ১৬ই মে (১৯৫৩) বিহারের মানভূম জেলায় প্রবেশ করিবেন। বিহারে আরও একমাস কাল ভ্রমণ করত বিহারের পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিবেন এবং অতঃপর উড়িষ্যায় ভ্রমণ আরম্ভ করিবেন। কিন্তু বিহারে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি তাঁহার ভ্রমণ-পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন করিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, বিহারের ভূমি-সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিহার ত্যাগ করিবেন না। তিনি বিহারের নিকট উহার কর্ষণযোগ্য ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ (৩২ লক্ষ একর) ভূমিদান চাহিলেন। বিনোবাজীর অনির্দিষ্ট কাল বিহারে থাকিয়া যাওয়ার সংকল্পের পিছনে কি যুক্তি ছিল তাহা বুঝা আবশ্যক। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"ভূমি-সমস্যার সমাধান করিতে পারিলে বর্তমান চিন্তাধারায় বিপ্লব আসিবে এইজন্য আমি সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিতেছি এবং আরও কিছুলোক ভ্রমণ করিতেছেন। কিন্তু আমি অনুভব করিয়াছি যে, এক প্রদেশে ব্যাপকভাবে উহার প্রয়োগ করিয়া কিরূপে সমস্যার সমাধান করা যায় তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এইজন্য বিহার হইতে আমি ৩২ লক্ষ একর জমি চাহিয়াছি।" উপরন্তু প্রদেশের মধ্যে কোন একটি জেলাতে আত্যন্তিকভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। ভগবান বুদ্ধের পরিভ্রমণভূমি বলিয়া গয়া জেলাকে ঐরূপ আত্যন্তিক কাজের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। বিহারে যত প্রকারের ভূমি আছে, সেই সমস্ত প্রকারের ভূমি গয়া জেলায় আছে। সমতল ভূমি, উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো ভূমি, বনাকীর্ণ, পার্বত্য, বালুপ্রধান ও কংকরময় ভূমি সবই গয়া জেলায় আছে। এজন্য ভূমির দিক হইতে গয়া জেলা বিহারের প্রতিনিধি-

স্থানীয়। গয়া জেলাকে আত্যন্তিক কাজের জন্য নির্বাচন করিবার ইহাও এক প্রধান কারণ। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহুসংখ্যক কর্মী সেখানে কাজ করিতে থাকেন।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে বিনোবাজী অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন তিনি মানভূম জেলায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। অসুখের জন্য মানভূম জেলার চাণ্ডিল গ্রামে তাঁহাকে প্রায় তিনমাস কাল বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হয়। এজন্য ঐ বৎসরের সর্বোদয়-সম্মেলনের অনুষ্ঠান চাণ্ডিলেই করিতে হয়। চাণ্ডিল সম্মেলনে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় যে, সেবাপুরী সম্মেলনের সঙ্কল্পানুসারে দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সারা ভারতে ২৫ লক্ষ একর ভূমিদান সংগ্রহ করা তো হইবেই, উপরন্তু ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে উহার মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ ৫ কোটি একর ভূমি ভূদানযজ্ঞে দানস্বরূপ সংগ্রহ করা হইবে। সেই উদ্দেশ্যে আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য—অন্তত এক বৎসরের জন্য অনন্যকর্মা হইয়া একাগ্রভাবে ভূদানযজ্ঞের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য কর্মীদের নিকট আবেদন করা হয়। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ৫ কোটি একর পরিমাণ ভূমিদান সংগ্রহ করিয়া ভারতের ভূমি-সমস্যা সমাধান সার্থক করিয়া তুলিবার সঙ্কল্প বিশেষ অর্থপূর্ণ। ১৭৫৭ সালে পলাশী-যুদ্ধে ভারত পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। আর ১৯৫৭ সালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের স্বরাজের পূর্ণতা প্রাপ্তি। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"আমি মনে করি অর্থ-নৈতিক ক্রান্তি* অনিবার্য। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল, ১৮৫৭ সালে বিপ্লব এবং এক্ষণে ১৯৫৭ সালে আর্থিক ও সামাজিক ক্রান্তি না হইয়া যায় না।"

সেবাপুরী সর্বোদয় সম্মেলনে দুই বৎসরের মধ্যে ভূদনাযজ্ঞে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল। দুই বৎসর অতীত

---

* 'ক্রান্তি' শব্দের অর্থ ৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হওয়ার অব্যবহিত পরে ১৮—২০শে এপ্রিল, ১৯৫৪ বুদ্ধগয়ায় সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় পর্যন্ত সারা ভারতে ২,৩৭,০২২ জন দাতার নিকট হইতে ২৮,২৫,১০১ একর ভূমি সংগৃহীত হয়। ইহাতে সেবাপুরী সম্মেলনের সংকল্প পূর্ণ হয়, যদিও প্রত্যেক প্রদেশের জন্য যে কোটা নির্দিষ্ট ছিল তাহা কতিপয় প্রদেশে পূর্ণ হয় নাই। তথাপি দুই বৎসরের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দাতার নিকট হইতে এত অধিক ভূমি পাওয়া এক অভাবনীয় ব্যাপার। ইহা ছাড়া বহু সমগ্র গ্রামদান পাওয়া যায়। অর্থাৎ গ্রামে বেশী হউক আর কম হউক যাঁহাদের যে-ভূমি ছিল তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের সমস্ত ভূমি ভূদানযজ্ঞে অর্পণ করেন। এরূপে ভূদান-যজ্ঞের প্রথম পর্যায় সফলভাবে অতীত হয়। এখন পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ৫ কোটি একর ভূমিদান সংগ্রহ করিবার কাজ আরম্ভ হইল। কোন কোন প্রদেশ এই দৃষ্টি লইয়া ইতিপূর্বেই কর্মতৎপর হইয়াছিল। বুদ্ধগয়া সম্মেলনের পর সারা দেশে এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কার্য আরম্ভ হইল। উপরন্তু বুদ্ধগয়া সম্মেলনের পর হইতে ভূমি-বিতরণের দিকে জোর দেওয়া হয় ও ইতিপূর্বে যে-জমি পাওয়া গিয়াছে তাহা সুব্যবস্থিতভাবে এবং তাড়াতাড়ি বিতরণ করিয়া দিয়া গ্রামরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিবার কাজও তৎপরতার সহিত করা হইতে থাকে।

বিহারে দীর্ঘ ২৭ মাস পাদ-পরিক্রমা করিয়া উড়িষ্যায় যাইবার পথে বিনোবাজী পশ্চিমবঙ্গ হইয়া যান। বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া পদযাত্রা করিয়া উড়িষ্যায় যাইতে তাঁহার ২৫ দিন অতিবাহিত হয়। ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী অতি প্রত্যূষে তিনি বাঁকুড়া জেলার শালতোড়ায় শুভ পদার্পণ করেন। তাঁহার পরিক্রমার সময় বাঁকুড়া জেলার জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত জাগৃতি পরিলক্ষিত হয়। ২৬শে জানুয়ারী তিনি উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন। পূর্বেই সেখানে ভূদানযজ্ঞের কাজ বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। তখন পর্যন্ত উড়িষ্যায় ৪২ হাজার দাতার নিকট হইতে মোট ১ লক্ষ ২৫ হাজার একর ভূমি ও ৮৫টি গ্রামদান পাওয়া গিয়াছিল। সেখানকার আন্দোলনের অগ্রগতি, বিশেষত গ্রামদানের গতি লক্ষ্য করিয়া উড়িষ্যায় যাইবার পূর্বেই বিনোবাজী এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"বিহারে

ভূমি-প্রাপ্তি, উড়িষ্যায় ভূমি-ক্রান্তি এবং অন্য সর্বত্র মুক্ত ভ্রমণ।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। বিনোবাজী উড়িষ্যায় যাইবার পর হইতে সমগ্র প্রদেশে বিশেষ করিয়া কোরাপুট জেলায় ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন এক নবপর্যায়ে উপনীত হয়। সেখানে গ্রামদানের প্রবাহ চলিতে থাকে। ভূমিদানের চরম পরিণতি সর্বস্ব গ্রামদানে। কারণ তাহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা ঘুচিয়া যায় এবং গ্রাম এক পরিবারে পরিণত হইয়া 'গ্রাম-পরিবারের' সৃষ্টি করে। যেদিন (২৮শে মে, '৫৫) তিনি কোরাপুট জেলায় প্রবেশ করেন 'সেদিন পর্যন্ত উড়িষ্যায় দানপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার একর এবং দাতার সংখ্যা ছিল ৫৯ হাজার ৩ শত। তন্মধ্যে এক কোরাপুট জেলায়ই ৯ হাজার দাতা হইতে ৫৯ হাজার একর জমিদান পাওয়া গিয়াছিল। সর্বস্বদানী গ্রাম পাওয়া গিয়াছিল ৯৯ খানি। ২০শে আগষ্ট ১৯৫৫ পর্যন্ত উড়িষ্যায় মোট ৪৯৮টি গ্রামদান পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে কোরাপুট জেলার গ্রামদানের সংখ্যাই প্রায় ৪০০, এবং ঐদিন পর্যন্ত উড়িষ্যায় প্রাপ্ত জমির পরিমাণ মোট ২ লক্ষ ৯ হাজার ৬৮১ একর।

১৯৫৫ সালে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে পুরীতে সপ্তম-বার্ষিক সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ভূমি-ক্রান্তি সফল করিবার সঙ্কল্পের পুনরুক্তি করা হয়। উপরন্তু সর্বোদয় তথা অহিংসায় নিষ্ঠাবান সকল ব্যক্তির প্রতি সর্বসেবা সংঘ সবিনয় আবেদন জানান যে, অহিংস প্রক্রিয়ার ঐ কঠিন পরীক্ষার সময় তাঁহারা যেন ১৯৫৭ সালের মধ্যে ভূমি-ক্রান্তি সফল করিবার জন্য অন্য সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সমগ্র বুদ্ধি, শক্তি ও কার্যকুশলতা ভূদানযজ্ঞের কাজে সমর্পণ করেন। ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত সারা ভারতে ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ৬৫৯ জন দাতার নিকট হইতে মোট ৪০ লক্ষ ১৪ হাজার ৬২৯ একর ভূমিদান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২ লক্ষ ১১ হাজার ২০৪ একর জমি ৭২ হাজার ৩৫২টি পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

উড়িষ্যার পদযাত্রা সমাপ্ত করিয়া ১৯৫৫ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে বিনোবাজী অন্ধ্ররাজ্যে প্রবেশ করেন। ঐ সময় পর্যন্ত উড়িষ্যায় মোট ৮১২টি গ্রামদান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৬০৬টি কোরাপুট জেলায়। পরবর্তী

জানুয়ারী মাসের (১৯৫৬) প্রথমে তিনি তদানীন্তন হায়দ্রাবাদ রাজ্যে পদযাত্রা আরম্ভ করেন। উড়িষ্যা ভ্রমণকালে ৩ দিন এবং হায়দ্রাবাদ ভ্রমণকালে ২ মাস তাঁহাকে অন্ধ্ররাজ্যের মধ্য দিয়া পদযাত্রা করিতে হইয়াছিল। অন্ধ্রের পদযাত্রায় প্রায় ৬৩ হাজার একর ভূমিদান, বার্ষিক ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা সম্পত্তিদানের প্রতিশ্রুতি, ২০টি সমগ্রদানী গ্রাম ও ১১টি গৃহদান পাওয়া যায়।

ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনকে সঙ্ঘের বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া উহাকে তন্ত্রমুক্ত করিয়া জন-আধারিত করিবার কল্পনা উড়িষ্যা যাত্রার সময়েই বিনোবাজীর মনে উদিত হয় এবং উড়িষ্যার শেষ শিবিরে তিনি সর্ব-সেবা সঙ্ঘের কতিপয় বিশিষ্ট সদস্যের নিকট তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। অতঃপর ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অন্ধ্ররাজ্যের বেজওয়াদা শহরে সর্ব-সেবা সঙ্ঘের যে বৈঠক হয় তাহাতেও ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি ঐ বিষয় আলোচনা করেন ও নিধিমুক্তির (কোন সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য না লওয়ার) কথা উল্লেখ করেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন,—"সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য লওয়া বা না লওয়ার প্রশ্ন গৌণ। মুখ্য কথা এই যে আন্দোলনের বুনিয়াদকে ব্যাপক করিতে হইবে।" কিন্তু সর্বসেবা সঙ্ঘ তখন অতদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তবে সঞ্চিত তহবিল হইতে কর্মীদের নির্বাহ খরচের জন্য যে অর্থ গ্রহণ করা হইত তাহা উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমানভাবে কমাইয়া সম্পত্তিদানের উপর অধিকতরভাবে নির্ভরশীল হইবার জন্য অধি-কতর প্রচেষ্টা হইতে থাকিল।

১৯৫৬ সালের ১৩ই মে তারিখে বিনোবাজী অন্ধ্রের পদযাত্রা শেষ করিয়া তামিলনাদে প্রবেশ করেন। উহার দুই সপ্তাহ পরে ২৭শে মে হইতে ২৯শে মে তামিলনাদের অন্তর্গত ভারতের সপ্তমহাতীর্থের মধ্যে অন্যতম মহাতীর্থ কাঞ্চিপুরমে অষ্টম সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সাল অতীত হইতে আর মাত্র ১৮ মাস বাকি। এজন্য বিনোবাজী এযাবৎ আন্দোলনের যে প্রগতি হইয়াছে সেই সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ৫ বৎসর ব্যাপী আন্দোলনের ফলে এমন কয়েকটি নমুনা সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহা অনুসরণ করিয়া নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত প্রযত্ন করিলে প্রত্যাশিত

সময়ের মধ্যে অভীষ্টলাভ হইতে পারে। ঐ সব নমুনা হইতেছে (১) বিহারে ২৪ লক্ষ ভূমিদান পাওয়া যাওয়ায় ইহা সিদ্ধ হইয়াছে যে অহিংস উপায়ে যে কোন প্রদেশের ভূমি-সমস্যা বহুদূর পর্যন্ত সমাধান করা যাইতে পারে। (২) উড়িষ্যায় ব্যাপক গ্রামদান পাওয়া গিয়াছে। তাহার দ্বারা ভূমিতে মালিকত্ব-বোধের মূল শিথিল হইয়াছে এবং গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা সম্মুখে আসিয়াছে। উপরন্তু ব্যাপক গ্রামদানের ফলে বিশ্বের সম্মুখে এক নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। (৩) বিহারে একই দিনে দুইশত গ্রামে গ্রামবাসীরা নিজেরাই ভূমি বিতরণ করিয়া লইয়াছে। উড়িষ্যায় ৪।৫ শত সমগ্রদানী গ্রামে প্রায় একই সময়ে ভূমি বিতরণ করা হইয়াছে। তাহাতে ব্যাপকভাবে ভূমি-বিতরণের উপায় কি তাহা বুঝা গিয়াছে। (৪) মধ্যপ্রদেশে ভূদানযজ্ঞের অগ্রগতি আশানুরূপ হইতেছিল না। অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য মধ্য-প্রদেশের কর্মীরা সামূহিক পদযাত্রার কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং তাহার ফল খুব ভাল হয়। অন্যান্য প্রদেশে সামূহিক পদযাত্রার কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ জাগ্রত হয়। ইহাতে এই আশার সঞ্চার হইয়াছে যে যেখানে কর্মীরা একা একা কাজ করিয়া আশানুরূপ ফল পাইতেছেন না সেখানে তাঁহারা এক নির্দিষ্টস্থানে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। (৫) ব্যাপকভাবে সম্পত্তিদান পাওয়া যাইতে পারে কিনা এ সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু বিহারে একটি জনসভায় জয়প্রকাশনারায়ণজী কয়েক হাজার সম্পত্তিদানপত্র পান। উড়িষ্যার ছোট ছোট গ্রামেও বহুসংখ্যক সম্পত্তিদান পাওয়া যায়।

তামিলনাদে বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের কাজের সংগে (১) খাদি ও অন্যান্য পল্লীশিল্প (২) জাতিভেদ দূরীকরণ ও (৩) নয়ীতালিম এই তিনটি কাজ যোগ করেন। তিনি কেন এরূপ করেন এ সম্পর্কে তিনি বলেন—"একটি প্রদেশে লক্ষ লক্ষ একর ভূমিদান পাওয়া যাইতে পারে ইহা বিহার সিদ্ধ করিয়াছে। একটি প্রদেশে শত শত গ্রামদান পাওয়া যাইতে পারে ও তদ্দারা ব্যক্তিগত মালিকানা ঘুচিয়া যাইতে পারে ইহা উড়িষ্যা সিদ্ধ করিয়াছে। এই-দিক হইতে আমার কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। ভূদানের পথে কি হইতে পারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। একজন মানুষ ইহার অতিরিক্ত আর কি করিতে

পারে? আমার নিজের সম্পর্কে বলিতে গেলে আমার পক্ষে ভূদানের কাজের পূর্ণ-পরিণতি হইয়া গিয়াছে। এইজন্য এখন হইতে আমি এখানে আমার ভূদানের কাজের সঙ্গে গ্রামোদ্যোগ, নয়ীতালিম ও জাতিভেদ নিরাকরণ প্রভৃতির কাজ জুড়িয়া দিয়া গ্রামরাজ্যের কল্পনাকে রূপায়িত করিতে চাই।" গ্রামদানের পর গ্রামনির্মাণের জন্য যে যে কাজ করা প্রয়োজন তাহা বিনোবাজী এরূপে তাঁহার কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। কিন্তু তখন তিনি হয়তো মনে করিতে পারেন নাই যে ভূদানের ব্যাপারে তাঁহার সব কাজ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। কারণ উড়িষ্যায় শত শত গ্রামদান পাওয়া যাইলেও অনেকে পাহাড় ও জঙ্গল অঞ্চলের সরলমতি অধিবাসীদের স্বল্পমূল্য-ভূমি-বিশিষ্ট গ্রামের গ্রামদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁহারা মনে করিতেন যে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের গ্রামের বা মূল্যবান-ভূমি-বিশিষ্ট গ্রামের গ্রামদান পাওয়া সম্ভব নহে। বিনোবাজীর পদযাত্রার সময়ে তামিলনাদ তাঁহাদের এই আশঙ্কা দূর করিল। মাদুরা জেলার জমিতে তিনটি করিয়া ফসল হয়। সেখানে মূল্যবান-ভূমি-বিশিষ্ট, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি অধ্যুষিত বহু বড় বড় গ্রামের গ্রামদান পাওয়া গেল। উপরন্তু সেখানে "ফিরকাদান" প্রাপ্তিও ঘোষিত হয়।

তামিলনাদে বিনোবাজীর পদযাত্রার সময়ে ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে পলনী নামক স্থানে বিনোবাজীর সমক্ষে সর্বসেবা সঙ্ঘের বৈঠক হয়। তথায় সর্বসেবা সঙ্ঘ বিনোবাজীর প্রেরণায় ১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে আন্দোলনকে 'তন্ত্রমুক্ত ও নিধিমুক্ত' করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তদনুসারে ১৯৫৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ভূদানযজ্ঞ সমিতি-সমূহের বিলোপ-সাধন করা হয় এবং গান্ধীস্মারকনিধি হইতে যে অর্থ সাহায্য লইয়া এতদিন ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের ব্যয় নির্বাহ করা হইতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কর্মীদের জন্য ও আন্দোলনের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য যাহা প্রয়োজন হইবে তাহা সম্পত্তিদান, সূত্রদান, শস্যদান প্রভৃতির সাহায্যে মিটাইবার সঙ্কল্প করা হয়। এরূপে সংস্থা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল ও সঞ্চিত অর্থভাণ্ডারের আশ্রয় ত্যাগ করা হইল। অর্থাৎ আন্দোলনকে জন-আধারিত করা হইল। আন্দোলন পরিচালনের দায়িত্ব জনসাধারণের উপর

অর্পিত হইল। কিন্তু আন্দোলন জন-আধারিত হইয়া ঠিকপথে চলিতে হইলে এবং উহার আশানুরূপ অগ্রগতি সম্ভব করিতে হইলে নিষ্কাম, আদর্শনিষ্ঠ সেবার আলোক-বর্ত্তিকা জনগণের সম্মুখে সদা প্রজ্জ্বলিত রাখা প্রয়োজন। এজন্য সংস্থা ভাঙ্গিয়া দিয়া নিষ্কাম, আদর্শনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ কর্মীদল সৃষ্টি করিবার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইল। ঐ আদর্শনিষ্ঠ, নিষ্কাম কর্মীকে 'সত্যাগ্রহী লোকসেবক' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সত্য, অহিংসা, লোকনীতি-পরায়ণতা, নিষ্কামতা ও নিষ্পক্ষতা এই পঞ্চবিধ নিষ্ঠা তাঁহার থাকা প্রয়োজন। প্রতি জেলার সত্যাগ্রহী লোকসেবকগণের মধ্য হইতে একজনকে 'জেলা নিবেদক' করা হয়। জেলার কাজ সম্পর্কে সর্বসেবা সঙ্ঘের সহিত তাঁহার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা হইল এবং তিনি জেলার কাজের পাক্ষিক বিবরণ সর্বসেবা সঙ্ঘ ও বিনোবাজীর নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তামিলনাদের পদযাত্রার সময়ে বিনোবাজী কন্যাকুমারীতে যান এবং তথায় সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া এই প্রতিজ্ঞা করেন যে যতদিন ভারতে গ্রামস্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিন তিনি পদযাত্রা করিতে থাকিবেন।

১৯৫৭ সালের মে মাসের শেষে কেরলের অন্তর্গত কালড়ী গ্রামে (ভগবান শঙ্করাচার্যের জন্মভূমি) সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহার কিছুদিন পূর্বে বিনোবাজী তামিলনাদের ভ্রমণ শেষ করিয়া কেরলে প্রবেশ করেন। কালড়ী সম্মেলনে বিনোবাজীর প্রেরণায় আন্দোলনকে মুখ্যত গ্রামদান আন্দোলনে রূপান্তরিত করা হয়। সর্বসেবা সঙ্ঘের ঐ সম্পর্কীয় প্রস্তাব অনুসারে অধিকাংশ শক্তি তখন গ্রামদান আন্দোলনের সফলতার জন্য নিয়োজিত করিবার জন্য কালড়ী সম্মেলনে আবেদন করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত পাঁচ কোটি একর ভূমিদান সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প এড়াইয়া যাওয়া হইল না কি—এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ পাঁচ কোটি একর ভূমিদান সংগৃহীত হইবার পূর্বেই আন্দোলন গ্রামদানের স্তরে উন্নীত হইয়া এমন ব্যাপক আকার ধারণ করিল, যাহাতে উহার সুদূর-প্রসারী ও ক্রান্তিকারী সম্ভাবনা সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ভূমিক্রান্তি সফল করিবার পক্ষে উহাই যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় তাহাও

সকলে অনুধাবন করিলেন। ফলে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল তথা দেশের প্রধান বিচারশীল ব্যক্তিগণ গ্রামদান সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় আন্দোলনকে গ্রামদানে রূপান্তরিত করা খুব সমীচীন হইয়াছিল। যেখানে গ্রামদানের দ্বারা দেশের সমগ্র ভূমির উপর হইতে ব্যক্তিগত মালিকানা নিরাকরণ করিবার সংকল্প লওয়া হইয়াছে সেখানে আংশিকভাবে পাঁচ কোটি একর ভূমিদান সংগ্রহ করিবার সংকল্প আপনা হইতেই উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তবে আংশিক ভূমিদান পাওয়া যাইলে যে তাহা গ্রহণ করা হইবে না এমন কথা হয় নাই। বরং যেখানে গ্রামদানের অনুকূল নহে সেখানে আংশিক ভূমিদান চাহিবারই কথা। তবে তখন হইতে ভূমিদান সংগ্রহকে গৌণ স্থান দেওয়া হইল।

বিনোবাজীর কেরল যাত্রার সময় সর্বাপেক্ষা মহত্বপূর্ণ কাজ হইল দেশব্যাপী শান্তিসেনা প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা। বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা পৃথক। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ অশান্তি কম দুশ্চিন্তার বিষয় নহে। বরং আভ্যন্তরীণ অশান্তি অধিকতর বিপজ্জনক ও ভয়প্রদ। কারণ আনবিক অস্ত্রশস্ত্র সকল রাষ্ট্রের অন্তরে এরূপ ভীতির সঞ্চার করিয়াছে যে এখন পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা জাগতিক যুদ্ধ ঠেকাইয়া রাখা সহজ-সাধ্য হইয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণপ্রসূত আভ্যন্তরীণ অশান্তি সংঘটনের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ সমগ্র জগৎ এক বিরাট বারুদস্তূপের উপর দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে। যে কোন সময়ে উহার বিস্ফোরণ হইয়া জাগতিক যুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তুলিতে পারে এবং জগৎকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করাইয়া দিতে পারে। উপরন্তু দেশের অভ্যন্তরে অশান্তি সংঘটিত হইতে থাকিলে যে সব গ্রামদান হইয়াছে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে. ভবিষ্যতে গ্রামদান হওয়ার আবহাওয়া কলুষিত করিয়া দিবে এবং গ্রামস্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবার ভবিষ্যতও অন্ধকারময় করিয়া তুলিবে। কেরলে অবস্থানকালে বিনোবাজী যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন এ সম্পর্কে তাঁহার অন্তরে গভীর চিন্তা চলিতে থাকে এবং তিনি অবিলম্বে দেশব্যাপী শান্তিসেনা প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত করেন। তৎকালে তামিলনাদ ও কেরলের অশান্তি-

প্রবণ আবহাওয়াও তাঁহার শান্তিসেনা গঠন করিবার সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিনোবাজীর কেরলে অবস্থানের শেষ দিন (২৩শে আগষ্ট, ১৯৫৭) কেরলের সর্বোদয় নেতা কেলপ্পনজী ও তাঁহার ৭ জন সঙ্গী শান্তি-সৈনিকের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শান্তি-সৈনিক হন। বিনোবাজীর কল্পনা অনুসারে শান্তি-সৈনিক স্বাভাবিক অবস্থায় সত্যাগ্রহী লোকসেবক-স্বরূপ সেবাকার্য করিবেন ও নিরন্তর নিষ্কাম সেবার ফলে অশান্তির সময়ে অশান্তির প্রতিকার করিবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। তাঁহার সেবাক্ষেত্রে অশান্তি সংঘটিত হইলে সেই বিশেষ অবস্থায় নিজের জীবন বলিদান দিয়াও তিনি অশান্তি প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিবেন। বিনোবাজীর শান্তিসেনা গঠনের কল্পনা যে সময়োচিত হইয়াছিল তাহা তামিলনাদের রামনাথপুরম জেলার দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও পাঞ্জাবের 'হিন্দী বাঁচাও' আন্দোলনের অশান্তিকর ঘটনাবলী দেখিয়া বুঝা যায়। অতঃপর বিভিন্ন প্রদেশে শান্তিসেনা গঠন করিবার কার্যক্রম শুরু হয়। বিনোবাজী শান্তি-সেনার দৃঢ় ভিত্তিতে সমগ্র আন্দোলনকে সংগঠিত করিতে আগ্রহশীল হন।

কেরলে বিনোবাজীর পদযাত্রার সময়ে ২২৪ জন দাতার নিকট হইতে ১৫৭১ একর ভূমিদান, ৩০১ খানি গ্রামদান, ১৩৩৭ জন দাতার নিকট হইতে বার্ষিক ৫১৪০৫৲ টাকার সম্পত্তিদান ও ৫৪০০ গুণ্ডি সূত্রদান পাওয়া যায়। ১৫৩৮৯টি সর্বোদয় সাহিত্যের বিভিন্ন পুস্তক বিক্রয় হয়।

কেরলের ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বিনোবাজী ১৯৫৭ সালের ২৪শে আগষ্ট মহীশূর রাজ্যে প্রবেশ করেন। ২৫, ২৬ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর বিনোবাজীর উপস্থিতিতে মহীশূর শহরে নিখিল ভারত নিবেদক-শিবির অনুষ্ঠিত হয় ও তাহাতে কর্মীদের জীবন, গ্রামদান ও সত্যাগ্রহ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে গভীর আলোচনা করা হয়। উহার অব্যবহিত পূর্বে ২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর মহীশূরের নিকটবর্তী ইয়ালয়াল নামক স্থানে সর্বসেবা সঙ্ঘের আহ্বানক্রমে বিনোবাজীর সমক্ষে গ্রামদান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে জওহরলাল নেহরু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট কেন্দ্রীয়মন্ত্রী, কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট ও প্রজা-সমাজবাদী দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও দেশের কয়েক-জন প্রধান বিচারশীল ব্যক্তি যোগদান করেন। সম্মেলন অন্তে সম্মেলনে

উপস্থিত নেতৃবর্গ এক সর্বসম্মত যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন। তাহাতে গ্রামদান আন্দোলনকে সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় ও উহাকে সফল করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করা হয়। উক্ত বিবৃতিতে বলা হয় যে (১) গ্রামদানের ফলে গ্রামবাসীদিগের আর্থিক ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে। (২) সমগ্র ভারতে ভূমিসমস্যার সমাধানের জন্য ও সমবায়মূলক (কো-অপারেটিভ) জীবন গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে যে মানসিক আবহাওয়া সৃষ্টি করার প্রয়োজন তাহা গ্রামদান আন্দোলনের দ্বারা সৃষ্ট হইবে ও (৩) গ্রামদান আন্দোলনের দ্বারা গ্রামদানী গ্রামে সমবায়মূলক জীবনের পূর্ণতর বিকাশ সাধিত হইবে। ঐ বিবৃতিতে বিশেষ করিয়া ইহা বলা হয় যে গ্রামদান আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এই যে উহার পদ্ধতি অহিংস ও উহার স্বরূপ স্বয়ং-প্রেরিত (voluntary)।এইরূপে এই আন্দোলনে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত ব্যবহারিক দিকের আর্থিক লাভ এবং সমবায় ও স্বাবলম্বনের উপর আধারিত নূতন সমাজ রচনার সংযোগ সাধন করা হইয়াছে। এই সর্বদলীয় গ্রামদান সম্মেলনের অনুষ্ঠান ও উহার প্রচারিত বিবৃতির ফলে সমগ্র দেশে গ্রামদানের আবহাওয়া আরও অনুকূল হইয়া ওঠে। যাঁহারা পূর্বে গ্রামদান আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন অথবা বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদেরও নৈতিক সমর্থন পাওয়া গেল।

'ভূদান-আরোহণ' গ্রামদান সোপানে উন্নীত হইয়া ক্ষান্ত হয় নাই। বিনোবাজী বলেন যে পর্বতের শিখর লক্ষ্য করিয়া আরোহণ করিতে করিতে শিখরে পেঁৗছিয়া দেখা যায় যে, তাহার ঊর্ধ্বে আরও একটি শিখর রহিয়াছে। তখন আবার সেই শিখরকে লক্ষ্য করিয়া আরোহণ করা হয়। সেই শিখরের কাছে পেঁৗছিলে আবার নূতন শিখরের সন্ধান মিলে। এরূপে 'ভূদান আরোহণ' একের পর আর এক সোপান উত্তীর্ণ হইতে হইতে শান্তিসেনা পর্যন্ত পেঁৗছিয়া যায়। "গ্রামদান, গ্রামস্বরাজ ও শান্তিসেনা"—এই ত্রিপদ-বিশিষ্ট মন্ত্র তখন হইতে বিনোবাজীর উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারিত হইতে থাকে।

১৯৫৭ সালের শেষ পর্যন্ত ৪৩ লক্ষ ৮১ হাজার ৮ শত ৭১ একর ভূমিদান (৪৩৮১৮৭১ একর), (গ্রামদানী গ্রামদানের ভূমি বাদে) পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬ শত ৪১ একর (৬৫৪৬৪১ একর) ভূমি বিতরণ

করা হয়। তখন পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৭ শত ৩ খানি (৩৭০৩) গ্রামদান পাওয়া যায়।

১৯৫৮ সালের ২২শে মার্চ মহীশূরের পদযাত্রা সমাপ্ত হয়। অতঃপর বিনোবাজী ২৩শে মার্চ (১৯৫৮) হইতে ২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে পদযাত্রা করেন। ৩০শে মে মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত তীর্থস্থান পন্ঢরপুরে সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ উপলক্ষে তথায় হিন্দুমন্দিরে প্রবেশাধিকার সম্পর্কে এক ক্রান্তিকারক পর্যায়ের সূচনা হয়। ঐ উপলক্ষে তথাকার বিঠলদেবের মন্দিরের দ্বার সর্বধর্মাবলম্বীদিগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ২৯শে মে বিনোবাজী তাঁহার খৃষ্টধর্মাবলম্বী দুইজন ইউরোপীয় মহিলা সহযাত্রী-সহ বিঠলদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে উহার তিন বৎসর পূর্বে (পুরী সর্বোদয়-সম্মেলনের সময়) বিনোবাজীকে তাঁহার ইউরোপীয় খৃষ্টান মহিলা সহযাত্রী-সহ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এতদিন পর্যন্ত হিন্দুমন্দিরে কেবলমাত্র হরিজনদিগের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আন্দোলন করা হইয়াছে। কিন্তু বিনোবাজী আরও অগ্রসর হইতে চাহেন। তিনি চাহেন যে হিন্দুমন্দিরে যদি সকল ধর্মের লোক প্রবেশ করিতে পারে তবেই হিন্দুধর্মের উদারতার পরিচয় দেওয়া হইবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরে ১৯৬০ সালে মধ্যপ্রদেশের পদযাত্রার সময়ে ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে তাঁহাকে বিধর্মী লইয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। ৭ই ও ৮ই আগষ্ট মহারাষ্ট্রের চালিশগাঁও নামক স্থানে বিনোবাজীর উপস্থিতিতে সর্বসেবা সঙ্ঘের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং তথায় ৮ই আগষ্ট সর্বসেবা সঙ্ঘ গঠনমূলক কার্যব্যতীত অন্য সমস্ত কাজের খরচের ব্যাপারে জন-আধারিত হইয়া চলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) হইতে ১৯৫৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত গুজরাটে পদযাত্রা করেন। উহার পর ১৫ই জানুয়ারী হইতে ২১শে মার্চ পর্যন্ত রাজস্থানে তাঁহার পদযাত্রা চলে। ঐ সময়ের মধ্যে ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ আজমীরে সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন অন্তে বিনোবাজী আজমীর হইতে ৯॥ মাইল দূরবর্তী গগওয়ান নামক স্থানে তাঁহার পরবর্তী শিবিরে গমন করেন।

৮৮২ জন শান্তি-সৈনিক সারিবদ্ধভাবে আজমীর হইতে গগওয়ান পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করেন। উহাই শান্তিসেনার প্রথম র‍্যালী। ঐদিন গগওয়ানায় শান্তি-সৈনিকগণের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তথায় বিনোবাজী শান্তি-সৈনিকগণের কি ভাবে চলা ও আচরণ করা উচিত তৎ-সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন। তিনি ১লা এপ্রিল (১৯৫৯) রাজস্থান হইতে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন এবং ২০শে মে পর্যন্ত সেখানে তাঁহার পদযাত্রা চলে। অতঃপর ২২শে মে তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। ৮ই জুন জম্মুতে বিনোবাজীর সমক্ষে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ সর্বসেবা সংঘে বিলীন হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সারা দেশে নয়ীতালিমের প্রসারের জন্য উহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি কাশ্মীর হইতে পুনরায় পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া পাঠানকোটে আসেন ও তথায় নব-বিধান অনুসারে গঠিত সর্বসেবা সংঘের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবের পদযাত্রার সময়ে নভেম্বর মাসে (১৯৫৯) বিনোবাজী 'অজ্ঞাত সঞ্চারে'র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া 'অজ্ঞাত সঞ্চার' করিতে আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে বরাবর পূর্ব হইতে তাঁহার পদযাত্রাসূচী স্থির করা থাকিত ও তদনুসারে তিনি পদযাত্রা করিতেন। কিন্তু ঐ সময়ে তিনি স্থির করিলেন যে তখন হইতে বেশী পূর্বে তাঁহার পদযাত্রার সূচী স্থির করা হইবে না। তবে দুই-চার দিনের কার্যক্রম পূর্ব হইতে স্থির থাকিতে পারে। এইজন্য তাহা মাত্র স্থানীয় কর্মীদের জানা থাকিবে। বাহিরের সকলের কাছে তাহা অজ্ঞাত থাকিবে। কোন্ প্রদেশে বা খুব বেশী হইলে কোন্ জেলায় তিনি ভ্রমণ করিতেছেন—এইমাত্র বাহিরের লোক জানিতে পারিবে। ইহাতে স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় তিনি যে কোন স্থানে একাধিক দিন থাকিয়া যাইতে পারেন। আবার প্রয়োজনমত এ-দিক ও-দিকও ঘুরিতে পারেন। নিবিড়ভাবে কাজ করিবার জন্য তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। অজ্ঞাত সঞ্চারের কারণে তাঁহার পক্ষে কোন নির্দিষ্ট তারিখে কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার নিশ্চয়তা থাকিল না। এজন্য তাঁহার উপস্থিতিতে সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠান করার আশা ত্যাগ করিতে হইল। তিনি নিজেও চাহিতেছিলেন যে তখন হইতে সর্বোদয় সম্মেলন যেন তাঁহার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত না হয়, যাহাতে

সর্বোদয় সেবকগণ তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে সর্বোদয় আন্দোলন-সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন এবং ঐভাবে ক্রমশ স্বতন্ত্রভাবে চলিতে শেখেন। এই কারণেও তিনি আর সম্মেলনে উপস্থিত থাকিতে চাহিলেন না। সুতরাং ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর এই প্রথমবার তাঁহার অনুপস্থিতিতে সেবাগ্রামে (ওয়ার্ধায় ২৬শে মার্চ হইতে ২৮শে মার্চ) সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিনোবাজীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সম্মেলনে যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি ও দর্শক যোগদান করেন। উপরন্তু বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় যথেষ্ট আগ্রহ, উৎসাহ ও সজীবতা পরিলক্ষিত হয়। এরূপে বিনোবাজীর অনুপস্থিতি-সত্ত্বেও সম্মেলন আশাতীতভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। উহাতে নেতৃবর্গ ও সাধারণ কর্মিবৃন্দ সকলের মনে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাগ্রত হয়।

উহার পর বিনোবাজী পাঞ্জাব হইতে উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মধ্যপ্রদেশের সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চল ঘুরিয়া মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য ভিন্দ জেলার ডাকাত অধ্যুষিত চম্বল অঞ্চলে প্রবেশ করেন। চম্বল গভীর-সংকীর্ণ-গিরিসঙ্কট বিশিষ্ট এক উপত্যকা। উহা গরিলা যুদ্ধের পক্ষে খুবই উপযোগী স্থান। এজন্য মধ্যযুগ হইতে উহা ডাকাত দলসমূহের নিরাপদ আবাস ও আশ্রয়স্থান হইয়া আছে। ওখানকার ডাকাত সমস্যা ও দুর্ধর্ষ ডাকাতের অত্যাচার-কাহিনী বহু পুরাতন। উহা মধ্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঠগ ও পিন্ডারীগণের প্রধান ঘাঁটিও এইখানেই ছিল। ওখানকার ডাকাতদলকে দমন করিবার জন্য মধ্যযুগের লোদীবংশীয় রাজা সিকান্দার হইতে আরম্ভ করিয়া আকবর, ওয়ারেন হেষ্টিংস, লর্ড অকল্যান্ড প্রভৃতির আমলে বহু চেষ্টা করা হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরও সরকারের পক্ষ হইতে এযাবৎ বহু প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি তাহাদিগকে কিছুতেই দমন করা যাইতেছিল না। এজন্য কাহারও কাহারও এরূপ মনে হইতেছিল যে বিনোবাজী যদি একবার ঐ অঞ্চলে ভ্রমণ করেন তবে হয়ত তাঁহার নৈতিক প্রভাবে ডাকাতদিগের হৃদয় পরিবর্তন হইতে পারে। ডাকাতদলের পক্ষ হইতেও বিনোবাজীর সহিত কিছু যোগা-যোগ করা হয় এবং তাঁহাকে ঐ অঞ্চলে আসিতে অনুরোধ করা হয়। সরকারের

পক্ষ হইতে বিনোবাজীকে এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে, বিনোবাজীর শান্তি কার্যের উপযোগী নৈতিক আবহাওয়া তৈয়ারী করিবার জন্য পুলিশের পক্ষ হইতে তিনি আবশ্যকমত সাহায্য ও সহযোগিতা পাইবেন। বিনোবাজী চম্বল উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াই ঘোষণা করেন—"কে ডাকাত আর কে ডাকাত নহে তাহা আমি নির্ণয় করিতে চাহি না। আমি তো সকলকেই ভাই বলিয়া মনে করি। আমার কাছে জগতে ডাকাত অঞ্চল বলিয়া কোন স্থান নাই। আমি এখানে ডাকাত সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আসি নাই। আমি এক ভাই-এর মত এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের নিকট আমার হৃদয়ের কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যাহাকে ডাকাত সমস্যা আখ্যা দেওয়া হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে ভীরুতা, কৃপণতা ও শোষণের সমস্যা।" দিনের পর দিন তাঁহার মুখ হইতে এরূপ শান্তি ও মৈত্রীর বাণী নিঃসৃত হইতে থাকিল। কর্মীরাও ডাকাতদের সহিত যোগাযোগ করিতেছিলেন। ১০ই হইতে ২২শে মে (১৯৬০) এর মধ্যে ২০ জন ডাকাত একে একে বিনোবাজীর নিকট অস্ত্রশস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করিল। লোকে ইহাকে অহিংসার 'যাদু' বলিয়া মনে করিল। এরূপ মনে করাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। কারণ ডাকাতগণ বিনোবাজীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে তাহারা আদালতের বিচার বা শাস্তির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে এরূপ কোনও আশ্বাস বা আশা তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। বরং তাহাদিগকে বলা হয় যে তাহাদের বিচার হইবে ও বিচারে যদি তাহাদের শাস্তি হয় তবে তাহা তাহাদিগকে হাসিমুখে ভোগ করিতে হইবে। উপরন্তু ডাকাতগণও অসঙ্গত কিছু চাহে নাই। তাহারা এইমাত্র চাহিয়াছিল যে তাহারা আত্মসমর্পণ করিবার পর বিচারাধীন থাকা কালে তাহাদের উপর যেন কোনরূপ বেআইনী অত্যাচার না হয়, তাহাদিগের সহিত যেন সর্বতোভাবে সাধারণ বিচারাধীন কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার করা হয় এবং জেলের মধ্যে তাহাদিগকে যেন পূজা-উপাসনা করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। ইহা কোন আইন বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত দাবী নহে। সরকারের সহিত কথা বলিয়া সরকারের সম্মতিক্রমে বিনোবাজী সরকারের হইয়া আত্মসমর্পণ-কারী ডাকাতগণকে এই মাত্র আশ্বাস দেন। যাহা হউক এই আশ্চর্যজনক ব্যাপার কেমন করিয়া ঘটিল তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। বিপথগামী-

দিগকে সংশোধন করিবার কোন নৈতিক উপায় ইতিপূর্বে কখনও অবলম্বন করা হয় নাই। চিরদিন পরম্পরাগত পন্থায় চলা হইয়াছে। তাহাদিগকে হিংস্র পশুর ন্যায় তাড়াইয়া লইয়া বেড়ানো হইয়াছে। তাহার ফলে যাহারা একবার পথভ্রষ্ট হইত তাহাদের সুপথে ফিরিবার আর কোন সুযোগ থাকিত না। সেদিকে কোন নৈতিক প্রেরণাও তাহারা কাহারও নিকট হইতে কখনও পাইত না। ফলে তাহারা উত্তরোত্তর অধিকতর বিপথগামী, অধিকতর প্রতি-হিংসাপরায়ণ ও অধিকতর হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল। উহার পরিণামস্বরূপ সে অঞ্চলে মৃত্যুকে হাতে না লইয়া অরক্ষিত অবস্থায় কাহারও ঘুরিবার-ফিরিবার জো ছিল না। বিনোবাজী ও তাঁহার সহযাত্রিগণ শান্তির বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে নির্ভয়ে তথায় পদযাত্রা করিতে থাকিলেন। কর্মীরাও নিঃশঙ্কভাবে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। তাহাতে পাষাণ গলিতে আরম্ভ করিল। পুলিশ এতদিন চেষ্টা করিয়াও যাহাদিগকে গ্রেফ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই তাহারাও এখন অস্ত্র-শস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করিল। ইহাতে জন-সাধারণ আশ্চর্যান্বিত হইল। এজন্য হাজার হাজার লোক তাহাদিগের দর্শন লাভের জন্য আসিতে লাগিল। ভাবাবেগে লোকে ভুলিয়া গেল যে তাহারা কাল পর্যন্ত নরহত্যাকারী, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারকারী দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল। লোকে তাহাদিগকে মাল্যদানাদি দিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। ব্যবহারিক দিক হইতে দেখিলে মনে হইতে পারে যে এতটা আতিশয্য ভাল হয় নাই। যাহা হউক, অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যাহাতে মনে করা যাইতেছিল যে পুলিশ যাহাদিগকে চাহে ক্রমশ তাহারা সকলেই ঐভাবে আত্মসমর্পণ করিবে ও অন্য সকলে চিরতরে ডাকাতি পরিত্যাগ করিবে এবং ঐ অঞ্চলে আর কোন ডাকাতের উপদ্রব থাকিবে না। কিন্তু শীঘ্র সে আশা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। পুলিশের প্রধানকর্তা হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে এই বিবৃতি দিয়া বসিলেন যে চম্বল ঘাটিতে বিনোবাজীর পক্ষ হইতে যাহা করা হইতেছে তাহাতে পুলিশের নৈতিক বল নষ্ট হইতেছে ও ডাকাতি সম্পর্কীয় পরিস্থিতিও বিগড়াইয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা সেরূপ ছিল না। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঐ বিবৃতির মর্ম প্রায় সমর্থনই করিলেন। ফলে তখন হইতে পুলিশের রূপ বদলাইয়া গেল।

শান্তিকর্মীরা পুলিশের নিকট হইতে আর কোনরূপ সহযোগিতা বা সহানুভূতি পাইলেন না—বরং বাধা পাইতে লাগিলেন। বর্তমানে তো অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে কর্মীরা আত্মসমর্পণকারী ডাকাতদের পরিবারবর্গের পুনর্বাসনের জন্যও গ্রামে যাইলে অনেক সময় তাঁহাদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করা হয় না ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে নানারূপ অপপ্রচার করা হয়। প্রকাশ যে, গোপনে এতদূর অপপ্রচারও করা হইয়াছে যে বিনোবাজী ষড়যন্ত্র করিয়া ডাকাতদিগকে সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য—যাহাতে বিনোবাজীর নামে বা নৈতিক প্রভাবে ওখানে কেহ আর কিছু না করিতে পারেন। অন্যদিকে যে সব ডাকাত আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহারা জেলে আদর্শ কয়েদীর মত আচরণ করিতে থাকা সত্ত্বেও তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করা হইতেছে। হাজতের মধ্যেও তাহাদিগকে বেড়ি লাগাইয়া রাখা হয়। উপরন্তু তাহাদিগকে পূজা-প্রার্থনা করিবারও সুযোগ দেওয়া হয় না। ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ এই যে পুলিশ ও সরকারের মনে হইয়াছিল যে চম্বল ঘাটিতে যে নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এইজন্য উহা আর তাঁহাদের সহ্য হইল না। এইজন্য তাঁহারা ঐ আবহাওয়া নষ্ট করিয়া দিয়া পুনরায় পুলিশরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। ফলে ডাকাতদের উপদ্রব পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর দুঃখের বিষয়, উহার জন্যও বিনোবাজীকে দায়ী মনে করানোর সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সরকারের অবশ্য কর্তব্য কোন কাজ সরকারের পক্ষে কোন কারণে সম্পাদন করা সম্ভব না হইলে যদি তাহা অন্য কেহ সরকারনিরপেক্ষ ভাবে এবং অহিংসা ও প্রেমের পথে সুসম্পন্ন করেন তবে তাহা সরকারের শেষ পর্যন্ত ভাল না লাগিতে পারে।

১৯৬০ সালের ১৮ই এপ্রিল বাঙ্গালোর শহর হইতে ৭ মাইল দূরে 'বিশ্বনীড়ম' নামক এক অন্তরাষ্ট্রীয় সর্বোদয় কেন্দ্র ও আশ্রম বিনোবাজীর মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বালকোবাজীর দ্বারা উদ্ঘাটন করানো হয়। 'বিশ্বনীড়ম্' দক্ষিণ ভারতের সর্বসেবা সঙ্ঘের কেন্দ্র। শ্রীবল্লভস্বামীজী প্রধানত সেখানে অবস্থান করেন এবং তাঁহার দ্বারা ঐ কেন্দ্র ও আশ্রম পরিচালিত হয়।

সেখানে সমশীতোষ্ণ আবহাওয়া ও উহা ছোট ছোট পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাঙ্গালোর ভারতের কেন্দ্রস্থান স্বরূপ। এইজন্য উহা অন্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্র হওয়ার পক্ষে আদর্শস্থান হইয়াছে। 'জমনালাল বাজাজ সেবা ট্রাষ্টের' দান-কৃত তিনশত একর জমির উপর ঐ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। উহার উদ্ঘাটন উপলক্ষে প্রেরিত বাণীতে বিনোবাজী বলেন—"এই কেন্দ্র কেবলমাত্র দক্ষিন-ভারতীয় প্রদেশসমূহের মিলন স্থান হইবে না; পরন্তু উহা ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রতীক হইবে। সমগ্র বিশ্বের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবার পক্ষেও উহা এক উত্তম মাধ্যম হইবে।" বুদ্ধগয়ার 'সমন্বয়-আশ্রম,' কাশীর 'সাধনা কেন্দ্র', পওনার পরমধামের 'ব্রহ্মবিদ্যা মন্দির' এবং 'বিশ্বনীড়ম্'—এই চারিটি কেন্দ্র ও আশ্রমকে বিনোবাজীর তথা সর্বোদয়ের শক্তিস্থান বলা হইয়া থাকে। এরূপ বলা হয় কেন? আধ্যাত্মিকতা সর্বোদয়ের মূল। উপরন্তু সর্বোদয়ের পরিসমাপ্তিও আধ্যাত্মিকতায়। সর্ব মানবের ঐক্য ধ্যেয়। আর ঐ ঐক্য সাধনে যে সেবক আত্মনিয়োগ করিবেন তাঁহার জীবনও তদ্রূপ আধ্যাত্মিকতায় ভরা হওয়া চাই। তাহার সাধনার জন্য ঐ চারিটি কেন্দ্র ও আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। উহাদের লক্ষ্য হইতেছে সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ইত্যাদি যমনিয়ম বা মহাব্রতের সাধনা ও জনসেবা এবং এতদুভয়ের মাধ্যমে আত্মদর্শন।

২৪শে জুলাই হইতে ২৫শে আগষ্ট (১৯৬০) পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক একমাসকাল বিনোবাজী মধ্যভারতের ইন্দোর নগরে অবস্থান করেন। বহু পূর্ব হইতে ইন্দোরে আসিবার কল্পনা তাঁহার মনে ছিল। তিনি প্রথমে পন্ঢরপুরে এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাশ্মীর ভ্রমণ সমাপ্ত হইবার পর তাঁহার ইন্দোরে আসা একরূপ নিশ্চিত হইয়াছিল। তিনি ইন্দোরে এতদিন থাকিলেন কেন? তাহার কারণ এই যে তিনি এতদিন প্রধানত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছেন। তিনি এখন শহরের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু তিনি ইন্দোর শহর পছন্দ করিলেন কেন? বিনোবাজী বলেন যে ইন্দোরের প্রতি তাঁহার অকারণ স্নেহ আছে। কেন এই স্নেহ সে সম্বন্ধে এরূপ মনে করা হয় যে একাধিক কারণে ইন্দোর সর্বোদয় কার্যের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল এবং উহা তাঁহার কল্পনার

সর্বোদয় নগর হইয়া গড়িয়া উঠিবার পক্ষে উপযোগী ক্ষেত্র। (১) ইন্দোরে বহু-সংখ্যক শিক্ষিত লোকের বাস; (২) ইন্দোর শান্ত ও সৌম্য শহর এবং ইন্দোর উত্তর ভারতের মধ্যে বড় শহর; (৩) ওখানে কস্তুরবা ট্রাস্টের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত এবং উহা অহল্যাবাঈ-এর স্থান। সুতরাং এখানে স্ত্রীশক্তির বিকাশ হওয়া সহজ হইবে। বিনোবাজী মনে করেন যে সামূহিক অহিংসা সাধনের ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীলোকগণ নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন তবে সফলতা সহজ সাধ্য হইবে। গান্ধীজী সেইরূপ মনে করিতেন। বিনোবাজী ইন্দোর শহরে একইস্থানে অবস্থান করিতেন এবং তথা হইতে প্রত্যহ ভোরে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পদযাত্রা করিয়া যাতায়াত করিতেন। তিনি যেখানে যাইতেন সেখানে নগরবাসীর অন্তরে সর্বোদয়ের ভাবনা জাগ্রত ও ইন্দোরকে সর্বোদয়-নগরে পরিণত করিবার জন্য যে যে কার্যক্রম তাঁহাদের গ্রহণ করা আবশ্যক সে সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া উপদেশ দিতেন। ইন্দোর শহরে ৪ লক্ষ লোকের বাস। ইন্দোর থাকাকালে তিনি সেখানে এরূপ দেড় শতেরও অধিক বক্তৃতা দেন। সেখানে সর্বোদয় পাত্রের উপর জোর দেওয়া হয়। পরিচ্ছন্ন ইন্দোর গড়িয়া তুলিবার জন্য শ্রীআপ্পা সাহেব পটবর্ধনের নেতৃত্বে নিয়মিত-ভাবে সাফাইয়ের কাজ করা হয়। বিনোবাজীও ঐ কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া পায়খানা সাফ্ করিয়াছিলেন। বিনোবাজী ইন্দোরে অবস্থানকালে অবসর-প্রাপ্ত প্রৌঢ় ব্যক্তিগণকে সর্বোদয় কাজে লাগাইবার পরিকল্পনা করেন এবং তজ্জন্য তিনি বার বার তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আবেদন করেন। তাহার ফলে বহু অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তি সর্বোদয়ের কাজে আগ্রহশীল হইয়া আগাইয়া আসেন। সেখানে এক "সর্বোদয়-বাণপ্রস্থী-মণ্ডল" গঠিত হয়। তাঁহারা সেখানে প্রশংসনীয় কাজ করিতেছেন। ইন্দোর শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পদ-যাত্রার সময়ে সদর রাস্তাসমূহের পাশে পাশে লাগানো সিনেমার অশোভনীয় ও অশ্লীল চিত্র, বিজ্ঞাপন ও পোষ্টারের দিকে তাঁহার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ইহাতে তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন যে লোকচক্ষের সমক্ষে এরূপ বিকার ও বাসনায় উত্তেজনাদানকারী পোষ্টার-আদির প্রদর্শনে জীবনের নৈতিক ভিত্তি শিথিল হয় ও তরলমতি বালক-বালিকাদের সংস্কার বিকৃত হইয়া যায়। এজন্য তিনি উহা অবিলম্বে বন্ধ করানোর জন্য বদ্ধপরিকর হন।

সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট তিনি আবেদন করিতে থাকেন। অশোভনীয় ও অশ্লীল পোষ্টার, চিত্রাদির প্রদর্শন খুবই অনুচিত এবং উহা বন্ধ করা উচিত —ইহা সকলেই অনুভব করেন কিন্তু উহার অপসারণের ব্যাপারে সকলেই অসহায় বোধ করিতে থাকেন। বিনোবাজী ২৬শে আগষ্ট ইন্দোর নগর ত্যাগ করেন। কিন্তু সেখানে অশোভনীয় পোষ্টার বিরোধী আন্দোলন চলিতে থাকে। ইন্দোর রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখে এক প্রকাশ্যস্থানে অশ্লীল চিত্র ও অশোভনীয় পোষ্টার ছিল। বিনয়পূর্বক বুঝানো ও অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও যখন উহা অপসারণ করা হইল না তখন বিনোবাজীর অনুমতিক্রমে সত্যাগ্রহ করিয়া উহার অপসারণের ব্যবস্থা করা হয়। মধ্যপ্রদেশ সর্বোদয় মন্ডলের অধ্যক্ষ শ্রীদাদাভাই নাইকজীর নেতৃত্বে এক সত্যাগ্রহী দল গত ৪ঠা নভেম্বর (১৯৬০) প্রত্যুষে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে উহা অপসারণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর ক্রমশ সারাদেশে বিভিন্ন শহরে অশোভনীয় পোষ্টার বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হইয়া যায়। এই ব্যাপারে সাধারণত এই প্রশ্ন উঠে যে অশোভনীয় বিজ্ঞাপন বা চিত্রের সংজ্ঞা কি? অন্য কোন উৎকৃষ্টতর সংজ্ঞার অভাবে এইটুকু বলিলে বোধহয় যথেষ্ট হইবে যে, যে চিত্র বা পোষ্টার মাতা-পিতা তাঁহাদের সন্তানদের সহিত এক-সঙ্গে দেখিতে পারেন না তাহাই অশোভনীয়। ইন্দোর শহরে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এই আন্দোলন সম্পর্কে সিনেমার কর্তৃপক্ষের নিকট গিয়া-ছিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন—অশোভনীয় পোষ্টারের ব্যাখ্যা কি? তাহার উত্তরে ঐ মহিলাগণ অশোভনীয় পোষ্টারের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অশোভনীয় পোষ্টার ইত্যাদির প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য গত ১২ই নভেম্বর (১৯৬০) জব্বলপুরে বিনোবাজীর সমক্ষে সর্বসেবা সংঘের কার্যকরী সমিতির বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে অশোভনীয় ও অশ্লীল বিজ্ঞাপন, চিত্রাদির সর্বপ্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শনের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করা সর্বোদয় আন্দোলনের মৌলিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া যেখানে সম্ভব (বিশেষত শহর অঞ্চলে) কর্মিগণের এই কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। ইহাও স্থির করা হয় যে যদি কোথাও এই ব্যাপারে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা

আবশ্যক বলিয়া মনে করা হয় তবে প্রাদেশিক সর্বোদয় মণ্ডল এবং সর্বসেবা সংঘ ঐ প্রশ্ন সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিয়া বিনোবাজীর অনুমতি অনুসারে সত্যাগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। উপরন্তু সর্বসেবা সংঘের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে সরকারের সহিত আলোচনা করিবার কথাও স্থির হয়। সরকারের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে অশোভনীয় পোষ্টার-চিত্রাদির সদর রাস্তায় প্রদর্শন বন্ধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক আইন প্রণয়ন করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন।

বিনোবাজী ইন্দোর হইতে দক্ষিণাভিমুখে যান। তিনি মধ্যপ্রদেশের আরও ৪।৫টি জেলা পরিক্রমা করিয়া ২৮শে সেপ্টেম্বর একদিনের জন্য দ্বিতীয়বার ইন্দোরে আসেন। যখন তিনি প্রথমবার ইন্দোরে ছিলেন তখন তিনি আসামে সংঘটিত ভাষা-বিরোধজনিত ঘটনাবলীতে খুবই ব্যথিত ছিলেন। তিনি ২৮শে সেপ্টেম্বর ইন্দোর জনসভায় আসামে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন। ইন্দোর হইতে আসামের সীমা ১৫০০ মাইল। তিনি ইন্দোর হইতে বেতুল, জব্বলপুর হইয়া আসামের পথে এলাহাবাদ অভিমুখে চলিতে থাকেন। তিনি মধ্যপ্রদেশে তাঁহার পূর্ণ ৬ মাস কাল পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৬০) তারিখে এই তৃতীয়বার উত্তরপ্রদেশে (মির্জাপুর জেলায়) প্রবেশ করেন। ৪ঠা ডিসেম্বর হইতে ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে তাঁহার পদযাত্রা চলে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আসামে যাওয়ার পথে তিনি তাঁহার "অজ্ঞাত সঞ্চার" বন্ধ করেন।

আসামের পথে ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৬০) তিনি বিহারে প্রবেশ করেন। বিহারে প্রবেশ করিয়াই সেইদিন জনসভায় তিনি ভূদান সম্পর্কে এক নূতন মন্ত্র ঘোষণা করেন। তাহা হইতেছে "বিঘায় কাঠা ভূমিদান" অর্থাৎ ভূমির ১-এর ২০ অংশ দান। বিহারের ৩২ লক্ষ একর ভূমিদান সংগ্রহ করিবার সংকল্প ছিল। উহা বিহারের মোট ভূমির মোটামুটি এক ষষ্ঠাংশ। কিন্তু ইতিপূর্বে সেখানে ২১ লক্ষ একর ভূমিদান সংগৃহীত হইয়াছিল। ১১ লক্ষ একর বাকি। এইজন্য তিনি প্রথম দিনই বিহারকে ঐ সংকল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দেন ও বিঘায় কাঠা ভূমিদান দিয়া বাকি ১১ লক্ষ একর পূরণ করিয়া দিবার জন্য ছোট বড় সকল ভূমি-মালিককে আহ্বান করেন। তিনি ভূমিদানের এই নূতন

আহ্বানে তিনটি সর্ত দিলেন ঃ—(১) ছোট-বড় সকল ভূমির মালিক ভূমিদান দিবেন; (২) পতিত বা অকেজো জমি লওয়া হইবে না। আবাদী জমিই দিতে হইবে ও (৩) দাতা নিজেই ভূমি বিতরণ করিবেন ও তাঁহার পছন্দমত কোন ভূমিহীনকে তাহা দিবেন। বিহারের কর্মিগণ মনে করিয়াছিলেন যে বিনোবাজী এবারে বিহারে আসিয়া শান্তিসেনার উপর জোর দিবেন। কিন্তু তিনি ভূমিদানের উপর জোর দেওয়ায় তাঁহাদের কিছু আশ্চর্যবোধ হইল। তিনি ৪৭ দিনে বিহারের ৫টি জেলা অতিক্রম করিয়া ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬১) বাংলায় পদার্পণ করেন এবং উত্তর বাংলায় ২৩ দিন পরিক্রমা করিয়া ৫ই মার্চ (১৯৬১) তারিখে আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবেশ করেন। ভূদানযজ্ঞের আরম্ভ হইতে ঐদিন পর্যন্ত তাঁহার প্রায় ৩৫ হাজার মাইল পদব্রজে অতিক্রম করা হয়।

তিনি বাংলায় প্রবেশ করিয়াই বিঘায় কাঠা ভূমিদানের জন্য আবেদন করেন ও বিঘায় কাঠা ভূমিদানের উপর উত্তরোত্তর জোর দিতে থাকেন। তিনি আসামে প্রবেশ করিয়াও বিঘায় কাঠা ভূমিদানের কথা বলিতে থাকেন। তাঁহার আসামে পৌঁছিবার ২ দিন পরে ৭ই ও ৮ই মার্চ গোলকগঞ্জে তাঁহার সমক্ষে সর্বসেবা সংঘের কার্যকরী সমিতির বৈঠক হয়। ১৮ই এপ্রিল হইতে ২০শে এপ্রিল অন্ধের বেজওয়াদার নিকট উণ্ডুতুরু নামক স্থানে ত্রয়োদশ সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিনোবাজী প্রবন্ধ সমিতির নিকট সর্বোদয় সম্মেলন সম্পর্কে এই ইঙ্গিত দেন যে সম্মেলনে বিঘায় কাঠা ভূমিদানের কার্যক্রমের উপর জোর দেওয়া উচিত। তিনি বলেন যে, সমগ্র দেশে আবাদী জমি চাওয়া আরম্ভ করা হউক এবং সেজন্য দেশব্যাপী অভিযান চালানো হউক। বিনোবাজী কেন বিঘায় কাঠা ভূমিদান আন্দোলন প্রবর্তন করিতে চাহিলেন তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। তিনি গয়ায় বিহার প্রাদেশিক সর্বোদয় সম্মেলনে (৯ই জানুয়ারী ১৯৬১) এবং বাংলায় পদযাত্রার প্রথমদিকে ইসলামপুরে বলেন যে বিঘায় কাঠা ভূমিদান চাওয়ার যে প্রক্রিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে —তাহা হইতেছে সৌম্যতর প্রক্রিয়া। ভূদানযজ্ঞ এক সত্যাগ্রহ প্রক্রিয়া। উহা সৌম্য প্রক্রিয়া। যখন সৌম্য প্রক্রিয়ায় আশানুরূপ ফল হয় না তখন সৌম্যতর প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। পূর্বে এক-ষষ্ঠাংশ ভূমিদান চাওয়া

হইত এবং তাহা প্রধানত বড় বড় ভূমি মালিকের কাছে চাওয়া হইত। তাহাতে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় তিনি সৌম্যতর প্রক্রিয়াস্বরূপ বিশ ভাগের একভাগ কিন্তু মাত্র আবাদী জমি চাহিতেছেন। বিনোবাজী বাংলার ইসলামপুরে বলেন—"আমি কেবলমাত্র বিঘা প্রতি এক কাঠা ভূমি চাহি নাই। আমার আর একটি দাবী আছে। তাহা হইল এই যে, 'দান দেও ইকট্‌ঠা, বিঘে মেং কঠা" অর্থাৎ সব লোককে দান দিতে হইবে। ছোট বড় যত ভূমির মালিক ততখানি দানপত্র? আপনারা চিন্তা করুন—ইহার দ্বারা কি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইবে না? প্রথমে আমাদের যে দাবী ছিল তাহা ছিল সৌম্য। আর ইহা হইল সৌমতর। ইহাতে সক্রিয়তা বাড়িবে, না কমিবে? নিশ্চয় বাড়িবে,কারণ এখন হইতে আমাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে হইবে এবং দান সংগ্রহ করিতে হইবে। পূর্বে কি হইত? একজনের নিকট আমরা যাইতাম; তিনি হয়ত দুইশত একর জমিদান করিতেন। তাহাতে আমাদের সারাদিনের কাজ হইয়া যাইত। এরূপ দান তো ভাল। কিন্তু ইহার দ্বারা শক্তির সৃষ্টি হয় না। মনে করুন, বর্তমানের প্রক্রিয়ায় গ্রামের সমস্ত কৃষক ভূমিদান দিলেন। তাহাতে কিরূপ শক্তির সৃষ্টি হইবে চিন্তা করুন।" অর্থাৎ এখন দাবী কম করা হইল বলিয়া ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরীব সকল ভূমিবান ব্যক্তি কিছু না কিছু ভূমিদান দিতে পারিবেন এবং তাহাতে আন্দোলনের ব্যাপকতা ও শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। বিঘায় কাঠা ভূমিদান আন্দোলনের আর একটি দিক আছে। ভূদানের আরোহণ হইতে হইতে উহা শেষে গ্রামদান ও গ্রাম স্বরাজ্যে আরূঢ় হইল। উড়িষ্যায় প্রধানত আদিবাসী অঞ্চল হইতে প্রায় দুই সহস্র গ্রামদান পাওয়া গেল। তামিলনাদে বৃহৎ বৃহৎ গ্রাম ও শিক্ষিত লোক অধ্যুষিত বহু গ্রামও পাওয়া গেল। অন্য ৩।৪টি প্রদেশেও কিছু কিছু গ্রামদান হইল। তাহাতে এরূপ মনে করা হইল যে ভূমিদান চাহিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। ভূমিদান চাহিবার আর প্রয়োজন নাই। এখন হইতে গ্রামদানই চাহিতে হইবে এবং উহার ভিত্তিতে গ্রাম স্বরাজ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচার করিতে হইবে। এজন্য বিনোবাজীর নির্দেশ না থাকিলেও অথবা কার্যক্রম হইতে ভূমিদান চাওয়া বাদ দেওয়া না হইলেও কার্যত. সারা দেশেই ভূমিদান চাওয়া এবং ভূমিদানের জন্য ঘুরা-ফেরা বন্ধ হইয়া গেল। একমাত্র

বিনোবাজী স্বয়ং কাশ্মীরে ভূমিদান চাহিলেন এবং সেখানে আইনের বলে সরকার বহু জমি অধিকার করিয়া লইলেও বিনোবাজীর আহ্বানে সেখানে কিছু ভূমিদান পাওয়া গেল। উপরন্তু উপরোক্ত মনোভাবের ফলে ভূমি বিতরণের কাজেও শিথিলতা আসিয়া গেল বলিয়া মনে হয়। অবশ্য নিধিমুক্তির পর কর্মিসংখ্যা হ্রাস পাওয়াও ইহার আর এক কারণ, কিন্তু প্রথমোক্ত কারণ প্রধান মনস্তাত্ত্বিক কারণ বলিয়া মনে হয়। গ্রামদান, গ্রাম স্বরাজের দিন আসিয়াছে। সুতরাং ভূমিদান, ভূমি বিতরণের মত নিম্নস্তরের কাজের আর কি প্রয়োজন? এই ধরনের কিছু মনোভাব যে সৃষ্টি হইয়াছিল বা এখনও যে তাহা বিদ্যমান আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমগ্রভাবে দেশে গ্রামদান পাওয়া সম্পর্কে বাস্তবিক অবস্থা কি? আজ পর্যন্ত সমগ্র দেশে কাঁচা পাকা মিলিয়া মোটামুটি চার হাজার গ্রামদান হইয়াছে কিন্তু ঐ সব গ্রামদানী গ্রাম সেই সেই প্রদেশের দুই-চারটি সংকীর্ণ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ভূদানযজ্ঞ আরোহণ গ্রামদান ও গ্রাম স্বরাজ্য পর্যন্ত উঠিয়াছে। তবে উহা প্রধানত বিচারের আরোহণ। বিচারে বহু ঊর্ধ্বে পোঁছানো যাইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেশের অধিকাংশ স্থানে সেই অবস্থা সৃষ্টি করার মত আবহাওয়া নাই। প্রধানত ব্যাপক ভূমিদানের দ্বারা সেই আবহাওয়া গড়িয়া উঠিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ব্যাপক ভূমিদান সংগ্রহের প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিয়া কেবলমাত্র গ্রামদান ও গ্রাম স্বরাজ্যের কথা প্রচার করিতে থাকি তবে তাহাতে গ্রামদানের সংখ্যাও বাড়িবার কথা নয়, বরং তাহাতে ভূমিদানের আবহাওয়াও উত্তরোত্তর মন্দীভূত হইয়া আসা স্বাভাবিক। হইয়াছেও তাহাই।

আর একটি কথা। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"নিষ্কাম বুদ্ধিতে সেবা করিতে হইবে। সেবার ফল শীঘ্র মিলিবে না—ইহা জানিয়াও পরম নিষ্ঠার সহিত অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত নিরন্তর কাজ করিয়া যাইতে হইবে। কখনও কোনরূপ শিথিলতা যেন না আসে। চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও অন্ধকারের মধ্যে দীপের মত থাকিয়া অনন্যনিষ্ঠ হইয়া সেবা করিয়া যাইতে হইবে।" সর্বোদয় সেবকের এই আদর্শ ও নিষ্ঠা থাকা আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ কর্মীর নিকট হইতে

এতদূর পর্যন্ত প্রত্যাশা করা দুরাশা। এইজন্য গ্রামদান ও গ্রাম স্বরাজ্যের কথা বলিয়া বেড়াইয়া যখন দেখা গেল যে আশানুরূপ ফল মিলিতেছে না তখন কর্মীদের মধ্যেও যে কিছু শিথিলতা আসিয়াছে তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। নিধিমুক্তির কারণে কিছু সংখ্যক কর্মী বিভিন্ন রচনাত্মক প্রতিষ্ঠানে চলিয়া গিয়াছেন বটে কিন্তু উপরোক্ত কারণে কর্মীদের মধ্যে কম শিথিলতা আসে নাই। তাহাতে অনেকে সর্বসময়ে কর্মী বলিয়া গণ্য হইলেও কার্যত আংশিক সময়ের কর্মী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কেহ কেহ কার্যত বসিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় বিঘায় কাঠা ভূমিদান আন্দোলন নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত চালাইলে কর্মিগণের ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পাইবে এবং সমগ্র আন্দোলনে নব শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সারা ভারতে ৪৩,৫২,৮৬৬ একর ভূমিদান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৮,৩৩,৪৬৬ একর ভূমি বিতরণ করা হইয়াছে। দানপ্রাপ্ত ভূমির মধ্যে এযাবৎ ১২,৭০,৬৬৬ একর ভূমি বিতরণের অযোগ্য বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ তারিখ পর্যন্ত সারা ভারতে মোট ৪৭৫২ খানি গ্রামদান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উড়িষ্যায় ১৯২৯টি (কোরাপুটে প্রায় ১৪০০), অন্ধ্রে ৫৮৭, মহারাষ্ট্রে ৫৮৪, কেরলে ৫৪৩, তামিলনাদে (মাদ্রাজ) ২৫২, রাজস্থানে ২৩৫ ও বাকি অন্যান্য প্রদেশে।

॥ ৯ ॥ তন্ত্রমুক্তি ও নিধিমুক্তি

সর্বসেবা সংঘ গত ১৯৫৬ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে উহার পালনী (মাদুরা, মাদ্রাজ) বৈঠকে বিনোবাজীর প্রেরণায় ও পরামর্শক্রমে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনকে 'তন্ত্রমুক্ত ও নিধিমুক্ত' করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে ১লা জানুয়ারী সমস্ত ভূদানযজ্ঞ সমিতি ভাঙিগয়া দিয়া ও 'গান্ধীস্মারক নিধি' হইতে যে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনকে সর্বজনাবলম্বী ও সঞ্চিত নিধিমুক্ত করা হয় একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই অবস্থা সত্যই বিপ্লবাত্মক। 'তন্ত্রমুক্তির' পশ্চাতে কি বৈপ্লবিক ভাবধারা আছে তাহা উপলব্ধি করা আবশ্যক। তন্ত্রমুক্তির ফলে এখন সমগ্র

আন্দোলনের দায়িত্ব জনতার উপর সঁপিয়া দেওয়া হইয়াছে। যখন ভূদান সমিতি ছিল তখন সত্যই শক্তি কম পাওয়া যাইত। কারণ তখন অধিকাংশ লোক মনে করিত যে ভূদানযজ্ঞের কাজের দায়িত্ব ভূদান সমিতির। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নাই। ভূদানযজ্ঞ যেন একটি দল এরূপও কাহারও কাহারও মনে হইত। এখন যদি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভূদান বা গ্রামদান চাহেন তবে তাঁহারা এই কাজে জোর দিবেন। কারণ এখন তাঁহাদের সকলের উপর নির্ভর করা হইতেছে। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি এই সব কথা জানা ছিল তবে প্রথমে কেন তন্ত্র (সংস্থা) খাড়া করা হইয়াছিল? উহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন যে প্রথম অবস্থায় সংস্থা ব্যতীত হয় তো কোন কাজই আরম্ভ করা কঠিন হইত। এইজন্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার সময় ঐরূপ সংগঠন করা ঠিকই হইয়াছিল। সংগঠনের সাহায্যে আন্দোলন বহুদূর অগ্রসর হয়। কিন্তু অতঃপর সেই সংগঠনই আন্দোলনের ব্যাপকতর হইয়া উঠার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতেছিল। বিনোবাজী বলেনঃ

"একবার বিকাশ, একবার নিরোধ এইভাবে কাজ ভাল চলে। এতদিন বিকাশের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এখন নিরোধের সময় আসিয়াছে। ইহার পরে হয় তো আবার বিকাশ আরম্ভ হইবে।* আবার কখন নিরোধ। এইভাবে কাজ চলিতে থাকিবে। ঈশাবাস্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে বিকাশ ও নিরোধ এই দ্বিবিধ সাধনা মানুষকে করিতে হয়।

*১৯৫৯ সালে সর্বসেবা সঙ্ঘের নূতন গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও চালু করা হইয়াছে। তদনুসারে গ্রামে ১০ জন পর্যন্ত লোকসেবকের দ্বারা প্রাথমিক সর্বোদয় মণ্ডল গঠিত হইয়াছে। জেলার লোকসেবকগণ মিলিত হইয়া জেলা প্রতিনিধি করিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা সর্বসেবা সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। প্রাথমিক সর্বোদয় মণ্ডলের সহিত সর্বসেবা সঙ্ঘের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। লোকসেবকগণ প্রয়োজন মনে করিলে মধ্যবর্তী (জেলা বা প্রাদেশিক) সর্বোদয় মণ্ডল গঠন করিতে পারেন। সদস্য না হইলেও যে কোন লোকসেবক সদস্যের অধিকারে সর্বসেবা সঙ্ঘ তথা মধ্যবর্তী যে কোন মণ্ডলের সভায় যোগদান করিতে পারেন। সর্বসম্মতি বা সর্বানুমতি না

"যদি তন্ত্র বা কাঠামোকে বজায় রাখা হইত তবে কাজ নিশ্চয় হইত, কিন্তু সে কাজ সীমাবদ্ধ থাকিত। উহা অনন্ত অপার হইতে পারিত না। যতদিন গাছ ছোট ছিল, ততদিন তাহাকে রক্ষা করার জন্য বেড়া লাগানো হইয়াছিল। এখন গাছ বড় হইয়ছে। এইজন্য বেড়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

বিনোবাজী বলেন যে যদি ঈশ্বর ও তাঁহার কাজের মধ্যে কোন সংগঠন খাড়া করা হয় তবে তাহা বাধকে পরিণত হইতে পারে। আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করিতে অভিলাষী হইয়া এক খৃষ্টান ভাই বিনোবাজীর পরামর্শ চাওয়াতে তিনি ঐ ভাইকে বলিয়াছিলেন, "ডু নট্ অর্গানাইজ্—সংগঠন খাড়া করিবেন না। সরাসরি সেবা করিতে থাকুন।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে সেণ্ট্ ফ্রান্সিসও এই কথা বলিয়াছিলেন। বিনোবাজীর অভিমত এই যে সদ্বিচার হাওয়াতে ছড়াইয়া দিলে ভাল হয়। যদি সদ্বিচার ভূমিতে বপন করা হয় (অর্থাৎ সংস্থার মাধ্যমে কাজ করা হয়) তবে তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মে ও তাহাতে লোক ছায়া পাইয়া থাকেন। কিন্তু যদি সদ্বিচার হাওয়াতে ছড়াইয়া দেওয়া যায় তবে তাহা প্রত্যেকের হৃদয় স্পর্শ করে এবং তাহা বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া যায়।

'তন্ত্রমুক্তি'-ও 'নিধিমুক্তি' প্রকৃতপক্ষে শক্তিদায়িনী। কিন্তু উহার পশ্চাতে যে গভীর বিচারধারা আছে তাহা যদি ঠিকভাবে বুঝা না যায় তবে দুর্বলতা আসিতে পারে। বিনোবাজী বলেন যে ইহা হইতে কর্মীদের প্রবল শক্তি অনুভব করা চাই এবং এরূপ ভাবনা পোষণ করা চাই যে—'তন্ত্র ও নিধি'

হইলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। ইহাতে সংগঠনের মূল গ্রামে লোকসেবকগণের হাতে সংগঠনের প্রধান অধিকার, লোকসেবকগণ তথা প্রাথমিক সর্বোদয় মণ্ডলের সহিত সর্বসেবা সঙ্ঘের সরাসরি সম্পর্ক, লোক-সেবকগণের সদস্যের অধিকারে সর্বসেবা সঙ্ঘের বৈঠকেও যোগদানের অধিকার, সর্বসম্মতিক্রমে বা সর্বানুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ—ইত্যাদি কারণে তন্ত্রের অধিকাংশ ত্রুটি দূর হইয়াছে, অথচ সংগঠনে যে সুবিধা থাকে তাহা পাওয়া গিয়াছে।

সবই চলিয়া গেল। এখন আমি মুক্ত হইয়া গিয়াছি। এইজন্য আমার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি আত্মার আশ্রয়ে (আধারে) আসিয়া পোঁছিয়াছি। ঈশ্বরের সম্মুখে সরাসরি দণ্ডায়মান হইয়াছি। জনতার উপর নির্ভরশীল হইয়াছি। এখন আমি জনতার সহিত মিলিয়া মিশিয়া যাইব। এই মহান শক্তি আমার মধ্যে আসিয়াছে। ঐ শক্তি ইতিপূর্বে আমার মধ্যে ছিল না। এইভাবে শক্তির অনুভূতি আসা চাই। ইহার পরিণাম অত্যন্ত শুভ হইতে পারে। এমন হইতে পারে যে সহস্র সহস্র কর্মী শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত বিনম্র হইলেন। জনতার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গেলেন। তখন জনতার উপর তাঁহাদের নৈতিক প্রভাব পড়িতে লাগিল। তাঁহাদের নিজেদেরও নৈতিক উন্নতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উহা দেখিবেন ও ভাবিবেন যে তন্ত্রমুক্তি ও নিধিমুক্তি হইবার ফলে ভূদান-কর্মীরা জনতাময় হইয়া গিয়াছেন ও জনতা তাঁহাদের কথায় সাড়া দিতেছেন। ইহা দেখিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকের অন্তরে তন্ত্র ভাঙিবার প্রেরণা আসিতে পারে। বিনোবাজীর মনে এই কল্পনা রহিয়াছে। যাহা হউক, ভূদানসেবকগণ যদি ঐরূপে 'সর্বভূতহৃদয়' হইয়া যান তবে জনতা যে আন্তরিকভাবে সাড়া দিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন বিশেষভাবে 'নিধিমুক্তির কথা' আলোচনা করা যাউক। এ সম্পর্কে বিনোবাজী লিখিয়াছেন, "গান্ধী-নিধি হইতে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের জন্য যে সাহায্য পাওয়া যাইত তাহা গ্রহণ করা হইত এবং তাহা করা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু প্রারম্ভে সঞ্চিত ধনের দ্বারা অনেক উপকার হয় বটে কিন্তু প্রাথমিক বিকাশের পর যদি সেই আধার বজায় রাখা যায় তবে ভবিষ্যতে আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে।" এজন্য নিধিমুক্তির সিদ্ধান্তের এক বৎসর পূর্ব হইতে বিনোবাজী নিধির আধার ভাঙিয়া ফেলিবার কথা ভাবিতে ছিলেন। কারণ তিনি এই বিচার করিতেছিলেন,—"নিধির আধার ভাঙিয়া না ফেলিলে বৈশ্বানর-অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারিবে না। এতদিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা হোমাগ্নি মাত্র। উহা কুম্ভের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অগ্নি যে পর্যন্ত কুম্ভের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সে পর্যন্ত বৈশ্বানর-অগ্নির আশা করা যাইতে পারে না। এইজন্য যজ্ঞের কুম্ভচ্ছেদ করিতে হয়।"

সম্পত্তিদান, শস্যদান প্রভৃতি হইতে যেমন যেমন অর্থের ব্যবস্থা হইতে থাকিবে তেমন তেমন স্বাভাবিকভাবে সঞ্চিত নিধির সাহায্য কম দেওয়া হইবে —এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ক্রমশ নিধিমুক্তির দিকে অগ্রসর হইলে কেমন হইত? বিনোবাজী বলেন,—"এই বিচার বিচার নয়। ইহা এক মোহচক্র। অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা, ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্।"—প্রথমে অনাসক্তির দ্বারা ছেদন কর; পরে সংশোধন কর। ইহাই ক্রান্তির প্রক্রিয়া।

বিনোবাজী বলেন—ইহা সত্য যে নিধিমুক্তির ফলে কিছু লোকের কষ্ট হইতেছে ও হইবে। তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। নিধিমুক্তির পশ্চাতে কি দৃষ্টি ও কত বলদায়িনী শক্তি আছে কেবলমাত্র তাহা যেন চিন্তা করা হয়। তবেই কর্মীদের এই ক্ষুদ্র দল ক্রান্তির কাজে অগ্রণী হইতে পারিবে এবং তাহা দেখিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিকদলও নিজেদের তন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিয়া ক্রান্তির কাজে অগ্রসর হইবার প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন।

নিধিমুক্তির পরে কার্যের ব্যাপকতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মীগোষ্ঠী সৃষ্টি করিবার জন্য বিনোবাজী অষ্টবিধ কার্যক্রমের পরামর্শ দান করেন। তাহা হইতেছে এইঃ—(১) প্রত্যেক পরিবার হইতে যেন একজনকে সার্বজনিক কার্যের জন্য অর্পণ করা হয় এবং পরিবারের অন্য সকলে যেন তাঁহার দায়িত্ব বহন করেন; (২) গঠন কর্মিগণ তাঁহাদের গঠনমূলক কার্যের সঙ্গে সঙ্গে ভূদানের কাজও করিতে থাকুন। তাহা হইলে উহার জন্য কোন পৃথক খরচ লাগিবে না। আর তাহা হইলে ভূদান-গ্রামদান কাজের ভিত্তিতে তাঁহাদের গঠন কাজও অপেক্ষাকৃত ভালভাবে চলিবে; (৩) এমন কোন কোন সর্বোদয় 'মিত্র-মণ্ডলী' আছেন যাঁহারা সর্বোদয়ের প্রতি অনুরাগী কিন্তু যাঁহারা অন্য কোন কাজে লাগিয়া থাকায় ভূদানের কাজের জন্য সময় দিতে পারেন না। তাঁহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে যেন সর্বোদয়ের কাজের জন্য খাড়া করেন ও নিজেদের আয়ের একাংশ তাঁহার জন্য দেন; (৪) শিক্ষকগণ সর্বোদয় সম্পর্কে ভালভাবে অধ্যয়ন করুন ও ছাত্রদের মধ্যে সর্বোদয়ের বিচার প্রচার করুন। উপরন্তু তাঁহারা নিজ নিজ বেতন হইতে কিছু কিছু করিয়া দিয়া কিছুসংখ্যক ছাত্রকে ভূদানের কাজের জন্য প্রস্তুত করিতে পারেন; (৫) যে সব রাজনৈতিক দল ভূদানযজ্ঞ সমর্থন করেন তাঁহারা তাঁহাদের কিছু

সংখ্যক কর্মীর উপর ভূদান-গ্রামদানের কাজের দায়িত্ব দিয়া তাঁহাদিগকে ঐ কাজের জন্য ছাড়িয়া দিতে পারেন; (৬) ১০টি গ্রাম লইয়া একজন কর্মী কাজ করিলে চলিবে। দশটি গ্রাম একজন কর্মীর ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। একজন কর্মীর জন্য মাসিক ৫০৲ টাকার বেশী খরচ হইবে না। যদি সেই কর্মী দশটি গ্রামের উত্তম সেবা করিতে থাকেন তবে এক এক গ্রামের উপর মাসিক ৫৲ টাকার দায়িত্ব পড়িবে। শস্য-দানের দ্বারা উহা মিটানো সহজ হইবে; (৭) দাতাগণ নিজেরা এক একটি দল গঠন করিয়া অন্য লোকের নিকট দান চাহিতে যাইতে পারেন। এযাবৎ ৫ লক্ষের অধিক দাতার নিকট হইতে দান পাওয়া গিয়াছে। যদি তাঁহাদের মধ্য হইতে শতকরা একজন করিয়া এই কাজের জন্য পাওয়া যায় তবে পাঁচ হাজার কর্মী পাওয়া যাইতে পারে। যদি তাহা হয় তবে খুব শক্তি লাভ হইবে এবং (৮) ব্যবসায়ীগণও এই কাজে যোগ দিতে পারেন। তাঁহারা গ্রামের উৎপাদিত শস্যাদি ভোগ করেন। সুতরাং তাঁহাদের গ্রামের সেবা করা উচিত। একজন ব্যবসায়ী একজন কর্মীর ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বিনোবাজী বলেন যে এরূপ কর্মী-গোষ্ঠী সৃষ্টি করিবার আরও অনেক পদ্ধতি হইতে পারে। জন-আধারিত হইয়া অর্থাৎ জনগণের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া যে কর্মী গড়িয়া উঠিবেন তিনি নিশ্চয়ই উত্তম কর্মী হইবেন। যদি তিনি ভাল কর্মী না হন তবে লোকে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন না। এজন্য সেবককে সকলদিক হইতে ভাল হইতে হইবে। সুতরাং সঞ্চিত ধনের বিবাদ ইত্যাদির ফলে সেখানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই।

॥ ১০ ॥ ভূদানযজ্ঞের পঞ্চ সোপান (ভূদান-আরোহণ)

ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন ক্রমশ সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করিল। উহার বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকিল। আন্দোলনের এরূপ উত্তরোত্তর গভীরতায় যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বিনোবাজী এক সোপান হইতে উর্ধ্বতর সোপানে আরোহন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ভূদানযজ্ঞ এক সোপান হইতে অন্য সোপানে আরোহন

করিতে করিতে অবশেষে পঞ্চম সোপানে আরূঢ় হইয়াছে। ঐ পঞ্চ সোপান কি কি ও কিরূপ তৎসম্পর্কে তিনি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেনঃ—

(১) তেলঙ্গানায় ভূমিহীন দরিদ্র ও ভূমির মালিকদের মধ্যে বিদ্বেষ, বিবাদ ইত্যাদির ফলে সেখানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি উদ্ভব হইয়াছিল তাহার প্রতিকার করার জরুরী প্রয়োজন ছিল। সেই অবস্থায় সেখানে ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ করা হয় এবং ভাল সাড়া পাওয়া যায়। তাহাতে সেখানকার ভয়াবহ পরিস্থিতিও প্রশমিত হয়। তাহার প্রভাব সমস্ত দেশের উপর পড়ে এবং উহা দেশের চিন্তাধারায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। প্রথম উহা ভূদানযজ্ঞের সোপান।

(২) তেলঙ্গানার হাঙ্গামায় ভূমির মালিকগণ ও তাঁহাদের সমর্থকগণের পক্ষে হাজার হাজার লোক নিহত হইয়াছিল। সেখানে লুটতরাজ, ডাকাতি ও অগ্নিসংযোগ অবারিত গতিতে চলিতেছিল। অনেকে মনে করিলেন, সেই অবস্থায় সেখানে ভূমির মালিকদের নিকট হইতে অনুকূল সাড়া পাওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু সমগ্র দেশের পক্ষে ভূদানযজ্ঞ উপযোগী কিনা—বিশেষত যেখানে স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান অর্থাৎ যেখানে কোন হিংসাত্মক আন্দোলন নাই সেখানেও ভূদানযজ্ঞের আহ্বানে সাড়া পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। এজন্য স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান এমন এক ক্ষেত্রে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখার প্রয়োজন ছিল। বিনোবাজীর দিল্লী যাইবার পথে ঐ পরীক্ষা চলিল ও উহা সফল হইল। সমগ্র দেশের দৃষ্টি ভূদানযজ্ঞের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ভূদানযজ্ঞের কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে ভূদানযজ্ঞের দ্বিতীয় সোপান রচিত হয়।

(৩) অতঃপর কর্মীদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইল—যাহাতে তাঁহারা আত্মবিশ্বাস লইয়া দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইয়া সফলকাম হইতে পারেন। দুই বৎসরের মধ্যে সারা দেশে ২৫ লক্ষ একর ও তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশে ৫ লক্ষ একর ভূমিদান সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প সেবা-পুরী সর্বোদয় সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়। ঐ দুই সঙ্কল্পই পূর্ণ হয় এবং তাহাতে কর্মীদের মধ্যে আত্মনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠালাভ করে। এইরূপে ভূদানযজ্ঞ তৃতীয় সোপানে আরূঢ় হয়।

(৪) দেশে যে পরিমাণ ভূমি আছে তাহার এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি পাওয়া যাইলে তবেই সকল ভূমিহীন দরিদ্রকে ভূমি দেওয়া যাইতে পারিবে। প্রথমে একটি প্রদেশে আত্যন্তিকভাবে কাজ চালাইয়া যদি উহার এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি সংগ্রহ করিতে পারা যায় তবে অন্যান্য প্রদেশেও উহার প্রভাব পড়িবে। তখন দেশের সর্বত্র এক-ষষ্ঠাংশ করিয়া ভূমিদান সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হইবে। এই দৃষ্টিতে বিহারের এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি অর্থাৎ ৩২ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করিবার সংকল্প করা হয়। উহার অধিকাংশ ভূমি অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ২৩ লক্ষ একর ভূমি সংগৃহীত হইয়া যায়। কিন্তু কর্মীরা ভূমি-বিতরণের কাজে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকায় ভূমিদান-প্রাপ্তির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারিলেন না। নচেৎ ৩২ লক্ষ একর ভূমিদান পাওয়া সেখানে কঠিন ছিল না। বিহারে যত ভূমি পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণ অপেক্ষা কত লোক ভূমিদান দিয়াছেন তাহারই গুরুত্ব সমধিক। সেখানে ৩ লক্ষ লোক ভূমিদান দিয়াছেন। একটি প্রদেশে কি করিয়া যে লক্ষ-লক্ষ লোক লক্ষ-লক্ষ একর ভূমি দান দিতে পারে সে-দৃশ্য বিহারে দেখা যায়। লক্ষ-লক্ষ লোক অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে দান করেন। বিহারে যে-দান পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ সাত্ত্বিক দান। উহা ভূদানযজ্ঞের চতুর্থ সোপান।

(৫) ভূমির প্রতি ব্যক্তিগত মালিকানাবোধের বিলোপ হইলে তবেই ভূমি-ক্রান্তি সাধিত হইবে। সমগ্র গ্রামদানে ব্যক্তিগত মালিকানা চলিয়া যায় এবং গ্রামই ভূমির মালিক হয়। সমগ্র গ্রাম এক পরিবারের মত হইয়া চলিতে থাকে। উহাকে বিনোবাজী 'গ্রাম-পরিবার' আখ্যা দিয়াছেন। বিনোবাজী উড়িষ্যার কোরাপুট জেলায় যখন পাদ-পরিক্রমা আরম্ভ করেন তখন সেখানে গ্রামদান আন্দোলন অভাবনীয়ভাবে সফল হইতে থাকে। ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসের শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যায় ৫ শতের অধিক সমগ্র গ্রামদান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোরাপুট জেলাতেই ৪ শতের কিছু অধিক।* ভূদানযজ্ঞ ষষ্ঠাংশ দান হইতে সর্বস্বদানে উন্নীত হয়। এইরূপে ভূদানযজ্ঞ উড়িষ্যায় পঞ্চম সোপানে আরূঢ় হয়।

*কোরাপুটে শেষপর্যন্ত ১৪০০এর উপর গ্রামদান হয়।

বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের ঐ পাঁচ সোপানের পৃথক পৃথক নামকরণ করিয়াছেন। প্রথম সোপানে এক স্থানীয় অশান্তি দমিত হয়। এজন্য তিনি উহার নাম দিয়াছেন—"অশান্তিদমন"। দ্বিতীয় সোপানে সমগ্র দেশের দৃষ্টি ভূদানযজ্ঞের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এজন্য উহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'ধ্যানাকর্ষণ'। তৃতীয় সোপানে কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়। তাই উহার নামকরণ করা হইয়াছে—"নিষ্ঠানির্মাণ"। চতুর্থ সোপানে কোন এক বিশেষ প্রদেশে কিভাবে এক-ষষ্ঠাংশ ভূমি সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। এজন্য বিনোবাজী উহাকে 'ব্যাপক-ভূমিদান' আখ্যা দিয়াছেন। পঞ্চম সোপানে গ্রামকে এক পরিবারে পরিণত করিবার প্রযত্ন করা হয়। এজন্য উহার নাম দেওয়া হইয়াছে—'ভূমি-ক্রান্তি'।

বিনোবাজী তাই বলিয়াছেন, 'ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন নহে, উহা আরোহণ'।

॥ ১১ ॥ ইহা যে বাপুরই সেই দৃশ্য

বিদেশী শাসনের অবসান হওয়ায় আমরা যে স্বাধীনতালাভ করিয়াছি তাহা মাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা। উহা সম্পূর্ণ স্বরাজ নহে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি সুযোগ মাত্র। ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তবে দেশ সম্পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ১৮ দফা রচনাত্মক কার্যক্রমের মধ্যে এই স্বরাজের চিত্রই আঁকিয়াছেন। অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা উক্ত ১৮ দফা গঠনমূলক কার্যের অন্যতম। কিন্তু অবস্থার পরিণতি এইরূপ হইয়াছে যে, ভূমি-সমস্যার সমাধান তথা অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা আজকালের যুগ-ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং মহাত্মা গান্ধীর সেই অসমাপ্ত কার্য ভগবান বিনোবা-জীর হস্তে সঁপিয়া দিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে বিভূতির প্রকাশ আমরা দেখিয়াছিলাম, বিনোবাজীর মধ্যে অনুরূপ বিভূতির বিকাশ দেখা যাইতেছে এবং মনে হইতেছে যে, গান্ধীজীর আত্মা বিনোবাজীর মাধ্যমে কাজ করিতেছে। কৃপালনীজী বিহারে বিনোবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তিনিও ঐরূপ অনুভব

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"বাপুর সঙ্গে চম্পারণে থাকিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, এখানে বিনোবাজীর কাছে আসিয়া সেই দৃশ্যই দেখিতেছি। বাপু যেভাবে কাজ করিতেন, বিনোবাজীও সেভাবে কাজ করিতেছেন। আমার কাজ তো ঐরূপ নহে; কারণ আমার প্রকৃতি ভিন্ন রকমের। কিন্তু যে-মনোভাব লইয়া, যে-পদ্ধতিতে ও যে-ধাঁচে বাপু কাজ করিতেন, বিনোবাজীও সেইরূপ করিতেছেন। গান্ধীজী যেভাবে গ্রামবাসী ভাইদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন, বিনোবাজীও সেইভাবে তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়া থাকেন। এইরূপ মনে হইতেছে ও আশাও হইতেছে যে, বাপুর সেই আত্মা পুনরায় আমাদের মধ্যে আসিয়া কাজ করিতেছে। এতদিন পর্যন্ত মনে হইতেছিল যে, তিনি যাহা-কিছু শিখাইয়াছিলেন, তিনি চলিয়া যাওয়ার পর লোকে সে-সবই ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এইসব কাজ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, মহাত্মার আত্মা বিনোবার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে কাজ করিতেছে এবং গান্ধীজীরই কাজ চালু রহিয়াছে—উহা বন্ধ হয় নাই। শুধু বিদেশী-শাসনের অবসান ঘটানোই তাঁহার কাজ ছিল না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ তাঁহারা বিদেশী-শাসনের অবসানকে ক্রান্তি বলিয়া ভাবিতেন। কিন্তু তাঁহার কাছে উহা ক্রান্তির এক পদক্ষেপ মাত্র ছিল। তিনি স্বাধীনতার সাহায্যে দারিদ্র্য-সমস্যা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন।"

॥ ১২ ॥ সমগ্র গ্রামদান বা ভূমির গ্রামীকরণ

আন্দোলনের প্রথম দিকে বিনোবাজী বলিয়াছিলেন,—"আমি ছোট পরিবার চাই না। এজন্য বড় পরিবার সৃষ্টি করিতে যাইতেছি। আমি সারা গ্রামকে এক পরিবাররূপে গড়িয়া তুলিতে চাই।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন —"এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমার আন্দোলন অগ্রসর হইতেছে এবং সফলতা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলিতে থাকিবে।" অতঃপর ১৯৫৩ সালের মধ্যভাগে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত এক কর্মী-শিবিরে বিহার প্রদেশের কর্মীদিগের কাছে তিনি ভূমি-ব্যবস্থার অন্তিম চিত্র সম্বন্ধে বলেন,—

"আমাদের অন্তিম অবস্থা এইরূপ হইবে। ভারতবর্ষে যত জমি আছে সবই একত্রিত করিয়া একসঙ্গে আবাদ করা হইবে এরূপ নহে। ব্যক্তির

হাতে জমি থাকিবে, কিন্তু গ্রাম-পঞ্চায়েৎ জমির মালিক হইবে। প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি আবাদ করিবার জন্য দেওয়া হইবে এবং উদ্বৃত্ত জমি সামূহিক থাকিবে। সামূহিক জমির ফসল হইতে গ্রামের সমস্ত জমির খাজনা দেওয়া হইবে। শিক্ষা, চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রভৃতির ব্যয় সামূহিক জমির আয় হইতে মিটানো হইবে। এইরূপে গ্রামের সার্বজনিক কার্যাদি সবই সামূহিক জমি হইতে হইবে এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রতেক্যের হাতে কিছু-কিছু জমি দেওয়া হইবে। প্রতি আট-দশ বৎসর অন্তর নূতন করিয়া জমির পুনর্বণ্টন হইবে। যদি কাহারও সংসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় তবে তাহাকে বেশী জমি দেওয়া হইবে এবং যদি কাহারও ঘরে পোষ্য সংখ্যা কম হইয়া যায় তবে তাহাকে কম জমি দেওয়া হইবে। ঐ সময়ের জন্য ঐ ব্যক্তি মালিক থাকিবে অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে তাহার নিকট হইতে কোন জমি ছাড়াইয়া লওয়া যাইবে না। প্রত্যেকে যে-কাজ করিবে তাহা এই মনে করিয়া করিবে যে, উহার দায়িত্ব তাহারই এবং ঐ জমি তাহারই। ঐরূপভাবে সামূহিক জমিও তাহাদের—এরূপ মনে করিয়া লোকে ঐ জমিতে কাজ করিবে। সমগ্র জমি আমাদের। আমাদের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইলে আমরা ঐ জমি হইতে আরও জমি পাইব; আবার আবশ্যক হইলে আমাদের কাছ হইতে জমি লওয়াও যাইবে—এরূপ মনোভাব থাকিবে। যদিও পিতাপুত্রের মধ্যে সম্বন্ধ অটুট তবু কোন বাপ একথা বলে না যে, আমি আমার পুত্রের মালিক। বাপ বলে যে, মালিক তো ভগবান এবং আমরা দুইজনই তাঁহার সেবক। অর্থাৎ তাহার সন্তানের প্রতি মমত্ব আছে বটে কিন্তু সে তাহার মালিক নহে। ঐরূপ জমির প্রতি মমত্ব থাকিবে বটে কিন্তু তাহার উপর মালিকানা থাকিবে না। জমি বিক্রি করা যাইবে না। কেহ কি নিজের ছেলেকে বিক্রি করে? ছেলেকে কাহারও সাহায্যার্থে দেওয়া যাইতে পারে। জমির মূল্য পয়সায় হয় না। উহা অমূল্য বস্তু।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র গ্রামদানের কল্পনা আরম্ভ হইতেই বিনোবাজীর মধ্যে গভীরভাবে ছিল। কিন্তু তিনি প্রথম হইতে সমগ্র গ্রামদানের উপর জোর দেন নাই। কারণ মহান ভাবধারা ব্যক্ত করা এক জিনিস আর উহা বাস্তবে পরিণত করা অন্য জিনিস। আন্দোলনের অগ্রগতি

হইতে হইতে উহার জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া চাই। তখন অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য সময় ও অবস্থা বুঝিয়া তিনি উত্তরপ্রদেশের মঙ্গরোট গ্রামের অধিবাসীদের নিকট সমগ্র গ্রামদানের কথা বলিলেন এবং তাঁহারা সর্বস্বদানস্বরূপ মঙ্গরোট গ্রাম দান করিলেন। উহাই প্রথম সমগ্র গ্রামদান। তৎপরে বিহারে ১৩টি গ্রাম এবং উড়িষ্যায় ২৫টি সমগ্র গ্রামদান পাওয়া যায়। উড়িষ্যায় সমগ্র গ্রামদানের সংখ্যা ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়-নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিনোবাজী বলিয়াছিলেন যে, উড়িষ্যায় তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইবে ভূমি-ক্রান্তি। সমগ্র গ্রামদানের দ্বারাই ভূমি-ক্রান্তি সাধিত হইতে পারে। বিনোবাজীর উড়িষ্যা ভ্রমণকালে কোরাপুট জেলায় সমগ্র গ্রামদানের প্রবাহ চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কোরাপুটের গ্রামদানী গ্রামের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৪০০। তাহাতে সারা জগতের দৃষ্টি গ্রামদান আন্দোলনের দিকে তথা কোরাপুটের দিকে আকৃষ্ট হয়। অতঃপর বিনোবাজী যখন দক্ষিণ ভারতের প্রদেশগুলিতে ও তৎপরে মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশে পদযাত্রা করেন, তখন সেই সব প্রদেশেও বহুসংখ্যক গ্রামদান হইল। অন্যান্য প্রদেশেও অল্পাধিক গ্রামদান হইতে থাকিল। ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সমগ্র দেশে মোট ৪৭৫২টি গ্রামদান হইয়াছে। প্রদেশ অনুসারে উহার সংখ্যা এইরূপ—(১) অন্ধ্র—৫৮৭, (২) আসাম—১৫৭, (৩) উড়িষ্যা—১৯২৯, (৪) উত্তরপ্রদেশ—৬৩, (৫) জম্মু-কাশ্মীর—০, (৬) কেরল—৫৪৩, (৭) তামিলনাদ (মাদ্রাজ)—২৫২, (৮) দিল্লী—০, (৯) পাঞ্জাব-পেপ্সু—৬, (১০) পশ্চিমবঙ্গ—২৬, (১১) গুজরাট—১৪৪, (১২) মহারাষ্ট্র—৫৮৪, (১৩) বিহার—৮২, (১৪) মধ্য-প্রদেশ—৭৪, (১৫) মহীশূর—৬৬, (১৬) রাজস্থান—২৩৫ ও (১৭) হিমাচলপ্রদেশ—৪।

ভূদানযজ্ঞের বিচারধারার ক্রমবিকাশ হইতে হইতে কিভাবে উহা গ্রাম-দানের বিচারে আসিয়া পৌঁছিল তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। ভূদান-যজ্ঞের প্রথম পর্যায়ে ভূমিদান দেওয়ার প্রেরণার পশ্চাতে অনুকম্পা (জীবে দয়া) ও ভূমিহীন দরিদ্র প্রতিবেশীকে সাহায্যদান দেওয়ার ভাবনার প্রাধান্য ছিল। (২) অতঃপর ভূমি সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিচার আসিল। বায়ু, জল ও

আলোকের ন্যায় ভূমি ঈশ্বরের (প্রকৃতির) দান। সুতরাং ঈশ্বর প্রদত্ত সকল জিনিসে তাঁহার সকল সন্তানের সমান অধিকার আছে। বিশেষত যে ভূমিহীন দরিদ্র ব্যক্তি ভূমিচাষ করিতে পারে, অথচ যাহার অন্য কোন উপযোগী জীবিকা নাই তাহার ভূমি পাইবার অধিকার সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। এরূপে ভূমিদানের বিচারধারায় ভূত দয়া ও সাহায্যদানের ভাবনার সহিত অধিকারের ভাবনা যুক্ত হইল। (৩) ভূমি ঈশ্বরের সৃষ্টি। সুতরাং একমাত্র ঈশ্বর ভূমির মালিক। মনুষ্য ভূমির মালিক হইতে পারে না। মানুষ ভূমিমাতার সেবকমাত্র হইতে পারে। এরূপে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ভূমির মালিকত্বের ভাবনা শিথিল হইল। (৪) কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মানুষকে ভূমির মালিক বলিয়া গণ্য করা না হইলেও ব্যবহারিক দিক হইতে যাহার হাতে ভূমি থাকে সেই ব্যক্তি কার্যত ভূমির মালিক থাকিয়া যায়। তাহাতে সমস্যা সমাধানের দিকে বিশেষ কিছু অগ্রসর হওয়া যায় না। বরং এইমাত্র ঘোষণা করিয়া আর অগ্রসর না হইলে স্থিত অবস্থাকেই কার্যত সহ্য করিয়া লওয়া হয়। অতএব এই অর্থাৎ দৃশ্যত অসম্ভব কিন্তু কার্যত সত্য অবস্থা দূর হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। (৫) গ্রামদানে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। গ্রামদানী গ্রামে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়বিধ মালিকানার সমাবেশ হইয়াছে। সমগ্র গ্রাম ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা ট্রাষ্টি স্বরূপ গ্রামের সমস্ত ভূমির মালিক হইবে, আবার উহা ব্যবহারিকভাবেও গ্রামের ভূমির মালিক হইবে। গ্রামের সমস্ত লোক সমভাবে ভূমির মালিকানার ফল ভোগ করিবে। অথচ ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তৎপ্রসূত সামাজিক দোষ-ত্রুটিসমূহ ঘুচিয়া যাইবে। গ্রাম হইবে মালিক ও জোত থাকিবে ব্যক্তির।

গ্রামদানী গ্রামের ভূমির ব্যবস্থা কিরূপ হইবে এবং কিভাবে ঐ গ্রামে গ্রাম-রচনার কাজ চলিতে থাকিবে তাহা বিনোবাজী কোরাপুট জেলায় ভ্রমণের সময় বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গ্রামবাসীদিগকে বুঝাইয়া দেন—"জমির মালিক ভগবান। গ্রাম হইবে ভগবানের পক্ষ হইতে জমির ট্রাষ্টি। আইনেও কোন ব্যক্তিকে জমির মালিক বলিয়া মানা হইবে না, গ্রামকেই জমির মালিক বলিয়া মানা হইবে। পরিবারে কতজন লোক আছে তাহা দেখিয়া মাথাপিছু ১ একর করিয়া জমি প্রত্যেক পরিবারকে চাষ করিবার জন্য দেওয়া হইবে।

প্রত্যেক ৫ বা ১০ বৎসর পরে পরিবারের লোকসংখ্যা কত দাঁড়ায় তাহা দেখিয়া তদনুসারে জমির পুনর্বিতরণ করা হইবে। গ্রামে কিছু সামুহিক জমি থাকিবে। ঐ জমির আয় হইতে গ্রামের সমস্ত জমির খাজনা দেওয়া ও গ্রামের উন্নতিমূলক কার্যাদি করা হইবে। কয়েক বৎসর পরীক্ষার পর যদি গ্রামের লোক চাহেন তবে তাঁহারা গ্রামের সমস্ত জমিকে সামুহিক-জমি করিয়া লইতে পারিবেন। এখন কেবল সুবিধার জন্য তাঁহারা পৃথক-পৃথক-ভাবে চাষ করিবেন। কাহারও ক্ষেতে যদি খুব বেশী কাজ পড়িয়া যায় তবে গ্রামের সমস্ত লোক মিলিয়া ঐ কাজ করিয়া দিবেন। যদি কেহ দুঃখ-কষ্টে পড়ে কিংবা কাহারও জমিতে ফসল কম হয় তবে তাহাকে সাহায্যদান করা হইবে। কিন্তু কেহ কাহাকেও ঋণ দিতে পারিবেন না। যাঁহার অভাব হইবে তাঁহাকে সাহায্য দেওয়া হইবে। কারণ সমগ্র গ্রাম এক পরিবারস্বরূপ বাস করিতে থাকিবে।

"সঙ্গে সঙ্গে গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং গ্রাম স্বাবলম্বী হইয়া পয়সার মায়া হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে। সেই উদ্দেশ্যে প্রথম কাজ হইবে—গ্রামবাসীরা মিলিত হইয়া স্থির করিবেন যে, তাঁহাদের গ্রামে বাহির হইতে কোন বস্ত্র আসিবে না। তুলাচাষ হইতে আরম্ভ করিয়া বস্ত্রবয়ন পর্যন্ত সমস্ত কাজ গ্রামেই করা হইবে। তাহার দ্বারা গ্রামের সকলে কাজ পাইবেন এবং গ্রামের ধনসম্পদ গ্রামেই থাকিয়া যাইবে। উপরন্তু গ্রামের জন্য অন্য যেসব জিনিসের প্রয়োজন তৎসমস্তই গ্রামে তৈয়ারি করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। গ্রামে কাহারও কোন নিজস্ব দোকান থাকিবে না। গ্রামের পক্ষ হইতে একটি দোকান থাকিবে। তাহার মাধ্যমে প্রয়োজনমত বাহিরের দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইবে এবং গ্রামে প্রয়োজনাতিরিক্ত যেসব জিনিস উৎপন্ন হইবে তাহা বাহিরে বিক্রয় করা হইবে।

"গ্রামের সমস্ত বালক-বালিকা সমান শিক্ষা পাইবে। শিক্ষক সকালে এক ঘন্টা বালক-বালিকাদের এবং সন্ধ্যায় এক ঘন্টা বয়স্কদের শিক্ষা দিবেন এবং সারাদিন নিজের কাজ করিবেন। ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্প ও ব্রহ্মবিদ্যা উভয়ই চাই। তাহাতে হাতের কাজ মিলিবে এবং বুদ্ধির ঠিকমত বিকাশ হইবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের সকলে একস্থানে মিলিত হইবেন।

তথায় গীতা, রামায়ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ হইবে এবং গ্রামের উন্নতি সম্পর্কে সকলে আলোচনা করিবেন। আজকাল মদ, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি পান-দোষের জন্য গ্রামের অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছে। এইজন্য সকল গ্রামবাসী মিলিত হইয়া ভগবানের নাম করিয়া সংকল্প করিবেন যে তাঁহারা মদ, বিড়ি প্রভৃতি ত্যাগ করিবেন। গ্রামে যাহার ঋণ আছে তাহা মকুব করিবার জন্য —অন্ততপক্ষে সুদ ছাড়িয়া দিবার জন্য মহাজনকে অনুরোধ করা হইবে। ভবিষ্যতে যদি কাহারও ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় তবে গ্রামের তরফ হইতে ঋণ করা হইবে। সরকারের নিকট হইতেও ঋণ লওয়া যাইতে পারিবে। গ্রামের সকল বিবাহের ব্যবস্থা গ্রামের পক্ষ হইতেই করা হইবে—কোন পরিবার বিশেষের পক্ষ হইতে নহে। এই কারণে বিবাহের জন্য কোন ঋণ করিবার প্রশ্ন উঠিবে না।

"সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ইত্যাদি সমস্ত ভেদভাব দূর করা হইবে। প্রত্যেক মানুষকে পরমেশ্বরের পুত্র বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং সেই দৃষ্টিতে সকলের সমান অধিকার থাকিবে। সকল রকম শিল্প তথা সকল রকম সমাজহিতকর কাজের সমান সামাজিক, নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা থাকিবে। গ্রামের জমিতে সকলের সমান অধিকার গণ্য করা হইবে এবং আদর্শ এই হইবে যে, প্রত্যেকে কিছুসময় ক্ষেতে কাজ করিবেন। কারণ কৃষিকার্য ব্যতীত মানবজীবনের পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নহে। গ্রামের তাঁতি, চামার, কামার প্রভৃতি সকলে গ্রামের লোকের প্রয়োজন-মত তাঁহাদের কাজ করিয়া দিবেন। উহার হিসাব রাখা হইবে না। বর্ষান্তে যখন ফসল উঠিবে তখন কৃষক ফসলের কিছু অংশ উঁহাদের প্রত্যেকের ঘরে দিয়া আসিবেন। পূর্বকালে গ্রামে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এইভাবে "বসুধৈব-কুটুম্বকম্"-এর আরম্ভ গ্রাম-পরিবার হইতেই হইবে।"

সর্বস্বদানী গ্রামের ভূমি-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা চলিয়া যায় বটে কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার সুবিধা গ্রামবাসীদের থাকিয়া যায়। অর্থাৎ তাহারা পৃথক-পৃথকভাবে জমি চাষ করিতে পায়। সমগ্র গ্রামদান সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন যে, ভূদানযজ্ঞের প্রথম পদক্ষেপে বলা হয়, গ্রামে কেহ ভূমি-

হীন থাকিবে না এবং উহার অন্তিম পদক্ষেপে বলা হয়, গ্রামে ভূমির মালিক কেহ থাকিবে না।

বিনোবাজী বলেন যে, সমগ্র গ্রামদানের সুফল চারি প্রকার—(১) আর্থিক, (২) সংস্কৃতিগত, (৩) নৈতিক ও (৪) আধ্যাত্মিক। উহার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যেঃ—

(১) আর্থিক দিক—"সমগ্র গ্রামদানের প্রথম সুফল হইতেছে—আর্থিক-ক্রান্তি। ব্যক্তিগত মালিকানার লোপ হইয়া গ্রামের সমস্ত জমি এক হইয়া যাইলে গ্রামের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইবে। কারণ, (ক) গ্রামের জন্য কোন্ ফসল কতটা পরিমাণ প্রয়োজন তাহার পরিকল্পনা করিয়া চাষ-আবাদের ব্যবস্থা হইবে, (খ) কৃষির উন্নতির জন্য সমবেত প্রচেষ্টা করা হইবে, (গ) সরকারী বা বাহিরের অন্যান্য সাহায্য পাওয়া সহজসাধ্য হইবে ও (ঘ) ব্যক্তিগতভাবে কাহারও ঋণ করার প্রয়োজন হইবে না। মোট কথায় ইহাতে গ্রাম-পরিকল্পনার বিশেষ সুবিধা হইবে। এইরূপে আর্থিক ক্রান্তি সাধিত হইবে।

(২) সাংস্কৃতিক দিক—"গ্রাম এক পরিবারের মত হইলে পরস্পরের মধ্যে প্রেম ও সহানুভূতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। নিজের সুখে বা নিজের দুঃখে অন্যে অংশভাগী হইলে সুখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও দুঃখের তীব্রতা হ্রাস পায়। এজন্য সমগ্রদানী গ্রামের অধিবাসীদের সুখ বাড়িবে ও দুঃখ কমিবে। উপরন্তু সমগ্রদানী গ্রামের লোকের পরিবারকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি দূরীভূত হইলে তাহাদের খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব গড়িয়া উঠিবে। কোন খেলোয়াড় একা না খেলিয়া যদি দলের সকলের সঙ্গে ও সহযোগে খেলে তবে তাহাতে সে সর্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ পায়। গণনৃত্যে নর্তকের অবস্থাও তদ্রূপ হয়। এজন্য সমগ্রদানী গ্রামের লোক এক পরিবারের মত সহযোগে থাকিবেন বলিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী সুখ পাইবেন এবং দুঃখের কারণ ঘটিলে দুঃখ কম বোধ করিবেন।

(৩) নৈতিক দিক—"গ্রামীকরণের ফলে গ্রামবাসীদিগের নৈতিক মানের উন্নতি সাধিত হইবে। বিবাদ-বিসম্বাদ, চুরি, অশোভনীয় আচরণ প্রভৃতি চলিয়া যাইবে। কেহ কি নিজের ঘরে চুরি করে? মানুষ নিজের ব্যক্তিগত

স্বার্থের জন্য পৃথক পরিবার ও পৃথক সম্পত্তি সৃষ্টি করিয়াছে। এই ব্যক্তিগত স্বামিত্ববোধের দরুন সমাজে নৈতিক অধঃপতন হইয়াছে। ভিক্ষুক দুই-চারিটি পয়সা এবং সামান্য এক টুকরা সাবান তাহার ছেঁড়া থলিতে সযত্নে বাঁধিয়া রাখে। সেরূপ কেহ বা কয়েক আনা, কেহ বা কয়েক টাকা আর কেহ বা সহস্র-সহস্র টাকা নিজ-নিজ থলিতে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এইভাবে লোকের মন সংকীর্ণ হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের ঘর ছোট করিয়া বাঁধিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের পরিবারের ধারণাকে অতি সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই পৃথিবীর সকল বিবাদ-বিসম্বাদের মূলে রহিয়াছে। যখনই ভূমি ও সম্পত্তির মালিকানা ঘুচিয়া যাইবে তখনই লোকের ও সমাজের নৈতিক মান উন্নীত হইবে সন্দেহ নাই। ইহাই সমগ্র গ্রামদানের সর্বোৎকৃষ্ট সুফল। তখন সমগ্র জগৎ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। আজ সারা জগৎ দুঃখার্ত। পরস্পরের স্বার্থ-সংঘর্ষ হইতেছে দুঃখের হেতু। ইহার ফলে হিংসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। যদি গ্রামের ভূমি ও সম্পত্তি গ্রামেরই হইয়া যায় তবে জগৎ নৈতিক মান উন্নয়নের একটি পথ খুঁজিয়া পাইবে।

(৪) আধ্যাত্মিক দিক—"আধ্যাত্মিক দিকের বিষয় সর্বশেষে বলা হইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার গুরুত্ব কম নহে। লোকে বলে—"ইহা আমার ঘর', 'উহা আমার ভূমি।"—এই 'আমি', 'আমার'-বোধ মানুষকে আসক্তির দাস করিয়া রাখিয়াছে। যখন মানুষ এই 'আমি', 'আমার'-বোধ হইতে মুক্ত হইবে এবং ইহা উপলব্ধি করিবে যে জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সকলেরই জন্য এবং জগতে এমন কিছু নাই যাহা কেবলমাত্র 'আমি'-র ভোগের জন্য, তখন সে অচিরে মুক্তিলাভ করিবে। প্রত্যেকের মন আজ বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ সে 'আমি', 'আমার'-বোধ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। এই কারণেই মুনি-ঋষিরা মুক্তির যে-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন সেই পথে চলিয়াও সুখ বা মুক্তি মিলিতেছে না। ইহা প্রায়ই বলা হইয়া থাকে যে, যদি মানুষ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া—গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তবে 'আমি', 'আমার'-বোধ চলিয়া যাইবে। কিন্তু এইরূপ নিষেধাত্মক পথে মুক্তিলাভ হইতে পারে না। সাধারণ কথায় যাহাকে ঘর বলা হয় তাহাকে যদি আমরা আমাদের প্রকৃত ঘর বলিয়া মানিতে রাজী না হই তবেই আমাদের মুক্তির পথ সুগম হইবে। আমাদের

এই জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকা চাই যে, সারা গ্রাম আমাদের ঘর এবং যে-ঘরে আমরা সাধারণত বাস করি এবং যাহাকে আমরা আমাদের নিজেদের ঘর বলিয়া মনে করি তাহা সকলের জন্য। 'আমি কাহারো জন্য নহি' এবং 'কেহ আমার জন্য নহে'—এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব নহে। 'আমি সকলের' এবং 'সকলে আমার'—এই বোধ জাগ্রত হইলে তবেই মুক্তিলাভ হইবে।

"অতীতে মুক্তিলাভের জন্য 'কিছুই আমার নহে'—এই ভাব সাধন করিবার বহু প্রযত্ন করা হইয়াছে। এজন্য সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া এবং লোকসংস্পর্শ হইতে দূরে গিয়া নির্জনে বাস করার ঝোঁক এই দেশে রহিয়াছে। এরূপ মনে করা হয় যে, ইহাই মুক্তির সহজতম উপায়। কিন্তু মুক্তিলাভের এরূপ কোন সোজা রাস্তা নাই। মানুষ সব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় বটে কিন্তু শেষে লেংটির উপরও তাহার আসক্তি থাকিয়া যায়। উহাতে কোন কাজ হয় না। অতএব আমাদের ইহা অনুধাবন করিতে হইবে যে, আমাদের যাহা কিছু আছে তাহা সবই গ্রামের। এমন কি আমরা নিজেরাও গ্রামের এবং গ্রাম আমাদের। এই বিশ্বাসের বলে অচিরে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।"

॥ ১৩ ॥ গ্রামদানী গ্রামের গঠনকার্য

পূর্ব অধ্যায়ে গ্রামদানী গ্রামের গঠনকার্য কিরূপ হওয়া আবশ্যক সে সম্বন্ধে বিনোবাজী যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে গ্রামদানী গ্রামের গঠনকার্য সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

গ্রামদানী গ্রামের গঠনকার্যের লক্ষ্য হইবে গ্রাম-স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপযোগী করিয়া গ্রামের গঠনমূলক কার্যক্রম নির্ণয় করিতে হইবে। উপরন্তু সমগ্র গ্রাম এক পরিবার এই ভাবনার ভিত্তিতে সমস্ত গঠন-মূলক কার্যক্রম স্থির করা আবশ্যক।

সর্বপ্রথম কাজ হইবে গ্রামের জমির মাথাপিছু সমবন্টন। কেবলমাত্র পরি-মাণের দিক হইতে সমবন্টন নহে। জমির উৎকর্ষতা বিবেচনায় বন্টন এমন-ভাবে হওয়া উচিত যাহাতে সকলে মাথাপিছু সমান ফসল পাইতে পারে।

কিন্তু সকল স্থানে ও সকল গ্রামে প্রথম অবস্থায় এরূপ বন্টন করা সম্ভব না হইতে পারে। এজন্য ইতর-বিশেষ করিতে হয়। কারণ মনে রাখিতে হইবে যে গ্রামদান এক প্রক্রিয়া (প্রোসেস্)। এক মহান লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া। গ্রামদানের দ্বারা গ্রামের লোক ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার ভাবনা ত্যাগ করিয়াছে এবং গ্রামের সকলকে নিজ পরিবারের মত মানিবার পক্ষে অনুকূল মনোভাব তাহার আছে। আরম্ভে এই ভিত্তিটুকু মাত্র থাকে। আর সব কিছু ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণত এরূপ মনে করা হয় যে গ্রামদান হইলেই গ্রামের সমস্ত ভূমির যৌথ আবাদ হওয়া চাই। কিন্তু সকলক্ষেত্রে প্রথমেই সমস্ত ভূমি যৌথ আবাদের মধ্যে লইতে সকলে স্বীকৃত হয় না। কারণ ব্যক্তিগত মালিকানার ভাবনা যাইলেও ব্যক্তিগত জোতের প্রতি একটা আসক্তি থাকিয়া যায়। ধীরে ধীরে তাহা অপনোদন করিতে হয়। উপরন্তু সর্বক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থায় যৌথ চাষ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বা লাভজনক হয় না। গ্রামের সাধারণ লোকের অভ্যাস ও মানসিক অবস্থা এখনও এমন যে, তাহা যৌথ চাষের পক্ষে উপযোগী নহে। দুই-একটি গ্রামদানী গ্রামে প্রথমেই যৌথ চাষ করিতে গিয়া ঐরূপ বুঝা গিয়াছে। হয়ত প্রত্যূষ ৫৷৷-৬টায় কাজ আরম্ভ করিবার কথা হইল। সকলে একসঙ্গে গিয়া একটা কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন। কিন্তু কেহ আসিল ৬টায়, কেহ ৭টায় আবার অনেকে আসিল প্রায় ৮টায়। কাজ করিতে করিতে এমন হৈচৈ ও গল্পগুজব আরম্ভ হইল, যাহার ফলে পৃথক-পৃথকভাবে কাজ করিলে যে পরিমাণ কাজ হইত তাহার বার আনা কাজও হইল না। এইসব কারণে অধিকাংশ জমির জোত প্রথম অবস্থায় ব্যক্তিগত রাখা হয় এবং কিছু জমি সামূহিক রাখা হয় ও তাহাতে যৌথ চাষ করা হয়। ঐ সামূহিক জমির আয় হইতে গ্রামের সমস্ত জমির খাজনা দেওয়া এবং গ্রামের সামূহিক উন্নতিমূলক কার্যাদি সম্পাদন করা হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় যেমন যেমন গ্রামের লোক চাষ ও অন্যান্য ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে সহযোগ করিয়া চলিবার প্রয়োজনবোধ করিতে থাকে তেমন তেমন কৃষি-আদি বিভিন্ন ব্যাপারে গ্রামের মধ্যে স্বৈচ্ছিক সহযোগ ও সমবায়মূলক কার্যপ্রণালীর বিকাশ হইতে থাকে। তবে প্রথম হইতে

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়।

গ্রামদানী গ্রামের অর্থ-ব্যবস্থার নীতি হইতেছে স্বাবলম্বন ও স্বয়ং-পূর্ণতা। দ্রোহরহিত উৎপাদক শ্রম হইবে উহার সাধনোপায়। উৎপাদক শ্রমের অর্থ হইতেছে যে শ্রমের দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু উৎপাদন করা হয়। কিন্তু শুধু উৎপাদক শ্রম হইলে চলিবে না। ঐ উৎপাদক শ্রম 'দ্রোহরহিত' হওয়া চাই। উহা যেন কাহাকেও দ্রোহ না করে অর্থাৎ কাহারও জীবিকায় আঘাত করিয়া তাহাকে বেকার না করে। চাউলের কল বা কাপড়ের কলের শ্রমিকেরা যে শ্রম করে তাহা উৎ-পাদক শ্রম সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা দ্রোহ রহিত নহে। কারণ কাপড়ের কল ও চাউলের কল কোটি-কোটি মানুষের জীবিকা কাড়িয়া লইয়া তাহা-দিগকে বেকার করিয়াছে।

গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থা এরূপ হইবে যাহাতে গ্রামের লোক সর্বোদয়ের আদর্শ অনুসারে জীবন গঠন করার শিক্ষালাভ করিতে পারে।

গ্রামদানী গ্রামে গঠনকার্যের দ্বারা মানুষের বৈষয়িক উন্নতি সাধন নিশ্চয়ই করিতে হইবে। কিন্তু উহা গ্রাম-নির্মাণ কাজের একমাত্র কাম্য নহে। ঐ কার্যক্রম এরূপ হওয়া ও এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, যাহাতে উহা গৃহীত হইবার পূর্বে গ্রামের লোক উহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। উপরন্তু তাহা সফল করিয়া তুলিবার দায়িত্বও যেন তাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। তাঁহারা যেন এরূপ অনুভব করেন যে উহা তাঁহাদেরই সিদ্ধান্ত এবং তাঁহারা উহা সফল করিবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কাজ করিতেছেন। কোন জিনিস উপর হইতে চাপান হইতেছে—এরূপ যেন তাঁহাদের মনে না হয়। এজন্য গঠনকর্মিগণ গ্রামের লোককে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ও তাঁহাদের সহায়তা করার জন্য থাকিবেন। যাহাতে গ্রামের লোক অন্যের বিনা নিয়ন্ত্রণে ও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মিলিতভাবে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য প্রযত্ন করিতে থাকেন—এই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং গ্রামের সমস্ত ব্যাপার গ্রামের লোকের দ্বারা পরিচালনা করিবার জন্য গ্রামসভা গঠন করিতে হইবে। ছোট গ্রামে পূর্ণবয়স্ক সকল স্ত্রী-পুরুষকে লইয়া এবং বৃহৎ গ্রামে প্রত্যেক পরিবার

হইতে একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রীলোককে লইয়া গ্রামসভা গঠিত হইবে অথবা অবস্থা অনুসারে গ্রামবাসীরা যেরূপ আবশ্যক মনে করেন সেরূপ করিতে পারেন। গ্রামসভার সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতি বা সর্বানুমতি-ক্রমে গৃহীত হওয়া চাই। গ্রামসভা গ্রামের শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচার-সম্পর্কীয় ব্যবস্থাও করিবেন। গ্রামের শৃঙ্খলা গ্রামই রক্ষা করিবে, গ্রামের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা গ্রামেই হওয়া চাই এবং বিবাদ মীমাংসায় মীমাংসা-কারীদের মতৈক্য হওয়া আবশ্যক।

গ্রামদানী গ্রামের গঠনকার্যের কার্যক্রম পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে উহা মূলত এক শিক্ষার কার্যক্রম। এজন্য নয়ীতালীমকে এখন আর বিদ্যালয়গৃহের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে না। সমগ্র গ্রামদানী গ্রাম এখন নয়ীতালীমের শিক্ষালয়ে পরিণত হইতে পারে। বিনোবাজী বিশেষভাবে চাহিয়াছিলেন যে তামিলনাদের মাদুরাই জেলার গ্রামদানী গ্রামগুলিকে নয়ীতালীমের কর্মীদের মাধ্যমে গড়িয়া তোলা হউক।

শ্রীযুক্ত অন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধের পরিচালনায় কোরাপুটের (উড়িষ্যা) গ্রামগুলির গঠনকার্য আরম্ভ করা হয়। তিনশত গ্রামের ভূমি বন্টন করিয়া তাহাতে গঠনকার্য চলিতেছিল এবং গঠনকার্যের আশানুরূপ অগ্রগতিও হইতেছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে কার্যের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এখন পুনরায় ঐ কাজ উৎসাহের সহিত চালানো হইতেছে এবং আরও কিছুসংখ্যক গ্রামের ভূমিবণ্টনও করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের আক্রানীমহলের আদিবাসী গ্রামগুলির গঠনকার্য আশানুরূপে অগ্রসর হইতেছে। উত্তরপ্রদেশের মঙ্গরোট প্রথম গ্রামদানী গ্রাম। ঐ গ্রামের গঠনকার্য বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। বিহারের কয়েকটি গ্রামদানী গ্রাম বেশ ভালভাবে গড়িয়া উঠিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিহারের মুঙ্গের জেলায় তারাপুর থানার বেরাই গ্রামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ গ্রামের নাম খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐ গ্রামের গঠনকার্যের বিবরণ এখানে কিছু উল্লেখ করিলে গ্রামদানী গ্রাম কিভাবে সর্বোদয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বেরাই গ্রামের মোট পরিবার সংখ্যা ৮৩। জনসংখ্যা কিঞ্চিদাধিক ৪০০। কৃষক ও শ্রমজীবীর গ্রাম। কিছু লোক রাজমিস্ত্রীর কাজ জানেন। গ্রামের

মোট জমির পরিমাণ ৪৯০ একর কিন্তু প্রায় সমস্ত জমি ভিন্ন গ্রামের ভূস্বামীদের হাতে। গ্রামেব লোকের মাত্র ৩০ বিঘা জমি ছিল। গ্রামের লোক ঐ সব অনুপস্থিত ভূস্বামীদের জমিতে ভাগ চাষ করিতেন। উপরন্তু তাঁহারা পার্শ্ববর্তী গ্রামের ধনী ব্যক্তিদের ধানভানার কাজ করিতেন। গ্রামে পূর্ব হইতে বিহারের সর্বোদয়-নেতা স্বর্গীয় লক্ষ্মীবাবুর পরিচালনায় কিছু চরকা চলিত। দেশের অন্যান্য স্থানে গ্রামদান হইতেছে শুনিয়া ঐ গ্রামের লোক গ্রামদান দিবার প্রেরণা লাভ করেন ও ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রাম-দান করেন। উহাতে যে সব অনুপস্থিত ভূস্বামীর জমি তাঁহারা ভাগচাষ করিতেন সেই সব জমির মালিক আতঙ্কিত হইয়া তাঁহাদিগকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেন। গ্রামের লোক তাহাতে বাধা দিলেন না বটে কিন্তু তাঁহারা স্থির করিলেন যে ঐ সব জমি চাষ করিবার জন্য তাঁহারা বাহির হইতে মজুর আনিতে দিবেন না। তাঁহাদিগকে ভাগচাষ হইতে বঞ্চিত করা হইল। এখন যদি ঐ জমিগুলি চাষ করাইবার জন্যও বাহির হইতে মজুর আমদানী করিয়া তাঁহাদিগকে বেকার রাখা হয় তবে তাঁহারা তাহা নীরবে সহ্য করিবেন না; তাঁহারা সত্যাগ্রহ করিতে বাধ্য হইবেন। ইহতে জমির মালিকগণ ঐরূপ করিতে সাহস করিলেন না। ঐ সব জমি চাষের জন্য গ্রামের লোককে মজুর রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইল। কিন্তু অ্যানদিক হইতে তাহাদের আর একটি বিপদ আসিল। যে সব ধনী ব্যক্তির ধানভানার কাজ তাঁহারা পাইতেন তাহা তাঁহারা বন্ধ করিয়া দিলেন, কারণ গ্রামদানের পর তাঁহারা আর গ্রামের লোকের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিলেন না। ইহার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিলেন। গ্রামের লোকের নিজেদের যে ৩০ বিঘা জমিতে তাঁহারা যৌথ চাষ করিয়াছিলেন তাহার উৎপন্ন ধান্য তাঁহারা নিজেদের পরিবারের খাওয়ার জন্য খরচ না করিয়া ঐ ধান্য ভাগ করিয়া লইলেন ও উহার চাউল তৈয়ারি করিয়া তাহা ঐ ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন ও বলিলেন যে এখন তাঁহাদিগকে ঐ চাউলের বদলে ধান দেওয়া হউক ও তাঁহাদের ধানভানার যে মজুরী পাওনা হয় তাহাও তাঁহাদিগকে দেওয়া হউক। তাহা হইলে ঐ ধানের চাউল প্রস্তুত করিয়া আবার তাহা তাঁহাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবেন। তাহা হইলে

তাঁহাদিগকে আর অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকিবে না। ইহাতে ধনী ব্যক্তিরা আশ্চর্যবোধ করিলেন। যাহা হউক, এইরূপ ব্যবস্থা কিছুদিন চলিবার পর গ্রামের লোককে পুনরায় পূর্ববৎ ধানভানার কাজ দেওয়া হয়। এই সবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক গ্রাম পরিবারের মত জীবন নির্বাহ করিবার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাঁহারা স্থির করেন যে গ্রামের লোকেরা যে যাহা উপার্জন করিবেন তাহা হইতে টাকা প্রতি চারি আনা (শতকরা ২৫ ভাগ) গ্রামসভার হাতে অর্পণ করিবেন। আর বেশী উপার্জন করিলেও কেহ দৈনিক ১৲ টাকার অতিরিক্ত গ্রহণ করিবেন না। এই প্রকারে গ্রামসভার হাতে যে অর্থ জমিতে থাকে তাহা হইতে যে সব পরিবারে উপার্জনকারীর তুলনায় পোষ্যসংখ্যা বেশী তাঁহাদিগকে সাহায্যদান করা হইত। তাহাতে গ্রামের সকলের পক্ষে সমানভাবে জীবন নির্বাহ করা সম্ভব হয়। গ্রামের লোকের সততার পরিচয় পাইয়া অনুপস্থিত ভূস্বামিগণ অনেকে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের জমি গ্রামরে লোককে পুনরায় ভাগচাষ করিতে দেন। ১৯৬০ সালে ৬৫ একর জমিতে যৌথ চাষ করা হইয়াছিল। জাপানী প্রথায় চাষ করা হয়। তাহাতে ধানের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গ্রাম বস্ত্র-স্বাবলম্বী হইয়াছে। গ্রামে ৫৫টি অম্বর চরকা ও প্রায় ২৫০টি সাধারণ চরকা চলিতেছে। প্রতিমাসে প্রায় দেড়মণ সুতা উৎপন্ন হয়। উহার পরিবর্তে গ্রামের লোক গ্রামের সমবায় দোকান হইতে নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র পাইয়া থাকেন। এক্ষণে গ্রামের গঠনকার্যের জন্য গ্রামের সামূহিক তহবিলে গ্রামের প্রত্যেক শ্রমিক তাহার প্রাপ্ত মজুরী হইতে প্রতিমাসে দুইদিনের মজুরী দিয়া থাকেন। প্রতি কাটুনী প্রতিমাসে দুই গুণ্ডী করিয়া সুতা দিয়া থাকেন। যাঁহারা ধান-ভানার কাজ করেন তাঁহারা প্রতিমণের জন্য প্রাপ্ত মজুরী হইতে ৩ ছটাক করিয়া চাউল দিয়া থাকেন। ঐভাবে গ্রামের সামূহিক তহবিলে প্রায় ৩০ হাজার টাকা জমিয়াছে। গ্রামের লোক প্রতিমাসে অন্তত একবার করিয়া গ্রামের সার্বজনীন কার্যে শ্রমদান করিয়া থাকেন। ঐভাবে শ্রমদানের দ্বারা বহু ইট প্রস্তুত করা ও পোড়ানো হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা গ্রামে অনেকগুলি গৃহনির্মাণ করা হইয়াছে। যাহাদের ঘর ছিল না, এমন কয়েকটি পরিবারের

গৃহনির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরন্তু কয়েকটি সামূহিক ঘরও নির্মিত হইয়াছে—যথা গ্রামসভার কার্যালয়, ধানের গুদাম, যৌথ চাষের জন্য পশুশালা, পাঠশালাগৃহ ও সভাগৃহ। গ্রামের ব্যাপার পরিচালনা করিবার জন্য সাতজন সদস্যবিশিষ্ট গ্রামস্বরাজ্য সমিতি ও এগারজন সদস্যবিশিষ্ট সর্বোদয় সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। উহাতে সর্বসম্মতিক্রমে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গ্রামটিতে যে গ্রাম-পরিবারসুলভ জীবনের কিছু বিকাশ সাধিত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে ঐ গ্রামের নিষ্ঠাবান গ্রামসেবক শ্রীনবনকিশোর চৌধুরীর নিজ ত্যাগশীল জীবনের মহৎ প্রেরণা রহিয়াছে। তিনি নিজেকে গ্রামের অন্যতম অধিবাসীস্বরূপ গণ্য করিয়া নিজ বেতনের অধিকাংশ গ্রাম-তবহিলে অর্পণ করিয়া আসিতেছেন ও গ্রামের লোকের সহিত নিজেকে এক করিয়া দিয়াছেন।

একথা সত্য যে, যে সব গ্রামদানী গ্রামে গঠনকার্য চলিতেছে তাহার মধ্যে কোন গ্রাম এখনও পর্যন্ত এমনভাবে গড়িয়া উঠে নাই যাহাকে গ্রামস্বরাজের নমুনাস্বরূপ জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরা যাইতে পারে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র সর্বোদয়ের বিপরীত প্রবাহ চলিতেছে। যেখানে প্রবাহ বিপরীত দিকে বহিতেছে সেখানে এক বা একাধিক নিখুঁত নমুনা সৃষ্টি করিয়া দেখানো সম্ভব নয়। মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের সৃষ্টি হয় সত্য, কিন্তু তাহা পৃথিবীর সর্বোত্তম উর্বর ভূমির নমুনাস্বরূপ প্রদর্শন করিবার যোগ্য হয় না। যাহা হউক, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়াও দুই-চারিটি গ্রামদানী গ্রাম যে গ্রাম-পরিবার ও গ্রাম-স্বরাজ্যের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, তাহাতে সকলের মনে আশার সঞ্চার হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রামদানী গ্রামকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব কাহার? গ্রাম গ্রামদান হইবার পর গ্রামদানী গ্রামে গঠনকার্যের দায়িত্ব কাহার লওয়া উচিত? উপরে উপরে বুঝিলে মনে হইতে পারে যে ইহা বিনোবাজী বা সর্বসেবা সংঘের দায়িত্ব। কিন্তু বিনোবাজী বলেন, যে এরূপ কেন হইবে? গ্রামদান সমস্ত দেশের হিতের জন্য। সুতরাং গ্রামদান হইবার পর সেই গ্রামের উন্নতির কথা চিন্তা করার দায়িত্ব সমগ্র দেশ গ্রহণ করিবে না কেন? এরূপও মনে হইতে পারে যে

সর্বোদয়-সমাজ বা গ্রাম-স্বরাজ্যের নমুনা সৃষ্টি করিয়া দেখানোর দায়িত্ব মূলত বিনোবাজীর বা তাঁহার সহকর্মিগণের। কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে ইহাও ভুল ধারণা। কার্লমার্ক্স্ সাম্যবাদের বিচার-ধারা জগতের সম্মুখে রাখেন। কিন্তু কেহ এরূপ বলেন নাই যে কার্লমার্ক্স্ সাম্যবাদের নীতি-পদ্ধতি অনুসারে এক নমুনা সৃষ্টি করিয়া দেখান, তবে তাহা গ্রহণ করা হইবে। সাম্যবাদের ভাবধারা যাঁহাদের ভাল লাগিয়াছে বা লাগিবে তাঁহারা তদনুসারে দেশ গঠন করিবার দায়িত্ব লইয়াছেন বা লইবেন। সর্বোদয়ের ক্ষেত্রে সেরূপ হইবে না কেন? সেরূপ প্রত্যাশা করা কি অযৌক্তিক?

গ্রামদানের পর গ্রামে যদি কোন গঠনকার্য নাও হয় তথাপি শুধু গ্রামদানের এক স্বতন্ত্র মূল্য আছে। সেই মূল্য হইতেছে ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জন। বিনোবাজী বলেন—"আমি জনগণের মধ্যে এই ভাবধারা জাগ্রত করিতে চাহিতেছি যে, ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জন দিতে হইবে। যদি গ্রামে গ্রামে লোক ইহা বুঝিয়া গ্রামদান দিতে থাকে তবে সেখানে আমরা ভালভাবে গঠনমূলক কাজ করিতে না পারিলেও গ্রামদানের যে স্বতন্ত্র মূল্য আছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না।" তিনি আরও বলেন—"স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমরা স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে পারি বা না পারি, স্বাধীনতার নিজেরই এক স্বতন্ত্র মূল্য আছে ও থাকিবে। সেরূপ ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনে ভূদান, সম্পত্তিদান, গ্রামদান প্রভৃতি যে সব দান পাওয়া যাইতেছে তাহার উপযুক্ত ব্যবহার আমরা করিতে পারি বা না পারি, ঐ সব দানেরই এক স্বতন্ত্র মূল্য আছে।"

॥ ১৪ ॥ প্রেম ও আত্মত্যাগবৃত্তির বিকাশ

আপাতদৃষ্টিতে জগৎ স্বার্থপর বলিয়া মনে হয়। যেদিকে তাকানো যায় স্বার্থপরতা, ঈর্ষা ও হিংসার লীলা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে স্বার্থের সংঘর্ষ ও পরস্পরের প্রতি কেবল ঈর্ষা ও হিংসার বিকট প্রকাশ। এই অবস্থায় এত

অল্প সময়ের মধ্যে সমস্যার তুলনায় নিতান্ত কম হইলেও এত বিরাট পরিমাণ ভূমি ভূদানযজ্ঞে প্রাপ্ত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইল?

মানুষের মধ্যে যেমন লোভ, হিংসা ও ঈর্ষা দেখা যায় তেমনি সাথে সাথে তাহার মধ্যে আত্মত্যাগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে দেখা যায়। নিজের জীবনে ধীরে ধীরে হিংসা, ঈর্ষা ও লোভের ক্ষয়সাধন করিয়া অহিংসা ও প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রযত্ন মানুষ করিয়া আসিয়াছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য এইখানেই। পশু প্রারম্ভে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। কিন্তু হিংসা-শক্তির ক্ষয় ও প্রেম-শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া মানুষ নিজের মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। এইখানেই মানবসভ্যতার প্রকৃত বিকাশ সাধিত হইয়াছে। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মানুষের যে নমুনা এখনও দৃষ্টিগোচর হয়, আন্দামানের গহন বনে জরওয়াজ নামক মনুষ্য জাতির যে-হিংস্র মূর্তি দেখা যায় তাহা হইতে উপরোক্ত উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোন কোন মানুষ প্রেম ও আত্মত্যাগ বৃত্তিতে এতদূর পর্যন্ত উন্নীত হইয়াছেন, যাঁহাদিগকে 'নরনারায়ণ', 'ঈশ্বরের অবতার' পর্যন্ত আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। ইহা বিশেষ ক্ষেত্র হইলেও ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে মানুষ নিজেকে কতদূর পর্যন্ত বিকশিত করিতে পারে।

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে প্রেম ও অহিংসা প্রতিষ্ঠায় মানবসভ্যতার বিকাশ এখন পর্যন্তও পরিবারের স্তরে সীমাবদ্ধ আছে। এজন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্যাগ ও প্রেমের বিকাশ সদাই দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণত নিজের পরিবার-পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লোকে নিজের পরিবার-স্বজনের জন্য কতই না ত্যাগ করে, কতই না দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকে। ঘরে ঘরে প্রেম ও ত্যাগের অনুপম মনোবৃত্তি ছড়াইয়া রহিয়াছে। মাতা-পিতা পুত্র-কন্যার জন্য, সন্তান মাতা-পিতার জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য ও স্বামী স্ত্রীর জন্য যে-আত্মত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া থাকে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যদি মানুষ সারা গ্রামকে নিজের পরিবার বলিয়া গণ্য করিতে পারে—যদি মানুষ দরিদ্রকে নিজের পরিবারের একজন ও দরিদ্র ভূমিহীনকে নিজের পরিবারের অন্যতম অংশীদার বলিয়া

গণ্য করিতে পারে তবেই ভূদানযজ্ঞ অবিলম্বে পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষ যত সংস্থা সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তন্মধ্যে পরিবার-সংস্থা মহত্তম। এখানে মানুষ অন্যের জন্য ত্যাগ ও দুঃখকষ্ট বরণ করিতে, অন্যের মধ্যে নিজেকে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করিতে এবং অন্যকে নিজের বিকাশ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু মানব-সভ্যতার প্রগতি ঐখানেই বন্ধ হইয়া রহিয়াছে; কারণ মানুষ পরিবারের মধ্যে আত্মত্যাগ ও আত্মবিকাশের যে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাকে পরিবারের মধ্যে, নিজ পুত্র-পরিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে—তাহাকে গ্রাম বা সমাজে সম্প্রসারিত করে নাই। তজ্জন্য ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য মানবসভ্যতাকে—প্রথমত ভারতীয় সভ্যতাকে—উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা। ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য—পরিবারের পরিধির ধারণাকে সম্প্রসারিত করা, প্রেম ও ত্যাগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা; গ্রামকে, সারা সমাজকে নিজের পরিবার বলিয়া গণ্য করা ও দরিদ্রকে—দরিদ্রভূমিহীনকে নিজের ষষ্ঠ পুত্র বলিয়া গণ্য করা। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আমি কেবল এইমাত্র চাহিতেছি যে, আপনারা আপনাদের সন্তানের প্রতি যেমন স্নেহ পোষণ করেন সেইরূপ স্নেহমমতা যেন অন্যের সন্তান-সন্ততির প্রতিও পোষণ করেন।" মানুষের আত্মার শক্তি, মানুষের প্রেম ও আত্মত্যাগের শক্তি অপরিসীম। কিন্তু বর্তমানে নিজের পরিবার-পরিজনের সীমার বাহিরে তাহা সুপ্ত। এই সুপ্ত শক্তিকে কিরূপে জাগ্রত করা সম্ভব?

এই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে প্রথমে জনমানসে চিন্তাবিপ্লব বা বিচার-বিপ্লব আসা আবশ্যক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বোধের ভিত্তির উপরই বর্তমান সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। এজন্য এই বিচার-বিপ্লব হইবে—জন-মানস হইতে স্বামিত্ববোধ দূর করায়। কিরূপে এই বিচার-বিপ্লব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে?

যেমন আত্মার শক্তি অপরিসীম তেমনি বিচার বা চিন্তার শক্তিও অপরিসীম। কোন চিন্তাধারা কোন এক মানুষের অন্তরে এমন লাগিয়া যায় যে, উহা তাহার জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে। দেখা যায় কোন কোন শ্রেষ্ঠ মানুষের বিচারধারায় এমন শক্তি নিহিত থাকে যে, তাহা অন্য মানুষের

জীবনে—শুধু তাহা নহে সমগ্র সমাজজীবনেই আমূল পরিবর্তন আনিয়া দেয়। ইহার জন্য বিচারধারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ভূদানযজ্ঞের অন্তর্নিহিত বিচারধারা সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও উহা ভারতীয় সমাজের বর্তমান অবস্থায় যাহা আশু প্রয়োজন তাহারই অনুকূল। এই বিষয়টি আরও একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। সাধারণভাবে ধর্মপ্রচার করা এবং অহিংস-ক্রান্তি (যাহাকে বিনোবাজীর কাজ সম্পর্কে বলিতে গিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ধর্মচক্র-প্রবর্তন বলিয়াছেন) সৃষ্টি করা দুইটি পৃথক ব্যাপার। মুনি-ঋষিগণ তো সর্বদা ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন ও তাহা প্রচারও করিয়া থাকেন। কিন্তু সময়ের প্রয়োজন কি, যুগের দাবী কি—তাহা চিনিয়া লইয়া তাহার সহিত ধর্ম-বিচার যুক্ত করিয়া দেওয়া ভিন্ন কথা। উহাই ক্রান্তির পথ। উহাই ধর্মচক্র-প্রবর্তনের পদ্ধতি। সৎ-পুরুষ আসেন এবং নিত্য প্রয়োজনের জন্য ধর্ম-প্রচার করিয়া থাকেন। ইহা চিরদিনই হইতেছে। তাহাতে ব্যাপকভাবে কোন হৃদয় পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যখন কোন ধর্ম-বিচার যুগের দাবীর অনুকূল হইয়া উহার সহিত যুক্ত হয় তখন ব্যাপকভাবে হৃদয়-পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। এজন্য গান্ধীজী দেশকে সামুদায়িক অহিংসার পথে লইয়া যাইতে সক্ষম হন। বিরোধীর সহিত সপ্রেম আচরণ করা ও অহিংসার পথে দ্বন্দ্ব করা পুরাতন কথা। কিন্তু তখন যুগের দাবী ছিল স্বরাজ। তাই তিনি যদি উহাকে স্বরাজের সহিত যুক্ত না করিতেন তবে তিনি আর কয়জন অনুগামী পাইতেন? ইংরেজ বিরাট শক্তিশালী ও অস্ত্রবলে বলীয়ান ছিল। আমরা নিরস্ত্র। এজন্য অহিংসপন্থায় ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু শুধু তাহাতেই হইত না। দেশের পরিস্থিতিও উহার অনুকূল ছিল। ঐভাবে অন্তরে ধর্ম-বিচারের বল ও বাহিরে পরিস্থিতির বল—এই উভয়কে যুক্ত করিয়া তিনি দেশকে অহিংসার শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ ভূমিহীন দরিদ্রের আজ ভূমি চাই, কেবলমাত্র এই দেশে নহে দুনিয়ায়—বিশেষত এসিয়া মহাদেশে। জমি না পাইলে কিছুতেই তাহারা শান্ত থাকিবে না—পরিস্থিতি এই। ইহার সঙ্গে আজ এক ধর্মবোধ জাগ্রত হইতেছে—ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। ক্ষুধার্ত ভূমিহীন প্রতিবেশীকে ভূমি

দেওয়া চাই। সকলকেই স্বাধীনভাবে উৎপাদক-শ্রম করিতে দিতে হইবে। তবেই প্রকৃত শান্তিময় সাম্য আসিবে। উৎপাদক-শ্রমের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা চাই। যদি পাঁচশত, হাজার বৎসর পূর্বে এই ধর্মবিচার করা হইত তবে কেহ তাহা শুনিত না। কিন্তু আজিকরা পরিস্থিতি এই ধর্ম-বিচার শুনিবার ও অনুসরণ করিবার অনুকূলে। এই ধম-বিচারের শক্তি ও বর্তমান পরিস্থিতির শক্তি একসঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। বাহিরের পরিস্থিতির ফলে ধর্ম-বিচার সহজে হৃদয়ে ক্রিয়া করে ও তাহাতে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আবার হৃদয় পরিবর্তিত হইলে উহার ফলস্বরূপ বাহিরের পরিস্থিতিও প্রভাবিত হয়। একে অন্যের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করিতে থাকে। যেমন ফল হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে ফল।

কিন্তু এই বিচারধারা সমাজে ব্যাপকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আর একটি জিনিসের প্রয়োজন। এই বিচারধারা কে প্রবর্তন করিতেছেন? একমাত্র উচ্চাঙ্গের শুদ্ধ জীবনই অন্য জীবনকে শোধন ও উন্নীত করিবার প্রেরণা ও শক্তি দান করিতে পারে। যদি পৃথিবীতে একজন মাত্র খাঁটি সত্যাগ্রহী থাকেন, তবে তাঁহার প্রভাব সারা পৃথিবীর উপর পড়িয়া থাকে এবং সারা পৃথিবীর হৃদয় তাঁহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে। তবে তাঁহার হৃদয়ে সারা দুনিয়ার প্রতি প্রেম থাকা চাই। আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন মানুষের আবির্ভাব হয়—জগত-কল্যাণই যাঁহার একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্য, যাঁহার জীবনে অন্যের সুখবিধানের জন্য আত্মত্যাগ ভিন্ন আর কিছু নাই, যাঁহার প্রেম সর্বব্যাপী হইয়াছে এবং যিনি 'আত্মোপম্য'-বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ যিনি সর্বজীবের সুখ-দুঃখ নিজেরই সুখ-দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন এবং যিনি সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন—সোজা কথায় যিনি প্রকৃত সত্যাগ্রহী। এরূপ মানুষকে আমরা মহাপুরুষ, মহাত্মা ইত্যাদি আখ্যা দিয়া আমাদের অন্তরের পরম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকি। এরূপ মানুষের আহবানে, তাঁহার দর্শনে, তাঁহার বাণী শ্রবণে আমাদের অন্তর্নিহিত ত্যাগবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হয়, আমাদের সুপ্ত আত্মশক্তি জাগ্রত হয়, আমাদের অন্তরস্থিত সংকীর্ণতার বন্ধন ছিন্ন হয় ও আমাদের অন্তরের নির্বাপিত আলো প্রজ্বলিত হয়। তিনি যে চিন্তাধারা মানুষকে গ্রহণ করিবার জন্য আহবান করেন তাহা মানুষের জীবনে অচিরে

অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। তিনি ত্যাগ বা দুঃখ-কষ্ট বরণের জন্য আহবান করিলে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মানুষ ত্যাগব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজ-কল্যাণের পথে অগ্রসর হয় এবং সমাজে ক্রান্তি (বিপ্লব)* আনয়ন করে। এমন

---

*হিন্দীতে 'বিপ্লব' শব্দের পরিবর্তে 'ক্রান্তি' শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষায় 'বিপ্লব' অর্থে 'ক্রান্তি' শব্দের ব্যবহার এখনও করা হয় নাই। আমার মনে হয় বাংলা ভাষায়ও 'বিপ্লব' শব্দের পরিবর্তে 'ক্রান্তি' শব্দ প্রচলিত হওয়া উচিত। কারণ ঐ দুইটি শব্দের অর্থের তুলনা করিলে বুঝা যাইবে যে 'ক্রান্তি' শব্দই সঠিক ভাবব্যঞ্জক। 'বিপ্লব' শব্দ 'প্লু' ধাতু হইতে উদ্ভুত। উহার অর্থ 'প্লবন' বা 'প্লাবন'। উহার ভাব নেগেটিভ, বা নঞ বোধক। 'বি' উপসর্গের যোগে উহার নেগেটিভ ভাব (নঞ্) আরও ভালভাবে ফুটিয়া উঠে ও ধ্বংসাত্মক ভাব সূচিত হইয়া থাকে। কারণ 'বি' উপসর্গ 'বিশেষ' 'বৈরূপ্য' ও 'নঞ্' বাচক। উপরন্তু উহাতে হিংসার অস্তিত্বের আভাসও আসে। এজন্য 'বিপ্লবের' আভিধানিক অন্যান্য অর্থ—'উপদ্রব', 'বিদ্রোহ'. 'অস্ত্র-কলহ', 'অব্যবস্থা' ইত্যাদি। অন্যদিকে 'ক্রান্তি' শব্দ 'ক্রম্' ধাতু হইতে উদ্ভুত। উহার অর্থ হইতেছে 'গতি'। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সূর্যের গতি-পথকে 'ক্রান্তি' বলে। সূর্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে যাওয়ার নাম 'সংক্রমন' বা 'সংক্রান্তি'। খ-গোল মধ্যবর্তী সূর্য-গমনার্থ তির্যগ গোল রেখার নাম ক্রান্তি। এই রেখায় সূর্যের বার্ষিক গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই গতির ফলে এক ঋতুর পর অন্য ঋতুর উদয় হয়, পুরাতন বর্ষের পর নূতন বর্ষের আবির্ভাব হয়; বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে হইতে অয়নাংশ অতিক্রান্ত হইয়া থাকে এবং অতঃপর যুগ পরিবর্তন হয়। এজন্য ক্রান্তি শব্দের সাধারণ অর্থ—এক অবস্থা হইতে বিরাট পরিবর্তনের দ্বারা অন্য অবস্থা প্রাপ্তি। এক অবস্থা অতিক্রম করিয়া অন্য অবস্থায় উপনীত হওয়ার ভার ইহাতে আছে। বিনাশ সাধন করা ইহার ভাবার্থে নাই অর্থাৎ ইহা পজিটিভ (বিধায়ক)। সূর্যের ক্রান্তির দ্বারা প্রথমে ঋতু পরিবর্তন, পরে বর্ষ পরিবর্তন, বর্ষের পর বর্ষ যাইতে যাইতে অয়নাংশ পরিবর্তন ও সর্বশেষে যুগ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তেমনি ক্রান্তি প্রথমে মানুষের চিন্তায়, পরে বাক্যে ও পরে কার্যে উদিত হয়। ক্রান্তিকারক কার্য প্রথমে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে ও পরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে বিকাশ হয় এবং অবশেষে উহা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য বাংলা ভাষায়ও বিপ্লবের স্থলে ক্রান্তি শব্দ ব্যবহার করা শ্রেয়। এজন্য এই পুস্তকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপ্লবের স্থলে 'ক্রান্তি' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

একজন মহামানব সম্প্রতি আমাদের মধ্যে ছিলেন তিনি হইতেছেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার আহবানে সারা ভারত ত্যাগ-মন্ত্রে ও দুঃখ-কষ্ট বরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উথলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগামী আচার্য বিনোবা ভাবের মধ্যে অনুরূপ বিভূতির বিকাশ হইয়াছে। এজন্য তাঁহার প্রবর্তিত বিচার এত অল্পদিনের মধ্যে সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের লোক গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে। দেশের বালক-বালিকারা পর্যন্ত ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয় সম্পর্কে জানিয়া গিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে দেশের অনেক স্থানে উহা ক্রান্তিকারক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের বিরাট সমস্যার তুলনায় নিতান্ত অল্প হইলেও অল্প-দিনের মধ্যে লোকে প্রেমভরে তাঁহার হস্তে লক্ষ লক্ষ একরের উপর ভূমি সঁপিয়া দিয়াছে।

এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে মনন ও অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই যে মহাত্মা ও মহাপুরুষের কথা উপরে বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তিনি কে? আত্মা অনন্ত গুণসম্পন্ন। আত্মা অনন্ত শক্তিতে ভরা। সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের সেই পরিস্থিতি-উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য আত্মার এমন এক গুণ বা শক্তির বিকাশ হওয়ার আবশ্যকতা আসে যাহার আবির্ভাব পূর্বে হয় নাই। তখন আত্মার সেই বিকাশ সাধিত হয় এবং মানুষের হৃদয়ে সেই শক্তি বা গুণের আবির্ভাব হয়। ইহার অন্ত নাই। যখনই প্রয়োজন আসিবে তখনই আত্মায় তদুপযোগী গুণের বিকাশ সাধিত হইবে এবং সমাজের কাজ চলিতে থাকিবে। এ পর্যন্ত আত্মার যত গুণ বা শক্তির বিকাশ হইয়াছে তাহাই শেষ, আর কোন নূতন গুণ বা শক্তির বিকাশ হইবে না—এরূপ মনে করা সংকীর্ণতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। আত্মার গুণ বা শক্তির ঐ আবির্ভাবকে বিনোবাজী অবতার আখ্যা দিয়াছেন। যে যুগপুরুষের মাধ্যমে ঐ গুণ বা শক্তির আবির্ভাব ও বিকাশ হয় তিনি প্রকৃতপক্ষে অবতার নহেন, তিনি নিমিত্তমাত্র। তাই বিনোবাজী বলিয়াছেন, "অবতারের অর্থ মানব হৃদয়ে শক্তির আবির্ভাব হওয়া। যেখানে সত্যনিষ্ঠার আবির্ভাব হইল সেখানে উহা রামচন্দ্রের রূপ গ্রহণ করিল। যেখানে নিষ্কাম কর্মযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল সেখানে উহা শ্রীকৃষ্ণের রূপ

গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধের মধ্যে করুণা মূর্তিমতী হইল; এজন্য আমরা বুদ্ধকে অবতার বলিয়া মান্য করিলাম। ইন্দ্রিয়ের কারণে আমরা মনুষ্যকে অবতার বলিয়া মান্য করিয়া থাকি। দেখিবার মত কিছু ইন্দ্রিয়ের জন্য আবশ্যক হয়। এইজন্য উহা রূপ সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাম, কৃষ্ণ বা বুদ্ধ অবতার নহেন। সত্যনিষ্ঠা, নিষ্কাম কর্মযোগ এবং ভূতদয়ার অবতার সেই সেই ক্ষেত্রে হইয়াছিল। ঐসব ক্ষেত্রে এরূপ মানবতার যে-যে গুণ ও শক্তি আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাই অবতার। কিন্তু মানুষ তাহাতে মূর্তিপূজা আরোপ করিল। উহাতে উপাসনার সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু শরীর অবতার নহে; মানব হৃদয়ে আবির্ভূত ভাবাবলীই অবতার। যেমন-যেমন আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হইতে থাকিল তেমন-তেমন উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অবতারের আবির্ভাব হইতে লাগিল। উহাই সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়া। ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিয়া তাহাদের শাসন কায়েম করিল। তাহারা এক চমকপ্রদ ব্যাপার দেখাইল। সমগ্র দেশকে নিরস্ত্র করিয়া দিল। তখন দেশের সম্মুখে এক সমস্যা দেখা দিল। হয় সারা দেশকে চিরদিন ইংরেজের গোলাম হইয়া থাকিতে হইবে, না হয় তাহাকে এমন শক্তি আবিষ্কার করিতে হইবে, যে-শক্তিবলে বিনা অস্ত্রে সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হইবে ও দেশকে মুক্ত করিতে পারা যাইবে। পরিস্থিতি বশত যখন এমন প্রয়োজন দেখা দিল তখন অহিংস প্রতিকার ও সত্যাগ্রহের আবিষ্কার হইল। মহাত্মা গান্ধী উহার নিমিত্তমাত্র হইলেন। আমি কয়েকবার একথা বলিয়াছি—যদি মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব না হইত তবে তাঁহার স্থলে অন্য কাহারও আবির্ভাব হইত। ঐ শক্তির আবিষ্কারের জন্যই উহা হইত। প্রয়োজন ছিল—ঐ শক্তিরই আবির্ভাবের। কেননা পরিস্থিতি ও কালের চাহিদা ছিল তাহাই। লোকে দেখিল যে, অহিংসা এক বিরাট শক্তি যাহার সহায়ে এত বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত বিরোধ করিতে পারা সম্ভব হইল এবং উহাকে ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। উহার এক চমৎকার ফল এই হইল যে, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। অত্যাচারী আর অত্যাচারী রহিল না। একে অন্যের বন্ধু হইল। এই প্রকার শক্তির আবির্ভাব হইল এবং তাহার দ্বারা আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলাম। স্বাধীনতার জন্য অনেক দেশই অনেক প্রকার

প্রযত্ন করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ইহা বিশেষ আবিষ্কার। কারণ ইহাতে মানব-হৃদয়ে নবশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর এখন ভারতের আর্থিক স্বাধীনতা, দারিদ্রতা নিবারণ ও সাম্যযোগ প্রতিষ্ঠার কার্য উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে তদুপযোগী শক্তির আবিষ্কার হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেই শক্তির আবির্ভাব হইতেছে।" সেই শক্তির নাম 'সর্বোদয়'। সর্বোদয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যে বুনিয়াদী শক্তির প্রয়োজন তাহা আজ সন্ত বিনোবাজীর মাধ্যমে বিকশিত হইতেছে। এ যুগের অবতার হইতেছে 'সর্বোদয়'। বিনোবাজী নিমিত্তমাত্র। একথা বলা ঠিক হইবে না যে যাহা এ পর্যন্ত হয় নাই তাহা ভবিষ্যতে কিরূপে হইবে।

এই বিষয়টি আরও একভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যখনই ঐরূপে আত্মার শক্তির আবির্ভাব হইবার প্রয়োজন হয় তখনই ভগবান তাহা এক মন্ত্ররূপে প্রদান করিয়া থাকেন। বিনোবাজী বলেন যে, মন্ত্রই হইতেছে প্রকৃত অবতার। যে বিশিষ্ট মনুষ্যের মাধ্যমে ঐ মন্ত্র ফলবতী হইয়া থাকে তাঁহাকে আমরা অবতার বলিয়া মানিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নিমিত্তমাত্র অবতার।

যখন ইহা বুঝা গেল যে, দেশের সকল দুঃখের মূল পরাধীনতা এবং কেবলমাত্র ছোট ছোট দুঃখ দূর করিলে চলিবে না তখন দাদাভাই নৌরজী স্বরাজের মন্ত্র দেশের সম্মুখে রাখিলেন। তখন হইতে ঐ মন্ত্রের সাধনা হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এক বিরাট শক্তিশালী জাতি এই দেশ শাসন করিতেছিল। তাহাদের হাতে অস্ত্র ছিল। আর এই দেশকে তাহারা নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। তাই মহাত্মা গান্ধী সামুদায়িক অহিংসার ভিত্তিতে 'ভারত ছাড়' মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। উহা বিরাট গণ-আন্দোলনে পরিণত হইল। সরকার উহাকে দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। মনে হইয়াছিল যে, আন্দোলন দমিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইল না। মন্ত্রকে কখনও দমন করা যায় না। উহার পশ্চাতে দর্শন থাকে, শক্তি থাকে। উহা সূর্য-কিরণের ন্যায় সর্বত্র পেঁছায় ও সকলের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ঐ মহান্ মন্ত্রোচ্চারণের পাঁচ বৎসর পরে ইংরেজকে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল। মন্ত্র ফলবতী হইল, আমরা স্বরাজ লাভ করিলাম। এক মন্ত্রের

পূর্তি হইল এবং ভগবান আমাদিগকে অন্য মন্ত্র প্রদান করিলেন। সমাজের কাজ এইরূপে চলিতে থাকে।

মন্ত্রের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"পরমেশ্বর এক পরমতত্ত্ব। ঐ তত্ত্ব হইতে মন্ত্র স্ফুরিত হইয়া থাকে। মন্ত্র হইতে মহাপুরুষগণ প্রেরণা লাভ করেন। মহাপুরুষদের বিচার সমাজকে চেতনা দান করিয়া থাকে। পরমেশ্বর প্রেরণার ক্ষেত্র ও মন্ত্রের মূল। মন্ত্ররূপে পরমতত্ত্ব প্রকটিত হয়। এক অবতারের কাজ পূর্ণ হইয়া গেলে দ্বিতীয় অবতারের আবির্ভাব হয়। ইহাতে সংসার সকল সময়ের জন্য সতেজ থাকে। ইহা ঈশ্বরের লীলা। রামচন্দ্রের সময় এক মন্ত্র আসিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সময় দ্বিতীয় মন্ত্র আসিল। বুদ্ধের সময় আসিল তৃতীয় মন্ত্র। এইভাবে মন্ত্রের পর মন্ত্র পাওয়া গেল এবং পৃথিবীর উন্নতি হইতে থাকিল।

"এক মন্ত্র অন্য মন্ত্রের জন্ম দিয়া চলিয়া যায়। এইভাবে বীজ হইতে ফল হয় এবং ফল হইতে বীজ হয়। এক বীজ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং আর একটি বীজ অংকুরিত হয়। এইরূপে এক মন্ত্র পূর্ণ হয় এবং অন্য মন্ত্রের আবির্ভাব হয়। পৃথিবীতে কোন বস্তুর নাশ হয় না। ইহা বিজ্ঞানের শিক্ষা। স্বরাজমন্ত্ররূপ অবতারের পূর্তি হইয়া গেল। তখন মহাত্মা গান্ধী আর একটি মন্ত্র দেশকে প্রদান করিলেন। তিনি ঐ মন্ত্র পূর্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার নাম 'সর্বোদয়'। ঐ মন্ত্রের বীজ স্বরাজ-আন্দোলনের মধ্যে বপন করা ছিল। স্বরাজ-প্রাপ্তির পর উহা অংকুরিত হইয়াছে।"

সর্বোদয়ের রূপ বিরাট ও ব্যাপক। উহার এক-এক ভাগ লইয়া আমরা কাজ করিতে পারি। ভূমি-সমস্যা সর্বোদয়ের বুনিয়াদ। আজ বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের মন্ত্র দেশকে দিয়াছেন।

॥ ১৫ ॥ ভারতে আত্মজ্ঞানের বিকাশ

এই প্রসংগে আর একটি বিষয় গভীরভাবে বুঝা আবশ্যক। ভূদানযজ্ঞ সত্যের উপর আধারিত এক মহান বিচার বা সিদ্ধান্ত এবং সেই বিচার দেশের বর্তমান জরুরী প্রয়োজনের অনুকূল। উপরন্তু উহার প্রবর্তক ও প্রচারক আত্মত্যাগী ও বিশ্বপ্রেমিক এক সন্ন্যাসী মহাপুরুষ। কেবলমাত্র এই তিনটি

কারণ যুগপৎ বিদ্যমান থাকাতেই কি এত অল্পদিনের মধ্যে ভূদানযজ্ঞের এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছে? অথবা এই তিন কারণ ছাড়া এমন আর কিছু আছে যাহার জন্য ইহা সম্ভব হইতে পারিয়াছে?—হ্যাঁ, তাহাই। ভারতের চরিত্রে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যেজন্য ভারতীয় জনগণ ভূদানযজ্ঞকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে। তাহা হইতেছে এই যে, ভারতের হৃদয় অর্থাৎ ভারতীয় মানুষের হৃদয় নির্মল ও অবিকৃত আছে। মহাত্মা গান্ধী এইকথা বলিতেন, বিনোবাজীও বলিতেছেন। এইজন্য ভূদানযজ্ঞের বিচার জনসাধারণকে এত সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে বুঝানো সম্ভব হইয়াছে এবং উহা এত সহজে গণহৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। হৃদয় পবিত্র ও অবিকৃত থাকার লক্ষণ কি? আমরা মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধির দ্বারা কোন বিষয় বুঝিয়া থাকি। কিন্তু কোন সৎ বিচার বুঝিলে বা উহার সম্বন্ধে জ্ঞান হইলেই মানুষমাত্রই তদনুসারে আচরণ করে না। কেবলমাত্র যাহার হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল সেই ব্যক্তিই উহার সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার সংগে সংগে তদনুরূপ আচরণ করিতে থাকে। এতদিন সে-ব্যক্তি যে তদ্রূপ আচরণ করে নাই তাহার একমাত্র কারণ এতদিন ঐ সম্পর্কে তাহার জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞতা ছিল। কিন্তু যাহার হৃদয় নির্মল ও স্বচ্ছ নহে সেই ব্যক্তিকে উহা বুঝাইলে সে বুদ্ধি দিয়া উহা বুঝিবে কিন্তু সহজে সে তদনুরূপ আচরণ করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে তাহার যে জ্ঞান তাহা হইবে শাব্দিক জ্ঞানমাত্র। ঐ জ্ঞান তাহার হৃদয়ের উপর সহজে ক্রিয়া করে না। অন্যকে নিজের মত করিয়া দেখা ও তাহার প্রতি তদনুরূপ আচরণ করা 'আত্মৌপম্য'-বৃত্তি। প্রতিবেশীকে নিজের মত করিয়া দেখা ও তদনুরূপ আচরণ করা সর্বোদয়ের মূল কথা এবং উহাই ভূদানযজ্ঞের প্রেরক ভাবনা। ইহার সারমর্ম এই যে, আমরা যেন নিজেকে একটিমাত্র দেহে সীমাবদ্ধ বলিয়া না ভাবি। আমাদের প্রতিবেশী, শুধু তাহা নহে, সারা সমাজ আমাদের নিজেদের ব্যাপক রূপ। সাধারণভাবে ভারতীয় মানুষের হৃদয় নির্মল ও শুদ্ধ। কিন্তু তাহার আত্মজ্ঞান সংকুচিত হইয়া রহিয়াছে, কারণ তাহাকে আত্মজ্ঞানের ব্যাপকতা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।

আমাদের মুনি-ঋষিগণ ব্যক্তিগত ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন কিন্তু সামুদায়িক ধর্ম শিক্ষা দেন নাই; তাই ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল থাকা সত্ত্বেও

ভারতের পক্ষে এতদিন সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে এই 'আত্মজ্ঞান'-ধর্ম আচরণ করা সম্ভব হয় নাই। বিনোবাজী বলেন—"আমি গ্রামে গ্রামে যাইয়া একই কথা বুঝাইতেছি। উহার সার এই—নিজেকে দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া ভাবিবেন না। ভারতে এরূপ বেদান্তের প্রচার কম হয় নাই। আত্মা সর্বব্যাপক —এই কথা তো এই দেশের সব লোকে মুখে বলে। কিন্তু শাব্দিক জ্ঞান এক কথা আর সেই বিচারের প্রয়োগ জীবনে করা অন্য কথা। ভারতবর্ষে শাব্দিক জ্ঞান এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে যে, কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে নহে পরন্তু প্রাণীমাত্রেই একই আত্মা বিরাজমান ইহা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আত্মা এতই সংকুচিত হয় যে, কেবলমাত্র নিজের শরীর ও উহার আশপাশ ভিন্ন সে আর কিছু চিন্তা করে না। ভারতের আত্মজ্ঞান এতদূর সংকুচিত হইয়াছে। মা নিজের সন্তানের জন্য ত্যাগ করেন; কারণ সন্তানের মধ্যে তিনি নিজের স্বরূপ দেখেন। তাঁহার আত্মজ্ঞান তাঁহার সন্তান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। মা নিজের সন্তানকে স্নেহ করেন কিন্তু অন্যের সন্তানের প্রতি তাঁহার স্নেহ নাই; কারণ তাহার মধ্যে তিনি নিজের আত্মাকে অনুভব করেন না। মুখে বলিতে যাইলে তো আত্মজ্ঞানের কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু মা অনুভব করেন যে তাঁহার আত্মা কেবল তাঁহার নিজের সন্তান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। সংস্কৃতে ছেলেকে সন্তান বা সন্ততি বলা হয়। সন্ততি অর্থাৎ বিস্তার। মা বুঝিয়া থাকেন যে, সন্তান আমারই বিস্তার, আমারই রূপ। এই পর্যন্ত তাঁহার আত্মজ্ঞান সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখন হইতে তাঁহার এই জ্ঞান হওয়া চাই যে নিজের রূপ এত ছোট নহে; উহা ব্যাপক।" আজ ভূদান-যজ্ঞের মাধ্যমে ভারতবাসীকে তাহার আত্মজ্ঞানের বিস্তারসাধন করার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং এজন্য যেখানে গভীরভাবে কাজ করা হইতেছে সেখানে লোকে অতি শীঘ্র ভূদানযজ্ঞকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতেছে। অবশ্য ইহার পশ্চাতে মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষার মহান্ পটভূমিকা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভূদানযজ্ঞের বিচার মহাত্মা গান্ধীপ্রদত্ত শিক্ষার ভিত্তির উপরই গড়িয়া তোলা সৌধ।

ভারতের আত্মজ্ঞানের বিকাশসাধন সম্পর্কে বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন —"কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, আমাদের হৃদয়ে তেমন খারাপ কিছু নাই।

যদি তাহা থাকিত তবে ভূদানযজ্ঞের এত ব্যাপক প্রচার হইত না। এইজন্য আমি মনে করি যে, ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল আছে। কিন্তু আমাদের আত্মজ্ঞান সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। শিশুদের হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল থাকে কিন্তু উহাদের জ্ঞান থাকে না। এজন্য তাহারা অন্যকে কষ্ট দিতে পারে। কুকুর অন্য কুকুরের নিকট হইতে খাবার কাড়িয়া লয়; কারণ উহার আত্মজ্ঞান অত্যন্ত সংকুচিত। উহার নিজের দেহের জ্ঞান আছে কিন্তু আত্মার জ্ঞান নাই। শিশুদের অবস্থাও এইরূপ। কেবলমাত্র খাওয়ার কথা শিশুরা জানে। যেখানে উহাদিগকে আত্মার জ্ঞান শিখাইয়া দেওয়া হয় সেখানে উহারা তাহা বুঝিয়া লয়। আমি দেখিয়াছি যেখানে পিতামাতা শিশুদিগকে আত্মজ্ঞান এইভাবে শিক্ষা দেন যে, নিজের জিনিস অন্যকে দিতে হয়, সেখানে তাহারা অন্যকে কিছু দিতে আনন্দ পায়। শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া দেহেই সীমাবদ্ধ থাকে। দেহ অপেক্ষা বড় কিছু সে ভাবিতে পারে না; কারণ তাহার আত্মার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু যখনই তাহাকে আত্মার জ্ঞান বুঝাইয়া দেওয়া হয় তখনই উহা সে বুঝিয়া লয়। উহার সংস্কারের আবশ্যকতা থাকে। সেইরূপ ভারতের হৃদয় শুদ্ধ, নির্মল কিন্তু তাহার সংস্কারের প্রয়োজন রহিয়াছে। ভারতবাসীকে ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে যে, 'ভাই, তুমি নিজেকে দেহেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছ। উহা ভুল। সমগ্র সমাজ আত্মার ব্যাপক রূপ; নিজেরই সন্ততি।'—এই কথা বুঝাইয়া বলাতে লোকে বুঝিতেছে। ইহা আমার অনুভব।"

ভারতবাসীর আত্মজ্ঞান সম্পর্কে বিনোবাজীর যে দুইটি প্রবচনের অংশ উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। তাহা এই। বিনোবাজী এক স্থানে বলিতেছেন—ভারতে বেদান্তের প্রচার কম হয় নাই। আত্মা সর্বব্যাপক—এই কথা তো এই দেশের সব লোক মুখে বলে। শুধু মানুষের মধ্যে নহে—এমন কি প্রাণীমাত্রেই এক আত্মা বিদ্যমান। কিন্তু উহা শাব্দিক জ্ঞানমাত্র। এজন্য উহা হৃদয়ের উপর ক্রিয়া করে নাই। কিন্তু অন্যস্থানে তিনি বলিতেছেন—আমাদের আত্মজ্ঞান সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল আছে। এই কারণে ভূদানযজ্ঞের বিচারের মাধ্যমে ভারতের জনসাধারণকে আত্মজ্ঞানের

শিক্ষা দেওয়া মাত্র উহা তাহাদের হৃদয়ের উপর এত তাড়াতাড়ি ক্রিয়া করিতেছে। একটু গভীরভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলে ইহাতে যে কোন অসামঞ্জস্য নাই তাহা বুঝা যাইবে। আত্মা সর্বব্যাপক—ইহা শিক্ষা দেওয়া বা এই জ্ঞান হওয়া এক কথা; আর এই আদর্শকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার প্রক্রিয়া ও কৌশল শিক্ষা দেওয়া পৃথক কথা। মা যদিও তাঁহার শিশুকে এই শিক্ষা দেন যে, শুধু মানুষের মধ্যে নহে—প্রাণীমাত্রেই একই আত্মা বিরাজিত, তথাপি শিশু অন্য প্রাণীকে কষ্ট দিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। কিন্তু মা যদি শিশুকে শিক্ষা দেন যে, নিজের জিনিস অন্যকে দিয়া তবে নিজে খাইতে হয়, তবে শিশু সেইমত আচরণ করিতে থাকিবে। সাধারণভাবে এক মহান্ আধ্যাত্মিক আদর্শ শিক্ষা দিলে মানুষ যদিও উহা মুখে বলিতে ও মনে অনুভব করিতে শিখিবে কিন্তু তাহার হৃদয় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল থাকা সত্ত্বেও তাহা সে জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সহজে শিখিতে পারে না। আত্মজ্ঞানের মহান্ আদর্শের প্রয়োগ কিভাবে জীবনে করা যায় তাহা শিক্ষা দেওয়াই এখানে আত্মজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত অর্থ। এজন্য ভারতে বেদান্তের ব্যাপক প্রচার হওয়া সত্ত্বেও এবং ভারতের হৃদয় স্বচ্ছ ও নির্মল থাকা সত্ত্বেও বেদান্তের জ্ঞান শাব্দিক জ্ঞানেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু যখনই ভূদানযজ্ঞের বিচারধারার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান প্রসারিত করার শিক্ষা প্রচারিত হইতে থাকিল তখনই ভারত তাহা এত শীঘ্র ও সহজে তাহার ব্যবহারিক জীবনেও গ্রহণ করিতে পারিতেছে।

এখানে আর একটি কথা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। বিনোবাজী বলিয়াছেন যে ভারতের লোকের হৃদয়ে তেমন খারাপ কিছু নাই এবং তাহা এখনও শিশুদের হৃদয়ের মত স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল আছে। এজন্য এদেশে ভূদান-যজ্ঞের এত ব্যাপক প্রচার হওয়া সম্ভব হইয়াছে। শিশুদের হৃদয়কে স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল বলিবার অর্থ কি? উপরন্তু শিশুদের ন্যায় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল হৃদয়ে কেন ও কিরূপে ভূদানযজ্ঞের প্রচার ব্যাপক হওয়া সম্ভব হইয়াছে তাহাও বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। শিশুদের হৃদয় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল—ইহার অর্থ এই যে শিশুর হৃদয়ে কোনও সংস্কারের ছাপ এখনও পড়ে নাই। উহা কোমল। উহা ট্যাবুলা র‍্যাজা অর্থাৎ উহা পরিষ্কার, দাগশূন্য

শেলটের মত। কোন সংস্কারের ছাপ না পড়িলেও তাহা সংস্কারপ্রবন হইয়া থাকে। একদিক হইতে ইহা বিপজ্জনক অবস্থা। কারণ যেমন তাহা উত্তম সংস্কার সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে, তেমনি খারাপ সংস্কারের ছাপ তাহাতে পড়া সহজ। অর্থাৎ সুযোগমত যে কোন সংস্কারের ছাপ উহাতে তাড়াতাড়ি পড়িতে পারে। ভারতবর্ষের লোকের হৃদয় এখনও শিশু-হৃদয়ের মত স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও নির্মল রহিয়াছে। অর্থাৎ এদেশের লোকের মধ্যে এখনও কোনদিকে দৃঢ় সংস্কার জন্মে নাই। সামূহিক ধর্ম অর্থাৎ আত্মার ব্যাপকতা বোধের সংস্কার জন্মে নাই অথবা বিপরীত দিকে ভৌতিকবাদেরও সংস্কার তাঁহাদের হয় নাই। কিন্তু ভারতের অন্তস্তলে ধর্মের বুনিয়াদ আছে। তবে তাহা ব্যাপক আত্মজ্ঞানের আধ্যাত্মিকতা নহে। তাহা হইলেও উহা সামূহিক ধর্ম তথা ব্যাপক আত্মজ্ঞানের বিচারধারা গ্রহণ করিবার পক্ষে যে খুবই অনুকূল ইহাতে সন্দেহ নাই। ভূদানযজ্ঞের বিচার সামূহিক ধর্মের উপর আধারিত। যদি ভারতকে শীঘ্র ভূদানযজ্ঞের বিচারধারা গ্রহণ করানো না হয় তবে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে ভারতবর্ষ অধিকদিন সংস্কারহীন হইয়া থাকিতে পারিবে না। উহাতে ব্যাপক আত্মজ্ঞানের ছাপ না পড়িলে ভৌতিকবাদ (মেটিরিয়া-লিজম্) এর উপর আধারিত সাম্যবাদের ছাপ পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কারণ এই দুই বিচারধারার মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ চলিবার যুগ আসিতেছে। সুতরাং ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয় আন্দোলন সফল হওয়া যে কিরূপ জরুরী তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

॥ ১৬ ॥ ক্রান্তির অভিব্যক্তি ও ক্রম

তিনটি ক্রমে 'বিপ্লব' বা 'ক্রান্তির' অভিব্যক্তি হয়। প্রথমে চিন্তায়, অতঃপর বাক্যে এবং অন্তিমে আচরণে বা কার্যে। আবার তিনটি পর্যায়ে ক্রান্তির পরিণতি ঘটিয়া থাকে। উহা প্রথমে কোন বিশিষ্ট বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনে, অতঃপর বহুব্যক্তির জীবনে এবং অন্তিমে উহা সমাজদেহে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে হৃদয় পরিবর্তন, পরে ব্যক্তিগত জীবন পরিবর্তন ও অবশেষে সমাজজীবনের পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। বিনোবাজী তাঁহার এক ভাষণে এই সম্পর্কে অনুপমভাবে বলিয়াছেন—"যে-

কোনও ক্রান্তি প্রথমে চিন্তায় সংঘটিত হয়; পরে উহা বাক্যে প্রকাশিত হয়, সংকল্পের রূপে আসে। অতঃপর কার্যে উহার বিকাশ হয়। কার্যও প্রথমে ব্যক্তিগত থাকে এবং পরে সামূহিক হয়। অতঃপর উহার উপর সারা সমাজের মোহর অঙ্কিত হইয়া যায়। এইভাবে ধর্ম-বিচার প্রথমে কোন কোন লোকের চিত্তে অংকুরিত হয় এবং পরে উহা সারা সমাজে স্মৃতি বা আইনের বিধান-রূপে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। তখন উহাকে রূঢ় আচার বা ধর্মনিষ্ঠা-রূপে মানা হয়। আমি এক উদাহরণ দিতেছি। আজ চুরি করা অন্যায় বলিয়া গণ্য করা হয়। সারা সমাজ এবং আইন উহার বিরোধী। কিন্তু চুরির বিরুদ্ধে আইনের বিধান আছে বলিয়া যে লোকে চুরি করে না একথা ঠিক নহে। চুরি করা যে মানবতা বিরোধী ইহা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি মানিয়া লইয়াছে। এই কারণে ধর্মস্মৃতি ও আইন—উভয়েই উহা স্থান পাইয়াছে। গোড়ায় এই বিচারধারা ছিল না। কিন্তু যখন নীতি-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইল তখন নিষ্ঠাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। আমি সামাজিক নিষ্ঠার একটি উদাহরণ দিলাম। ঐরূপ নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি রাখিতে নাই, অধিক কিছু জমাইয়া রাখা উচিত নহে। চুরি করার ন্যায় অধিক সংগ্রহ করাও পাপ—এই ধর্ম-বিচার আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই বিচার নূতন নহে, ইহা বহু পুরাতন। মহর্ষিগণ নিজেদের জীবনে উহা প্রয়োগ করিতেন। ব্যক্তিগতভাবে উহা নিজ জীবনে আচরণ করিয়াছেন এমন মহাত্মা এবং সাধুসন্ত ছিলেন। কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে চুরির বিরুদ্ধে যেরূপ মনোভাব, পরিগ্রহের বিরুদ্ধে সেরূপ দৃঢ় ও তীব্র মনোভাব নাই। সেরূপ মনোভাব এক্ষণে সৃষ্টি করিতে হইবে। এইজন্য আমি এই আন্দোলনের নাম দিয়াছি 'ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন'। কেননা ইহাতে এক বিচারধারাকে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অসংগ্রহ ও অপরিগ্রহকে কেবলমাত্র ঋষি ও সাধুসন্ন্যাসীদের পক্ষে আচরণীয় গুণ বলিয়া মানা হইয়াছে। তদ্রূপ সাধারণ লোকের জন্যও, গৃহস্থদিগের জন্যও উহা জীবনের মূলাধার হওয়া চাই। ইহাব্যতীত শোষণ কিছুতেই দূর করা যাইবে না। এই ধর্মবিচার সামাজিক নিষ্ঠারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহার আরম্ভ হইবে বিচার ক্রান্তিতে এবং ইহার পরিণতি হইবে সামাজিক ক্রান্তিতে।" এরূপে শান্তির পথে সদ্‌ভাবনা জাগ্রত করিয়া ক্রান্তি সৃষ্টি

করা ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের চরম লক্ষ্য। তিনি বলেন—"আমি ন্যায় ও প্রেম উভয়কে একত্রিত করিতে চাহিতেছি। ইহাকে সূর্য-চন্দ্র বলা যায়। উহা ঈশ্বরের দুই চক্ষু। ঐ দুই চক্ষু একসঙ্গে মিলিত হইলে তেজ পরিপূর্ণ হয়।"

॥ ১৭ ॥ ভূদানযজ্ঞের মূলতত্ত্ব ও সামূদায়িক ধর্ম

ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয়ের মূল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পূর্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা গিয়াছে যে উহা কোন খণ্ড বিচার নহে। উহা হইতেছে জীবনের সামগ্রিক মহান্ সিদ্ধান্ত ও জীবনে উহার প্রয়োগের উপায়। বৈদিক ধর্মের সার ইহার মধ্যে নিহিত আছে এবং তাহাই সূত্রাকারে "ঈশাবাস্য" মন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে। "ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।" জগতে যাহা কিছু আছে সবই ঈশ্বরময়, সবই ঈশ্বরের। তিনিই একমাত্র মালিক। ইহা বুঝিয়া আমাদের সব কিছুই তাঁহাকে সমর্পণ করা চাই এবং যাহা কিছু তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে তাহা তাঁহার প্রসাদ গণ্য করিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এখানে আমার কিছু নাই, সবই ভগবানের—এই ভবনা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যে-ব্যক্তি এইভাবে জীবনযাপন করিবে কাহারও ধনে তাহার অভিলাষ থাকিবে না। ঈশ্বর-সমর্পণ, যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ, ঈর্ষা না করা ও ধনের লালসা না করা—ইহা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম-বিচার ও তাহা সাধনের উপায়। ইহাকেই সামূ-দায়িক ধর্মস্বরূপ সমাজনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের দেশে অনেক সাধু-সন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সাধুরা ধ্যান-জপ আদি শিক্ষা দিয়াছেন; কিন্তু সামূদায়িক ধর্ম কি তাহা তাঁহারা শিক্ষা দেন নাই। এ সম্পর্কে প্রজা-সমাজবাদী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণজী যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। "আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন—'আপনি যে বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন, সে বিষয়ে মুনি-ঋষিগণ তো বহু করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে সমাজের পরিবর্তন হয় নাই কেন?' তাহার উত্তরে আমি বলিব—'তাঁহাদের অসফলতার কারণ এই যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত একাঙ্গী ছিল।

তাঁহারা কেবল ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, খারাপ যাহা-কিছু সব ব্যক্তিরই মধ্যে। বুদ্ধের নিদান এই যে, তৃষ্ণাই সব দুঃখের মূল। একদিকে ইহা সত্য। কিন্তু একটি ছেলে রাজার ঘরে জন্মিল এবং আর একটি ছেলে গরীবের ঘরে জন্মিল—ইহার কারণ তো তৃষ্ণা নহে। এই প্রকারে আমরা সমাজবাদী-সমাজ পরিবর্তনের উপর বেশী দৃষ্টি দিয়া থাকি। মুনি-ঋষিরা মনে করিতেন অন্তরেই সর্বকিছু; আর আমরা মনে করিয়া থাকি বাহিরেই সর্বকিছু। আমার মতে এই দুই বিচারই একাঙ্গী-দোষে দুষ্ট। আমি চাই এই দুই-এর সমন্বয় হউক। যদি ইহার কোন একটিকে আমরা ছাড়িয়া দেই, তবে উত্তম সমাজ রচনা করিতে পারিব না। উভয়কে ধরিয়া থাকিলে তবে ভাল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইবে।"

মহাত্মা গান্ধী দেশকে সামুদায়িক ধর্মে শিক্ষাদান করিতে ব্রতী হন। ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক জীবন যে এক ও অবিভাজ্য তাহা বুঝাইয়া দিয়া তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সততা ও অহিংসা প্রয়োগের শিক্ষাদান করেন এবং অহিংস সমাজরচনার উদ্দেশ্যে দেশকে প্রস্তুত করিবার জন্য গঠনমূলক কার্যের ব্যবস্থা করেন। জীবনের এক ক্ষেত্রে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা সহজসাধ্য হইবে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ হইয়াছিল। কিন্তু তখনকার বিশেষ পরিস্থিতিতে সে অহিংসা ছিল দুর্বলের অহিংসা, অসহায় লোকের অহিংসা। এজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মনে করিলে ভুল করা হইবে। এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উহা প্রয়োগের আর অবকাশ নাই। দেশ ও কালের পরিস্থিতির প্রয়োজনে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অহিংসা প্রয়োগের সুযোগ আসিয়াছে। গান্ধীজীর অবর্তমানে সেই মহান্ কার্যের ভার ভগবান বিনোবাজীর হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই সামুদায়িক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় কি? আজ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার মাধ্যমে ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব কি? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই ধর্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বিচার ও আচারে মহান্ ক্রান্তি সৃষ্টি করিতে হইবে। রাষ্ট্রশক্তি বিচার-বিপ্লব বা নিষ্ঠা-বিপ্লব সৃষ্টি করিতে

অক্ষম। রাষ্ট্রশক্তি অনুসরণকারী মাত্র হইতে পারে; সমাজে উহা পথ-প্রদর্শন-কারী হইতে পারে না। কোন মৌলিক ভাবধারা সৃষ্টি করা উহার সাধ্যাতীত। যখন কোন বিচার মানুষের বিবেকবুদ্ধি মানিয়া লয় ও আচরণে উহা অনুসৃত হইতে থাকে কেবলমাত্র তখনই রাষ্ট্র আইনের বিধান করিয়া উহাতে ছাপ মারিয়া দিতে পারে এবং দণ্ডশক্তির বলে উহা সার্বজনীন কার্যে পরিণত করিতে পারে। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"বিচার-প্রচার তো নেতৃবৃন্দ ও বিচার প্রবর্তকগণের কাজ। ক্রান্তিকারক বিচার যখন লোকে মানিয়া লয় তখন সরকারকে উহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হয় এবং যদি সরকার তাহা না করে তবে সরকারের পরিবর্তন হয়। '0' শূন্যের যেরূপ মূল্য, সরকারকে আমি তদ্রূপ মূল্য দিয়া থাকি। জনশক্তির সহিত সরকারের শক্তি মিলিত হইলে তবেই সরকারের মূল্য বড় হইতে পারে। যখন বিচার ছড়াইয়া পড়ে তখন ঐ বিচারের অনুকূলে রাজ্য গঠিত হয়। নচেৎ রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত হয়। মার্কস্ বিচার প্রবর্তন করিলেন, তখন লেনিনের নেতৃত্বে রুশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হইল। রুশো ও ভল্টেয়ার প্রবর্তিত বিচার-ক্রান্তির ফলে ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। আমি মনে করি, আমার বিচারধারার ভিত্তিতে জনমত গঠিত হওয়া মাত্র সরকার তাহা মানিয়া লইবেন। যদি না মানেন তবে সরকার খতম হইয়া যাইবে এবং তাহাতে আমার দুঃখ হইবে না।"

॥ ১৮ ॥ সর্বোদয়প্রেমীর কর্তব্য

কেহ কেহ বিনোবাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি বাহিরে রহিয়াছেন কেন এবং রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই কেন। তাহার উত্তরে বিনোবাজী এক সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইয়া বলেন যে, তাঁহার কাজ রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের কোন্ পথে চলা উচিত সেই পথ রাষ্ট্রকে দেখাইয়া দেওয়া ও সেইপথ ঠিক করিয়া দেওয়াই তাঁহার কাজ।—"দুইটি বলদ গরুর গাড়ীতে জোতা রহিয়াছে। আমি যদি তৃতীয় বলদ হইয়া গাড়ীতে কাঁধ দেই, তবে তাহাতে গাড়ীর কী আর সুবিধা হইবে? তাহার চাইতে যে-পথে যাওয়া উচিত সেই রাস্তা যদি একটু ঠিক করিয়া

দিতে পারি তবে গাড়ীর সব চাইতে বেশী উপকার আমি করিতে পারিব।” তিনি রাষ্ট্রশক্তির নাম দিয়াছেন—‘দণ্ডশক্তি’। বিনোবাজী বলেন—“আজ আমাদের যে-রাজসরকার আছে তাহার হাতে আমরা ‘দণ্ডশক্তি’ সঁপিয়া দিয়াছি। হিংসা ঐ ‘দণ্ডশক্তির’ অংশীভূত হইয়া রহিয়াছে। তথাপি আমরা উহাকে ‘হিংসা’ বলিতে চাহি না। উহাকে হিংসা হইতে পৃথক শ্রেণীতে রাখিতে চাই। আমরা উহাকে হিংসাশক্তি হইতে ভিন্ন ‘দণ্ডশক্তি’ বলিতে চাই, কেননা সমগ্র জনগণ ঐ শক্তি সরকারের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এইজন্য উহা অবিমিশ্র হিংসাশক্তি নহে। উহা ‘দণ্ডশক্তি’।”

॥ ১৯ ॥ রাষ্ট্রনায়কগণের করুণ অবস্থা

বিনোবাজী মনে করেন যে, দেশের রাষ্ট্রনায়কদের অহিংসার উপর শ্রদ্ধা আছে। তাঁহাদের হৃদয় অনুভব করে যে, অহিংসা ব্যতীত কোন সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না। কিন্তু যখন তাঁহারা বুদ্ধি দিয়া চিন্তা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্বের কথা বিবেচনা করিয়া অহিংসার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে সাহস পান না। বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারা কাজ করেন। তাঁহাদের বুদ্ধি তাঁহাদিগকে বলিয়া দেয়—‘আমরা সৈন্যদল তুলিয়া দিতে পারি না। আমরা যে-জনগণের প্রতিনিধি সেই জনগণ তেমন শক্তিমান নহেন, বিনা সৈন্যবলে তাঁহাদের চলিবার যোগ্যতা নাই। এই-জন্য তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপে আমরা এই দায়িত্ব বোধ করি যে, আমাদিগকে সৈন্যদল সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও মজবুত করিতে হইবে।’ এইরূপে তাঁহাদের হৃদয় এক কথা মানে কিন্তু তাঁহাদের বাস্তব পরিস্থিতি-প্রভাবিত-বুদ্ধি উল্টা কথা বলিয়া দেয়। হৃদয় ও বুদ্ধির বিরোধের বিপাকে পড়িয়া অসহায় অবস্থায় তাঁহাদিগকে সৈন্যবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাঁহাদের হৃদয় রচনাত্মক কার্যে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধি চরকা বা অন্যান্য গ্রাম্যশিল্প যুদ্ধযন্ত্র মজবুত করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিতে সাহস পায় না। ইহা তাঁহাদের ভণ্ডামি নহে; ইহা তাঁহাদের নিতান্ত করুণ অবস্থা। বিনোবাজী বলিয়াছেন—“আত্মনিরীক্ষণপূর্বক আমি ইহা বলিতেছি যে, যাঁহারা আজ দায়িত্বের আসনে বসিয়া রহিয়াছেন তাঁহাদের আসনে যদি আমরা বসিতাম

তবে আজ তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা হইতে যে বিশেষ অন্যরূপ আমরা করিতে পারিতাম, এমন নহে। ঐ স্থানই এমন! উহা যাদুর আসন। ঐ আসনে যে বসিবে তাহার উপর এক সংকুচিত, সীমাবদ্ধ, অস্বাভাবিক ও অস্বাধীন গণ্ডীর মধ্যে চিন্তা করিবার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। যাহাকে আমি অস্বাধীন নাম দিয়াছি সেই বদ্ধস্থানে পড়িয়া অসহায় অবস্থায় দুনিয়ার স্রোত যেদিকে বহিতেছে বলিয়া দেখা যায়, সেই দিকে তাকাইয়া চিন্তা করিবার দায়িত্ব তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসে।" এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? বিনোবাজী বলিয়াছেন—"দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা এই কথা বলেন—'আমরা যে-কাজ করিতেছি সে-কাজ আপনারা করিবেন না। ঐ কাজে আপনারা আবদ্ধ হইবেন না। বরং আমরা যে অভাব বোধ করিতেছি তহা যদি আপনারা পূরণ করিতে পারেন তবে তাহা করুন'।" বিনোবাজী বলেন, "এই আশায় তাঁহারা আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। ইহা আমাদিগকে ঠিকমত বুঝিতে হইবে এবং ঐ দৃষ্টিতে আমি যাহাকে 'স্বতন্ত্র লোকশক্তি' বলিয়া থাকি সেই 'স্বতন্ত্র লোকশক্তি' যেরূপে নির্মাণ করা যায় সেই কাজে সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা রাষ্ট্রশক্তিকে প্রকৃত সহায়তা দান এবং দেশের সমুচিত সেবা করিতে পারিব।"

॥ ২০ ॥ দণ্ডনিরপেক্ষ জনশক্তি

এই স্বতন্ত্র লোকশক্তি কি? ইহা রাষ্ট্রশক্তি বা দণ্ডশক্তি নহে। উহা দণ্ডশক্তি হইতে ভিন্ন। উপরন্তু উহা হিংসার বিরোধী। বিনোবাজী চাণ্ডিল সর্বোদয় সম্মেলনে ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ক্রান্তি প্রথমে চিন্তায় উদয় হয় এবং অবশেষে উহা কার্যে বা রূঢ় আচরণে পরিণতি লাভ করে। উপরন্তু ক্রান্তিমূলক আচরণ প্রথমে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ও অন্তিমে উহা সমগ্র সমাজে সমাজনিষ্ঠারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ক্রান্তির এই চরম পরিণতি যখন রূঢ় আচরণে এবং সমগ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাই হয় 'স্বতন্ত্র লোকশক্তি'র অভিব্যক্তি। শান্তি ও প্রেমের পথেই ইহা করা সম্ভব। উহা সমাজের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা-মাত্র নহে। উপরন্তু রূঢ় সামাজিক নিষ্ঠামূলক সুপ্রতিষ্ঠিত আচরণে উহা

প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় সার্বজনীনভাবে উহার আচরণ করা আইনের বিধানের উপর নির্ভর করিবে না। শান্তির পথে বিচার-প্রচারের দ্বারা লোকের মধ্যে এমন মনোভাব সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে আইন হউক আর নাই হউক, লোকে বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তদনুসারে কার্য করিবে। সুতরাং লোকে জমি বাঁটোয়ারাও করিয়া লইবে। এই প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"কোন আইনের কারণে কি মাতা সন্তানকে দুগ্ধ পান করান?" ইহা হইতে আমরা অহিংস ক্রান্তি বা জনশক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম। হিংসা তো দূরের কথা, দণ্ডশক্তি প্রয়োগ করিবার অবকাশও যেন না থাকে এইরূপ পরিস্থিতি সমাজে সৃষ্টি করিতে হইবে এবং তাহা করা সর্বোদয় অনুরাগীদের কার্য। বিনোবাজী বলেন—"যদি আমরা উহা করি তবে বুঝিতে হইবে যে, আমরা আমাদের স্বধর্ম চিনিয়া লইতে পারিয়াছি এবং তদনুসারে আচরণ করিতে শিখিয়াছি। আর যদি আমরা তাহা না করি এবং দণ্ডশক্তির প্রয়োগ-দ্বারা যেটুকু জনসেবা হইতে পারে তাহার প্রতি লালসা পোষণ করি, তবে যে-বিশেষ কার্য আমাদের দ্বারা হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হইয়া থাকে সেই-কার্য আমরা করিতে পারিব না বা সেই আশা আমরা পূর্ণ করিতে পারিব না। বরং আমরা বোঝাস্বরূপ গণ্য হইব—এইরূপ সম্ভাবনা আছে।"

॥ ২১ ॥ সমস্যা সমাধানে আইনের স্থান

আইনের দ্বারা ভূমি-সমস্যার সমাধান করার প্রশ্ন সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন, 'সরকারের উপর আপনার প্রভাব আছে দেখা যায়। যাহাতে সরকার বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি বিতরণের পথ খুলিয়া দেয় এজন্য আপনি সরকারের উপর চাপ দিতেছেন না কেন? আপনার প্রভাব কেন এইদিকে প্রয়োগ করিতেছেন না?"—এরূপ বহুলোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিতে চাই যে—ভাই, আইনের পথে তো আমি বাধা দিতেছি না। আপনারা যেরূপ চাহেন সেদিকে যদি আমাকে আরও এক-পা অগ্রসর হইতে বলেন তবে আমি বলি যে, যে-পথ আমি গ্রহণ করিয়াছি ঐপথে যদি আমি পূর্ণ সফলতা, ষোল আনা ফল না পাই এবং বার আনা—আট আনাও সফলতা পাওয়া যায় তাহাতেও আইন হওয়ার

সুবিধা হইবে। প্রথমত তো আমি আইন প্রণয়নের পথে বাধা দিতেছি না। দ্বিতীয়ত আমি আইন প্রণয়নের সুবিধা করিয়া দিতেছি। উহার জন্য আমি অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছি—যাহাতে আইন সহজে প্রণীত হইতে পারে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আরও এক-পা যদি আমি আপনাদের দিকে অগ্রসর হই এবং প্রচার করিতে থাকি 'আইন ছাড়া এই কাজ হইবে না, আইন করিতেই হইবে' তাহা হইলে আমি স্বধর্মচ্যুত হইয়াছি বলিয়া গণ্য হইব। উহা আমার ধর্ম নহে। বরং ইহা বিশ্বাস করা আমার ধর্ম যে, বিনা আইনের বলে জনতার হৃদয়ে এমন ভাবধারা সৃষ্টি করিতে পারিব যাহাতে কিছুমাত্র আইন না হইলেও লোকে ভূমিবন্টন করিয়া লইবে। কোন আইনের ভয়ে কি মাতা সন্তানকে স্তন্যদান করেন? অতএব মানুষের হৃদয়ে এমন এক শক্তি রহিয়াছে যাহাতে তাহার জীবন সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রেমই মানুষের জীবনে একমাত্র ভরসা। প্রেমে তাহার জন্ম। প্রেমের আওতায় সে লালিতপালিত। আর অবশেষে যখন তাহাকে এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে হয় তখন সে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার চারিদিক দেখিয়া লয় এবং তখন যদি তাহার প্রেমাস্পদ তাহাকে দেখিবার জন্য আসিয়া থাকে তবে সে সানন্দে দেহত্যাগ করিয়া ইহধাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। অতএব প্রেমের এইরূপ শক্তি অনুভব করা সত্ত্বেও উহাকে অধিক সামাজিকরূপে বিকশিত করিবার সাহস না রাখিয়া যদি আইনের জন্য চীৎকার করিতে থাকি, তবে জনশক্তি নির্মাণ করিয়া রাষ্ট্রকে সহায়তা দান করিতে পারিব বলিয়া যে আশা করা হয় তাহা বিফল হইবে। এইজন্য আমি 'দন্ডশক্তি' হইতে ভিন্ন 'জনশক্তি' নির্মাণ করিতে চাহিতেছি। আর আমাদিগকে উহা নির্মাণ করতেই হইবে। এই যে জনশক্তি আমরা রচনা করিতে চাহিতেছি উহা যে দন্ডশক্তির বিরোধী হইবে এমন কথাও নহে; তবে উহা হিংসার বিরোধী। ঐ জনশক্তি দন্ডশক্তি হইতে ভিন্ন।"

এখানে একটি কথা ভালভাবে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। উপরে বিনোবাজীর যে উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে তিনি ভূমি সম্পর্কীয় আইন প্রণয়নের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছেন, যাহাতে সহজে আইন প্রণীত হইতে পারে। ইহা হইতে এরূপ মনে হইতে পারে যে, বিনোবাজী আইন প্রণয়নের পক্ষপাতী। কিন্তু তিনি কেমন করিয়া আইন

প্রণয়নের পক্ষপাতী হইতে পারেন? আইন কেমন করিয়া অহিংসার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত হইতে পারে? এজন্য বিনোবাজী যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা বুঝিতে হইলে আইনের স্বরূপ কি তাহা জানা প্রয়োজন। যে আইন কেবল মাত্র ক্ষমতাধিষ্ঠিত দলের ভোটের জোরে পাশ করাইয়া বিধিবদ্ধ করা হয় তাহার সহিত অহিংসার যে সম্পর্ক নাই তাহা বুঝা কঠিন নহে। কিন্তু সমাজে আইনের অনুকূলে নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হইবার পর যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে সেই আইনকে অহিংস আইন বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রদেশে যে সব মন্দির প্রবেশ আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহার পশ্চাতে যথেষ্ট নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছিল। সংশ্লিষ্ট মন্দিরসমূহে হরিজনদিগের প্রবেশাধিকার দিবার জন্য জনমত আগ্রহশীল ছিল। এমন কি বহুক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত মন্দিরের কর্তৃপক্ষগণও হরিজনদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতে রাজি হইয়াছিলেন কিন্তু আইনগত বাধার জন্য তাঁহারা মন্দিরদ্বার হরিজনদিগের জন্য উন্মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। এরূপ অবস্থায় মন্দির প্রবেশ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় তাহাকে অহিংস আইন বলা যাইতে পারে। আজ দেশে ভূমির মালিকানা ত্যাগ সম্পর্কে অনুকূল আবহাওয়া নাই। ভোটের জেরে সিলিং-এর আইন কোন-কোন প্রদেশে পাশ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার পশ্চাতে সমাজে অনুকূল আবহাওয়া নাই। ভূমির মালিকগণ গোপনে ভূমি আত্মীয়-স্বজনের নামে হস্তান্তর করিয়া ফেলিয়াছেন। উপরন্তু যাঁহাদের সিলিং-নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কম ভূমি আছে তাঁহারাও কি ভূমিহীন দরিদ্রদের সঙ্গে তাঁহাদের ভূমি বন্টন করিয়া ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত? না, তাহাও নহে। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের ফলে লোকের মনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসিতেছে। ভূদানযজ্ঞ যতই অগ্রসর হইবে, ততই সমাজে বিচার পরিবর্তন হইতে থাকিবে। ভূমির সমান বন্টন ও ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জন সম্পর্কে সমাজে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে থাকিবে। তখন অধিকাংশ লোক স্বীয় বিচারবুদ্ধিতে ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ করিবে বা করিতে প্রস্তুত থাকিবে। সেইরূপ পরিস্থিতিতে আইন প্রণীত হইলে সেই আইন অহিংসার বিরোধী হইবে না এবং তদনুসারে কাজ হওয়াও সহজসাধ্য হইবে। উহা কার্যকরী

করিবার জন্য দণ্ডশক্তির প্রয়োজন হইবে না। বিনোবাজী এরূপ আইন প্রণয়নে আপত্তি করিবেন না। এজন্য তিনি আইন সম্পর্কে বলিয়াছেন—"আইন এক ভিন্ন ব্যাপার। হিংসা ও অহিংসা উভয়ের সঙ্গেই উহার সম্বন্ধ। আইনের পিছনে ভৌতিক শক্তি অথবা নৈতিক শক্তি থাকা চাই। আমার কার্যের জন্য এমন এক নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হইতেছে, যাহার দ্বারা সরকারের আইন প্রণয়নে সুবিধা হইবে। সেই নৈতিক আবহাওয়া তৈয়ারী না হওয়া সত্ত্বেও যদি আইন করা হয়, তবে সেই আইন প্রয়োগ করিবার জন্য দণ্ডশক্তির প্রয়োজন হইবে। যদি আমাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য সৈন্য-বলের প্রয়োজন হয়, তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের কী দশা হইবে তাহা মনোযোগের সহিত একবার ভাবিয়া দেখুন।" তিনি আরও বলেন—"লোকে আইন প্রণয়নের কথা তুলিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জানে না যে, আইন তো পশ্চাদনুসরণ করিবেই। আমার কার্যের দ্বারা যে আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে তাহার সাহায্যে সরকারেকে অবশ্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। নচেৎ এই সরকার খতম হইয়া যাইবে। অন্য সরকার আসিবে।"

আইন তৈয়ারী হয় হউক এবং তাড়াতাড়ি হউক। কিন্তু সেইকাজে যদি সর্বোদয় কর্মীরা লাগিয়া যান তবে তাহা তাঁহাদের পক্ষে পরধর্ম আচরণ করা হইবে। বিনোবাজী বলেন—"আমাদের স্বধর্ম হইবে গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করা এবং বিচারের উপর বিশ্বাস রাখা। আমরা ইহা বলিব না—'ওরে, বিচার শুনিলে-শুনাইলে কবে কাজ হয়?' বিচার অন্তরে আসিলেই কাজ হইবে। কারণ আমাদের কাজ বিচার-ধারা বুঝিবার ফলে হওয়া সম্ভব।" কোন বিশেষ সামাজিক আচরণের পশ্চাতে যে বিচার-ধারা থাকে তাহা বুঝিয়া ও তাহা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া লোকে আইন না হইলেও সরকার নিরপেক্ষ-ভাবে যে সামাজিক আচরণ করিয়া থাকে তাহাকে বিনোবাজী 'বিচার শাসন' বলেন।

যাঁহারা সর্বোদয়ের এই দৃষ্টি মান্য করেন না তাঁহাদের কথা মানিয়া লইয়া যদি ইহা মনে করা হয় যে, আইন ব্যতীত ভূমি-সমস্যার সমাধান হইবে না, আইন করিতেই হইবে—তথাপি এখনই কি উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হইবে? প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরা যাউক। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী-

বিলোপ আইন প্রণীত হইয়াছে এবং খাস জমির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (২৫ একর) উহার বর্তমান মালিকের হাতে রাখিয়া অবশিষ্ট জমি সরকার কর্তৃক গৃহীত হইবার আইন প্রণীত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনে করিতেন যে, ঐ আইনের বলে ৪ লক্ষ একর আবাদী ও আবাদযোগ্য ভূমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের জন্য সরকারের হাতে আসিবে। কিন্তু এদিকে ভূমির মালিকগণ আইনের বিধান এড়াইবার জন্য নির্দিষ্ট 'সিলিং'-এর অতিরিক্ত যে ভূমি তাঁহাদের আছে তাহা বেনামে হস্তান্তর করিয়া রাখেন বলিয়া প্রকাশ। এইরূপ হস্তান্তর বন্ধ করিবার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। তথাপি ঐরূপ হস্তান্তর বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, ঐ আইনের বলে সরকারের হাতে ২ লক্ষ ৭০ হাজার একর ভূমি আসিয়াছে। প্রকাশ যে উহার মধ্যে বহু জমি অকেজো। যাহা হউক, যদি সরকার ৪ লক্ষ একর খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের জন্য পাইতেন তবে তাহাতে কী হইত? বর্তমান লোক গণনায় পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১ কোটি সাড়ে ৪০ লক্ষ (১,৪০,৪৬,০৪০)। তাহার মধ্যে ভূমিহীনের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৬০ লক্ষ। ইহা ব্যতীত যাহাদের ৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি আছে তাহাদিগকেও ভূমিহীন দরিদ্র বলিয়া গণ্য করা উচিত। ৪ লক্ষ একর জমি লইয়া উহাদের কয়জনকে ভূমি দেওয়া যাইতে পারিবে? পশ্চিমবাংলার আবাদী ও আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ মোটামুটি ১ কোটি ৪৬ লক্ষ একর। সাধারণভাবে এরূপ অনুমান করা হয় যে, যত জমি আছে তাহার এক-ষষ্ঠাংশ পাইলে দেশের ভূমিহীনদিগকে কিছু-কিছু জমি দেওয়া যাইতে পারে। সেই হিসাবে পশ্চিমবাংলায় মোটামুটি ২৫ লক্ষ একর ভূমির প্রয়োজন। তাই পশ্চিমবাংলার নিকট ভূদানযজ্ঞের প্রেমের দাবী ২৫ লক্ষ একর। আইনের বলে কি এই ২৫ লক্ষ একর ভূমি সরকারের হাতে আসা সম্ভব? বর্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, সরকার ইচ্ছা করিলে এখনই কঠোরতর আইন করিয়া ২৫ লক্ষ একর জমি তাঁহাদের হাতে লইতে পারেন। যদি তাঁহাদের কথা মানিয়া লওয়া যায় তবে ঐ ২৫ লক্ষ একর জমির জন্য প্রতি একরে কমপক্ষে ৬০০৲ টাকা করিয়া ধরিলেও মোট ১৫০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে

দেওয়ার আবশ্যক হইবে। এই টাকা দিবার মত অবস্থা সরকারের আজ নাই এবং নিকট ভবিষ্যতেও হইবে না। সারা ভারতবর্ষে ভূমিহীনদের জন্য ৫ কোটি একর ভূমির প্রয়োজন ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই ৫ কোটি একর ভূমি ক্ষতিপূরণ দিয়া লওয়া আজ সরকারের পক্ষে সম্ভব নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, বিনা ক্ষতিপূরণে ঐ পরিমাণ জমি হাতে লইবার জন্য সরকার এখন বা নিকট ভবিষ্যতে ভারতীয় সংবিধানের আবশ্যকীয় সংশোধন করিতে পারিবেন কি? বর্তমান সমাজব্যবস্থা ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন পর্যন্ত সমাজে এই ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ শিথিল না হয় ততদিন পর্যন্ত সংবিধানের উক্তরূপ সংশোধন হওয়া সম্ভব নহে।

এই প্রসংগে ভূমির সমবন্টন সংক্রান্ত আবশ্যকীয় আইন প্রণয়ন সম্পর্কে আর একটি প্রয়োজনীয় দিক বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। বর্তমানে দেশে যে শাসনব্যবস্থা চলিতেছে তাহা হইতেছে পার্লিয়ামেন্টারী গণতন্ত্র। তাহাতে যে দল পার্লিয়ামেন্টে বা রাজ্য আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন তাঁহাদের হাতে ৫ বৎসরের জন্য শাসনাধিকার আসিয়া থাকে। গণভোটের দ্বারা কেন্দ্রীয় পার্লিয়ামেন্ট ও রাজ্য বিধানসভার সভ্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সার্বজনীন ভোটাধিকার চলিতেছে। ২১ বৎসর বা তদতিরিক্ত বয়স্ক সকলেরই ভোটাধিকার আছে। এই অবস্থায় সমাজ-গঠন ও অর্থনীতি সম্পর্কে যে-দলের যে-আদর্শ থাকুক না কেন, তাঁহাদের পক্ষে জনগণের মনোভাব উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব নহে। আজ জনগণের মনোভাব কি? যদি ৫০, ৩০, ২৫ বা ২০ একরের সিলিং করার প্রশ্ন হয় তাহা হইলে অধিকাংশ লোক হয়তো তাহার অনুকূলে মনোভাব পোষণ করিতে পারেন। কিন্তু যেখানে ভূমির সমবন্টনের প্রশ্ন অথবা ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা নিরাকরণ করিবার প্রশ্ন সেখানে যাঁহার ৩ একর ভূমি আছে তাঁহারও বর্তমান অবস্থায় উহাতে রাজি হইবার মনোভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। উপরন্তু ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা চলিয়া যাইবার পর অন্যান্য সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার উপরও পরবর্তী আক্রমণ আসিতে পারে এই আশঙ্কায় সমাজের অন্য শ্রেণীর লোকেরও বর্তমান অবস্থায় উহার প্রতি আন্তরিক সমর্থন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং এই ভোট লাভের প্রতিযোগিতার যুগে কোন দলই ভূমির সমবন্টনের বা সঙ্গত-বন্টনের আইন

প্রণয়ন করিতে সাহসী হইবেন না। অভিজ্ঞতায়ও সেরূপ দেখা গিয়াছে। কেরলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সরকার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানে কাহারও দ্বারা ভূমি সম্বন্ধে অধিক প্রগতিশীল আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু এই বিষয়ে আর একটি দিকের কথা ভাবিবার আছে। বর্তমানে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত ভারতের যে সম্পর্ক চলিতেছে তাহাতে দেশের অধিকাংশ জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন আইন চাপাইয়া দিয়া জনগণকে অসন্তুষ্ট রাখা কোন সরকারই নিরাপদ বলিয়া মনে করিবেন না। এই অবস্থায় উপযোগিতার দৃষ্টিতেও (এক্স্পিডিয়েন্সি) ভূমির সম বা সঙ্গত বন্টনের পক্ষে ভূদানযজ্ঞই বর্তমানে একমাত্র উপযোগী উপায়।

ভূদানযজ্ঞের ফলে 'ভূমি আমার নয়, সবই ভূমি ভগবানের'—এই বৈপ্লবিক বিচারবোধ যতই সমাজে উত্তরোত্তর বিস্তারলাভ করিতেছে ততই সংবিধানের ক্ষতিপূরণ দান সংক্রান্ত কঠোরতা হ্রাস করিবার পক্ষে নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হইতেছে। ভূদানযজ্ঞ আংশিকভাবে সফল হইলেও তাহাতে এমন এক বৈপ্লবিক বিচারবোধ সমাজে ব্যাপকভাবে জাগ্রত হইবে যাহাতে বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি-সংগ্রহের পক্ষে আইন প্রণয়ন করা সহজ হইবে। ক্রমশ এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হইতে পারে যাহাতে ঐরূপ আইন প্রণয়ন করা অনিবার্য হইতে পারে। একমাত্র ভূদানযজ্ঞ অর্থাৎ সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত বিচার সমাজে এই চিন্তা-বিপ্লব বা বিচার-বিপ্লব আনিতে পারে। অন্য কিছুতে তাহা সম্ভব নহে। হিংসাত্মক উপায়ে ভূমি ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রচার বা আন্দোলন চালাইলে তাহাতে ভয় আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতে চিন্তা-বিপ্লব বা বিচার-বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে না। আইন করিবার জন্য ভয় দেখাইলে বা আইন করিলে বিচার-বিপ্লব আসে না। এজন্য আইনের পথে বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি লইয়া তাহার পুনর্বন্টনের ব্যবস্থা করিতে হইলেও ভূদানযজ্ঞই একমাত্র পন্থা যাহা আইন প্রণয়নের পক্ষে উপযুক্ত নৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে।

তাই ভূমি-সমস্যার সমাধানে আইনের সহিত ভূদানযজ্ঞের তুলনামূলক বিচার করিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে যেঃ—

(১) সরকার আইনের বলে জমি ছিনাইয়া লইতে পারেন কিন্তু জমি লইবার ঐ প্রক্রিয়া মানুষের হৃদয়ে প্রেম সৃষ্টি করিতে পারে না।

(২) ভূদানযজ্ঞের দ্বারা হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন সংঘটিত হয়। কিন্তু আইনে তাহা সম্ভব নহে। বরং তাহাতে কটুতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(৩) ভূদানযজ্ঞের দ্বারা জনতার শক্তি জাগ্রত হইবে এবং তাহা সমাজকে সর্বাত্মক বিপ্লবের পথে অগ্রসর করাইয়া দিবে। আইন সেই শক্তি জাগ্রত করিতে অক্ষম।

শ্রীদাদা ধর্মাধিকারী তাঁহার 'ক্রান্তির পথে' পুস্তিকায় আইনের এই অক্ষমতার কয়েকটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেনঃ—"আমাদের সংবিধান অনুসারে ভারতের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের ততখানি অধিকারই আছে, যতখানি বিজয়লক্ষ্মী, রাজকুমারী অমৃত কাউর এবং সুচেতা কৃপালনীর আছে কিংবা সরোজিনী দেবীর ছিল। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ কি দেখিতেছি? দেশের গৃহলক্ষ্মীরা ঘরের চৌকাঠ পার হইয়া বাহির হইতে পারেন না। আর বাহির হইলেও ঘোমটা দিয়া বা বোরখার আড়ালে বাহির হন। আইন তাঁহাদিগকে অধিকার দিয়াছে বটে কিন্তু শক্তি দিতে পারে নাই। অস্পৃশ্যদের অবস্থাও তাই। কাগজে-কলমে অস্পৃশ্যতা দূরীকৃত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবজীবনে অস্পৃশ্যতা ঠিকই আছে। আইনে মাদকদ্রব্য বর্জনের কথা আছে, কিন্তু মদ্যপান চলিতেছেই।"

(৪) ভূদানযজ্ঞ সমাজে বিচার-ক্রান্তি সৃষ্টি করিবে। ভূদানযজ্ঞের সর্বাপেক্ষা ক্রান্তিকারী সুফল হইতেছে মালিকানা বিসর্জন। আইনের দ্বারা জমি লইতে পারা যাইলেও মালিকানা বিসর্জনের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। কারণ আইনে বিধায়ক শক্তি নাই। খুব বেশী হইলে আইন খারাপ কাজ রোধ করিতে পারে। কিন্তু সৎপ্রেরণা জাগ্রত করিতে আইন অক্ষম।

(৫) ভূদানযজ্ঞে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতেই জমি পাওয়া যায়, কিন্তু আইনে নির্দিষ্ট সিলিং-এর অতিরিক্ত জমিমাত্র লওয়া যাইতে পারে।

ভূদানযজ্ঞ আইন চায় না। ভূদানযজ্ঞ চায় ধনীকে প্রতিবেশী-ধর্মে দীক্ষা দান করিতে, তাঁহার আত্মজ্ঞানের বিকাশ সাধন করিতে এবং তাঁহার আত্মাকে

পরিবারের পরিধির বাহিরে সম্প্রসারিত করিতে। ধনীরা তাঁহাদের পরিবারের বাহিরে যাহারা দরিদ্র আছে তাহাদিগকে নিজেদের পরিবারের অংশীদার স্বরূপ ভাবিতে আরম্ভ করুন। তাঁহাদের পরিবারের বাহিরে যে ভূমিহীন দরিদ্র আছে তাহাকে নিজেদের পুত্র বলিয়া গণ্য করুন ও তাহাকে তাহার অংশ দিন। মা সন্তানকে যখন কোলে তুলিয়া লন তখন মাকে একটু ঝুঁকিতে হয়। আজ ধনী তাঁহার ভূমিহীন দরিদ্র সন্তানকে কোলে তুলিয়া লউন। সেজন্য তাঁহাকে ঝুঁকিতে হইবে অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান কিছু খর্ব করিতে হইবে। যুগের পরিবর্তন হইতেছে। ধনীরা যুগের ইঙ্গিত বুঝিয়া লউন। আজ দরিদ্রের ভগবান জাগ্রত হইয়াছেন। এযুগে ভূমি ধনীর হাত হইতে দরিদ্রের হাতে যাইবেই। প্রশ্ন এই যে কোন্ পথে তাহা যাইবে? আজ যদি প্রেমের পথে, শান্তির পথে ধনী তাঁহার ভূমি দরিদ্রের জন্য অর্পণ করেন এবং মা সন্তানকে স্তন্যপান করাইবার সময় যে পরম আনন্দ অনুভব করেন ধনীও দরিদ্রের জন্য ভূমি অর্পণ করিবার সময় যদি সেইরূপ পরম আনন্দ অনুভব করেন, তবে ধনীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা পাইবে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার সম্মান ও মর্যাদা বর্ধিত হইবে এবং তিনি সমাজের প্রকৃত সেবক ও নেতা হইতে পারিবেন। ধনীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আছে। আজ তাহা সমাজসেবার কাজে লাগিতেছে না। তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি ত্যাগের দ্বারা পূত—পবিত্র হউক। তবেই তাহা গণ-দেবতার অর্চনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হইবে। যুগ পরিবর্তনে তাঁহাদের ভূমি বা সম্পত্তি অধিক থাকিবে না। আজ যিনি রাজা তিনি কাল-প্রবাহের পরিবর্তনে কাল আর বাহিরের রাজা থাকিবেন না। তবে তাঁহারা যেন চিরদিন জন-মানসে রাজর্ষি স্বরূপ বিরাজিত থাকেন। তাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ ও সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। আজ দরিদ্র ভূমিহীন ধূলায় লুণ্ঠিত। ধনীর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ত্যাগের দ্বারা দরিদ্র সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিবে। সমাজে দ্রোহরহিত উৎপাদক-শ্রমের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনীও ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হইয়া জন-হৃদয়ে সম্মানের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে। ইহাই ভূদানযজ্ঞের মুখ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

॥ ২২ ॥ ভারতে দারিদ্র্যের মূল ও বিশ্বপরিস্থিতি

সমাজে দারিদ্র্য কেন? দারিদ্র্য, শোষণ ও ধন-বৈষম্যের মূল কোথায়? উপাদানের আধার, সাধন ও যন্ত্রে উৎপাদকের পূর্ণ অধিকার ও মালিকানা থাকা চাই। নচেৎ উৎপাদককে তাহার উৎপাদক-শ্রম করিবার সুযোগ হারাইতে হয়; অথবা তাহাকে তাহার শ্রমলব্ধ সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ভূমি উৎপাদনের মৌলিক সাধন বা ক্ষেত্র। যে ব্যক্তি নিজ হাতে জমি আবাদ করিয়া তাহাতে ফসল উৎপাদন করিবে, জমিতে অধিকার তাহারই থাকা চাই। যে শ্রমিক-শিল্পী যন্ত্র সাহায্যে মাল উৎপাদন করে, উৎপাদন-যন্ত্রের অধিকারও তাহার হাতেই থাকা চাই। ইহাই স্বাভাবিক ও সংগত নিয়ম। যতদিন এই নিয়ম যথাযথ পালিত হইতেছিল, ততদিন সকলেই শ্রম করিত এবং সকলেই ধানোৎপাদন করিত। কেহই শোষিত ছিল না। কেহই দরিদ্র ছিল না। আবার কেহ বিরাট ধনীও ছিল না। যখনই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ হইল তখনই সমাজে শোষণ, দারিদ্র্য ও ধনবৈষম্যের সূত্রপাত হইল। অর্থাৎ উৎপাদনের মৌলিক সাধন ভূমি যতদিন উৎপাদক চাষীর হাতে ছিল, ততদিন চাষীর দারিদ্র্য ছিল না। যখনই তাহা অনুৎপাদক উপভোক্তার হাতে গেল, তখনই উৎপাদক চাষী অসহায়, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় তাহাকে শোষণ ও উৎপীড়নের কাছে নতিস্বীকার করিতে হইল, নচেৎ বেকার হইয়া তাহাকে উপবাসী থাকিতে হইত। তখন হইতে সে তাহার শ্রমার্জিত সম্পদের সবটুকু ভোগ করিতে পাইল না। কিঞ্চিৎ অংশমাত্র তাহার কপালে জুটিল। তাহার শ্রমোৎপাদিত সম্পদের অধিকাংশ মালিক-ধনিক আত্মসাৎ করিতে লাগিল। শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হইল। যতদিন পরিধেয় বস্ত্রাদির সূতা উৎপাদনের যন্ত্র চরকা উৎপাদক-শ্রমিক গ্রামবাসীর হাতে ছিল ততদিন শোষণ ও দারিদ্র্য ছিল না। যখনই সেই চরকা বৃহৎ কলের আকারে অনুৎপাদক ধনিক পুঁজিপতির হাতে গেল তখনই বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও শোষণের সৃষ্টি হইল। যতদিন বস্ত্র-উৎপাদনের যন্ত্র তাঁত উৎপাদক তাঁতীর হাতে ছিল ততদিন দারিদ্র্য ও শোষণ ছিল না।

যখনই সেই তাঁত বৃহৎ বস্ত্র-কলের আকারে অনুৎপাদক পুঁজিপতির হাতে গেল তখনই গ্রামে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইল। যতদিন তৈল উৎপাদনের যন্ত্র ঘানি গ্রামীণ তৈলশিল্পী কলুর হাতে ছিল ততদিন দারিদ্র্য ছিল না। যখনই তাহা বৃহৎ তৈলকলের আকার ধারণ করিয়া ধনিক কলওয়ালার কুক্ষিগত হইল তখনই গ্রামে বেকার ও দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। যতদিন ধান-ভানার যন্ত্র ঢেঁকি গ্রামের বিধবা ও ক্ষুদ্র কৃষকের আয়ত্তে থাকিয়া তাহাদিগকে অবসর সময়ে কাজ দিত ততদিন গ্রামে এত অভাব ও সম্বলহীনতা ছিল না। যখনই ঢেঁকি ছোট-বড় চাউলকলের আকারে অনুৎপাদক ধনী ও মধ্যবিত্তের হাতে যাইতে আরম্ভ করিল, তখনই বিধবার চোখে উত্তপ্ত অশ্রুজল দেখা দিল ও দরিদ্র কৃষকের হৃদয় ভগ্ন হইল। এইরূপে আরও বহুতর উদাহরণ যোগ করা যায়।

আমাদের দেশের অবস্থা কি? অতীতে ভারতের ন্যায় সমৃদ্ধশালী দেশ জগতে আর কোথাও ছিল না। ভারতের ধন-সম্পদের কাহিনী বিশ্ববিশ্রুত ছিল। ধন-সম্পদের লোভে বাহির হইতে দলে দলে লুণ্ঠনকারী ও আক্রমণকারী ভারতে আসিত। তখন দেশের প্রায় সকলের হাতে জমি ছিল। লোকসংখ্যাও কম ছিল। কিন্তু লোকে শুধু জমির উপর নির্ভর করিয়া থাকিত না। বহুবিধ গৃহশিল্পের প্রচলন ছিল। লোকে অর্ধেক সময় চাষ-আবাদ করিত ও অবশিষ্ট অর্ধেক সময় এক বা একাধিক শিল্পে নিযুক্ত থাকিত। ভারতের বস্ত্রশিল্প সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। ঢাকার মসলিনের খ্যাতি সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত ছিল। বস্ত্র সম্বন্ধে ভারত যে কেবল স্বাবলম্বী ছিল তাহা নহে, ইউরোপ প্রভৃতি সুদূর দেশেও ভারতের বস্ত্র প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হইত। অতঃপর ইংরেজ এদেশে আসিল, ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরেজ-রাজত্ব চলিতে থাকিল। তাহাদের হাতে বিজ্ঞানের উন্নতি হইল। ইংল্যাণ্ডে প্রথমে বৃহৎ যন্ত্রের সৃষ্টি হইল। ইংরেজরা তাহাদের দেশে বড় কলে বস্ত্র প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যাদি তৈয়ারি করিয়া ভারতে আমদানী করিতে থাকিল ও তাহাদের রাজশক্তির প্রভাবে ও চাপে সেই বড় কলে প্রস্তুত সস্তা দ্রব্যাদি এই দেশে বিক্রয় করিতে থাকিল। ভারতের জনসাধারণ বৃহৎ যন্ত্রে প্রস্তুত চাকচিক্যময় ও সস্তা জিনিসের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না।

এইভাবে ভারতের পল্লীশিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকিল। মানুষের জীবনধারণের পক্ষে খাদ্যের পরে বস্ত্রের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। বস্ত্র উৎপাদনের কাজে খাদ্য উৎপাদনের পরেই মানুষের সর্বাপেক্ষা অধিক ও ব্যাপক কর্মসংস্থান হইতে পারে। ভারতেও সেই অবস্থা চলিতেছিল। কিন্তু ভারত সেই ব্যাপকতম গৃহশিল্প হারাইল। ক্রমশ অন্যান্য গৃহশিল্পও ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। যাহারা শিল্প হারাইল হয় তাহারা একেবারে বেকার হইল, না হয় তাহাদের হাতে যৎসামান্য জমি ব্যতীত আর কিছুই থাকিল না। অস্বচ্ছল অবস্থার লোকেদের তো কথাই নাই, অল্পবিত্তবান লোকেরাও তাহাদের জমি রক্ষা করিতে পারিল না। অজন্মা হইত, অনটন হইত, দুর্ভিক্ষ আসিত, শিল্পহারা লোক তথা অন্য লোকেও পেটের দায়ে তাহাদের জমি বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইত। মহাজনের দেনার দায়ে, মালিকের খাজনার দায়ে তাহাদের জমি বিক্রয় হইয়া যাইত। এরূপে লোকের হাত হইতে প্রথমে শিল্প চলিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের জমিও চলিয়া যাইতে থাকিল। এইভাবে মহাজনের হাতে, মালিকের হাতে, যাহারা জমি চাষ করে না ও চাষ করিতে জানে না তাহাদেরই হাতে দেশের অধিকাংশ জমি পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। দেশে লক্ষ লক্ষ শিল্পহারা ও কোটি-কোটি ভূমিহারার সৃষ্টি হইল। অন্যদিকে কেবলমাত্র গৃহশিল্পসমূহ যাহাদিগকে জীবিকাদান করিত তাহারা তাহাদের শিল্প হারাইয়া উত্তরোত্তর অধিকাধিকভাবে ভূমির উপর চাপবৃদ্ধি করিতে লাগিল। দেশের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। পল্লীশিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হওয়ায় জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ইংরেজ-রাজত্বের মধ্য ও শেষ ভাগের এই হইল করুণ কাহিনী!

॥ ২৩ ॥ পশ্চিমবঙ্গের ভূমিব্যবস্থা

ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমবাংলার অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। ভূমি-রাজস্ব (ফ্লাউড্) কমিশনের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৯৪০ সালে অবিভক্ত বাংলায় ৩ একর পর্যন্ত জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা গ্রামের মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৫৭·২ ভাগ এবং ৩ একরের অধিক জমি

আছে এমন পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৪২·৮ ভাগ। উহার চার বৎসর পরে ১৯৪৪-৪৫ সালে ভূমি সম্বন্ধে বিস্তারিত তদন্তের জন্য শ্রী এইচ, এস, এম, ইশাকের অধ্যক্ষতায় যে কমিশন বসে (এগ্রিকালচার‍্যাল স্টাটিস্‌টিক্‌স্‌ বাই প্লট টু প্লট এনিউমারেশন) তাহার রিপোর্ট (যাহা ইশাক রিপোর্ট নামে খ্যাত) হইতে জানা যায় যে, এই কয় বৎসরে অবস্থা আরও বহু পরিমাণে খারাপের দিকে গিয়াছে। ৩ একরের কম জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৭৬·১ ভাগ এবং ৩ একরের বেশী জমি আছে এমন পরিবারের সংখ্যা হইয়াছে শতকরা মাত্র ২৩·৯। অর্থাৎ কৃষক পরিবারের জমির পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে এবং তাহাদের অবস্থা ক্রমশ হীন হইতে হীনতর হইতেছে। কম-বেশী জমি আছে এই ভিত্তিতে ইশাক-রিপোর্টে গ্রামের পরিবারসমূহকে 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' ও 'ঙ'—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ও তদনুসারে কৃষিজীবী পরিবারসমূহের প্রকৃত অবস্থা উহাতে বিবৃত করা হইয়াছে। এই জমি হইতেছে 'খাস' জমি অর্থাৎ যে-জমি জমির মালিকেরা নিজেরা, পরিবারের লোকজনের দ্বারা কিংবা মজুরের দ্বারা চাষ করে অথবা যাহা বর্গা বা ভাগপ্রথায় অথবা অস্থায়ী বিলি করিয়া চাষ করা হয়। উহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রামে 'ক' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ যাহাদের কোন জমি নাই—বাস্তুভিটা পর্যন্ত নাই অথবা কেবলমাত্র বাস্তু-ভিটাটুকু আছে) তাহাদের সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার ৩৬·৪ ভাগ; কিন্তু তাহাদের জমির পরিমাণ বাংলার মোট জমির শতকরা মাত্র ১·৮ ভাগ। 'খ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ বাস্তু ছাড়া যাহাদের এক একর পর্যন্ত জমি আছে) সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার ১৭·৭ ভাগ, কিন্তু তাহাদের অধিকৃত জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৪·২ ভাগ। 'গ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ যাহাদের হাতে এক একরের বেশী জমি আছে কিন্তু ৩ একরের অধিক জমি নাই) সংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ এবং তাহাদের জমি মোট জমির শতকরা ১৬·৯ ভাগ। 'ঘ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ ৩ একরের অধিক কিন্তু ৫ একরের কম এমন জমি আছে) সংখ্যা মোট পরিবার সংখ্যার শতকরা ৯·৬ ভাগ এবং তাহাদের জমির পরিমাণ শতকরা ১৪·৭ ভাগ। এবং 'ঙ' শ্রেণীর পরিবার (অর্থাৎ যাহাদের ৫ একরের বেশী জমি আছে) সংখ্যা মোট পরিবার

সংখ্যার ১৪·৩ ভাগ; কিন্তু তাহাদের অধিকৃত জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৬২·৪ ভাগ। সুতরাং ১৯৪৪-৪৫ সালের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, শতকরা ৩৬·৪ পরিবারের হাতে মোট জমির শতকরা মাত্র ১·৮ ভাগ। অন্য দিকে মোট পরিবারের শতকরা ১৪·৩ ভাগের হাতে মোট জমির শতকরা ৬২·৪ ভাগ। অর্থাৎ অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে জমি পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। অন্যদিকে অধিকাংশ লোকের হয় জমি নাই অথবা জমি যদিও বা থাকে তবে ১ একরের বেশী নাই। ইহা হইতে দুর্দশা ও সংকটের চরম অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়।

উপরন্তু অধ্যাপক মহলানবীশ প্রভৃতি মনীষিগণ ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ভাবীফল সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া যে-রিপোর্ট লিপিবন্ধ করিয়াছেন (সার্ভে অফ্ দি আফ্‌টার এফেক্টস্ অফ্ দি বেঙ্গল ফ্যামিন্ ইন্ ১৯৪৩) তাহা হইতে বাংলার দুর্দশার আরও ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। উক্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষের পূর্বে ১৯৩৪ সালে শতকরা ৩৬টি গ্রাম্য পরিবারের কোন ধানী-জমি ছিল না। শতকরা ৪১টি পরিবারের মাত্র ২ একর পর্যন্ত জমি ছিল। শতকরা ১৫টি পরিবারের ২ একর হইতে ৫ একর পর্যন্ত এবং শতকরা ৮টি পরিবারের ৫ একরের উপর জমি ছিল। দুর্ভিক্ষের ফলে অবস্থার ভীষণ অবনতি ঘটে। দুর্ভিক্ষের সময় ৯ লক্ষেরও অধিক পরিবার তাহাদের সমস্ত ধানী-জমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া নিঃসম্বল হয় এবং জীবিকার একমাত্র বা প্রধানতম উপায় হারাইয়া বসে। ২½ লক্ষ পরিবার তাহাদের সমস্ত জমি-জমা বাস্তু-ভিটা পর্যন্ত হারাইয়া কৃষি-মজুরে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের পূর্বে কৃষি-মজুর পরিবারের মধ্যে শতকরা ১৬টি পরিবারের কিছু-কিছু ধানী-জমি ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় তাহাদের শতকরা ১৩টি পরিবার তাহাদের যাহা-কিছু জমি ছিল সবই খোয়াইয়া বসে। অন্যান্য শ্রেণীর কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যেও অনুরূপ দুর্দশা সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহারা সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতির ন্যায় কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। সাধারণ অবস্থায় কৃষিজীবী সমাজে

আর্থিক অবনতির যেসকল কারণ ক্রিয়া করিয়া আসিতেছিল, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ তাহারই চরম পরিণতি। অবিভক্ত বাংলার এই অবস্থা।

কিছুকাল পূর্বে (১৯৪৬-৪৭) গ্রামাঞ্চলের ঋণভার সম্পর্কে এক সরকারী তদন্ত (সার্ভে অফ্ রুর‍্যাল্ ইনডেটেড্‌নেস্ ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল) হইয়াছিল, তাহাতে ঐ সময় কাহার কিরূপ ভূমি ছিল তাহাও অনুসন্ধান করা হয়। তাহা হইতে অবস্থার যে আরও বেশী অবনতি হইতেছে, ইহা সূচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কৃষি-শ্রমিকের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে এক নমুনা-তদন্তের ব্যবস্থা করেন। উহাতে বৃন্দাবনপুর নামক এক গ্রামে নমুনা-তদন্ত করা হয় (দি স্যাম্পল্ ইনকোয়ারি ইন্‌টু দি ভিলেজ্ অফ্ বৃন্দাবনপুর)। তাহা হইতে জানা যায় যে অবস্থার আরও দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছে। বৃন্দাবনপুর গ্রামে মোট পরিবার-সংখ্যা ছিল ১৪৯টি। তাহার মধ্যে ৭২টি অর্থাৎ শতকরা ৪৮·৩ ভাগ কৃষিজীবী পরিবার। অবশ্য ইহার মধ্যে ৫৮টি পরিবারকে জমি চাষ করিতে দেখা গিয়াছে। এই ৫৮টি পরিবারের মধ্যে (ক) ৪৪টি অর্থাৎ শতকরা ৭৫·৯ ভাগের ২ একরের কম জমি, (খ) ১২টি পরিবারের অর্থাৎ শতকরা ২০·৫৬ ভাগ পরিবারের ২ একর হইতে ৫ একর পর্যন্ত এবং (গ) ২টি পরিবারের অর্থাৎ শতকরা ৩·৫ ভাগ পরিবারের ৫ একর হইতে ১০ একর পর্যন্ত জমি আছে। ১০ একরের বেশী কাহারও জমি নাই। অবশ্য একটিমাত্র গ্রামের পরিসংখ্যানের দ্বারা সাধারণ অবস্থা সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব না হইলেও উহার দ্বারা অবস্থার গতি যে কোন্ দিকে যাইতেছে তাহা বুঝা যায়। এক্ষণে ভূমি-রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টের সহিত ঋণভার তদন্ত ও বৃন্দাবনপুর গ্রামের নমুনা-তদন্তের তুলনামূলক বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। তাহা হইতে পশ্চিমবাংলার সংকটের গভীরতা সহজেই উপলব্ধি করা যাইবেঃ—

	ভূমি-রাজস্ব কমিশন ১৯৩৯-৪০ (পশ্চিম-বাংলার জন্য নিধারিত হিসাব)	গ্রাম্য ঋণভার তদন্ত (পশ্চিম-বাংলা) ১৯৪৬-৪৭	বৃন্দাবনপুর গ্রামের নমুনা-তদন্ত ১৯৪৯
২ একর পর্যন্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য পরিবারের শতকরা হিসাব	৪১·১%	৬৪·৭%	৭৫·৯%
২ হইতে ৫ একর পর্যন্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য-পরিবারের শতকরা হিসাব	২৯·১%	১৮·৩%	২০·৬%
৫ হইতে ১০ একর পর্যন্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য-পরিবারের শতকরা হিসাব	১৯·৭%	১০·৭%	৩·৫%
১০ একরের অতিরিক্ত জমি আছে এরূপ গ্রাম্য-পরিবারের শতকরা হিসাব	১০·১%	৬·৩%	০
	১০০%	১০০%	১০০%

এই হিসাব ১৯৪৭ সালের পূর্বেকার। দেশ বিভাগের ফলে জনসংখ্যার চাপবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতিজনিত দুর্মূল্যতা, বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতির জন্য উপর্যুপরি কয়েক বৎসর অজন্মা ও প্রায় প্রতি বৎসর রাজ্যের অল্পাধিক

অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা ইত্যাদি কারণে পশ্চিমবাংলার দুর্দশা ও সংকট যে এক্ষণে চরমে পৌঁছিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবাংলায় বর্গাদারদের সংখ্যাবৃদ্ধি উক্ত দারুণ দুর্দশার অন্যতম প্রমাণ। ছোট-ছোট জমির মালিক ক্ষুদ্র কৃষক নিজেদের জোতজমি হারাইয়া অধিকাধিকভাবে ভাগচাষীতে পরিণত হইতেছে। বর্তমানে ভাগচাষ-জমির পরিমাণ মোট জমির শতকরা ৪০ ভাগে দাঁড়াইয়াছে।*

১৯৩১ সালে পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫১·৪ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৫১ সালে উহা শতকরা ৫৭·২১ দাঁড়াইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে কর্মী ও তাহার পোষ্যবর্গ দুই-ই আছে। কত কর্মীর উপর কত পোষ্য নির্ভর করে তাহা বিচার করিলে দুর্দশার আর একটি পরিমাপ করা যায়। ১৯৩১ সালে ৫৯ লক্ষ পোষ্য ৩৮ লক্ষ কর্মীর উপর নির্ভর করিত; কিন্তু অবস্থার অবনতি ঘটিয়া ১৯৫১ সালে দেখা যায় যে এক কোটীর উপর লোক পোষ্য হিসাবে ৩৭ লক্ষ কর্মীর উপর নির্ভর করিতেছে। এইদিক দিয়াও বুঝা যায় যে, পশ্চিমবাংলার অবস্থা চরমে উঠিয়াছে। যাহারা নিজের জমি নিজেরা চাষ করে, তাহাদের সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে পশ্চিম-বাংলার অবস্থার শোচনীয়তা আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। ১৯৫১ সালের সেন্সাস্ অনুসারে যাহারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করে তাহাদের সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩২·৩ ভাগ, উত্তরপ্রদেশে ৬২·২ ভাগ, বিহারে ৫৫·২ ভাগ, উড়িষ্যায় ৫৯·৫ ভাগ, বোম্বাই-এ ৪০·৭ ভাগ ও মাদ্রাজে ৩৪·৯ ভাগ। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার অবস্থা সব চাইতে শোচনীয়।

গ্রামাঞ্চলের ঋণভার সম্পর্কে যে সরকারী অনুসন্ধানের কথা উপরে বলা হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৫৬টি পরিবার ঋণ-গ্রস্ত। বিলাসে বা বিবাহ ইত্যাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য এইসব ঋণ করা হয় নাই। আশ্চর্যের কথা, প্রধানত খাদ্য খরিদের জন্য এইসব ঋণ গ্রহণ করা

---

* 'পশ্চিমবঙ্গে ভূমি কি কম'—পৃঃ ১৩৬ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। দেনার গড়পড়তা শতকরা প্রায় ৪৯ ভাগই খাদ্য ক্রয়ের জন্য। যাহাদের জমি আছে তাহাদের ক্ষেত্রেও দেনার প্রায় ৫৫ ভাগ খাদ্য খরিদের জন্য। আবার ঐ দেনা শোধ করা হইয়াছে সংসারের আয় হইতে নহে—জীবিকার একমাত্র সম্বল চাষের জমি বিক্রয় করিয়া। উপরন্তু পূর্বে যেস্থলে জমি বন্ধক রাখিয়া ঋণগ্রহণ করা হইত, আজকাল সেইস্থলে জমি একেবারে সাফ্ বিক্রয় করিয়া ফেলা হইতেছে। ১৯৪০ সালে যত জমি বিক্রয় হয়, তাহার শতকরা ২৪ ভাগ জমি বন্ধক দেওয়া হয়; কিন্তু ১৯৪৩ সালে দেনার জন্য জমি বন্ধক দেওয়া কমিয়া গিয়া বিক্রয়ের শতকরা ১০ ভাগে দাঁড়ায়। ইহাতে জমি সাফ্ বিক্রয় করিয়া ফেলা যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে। উপরন্তু আজকাল পেশাদারী মহাজন ও জমিদার কর্তৃক গ্রামে ঋণদান করা বহুলাংশে কমিয়া গিয়াছে। সেইস্থলে এক শ্রেণীর ভূমিলোভী জোতদার ধান প্রভৃতি অসময়ে হাওলাত দিয়া বা টাকা ধার দিয়া উক্ত দেনার দায়ে চাষীদের ভূমি বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছে। জনসংখ্যার শতকরা ৩০·৩ ভাগ লোক নিজ জমির চাষী। তাহাদের ঋণকৃত দেনার পরিমাণ মোট ঋণের শতকরা ৪৭·৪ ভাগ। ইহার পর আসে কৃষি-শ্রমিক। তাহাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৬·৫ ভাগ এবং তাহাদের ঘাড়ে দেশের মোট ঋণের শতকরা ১১·৬ ভাগ চাপিয়া আছে। জোতদার ও ব্যবসায়ীর ঋণের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। ইহাতে সাধারণ কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের দুর্দশার গভীরতা সূচিত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় দলিল রেজেষ্টারীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আশ্চর্যের বিষয় রেজেষ্টারীকৃত দলিলের মধ্যে ভূমি-বিক্রয়ের দলিল অন্য দলিলের অনুপাতে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রধানত খাদ্য-শস্যাদি খরিদের জন্যই ঐসব জমি বিক্রয় করা হইতেছে। ইহাতে পশ্চিম-বাংলার অবস্থা যে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে কি আর বাকী থাকে?

॥ ২৪ ॥ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে দুর্দশার দৃশ্য

এই সকল পরিসংখ্যানের উপর বিচার করিলে মনে যে-চিত্র ফুটিয়া উঠে গ্রামের অভ্যন্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাহা অপেক্ষা আরও ভয়াবহ চিত্র

দৃষ্টিগোচর হয়। জমির ফসলে ভাগচাষীদের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, এ সম্পর্কে কিছু আইনও প্রণীত হইয়া চালু হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এখনও বহু অঞ্চলে ভাগচাষীরা স্বেচ্ছায় জমির মালিককে ফসলের অর্ধাংশ তো দেয়ই, উপরন্তু বিঘাপ্রতি ৭৲-৮৲-১০৲ টাকা পর্যন্ত জমির মালিককে নগদ দিয়া থাকে। উহাকে সেলামী বলা হইয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলে নগদ না দিয়া স্বেচ্ছায় জমির মালিককে অর্ধাংশের অতিরিক্ত ফসল ভাগ দেওয়া হয়। সেইসব স্থানে আন্দোলন করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা ফলবতী হয় না। কারণ সেই সব অঞ্চলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা এত বেশী যে, তাহারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া গোপনে জমির মালিককে অতিরিক্ত ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়া জমি লইয়া থাকে। তাহারা লাভ-ক্ষতির দিকে লক্ষ্য করে না। চাষ করিয়া যে তাহাদের ক্ষতি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি জমি চাষ করিবার জন্য তাহাদের এরূপ দুর্দমনীয় আগ্রহ ও ব্যাকুলতা!

গত কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে—ফসল স্বাভাবিক হউক বা কম হউক, গ্রামের একাংশ লোকের মধ্যে প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষের অবস্থা আসিবেই। ইহারা হইতেছে ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত-মজুর। ইহা ছাড়া ৫।৭ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকও আছে। ফসল হইবার পর ৪।৫ মাসের মধ্যে তাহাদের গৃহে আর কিছু থাকে না। পুরা কাজও পায় না। সরকার হইতে সস্তা দামে খাদ্যশস্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলেও তাহাদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকে না। এজন্য পশ্চিমবাংলায় কয়েক বৎসর যাবৎ যে দুর্ভিক্ষ হইতেছে তাহা মাত্র খাদ্যশস্যের দুর্ভিক্ষ নহে—উহা প্রধানত ক্রয়-ক্ষমতার দুর্ভিক্ষ। ক্রমশ ঐ অবস্থা ব্যাপকতর ও গভীরতর হইতেছে। শুধু তাহাই নহে। ধরুন—দুর্ভিক্ষের অবস্থা নাই, স্বাভাবিক অবস্থা। আমন ধান্যের অঞ্চল। আশ্বিন-কার্তিক মাস। কোন এক গ্রামে গেলেন। চাষী গ্রাম। দেখিবেন—সন্ধ্যায় গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ বাড়ীতে চুল্লীতে আগুন জ্বলিবে না। গ্রামের লোকে রাত্রে (৮।৯টার সময়) কোথাও সমবেত হইল। আপনি গ্রামের লোকের পরিচিত। শুষ্ক মুখ দেখিয়া কাহাকেও আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই, খাওয়া হয়ে গেছে কি?" শুষ্ক মুখে হাসি

ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া সে উত্তর দিবে—"হ্যাঁ"। কিন্তু বাস্তবিক সেবেলা তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। এরূপে বৎসরের পর বৎসর তাহাকে অন্তত ৩।৪ মাস একবেলা-একসন্ধ্যা খাইয়া থাকিতে হয়। এরূপ বহু শুষ্ক মুখ গ্রামে ঐ সময় দেখিতে পাইবেন। লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই সব কথা বলিতেছেন। বিনোবাজী এক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"বুভুক্ষমানঃ রুদ্ররূপেন অবতিষ্ঠতে" অর্থাৎ ক্ষুধার্তের রুদ্রমূর্তি। কিন্তু এখানকার দরিদ্র ক্ষুধার্ত কেমন শান্ত! তাহার এক মুখ আছে বটে কিন্তু কাজ করিবার জন্য দুই হাতও আছে—কর্মক্ষম, বলিষ্ঠ। কাজ করিতে প্রস্তুত অথচ কাজ পায় না। এজন্য অনাহারে থাকিতে হয়। ইহাতে তাহার ভিতরে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিবার কথা! কিন্তু দেখা যায় অবস্থা বিপরীত। খাইতে পায় না, এজন্য অপরাধ যেন তাহারই—এইভাবে সে জীবনধারণ করিয়া থাকে। ধনীরা আর কতদিন তাহাদের অনাহারে রাখিবেন? এখানে বিনোবাজীর এক মহতী বাণী স্মৃতিপটে উদিত হয়।—"অন্নে সমস্য যদসন মনীষাঃ", আমরা যদি এক গ্লাসও অন্ন গ্রহণ করি তবে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহার মধ্যে সকলেরই বাসনা নিহিত রহিয়াছে। এইজন্য সকলকে খাওয়াইয়া তবে নিজে খাইবে। তবেই খাদ্য হজম হইবে। ধনীদের ভাল হজম হয় না---কেননা তাঁহারা যাহা খাইয়া থাকেন তাহার উপর সকলের বাসনা পড়িয়া রহিয়াছে।" গ্রামের শিল্প আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই। সবই তাহার কাছ হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। শেষ যাইতে বসিয়াছে—ঢেঁকি। যতই ভূমি ধনীর হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, ততই ঢেঁকির সর্বনাশ ঘটিতেছে। ধনীর গোলায় শত-শত মণ, হাজার হাজার মণ ধান থাকে। সে তাহা কলওয়ালাকে বিক্রয় করিয়া দেয়। তাহার ধান ঢেঁকিওয়ালাকে দিয়া চাউল তৈয়ারী করাইয়া চাউল বিক্রয় করিবে না—সে ধানই বিক্রয় করিবে এবং তাহা কলওয়ালার কাছেই বিক্রয় করিবে। গ্রামের ঢেঁকিওয়ালার কাছে সে খুচরা বিক্রয় করিতে চাহে না। তাহার উপর এখন গ্রামে-গ্রামে হাস্কিং মেশিন বা ছোট চাউল-কল বসিয়া ঢেঁকির সর্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছে। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে শহর ও শিল্পাঞ্চলে বড়-বড় চাউল-কল ছিল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ব্যবহারের জন্য যে-চাউল প্রয়োজন

হইত তাহা ঢেঁকিতেই প্রস্তুত হইত। এখন হাস্কিং মেশিন বসিয়া তাহা নষ্ট হইয়া গেল। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবাংলায় ২৪ শত লাইসেন্সপ্রাপ্ত হাস্কিং মেশিন ও লাইসেন্স নাই এমন ১২ শত হাস্কিং মেশিন—মোট ৩৬ শত হাস্কিং মেশিন চলিতেছিল। বৎসরে ৩০০ দিন কাজ চলে ও দৈনিক গড়ে ৩০ মণ করিয়া ধান ভানে—এই হিসাবে ৩৬ শত হাস্কিং মেশিনের দ্বারা বৎসরে অল্পাধিক ২½ কোটী টাকার আয় হইতে ঢেঁকি অর্থাৎ দেশের দরিদ্র সাধারণ বঞ্চিত হইতেছে। এখন তো হাস্কিং মেশিনের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শত শত বৃহৎ চাউলের কল তো রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের যাঁহারা গণ্যমান্য শ্রেষ্ঠব্যক্তি তাঁহাদের অনেকেই এই-সব হাস্কিং মেশিন স্থাপন করিয়া গরীবের শেষ সম্বলটুকু কাড়িয়া লইতেছেন। ইংরেজ রাজত্বের সময় বৃহৎ কল আমাদের প্রায় সব কাড়িয়া লইয়াছিল, অবশিষ্ট ছিল ঢেঁকি। দেশ স্বাধীন হইবার পর স্বাধীন দেশই বাকী অংশটুকুরও সর্বনাশ সাধন করিল। এ কলঙ্ক কাহিনী চিরতরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

॥ ২৫ ॥ পশ্চিমবঙ্গে ভূমি কি কম

পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযজ্ঞের সাফল্যের জন্য অনুকূল মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করিবার পক্ষে একটি বড় অন্তরায় শিক্ষিত লোকের ধারণা। তাঁহাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, সমগ্রভাবে ভারতের তুলনায় বাংলার জমি অপেক্ষাকৃত অনেক কম এবং তাই পশ্চিমবঙ্গ ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের পক্ষে উপযোগী ক্ষেত্র নহে। সত্যই কি পশ্চিমবঙ্গে জমি কম? ভারতের জনসংখ্যা ৩৬ কোটী* এবং ভারতের আবাদী ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩৫·২৮ কোটী একর অর্থাৎ ভারতের মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু ভূমি হইতেছে ৯৮ শতক। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা মোটামুটি ২½ কোটী। কিন্তু উহার কর্ষিত ও কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ১ কোটী ৪৬ লক্ষ একর অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার মাথাপিছু জমি ৫৮ শতক। এই দৃষ্টিতে পশ্চিম-

---

*১৯৫১ সালের লোকগণনার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এই তুলনামূলক বিচার করা হইতেছে।

বঙ্গের জমি কম বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। কোন প্রদেশের জমি অপেক্ষাকৃত কম কি বেশী ইহা বিচার করিতে হইলে সেই প্রদেশের কৃষির উপর নির্ভরশীল লোক ও তাহাদের পোষ্য-বর্গের সংখ্যা কত এবং তাহাদের মাথাপিছু জমি কত তাহা দেখিতে হইবে। মোট লোকসংখ্যা জমির অনুপাতে বেশী হইলেও যদি কোন প্রদেশে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা কম থাকে, তবে মোট লোকসংখ্যা বেশী হইলেও তাহাতে কিছু যায় আসে না। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তাহাই। এখানে মোট জনসংখ্যা জমির তুলনায় কোন-কোন প্রদেশ অপেক্ষা বেশী হইলেও কৃষির উপর নির্ভরশীলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। উপরন্তু জন-বহুলতা ও জমির প্রকৃতির দিক হইতে বাংলার অনুরূপ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা মোট জনসংখ্যার তুলনায় বাংলার জমি কমও নহে। পশ্চিমবঙ্গের অনুরূপ ঐ অঞ্চলের নাম (লোয়ার গ্যাঞ্জেটিক্ প্লেনস্) অর্থাৎ গঙ্গার নিম্নাঞ্চল। উত্তরপ্রদেশ (বারাণসী, গোরক্ষপুর, বালিয়া প্রভৃতি ৮টি জেলা), ছোটনাগপুর ছাড়া সমগ্র বিহার এবং হিমালয়ের পাদদেশস্থ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চল সমতল, উর্বর ও ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জন-বহুল। ১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুসারে ঐ অঞ্চলের প্রতি বর্গ-মাইলের জনসংখ্যা ৮৩২। তাই উহার সহিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করা সমীচীন। মধ্যপ্রদেশ বা রাজস্থান যেখানে বসতি কম, বহু জমি, পতিত জমিও বেশী, কিন্তু জমি তেমন উর্বর নহে, তাহার সহিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করিলে চলিবে না। গঙ্গার নিম্নাঞ্চলের জনসংখ্যা মোট ৭ কোটী, উহার ভূমি-আয়তন ৫ কোটী ৩৮ লক্ষ একর অর্থাৎ মাথাপিছু ৭৭ শতক। আর পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-আয়তন মোটামুটি ১৮৩ লক্ষ একর অর্থাৎ মাথাপিছু ৭৩ শতক। এখন আবাদী জমির দিক হইতে গঙ্গার নিম্নাঞ্চলের সহিত পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করা যাউক। ঐ অঞ্চলের আবাদী জমির মোট পরিমাণ ৩৫৬ লক্ষ একর অর্থাৎ আবাদী জমি মাথাপিছু ৫১ শতক। পশ্চিমবঙ্গের আবাদী জমির পরিমাণ ১২৮ লক্ষ একর অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গেও আবাদী জমি মাথা-পিছু ৫১ শতক। এখন কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকদের মাথাপিছু

আবাদী জমি কোথায় কত তাহা দেখা যাউক। বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা লইয়া পূর্ব-ভারত এইরূপ বলা হয়। পূর্ব-ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭৫·৬ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। আর সারা ভারতে জনসংখ্যার শতকরা ৬৯·৮ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, গঙ্গার নিম্নাঞ্চলে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোক উহার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৫-এর কম নহে। উপরে বলা হইয়াছে যে, ঐ অঞ্চলের জনসংখ্যা ৭ কোটী। অতএব সেই অঞ্চলের কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা অন্যূন ৫২৫ লক্ষ ও তাহাদের জনপ্রতি আবাদী জমির পরিমাণ ৬৮ শতক। অন্য-দিকে পশ্চিমবাংলায় কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা ১ কোটী ৪০ লক্ষ (১৯৫১-এর লোকগণনা) অর্থাৎ উহার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৭ ভাগ। উপরে বলা হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গে মোট আবাদী জমির পরিমাণ মোটামুটি ১২৮ লক্ষ একর। অতএব পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের মাথাপিছু জমি ৯১ শতক। অর্থাৎ গঙ্গার নিম্নাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিম-বাংলায় কৃষিজীবী লোকের মাথাপিছু আবাদী জমি ২৩ শতক করিয়া বেশী। যাঁহারা এই সম্পর্কে বিপরীত ধারণা পোষণ করেন, ইহাতে তাঁহাদের চোখ খুলিয়া যাওয়া উচিত। এখন এই সম্পর্কে সারা ভারতের সহিত বাংলার তুলনা করা যাউক। ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোক মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৯·৮ ভাগ—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং ভারতে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা মোটামুটি ২৫ কোটী। ভারতের মোট কর্ষণ-যোগ্য (কর্ষিত সমেত) ভূমির পরিমাণ মোটামুটি ৩৫·২৮ কোটী একর। অর্থাৎ মাথাপিছু ১·৪১ একর। পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকসংখ্যা মোটামুটি ১৪০ লক্ষ ও কর্ষণযোগ্য ভূমি ১৪৬ লক্ষ একর অর্থাৎ মাথাপিছু ১·০৪ একর। অতএব পশ্চিমবঙ্গে জমি কম কি?

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইতে বাংলায় ভূদানযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। খাস জমি যদি এমন ব্যক্তির নিকট থাকে যাহা তিনি নিজে বা নিজের পরিবারের লোকজনের দ্বারা চাষ করা তো দূরের কথা মজুর দিয়া চাষ করানও তাঁহার পক্ষে সম্ভব

নহে, তবে তিনি ঐ জমি ভাগচাষীর দ্বারা চাষ করাইয়া লন। অথবা খাজনায় অস্থায়ীভাবে দুই-এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত দিয়া থাকেন। জমিদার, বড়-বড় জোতদার ও মধ্যবিত্ত যাঁহারা চাকুরী, ব্যবসা প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকেন তাঁহাদের যেসব খাস জমি আছে সেইসব জমি সাধারণত ঐভাবে চাষ করানো হইয়া থাকে। অর্থাৎ অনুৎপাদকের হাতে খাস জমি থাকিলে সেই জমির চাষ ঐভাবে হইয়া থাকে। ভূমি-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য ঐসব জমি ভূমিহীন দরিদ্রের মধ্যে বণ্টিত হওয়া আবশ্যক। তাই ভাগচাষের জমি ও অন্যান্য অস্থায়ী বন্দোবস্তের জমি যে-প্রদেশের যত বেশী সেই প্রদেশে ভূদানযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা তত অধিক। এইদিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কিরূপ দেখা যাউক। এক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, ১৯৪৬-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষ প্রথায় যে-জমি চাষ করা হয় তাহার পরিমাণ ছিল পশ্চিমবঙ্গের মোট আবাদী জমির শতকরা ৩৮·২৬ ভাগ। কিন্তু ১৯৫১ সালের লোক-গণনার রিপোর্টে প্রকাশ যে, পশ্চিম-বঙ্গে ভাগচাষ জমির পরিমাণ আবাদী জমির মোটামুটি শতকরা ২৩ ভাগ। ইহা ঠিক হিসাব নহে। পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লোকগণনার অব্যবহিত পূর্বে বর্গাদার-আইন প্রণীত হওয়ায় জমির মালিকগণ তাঁহাদের ভাগচাষ জমির পরিমাণ কম করিয়া বলিয়াছেন। এইরূপে লোকগণনার রিপোর্টে ভুল হিসাবই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৮ সালে ভাগচাষের জমি যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা ১৯৫১ সালে কম হইতেই পারে না। বরং বেশী হইবে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় ভাগচাষ-জমির পরিমাণ উহার আবাদী জমির শতকরা ৪০ ভাগ হইবে। সাম্প্রতিক দুইটি অনুসন্ধান হইতেও ঐরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজস্বমন্ত্রী স্বর্গীয় বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁহার লিখিত এক প্রবন্ধে ঐরূপ বলেন। যাহা হউক, উহা শতকরা ৩৮-এর কম যে হইবে না ইহা নিশ্চিত। ভারতবর্ষে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের অনুপাতে ভাগচাষীর ও অনুরূপ শ্রেণীর চাষীর সংখ্যা শতকরা ১২·৭ এবং পূর্ব-ভারতে উহা শতকরা ১২·৪ ভাগ। সুতরাং ভারতবর্ষে ও পূর্ব-ভারতে ভাগচাষ-জমির পরিমাণ ও মোট আবাদী

জমির অনুপাত ঐরূপ বা উহার কাছাকাছি হইবে সন্দেহ নাই। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষ-জমির অনুপাত উহার ৩ গুণ। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশে খাস জমির সব চাইতে বেশী অংশ অনুৎপাদকের হাতে রহিয়াছে। ঐ দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সব চাইতে বেশী এবং পশ্চিমবঙ্গই যে ভূদানযজ্ঞের পক্ষে সব চাইতে উপযোগী ক্ষেত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে জমি অপেক্ষাকৃত কম—এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক।

॥ ২৬ ॥ দরিদ্র চায় ভূমি

বলা হয়, গ্রামের বহু দরিদ্র ব্যক্তি অলস ও কর্মবিমুখ। তাহাদের মধ্যে গৃহশিল্প প্রচলন করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিয়া বিফল হইতে হইয়াছে। ইহা সঠিক উক্তি নহে। তবে ইহা সম্পূর্ণ অসত্য—তাহাও নহে। প্রথমে গৃহশিল্প তাহাকে দিলে সে তাহা অন্তরের সহিত গ্রহণ করে না। কিন্তু তাহাকে জমি দাও, সে পাগলপ্রায় হইয়া ছুটিয়া আসিবে। কারণ সে প্রথমে চায় জমি। ভূমি-সমস্যা প্রথমে সমাধান করিতে পারিলে অন্য সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাই সফল হইবে। নচেৎ সবই ডুবিবে। দরিদ্রের মধ্যে যে কিছুটা আলস্য আসিয়াছে, তাহা সত্য। কিন্তু তাহার জন্য সে দায়ী নহে। এনফোর্সড্ আইডলনেস বহুদিন চলিলে অর্থাৎ বাধ্যতামূলকভাবে বহুদিন কর্মহীন হইয়া থাকিতে হইলে ক্রমে তাহা কর্মবিমুখতা ও অভ্যাসগত অলসতায় পরিণত হয়। গ্রামের দরিদ্রদের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। তবে জমি চাষ করিতে তাহার আলস্য থাকিবে না। কিন্তু তাহার সেই জমি নিজের করিয়া পাওয়া চাই।

॥ ২৭ ॥ বেকারসমস্যা ও তাহার স্বরূপ

১৯৫১ সালের লোকগণনার বিবরণীতে ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণকে কার্যক্ষম বলিয়া ধরা হইয়াছে। ১৯৫১ সালের গণনা অনুসারে সারা ভারতে তাহাদের সংখ্যা ২১ কোটী ২০ লক্ষ। কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে এদেশে একদিকে ১০ বৎসরের বালক এবং অন্যদিকে ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধকে

পর্যন্ত কাজ করিতে হয়। সেই হিসাবে ভারতের কার্যক্ষম লোকের সংখ্যা ২৪ কোটী। ইহার মধ্যে মোটামুটি ১৪ কোটী লোক কাজ পায় আর ১০ কোটী লোককে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। যে ১৪ কোটী লোক কাজ পায় তাহারাও পুরা কাজ পায় না। ঐ ১৪ কোটী লোকের মধ্যে ১০ কোটী লোক চাষের কাজ করে। যাহারা চাষের কাজ করে তাহাদের অধিকাংশের মাত্র ৬ মাস কাজ থাকে এবং অবশিষ্ট ৬ মাস তাহাদিগকে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়। কারিগর শ্রেণীর লোকসংখ্যা গ্রামের লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় ১০ জন। কাজের অভাবে তাহাদেরও বৎসরে ৬ মাস বসিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং আমাদের দেশের বেকার-সমস্যা যে কত ব্যাপক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের জমির পরিমাণ ৫ একরেরও কম এবং তাহাদের বার্ষিক আয় নিতান্ত কম। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, যেসব কৃষকদের নিজেদের জমি আছে তাহাদের মধ্যে অর্ধেকের বার্ষিক আয় ৩০০৲ টাকারও কম এবং চাষ-আবাদের খরচ বাদে তাহাদের লাভ থাকে ৬০৲ টাকা বা তদপেক্ষা কম। ভূমি-সংস্কার বা কৃষির উন্নতির জন্য তাহারা বৎসরে ২২৲ টাকা হইতে ৫১৲ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করিতে সমর্থ নহে।* গ্রাম্য কারিগরগণের বার্ষিক আয়ও খুব কম। কৃষির কাজে ও কুটির-শিল্পে শতকরা ৭৫ জন লোক কাজ করে। তাহাদের এই দুরবস্থা! এজন্য দেশে বেকারসমস্যা যেমন বিরাট তেমনি যাহারা বেকার নহে তাহাদের মধ্যেও দারিদ্র্য ভয়ানক।

পল্লীশিল্পের ধ্বংসাবশেষস্বরূপ যে দুই-চারিটি গৃহশিল্প মৃতপ্রায় অবস্থায় কোনরকমে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছিল তাহাও স্বাধীনতা লাভের পর দেশের লোকেরদ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ঢেঁকি প্রভৃতিতে চাউল কুটা বা গম পেষার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বাধীনতালাভের পর গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরা গ্রামে গ্রামে হালার (চাউল তৈয়ারির ছোট কল) বসাইয়া বিশেষত ঢেঁকি ও হাতে চাউল

---

* শ্রীঅন্নাসাহেব সহস্রবুদ্ধের "পরিকল্পনা ও আর্থিক কার্যক্রম" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই সংখ্যাগুলি গৃহীত হইয়াছে।

প্রস্তুতের অন্যান্য হস্তচালিত যন্ত্রের ধ্বংস সাধন করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে প্রায় ৪ হাজার ছোট চাউল কল বসানো হইয়াছে। দৈনিক ৩০ মন ধান কুটে ও বৎসরে কম পক্ষে তিন শত দিন চলে এই হিসাবে বৎসরে অন্তত আড়াই কোটি টাকা যাহা দরিদ্র সম্বলহীন গ্রামবাসীদের হাতে যাইত তাহা হইতে আজ তাহারা বঞ্চিত। দেশের অন্যান্য ধন-সম্পদও অল্প সংখ্যক ধনিকের হাতে পুঞ্জীভূত হইয়াছে।

বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের আর একটি দিক আছে। তাহা এখানে উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পাশ্চাত্য দেশ হইতে যে অর্থশাস্ত্র এদেশে আসিয়াছে তাহার কু-প্রভাব সর্বস্তরের মানুষের মনোবৃত্তিকে কলুষিত করিয়াছে। উহা তাহাকে স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে উৎকর্ষতার পার্থক্য না থাকিলে তন্মধ্যে যে জিনিস সস্তা তাহা খরিদ করা কোন অবস্থায় অন্যায় নহে, বরং সমাজে যোগ্যতা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তাহা খরিদ করা উচিত এই মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপে যাহা সস্তা তাহার প্রতি আকর্ষণ আসিয়াছে। সস্তার লোভ সমাজকে অধঃপতিত করিয়াছে। মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে যে সস্তা হইলেই তাহা পবিত্র বা গ্রাহ্য নহে। চোরাই মাল তো সস্তা! মানুষকে বেকার করিয়া যাহা সস্তায় দেওয়া যায় তাহা চোরাই মালের মত অপবিত্র ও অগ্রাহ্য। কিন্তু আজ সমাজ এই মানবতার দাবীকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে। শহর গ্রামকে শোষণ করে। গ্রামের লোকের দুঃখ দুর্দশার প্রতি শহরের লোকের কোনরূপ ভ্রূক্ষেপও নাই। ইহা জানা কথা। গ্রামের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা যাহা ছিল তাহাও আজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে এখনও যে কয়টি পল্লীশিল্প মৃতপ্রায় অবস্থায় বাঁচিয়া আছে তাহা যাহারা চালায় তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষ্য করিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়। যে ব্যক্তি ঘানিতে তৈল উৎপাদন করে সে তাঁতীর প্রস্তুত তাঁতের বস্ত্র খরিদ করে না, সে মিলের সস্তা বস্ত্র খরিদ করিয়া থাকে। আর তাঁতীও তেলীর ঘানির তৈল ব্যবহার করে না, কলের সস্তা তৈল খরিদ করে। তাঁতী গ্রামের দরিদ্র বিধবার হাতে প্রস্তুত চাউল বা আটা খরিদ না করিয়া অপেক্ষাকৃত সস্তা কলের চাউল বা আটা খরিদ করে। ঐ বিধবাও তাঁতের কাপড় খরিদ

করে না, কলের সস্তা বস্ত্র ব্যবহার করে। তেলী কুম্ভকারের প্রস্তুত মাটির বাসনাদি খরিদ না করিয়া এলুমিনিয়মের পাত্রাদি ব্যবহার করে। কুম্ভকারও তেলীর ঘানির তৈল ব্যবহার না করিয়া কলের সস্তা তৈল খরিদ করিয়া থাকে। আরও বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এরূপে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে মারিতেছে। তেলী তাঁতীকে, তাঁতী তেলীকে, হাতে চাউল প্রস্তুতকারী তেলীকে আবার তেলী হাতে কুটা চাউল প্রস্তুতকারীকে, কুম্ভকার তেলীকে, তেলী কুম্ভকারকে উহারা যেন এক 'পারস্পারিক মারকসংঘ' প্রতিষ্ঠা করিয়া পরস্পরের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা নিজেরাও আত্মঘাতক হইতেছে। তাঁতী তাহার প্রস্তুত তাঁতের বস্ত্র অন্যের কাছে বিক্রয় করিবে কিন্তু সে নিজে সস্তায় মিলের বস্ত্র খরিদ করিয়া ব্যবহার করিবে। কাটুনীও নিজের সূতা বিক্রয় করিয়া দিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য সস্তায় মিলের বস্ত্র খরিদ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। ঐ সকলের ক্রমবর্ধমান ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের অবস্থা আজ চরমে উঠিয়াছে। বদ্ধমূল দারিদ্র্য ও নিঃসম্বলতা গ্রামের সাধারণ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার অভাবজনিত দুর্ভিক্ষ প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

আজকাল পত্রিকাদিতে ও লোকমুখে বেকার-সমস্যার কথা প্রায়ই আলোচিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের আলোচ্য ঐসব বেকার কাহারা? যে অনশনক্লিষ্ট বা অর্ধাশনক্লিষ্ট মরণোন্মুখ কোটী-কোটী দরিদ্র ভূমিহীন ও কারিগরের কথা আলোচনা করা হইল এ তাহারা নহে। তাঁহাদের আলোচ্য বেকার হইতেছে—শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বেকার। উহাদের বেকারত্ব ঘুচাইতে হইবে এবং উহা যে দেশের এক সমস্যা—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের বেকার-সমস্যার হিসাবে মাত্র তাহাদিগকেই দেশ বা জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরা বিভ্রান্তিকর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনায় তাহা সরকারী হউক আর বে-সরকারী হউক, ঐ সব কোটী-কোটী ভূমিহীন দরিদ্রের স্থান থাকে না। যদি বা থাকে, তাহা নিতান্ত গৌণভাবে থাকে। এজন্য যাহা দেশের সব চাইতে জরুরী সমস্যা তাহা আজ সাধারণ শিক্ষিত সমাজ ও সরকারের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া যাইতেছে—ইহা অদৃষ্টের

পরিহাস। বিনোবাজী তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"যদি সর্বাত্মক পরিকল্পনা করা সম্ভব না হয় এবং যদি আংশিক পরিকল্পনাই (প্ল্যানিং) করিতে হয়, তবে ঐসব কোটী-কোটী দরিদ্রের স্থান তাহাতে অগ্রগণ্য হওয়া আবশ্যক।" ইহার কারণ কি? কারণ উহারাই দেশের সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের, উহারাই সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা নিঃসম্বল ও অসহায়। এস্থলে মহামতি মার্কসের একটি কথা উল্লেখ করিতে চাই। তিনি সেইকালে ও সেইদেশে যাহাদেরই লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিয়া থাকুন না কেন ঐ উক্তিতে আজকার এইসব অসহায় মরণযাত্রী ভূমিহীন দরিদ্রের চিত্র ফুটিয়া উঠেঃ—

"The forest of uplifted arms demanding work becomes ever thicker, while the arms themselves become ever thinner" অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের কাজের দাবীতে ঊর্ধ্বপ্রসারিত হস্তের সংখ্যা অনবরত বাড়িতে বাড়িতে উহাদের বন যতই নিবিড়তর হইতেছে ততই ঐসব কর্মহীন হস্ত নিরন্তর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। এজন্য আজ তাহাদেরই কল্যাণ-ব্যবস্থার কষ্টিপাথরে সবকিছুকে যাচাই করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর এক নিরুপম বাণী মানসপটে উদিত হয়।

"I will give you a talisman. Whenever you are in doubt ....apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself, if the step you contemplate is going to b of any use to him. Will he gain something by it ? Will it restore him to a control over his own life and destiny ? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions ?"— "আমি আপনাকে একটি মন্ত্রপূত কবচ দিব। যখনই কোন বিষয়ে সন্দেহ হইবে তখনই এই পরীক্ষাটি প্রয়োগ করিবেন। নিজে দেখিয়াছেন এমন সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সব চাইতে অসহায় লোকের মুখ নিজের স্মৃতিপটে আনিবেন এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আপনি যে-ব্যবস্থা করিতে যাইতেছেন তাহাতে তাহার কোন উপকার হইবে কি না! ইহার দ্বারা সে

কি লাভবান হইবে? ইহাতে কি সে নিজের জীবনযাত্রা ও ভাগ্যের উপর আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবে? অর্থাৎ ইহাতে কি ক্ষুধার্ত ও আধ্যাত্মিকতার আলোকবঞ্চিত কোটী-কোটী লোকের স্বরাজ আসিবে?"

এই দৃষ্টিতে ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন যে প্রকৃষ্টতম ব্যবস্থা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

॥ ২৮ ॥ দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের উপায়

কিরূপে এই দারিদ্র্য, শোষণ ও অসহনীয় ধনবৈষম্য দূরীভূত হইবে? ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা কি? ইহার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে যে, যে-যে কারণে দারিদ্র্য ও শোষণের সৃষ্টি হইয়াছে সেই-সেই কারণ দূরীভূত করা। অর্থাৎ উৎপাদনের মৌলিক সাধন ভূমিকে অনুৎপাদক ধনীর হাত হইতে দরিদ্র ভূমিহীনের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া, ভূমির সংগত বণ্টন করিয়া দেওয়া। উপরন্তু উৎপাদনের যন্ত্রও গ্রামের শ্রমিক-শিল্পীকে ফিরাইয়া দেওয়া। অনেকে মনে করেন, অন্যকাজ দিয়া দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অনেকের ধারণা—যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান করা যাইবে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহা সম্ভব নহে। এই দেশে যে-বৃহৎ শিল্প এযাবৎ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা একশত বৎসর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে এযাবৎ মাত্র ২৭ লক্ষ লোককে যন্ত্রশিল্পে কাজ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। ১৯৫০ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ। সরকার মনে করেন যে, যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে কোটী কোটী লোককে কাজ দেওয়া যাইতে পারিবে। সরকারী পরিকল্পনায় যাহাই থাকুক না কেন, ইহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইংলণ্ড বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে ধনশালী হইয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার বৃহৎ যন্ত্রজাত পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য ইংলণ্ডের বিশ-পঁচিশ গুণ পরিমিত ভূখণ্ডকে বলপ্রয়োগে পদানত রাখিতে হইয়াছিল। তবেই সে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্য বিক্রয় করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। আজ কি তাহা সম্ভব? ভারতকে যদি বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে তাহার দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হয়, তবে খরিদ্দারের অন্বেষণের জন্য তাহাকে মঙ্গল-আদি গ্রহে যাইতে হইবে।

এই যুগে পৃথিবীর কোথাও তাহার ঐ পণ্য বিক্রয় করিবার স্থান বা সুযোগ হইবে না। আমেরিকার ভূমি বণ্টন করিলে সেখানকার জনসংখ্যার মাথাপিছু ২৫ একর করিয়া পড়িবে। উপরন্তু অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সে পাইয়াছে। রুশিয়ার জনসংখ্যা ও ভূমির পরিমাণ যেরূপ তাহাতে তাহারও ভূমি-সমস্যা নাই। অষ্ট্রেলিয়া ভারতের তুলনায় অনেক বৃহৎ দেশ, তাহার লোকসংখ্যা এখনও এক কোটীতে উঠে নাই। ভারতের লোকসংখ্যা ৪৩ কোটী, কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ৩৫ কোটী একর। মাথাপিছু ১ একর ভূমিও নাই। পশ্চিমবাংলার কর্ষিত ও কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ মোট ১ কোটী ৪৬ লক্ষ একর এরূপ হইবে; লোকসংখ্যা ৩ কোটীর অতিরিক্ত। জমি ছাড়া জীবিকার আর অন্যকোন উপায়ও গ্রামে অবশিষ্ট নাই। ভারত প্রযত্ন করিলেও জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আমেরিকা বা ইংলণ্ডের মত উন্নীত করিতে কখনও সমর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে ভারত যদি ঠিক পথে চলা শিক্ষা করে, তবেই সে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করিয়া সকলের স্বচ্ছল জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবে। অন্যদিকে ভারত যদি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পদাঙ্কানুসরণ করিতে অগ্রসর হয় তবে সে আরও কতিপয় ধনকুবের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে বটে, কিন্তু জনগণের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূর করিতে কিছুতেই সক্ষম হইবে না—বরং উত্তরোত্তর সে অতল জলে ডুবিবে। বিনোবাজী বলিয়াছেন, "আমি তো প্লানিং কমিশনকে এই কথা বলিয়া দিয়াছি, যদি আপনারা দেশের সমস্ত লোকের জন্য প্লানিং করিতে সমর্থ না হন এবং মাত্র আংশিক প্লানিং করেন, তবে সে-আংশিক প্লানিং গরীবের জন্য করুন। এই প্রসঙ্গে আমি রাজাজীর উদাহরণ দিতে চাই। রাজাজীর মত প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ যদি না থাকিতেন তবে মাদ্রাজে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা যায় না। তিনি গরীবদের দৃষ্টিকেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কন্ট্রোল-ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়াছেন এবং সব চাইতে তাঁহার বড় কাজ এই যে, তিনি এখন তাঁতীদের সমস্যার কথা উঠাইয়া তাহাদের হিতের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছেন। আমি প্লানিং কমিশনকে এই কথা বলিয়া দিয়াছি যে, যদি বৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত লোকের বেকার-সমস্যা দূর করা যায় তবে আমি আমার চরকা জ্বালাইয়া দিব। পরন্তু আমি জানি যে, গ্রাম-

শিল্প ভিন্ন এই সমস্যার সমাধান করা কিছুতেই সম্ভব নহে।" তিনি আরও বলিয়াছেন--"লোকেরা বলেন, জমি কোথা হইতে দিব? তাঁহারা অন্য কাজ দিবার কথা বলেন। এ কথার কোন মূল্য নাই। অন্য কাজ দিবার আপনি কে? মায়ের কোল হইতে সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া অন্য কী কাজ আছে যাহা তাহাকে দিতে পারেন? গ্রামশিল্পগুলিও তো তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁতীর কাজ তো বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, ইহার পরেও তাহাকে অন্য কী কাজ দিবেন? জমি তো এক বুনিয়াদী চাহিদা। জমি পঞ্চভূতের মধ্যে অন্যতম। উহা দিতে আপনি অস্বীকার করিতে পারেন না।" ভারতকে তাহার নিজের অবস্থা ও সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। জমির সঙ্গত বন্টন হইলেও তাহাতেই গ্রামবাসীদের চলিবে না। গ্রামপরিবার মোটামুটি ৫ একর করিয়া জমি পাইলেও তাহাতে তাহার স্বচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা চলিবে না: পশ্চিমবাংলায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ যেরূপ তাহাতে পাঁচজনের পরিবার-পিছু ৫ একর করিয়াও জমি দেওয়া চলিবে না।* সুতরাং তাহার জন্য অন্য কিছু উপজীবিকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একমাত্র গ্রাম্যশিল্পের দ্বারাই তাহা সম্ভব হইতে পারে। বর্তমান অবস্থায় যে-যে শিল্প কুটিরশিল্পরূপে চালু করা সম্ভব, তাহারই ব্যবস্থা তাহাদের জন্য করিতে হইবে। খাদ্য ও পরিধেয়, যাহা প্রধানত গ্রামে প্রস্তুত করা সম্ভব তাহা গ্রাম্যশিল্পের দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা ছাড়া যেসব কাঁচামাল গ্রামে উৎপন্ন হয় এবং যাহা হইতে উৎপন্ন পাকা মাল ঐ গ্রামেরই প্রয়োজন, তাহা উৎপাদন করিবার ব্যবস্থাও গ্রাম্যশিল্পের দ্বারা করিতে হইবে। আজ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি বিকারগ্রস্ত। আজ সে বৃহৎ শিল্পযন্ত্রের উন্নতি সাধনে উন্মত্ত। এদেশের

* ১৯৫১ সালের লোকগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা 'পোষ্যবর্গ সমেত) ১,৪০,৪৬,০৪০। তন্মধ্যে নিজের জমি আছে ৮০,২৩,৭৫৭ জনের; অন্যের জমি চাষ করে ২৯,৮০,৪০২ জন এবং কৃষিশ্রমিক ৩০,৪১,৮৮১ জন। পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমির পরিমাণ ১ কোটী ২৮ লক্ষ একর (১,২৮,৬২,৮০০) এবং আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ১৮ লক্ষ একর (১৮,২৯,৮০০)।

কোন বৈজ্ঞানিক অন্যকথা দূরে থাকুক ঢেঁকিতে 'বল-বেয়ারিং' বা অন্য সহজ সরল কিছু লাগাইয়া উহা চালানোর শ্রম লাঘব করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি? আজ বৈজ্ঞানিককে গ্রাম্যশিল্পযন্ত্রের উন্নতি সাধনে জরুরী-ভাবে মনোনিবেশ করিতে হইবে। হিংসার সহিত বিজ্ঞানের অবৈধ মিলন ঘটিয়াছে। এজন্য আজ জগৎ ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। বিজ্ঞান যদি জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে চায় তবে অহিংসার সহিত বিজ্ঞানের পরিণয় হওয়া চাই। গ্রাম্যশিল্পে উৎপন্ন খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতির মূল্য মিলজাত দ্রব্যের মূল্যের তুলনায় অধিক হইলেও সমগ্র দৃষ্টিতে বা সারা দেশের কল্যাণের দিকে তাকাইয়া শহরবাসীকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রামকে দরিদ্র ও বেকার রাখিয়া মিলজাত সস্তা মালের দিকে ধাবিত হইলে চলিবে না। শহর গ্রামকে শোষণ করিবার জন্য নহে, পরন্তু গ্রামকে সেবা করিবার জন্যই থাকিবে।

॥ ২৯ ॥ কর্তৃত্ব বিভাজন

কিন্তু এই সংকল্প বা কামনা সার্থক করিয়া তুলিবার উপায় কি? অর্থাৎ গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গ্রাম্যশিল্পকে তাহার যথাযোগ্য স্থানে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় কি? জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদি সরকার দণ্ডশক্তির সাহায্যে গ্রাম্যশিল্প পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন তবে ভাল কথা। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব করা যাইবে? ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্য 'জনশক্তি' নির্মাণের বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। যদি তাহা আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকি তবে দণ্ড-নিরপেক্ষভাবে কিরূপে গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সমাজে বিচারবোধ জাগ্রত করিয়া ঐ সম্পর্কে সমাজনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাই হইবে সর্বোদয়-সেবকের কাজ। খাদি প্রভৃতি রচনাত্মক কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সেই বিচারবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আজ বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ভূদানযজ্ঞ সফল হইলে তবে ঐসব রচনাত্মক কার্যক্রম সফল করা সহজসাধ্য হইবে। সমাজে ব্যাপকভাবে বিচারবোধ জাগ্রত

হইলে সেই বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়াকে বিনোবাজী 'বিচার-শাসন' বলিয়াছেন। জনশক্তি কার্যকরী করার জন্য বিচার-শাসন প্রধান উপায়। গৃহশিল্পের ক্ষেত্রেও ঐরূপ। কিন্তু গ্রাম্যশিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কেবলমাত্র বিচার-শাসনের দ্বারা কাজে পূর্ণ সফলতা লাভ করা সম্ভব হইবে না। মনে করুন, কোন এক গ্রাম বা অঞ্চল বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কেবলমাত্র ঘানির তৈল ব্যবহার করিতে চাহিল এবং গ্রামের প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত সংখ্যক ঘানি গ্রামের মধ্যে চালাইতে চাহিল। কিন্তু বাহির হইতে গ্রামের মধ্যে কলের তৈল আসা বন্ধ হইল না।তাহাতে গ্রামের সংকল্প সিদ্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং গ্রামের এই অধিকার থাকা চাই যে, গ্রামের মধ্যে কোন্ জিনিস প্রবেশ করিতে পারিবে ও কোন্ জিনিস প্রবেশ করিতে পারিবে না—তাহা গ্রামই স্থির করিয়া দিবে। গ্রামের সিদ্ধান্ত অনুসারে তৎ-তৎ জিনিসের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে হইবে। অতএব জনশক্তি কার্যকরী করার দ্বিতীয় উপায় হইতেছে—কর্তৃত্ব-বিভাজন। যতদিন সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীকৃত হইয়া থাকিবে ও গ্রামে-গ্রামে এই শক্তি বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া দেওয়া না হইবে ততদিন প্রকৃত 'গ্রামরাজ' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। এজন্য বিনোবাজী বলেন, "বিচার-শাসন ও কর্তৃত্ব-বিভাজন জনশক্তির দুই হাতিয়ার। অতএব আমরা এই ক্ষমতা চাহিতেছি যে, যদি কোন গ্রামের লোক চাহে যে 'আমরা গ্রামের মধ্যে বাহিরের মাল আসিতে দিব না' তবে গ্রামের সেই অধিকার থাকা চাই।" যদি কোন গ্রাম বা অঞ্চলের অধিবাসীগণ ইহা স্থির করেন যে, সেই অঞ্চলে যে-ধান উৎপন্ন হয় তাহা চাউল-কলের জন্য চালান দেওয়া হইবে না ও কলের চাউল সেই অঞ্চলে আসিতে পারিবে না, তবে গ্রামের সেই অধিকার থাকা চাই ও সেই অধিকারকে কার্যকরী করিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকা চাই। যদি সরকার তাহা মানিয়া লন, তবে অহিংসার পক্ষে তাহা অনুকূল হইবে। কিন্তু যদি তাহা না করেন তবে উপায় কি? সে সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"সরকার যদি তাহা স্বীকার না করেন তবে আমরা জনসাধারণের কাছে গিয়া বলিব যে, এই স্বরাজ্য আসল স্বরাজ্য নহে। সেক্ষেত্রে আমরা ঐরূপ দাবী করিতে থাকিব ও সরকার উহার বিরোধী থাকা সত্ত্বেও আমরা উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্তুত

হইব।” বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন, “যখন আমরা এই কথা (কর্তৃত্ব-বিভাজন) বলি তখন কর্তৃপক্ষ বলেন যে, এইভাবে এক বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে ছোট রাষ্ট্র থাকা চলিতে পারে না। তাহাতে আমি ইহা বলিতে চাহি যে, যদি আমরা ক্ষমতার বিভাজন না করি, কর্তৃত্বের বিভাজন না করি তবে সেনাবল অনিবার্য—ইহা বুঝিয়া লউন। তাইতো সেনা ছাড়া আজ চলিতেছে না এবং কখনও চলিবে না। অতএব চিরদিনের জন্য ইহা স্থির করুন যে, সেনাবলের দ্বারা কাজ চালাইবেন ও সেনা সুসজ্জিত রাখিবেন। আর একথা যেন কখনও বলা না হয় যে, আমরা একদিন না একদিন সৈন্যবলের প্রয়োজন হইতে মুক্ত হইতে চাই। যদি কোনও দিন সেনা ছাড়িয়া দিতে চান তবে পরমেশ্বর যেরূপ করিয়াছেন আমাদেরও সেরূপ করিতে হইবে। পরমেশ্বর বুদ্ধির বিভাজন করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেককে তিনি বুদ্ধি দিয়াছেন--বৃশ্চিককেও দিয়াছেন, সর্পকেও দিয়াছেন, ব্যাঘ্রকেও দিয়াছেন এবং মনুষ্যকেও দিয়াছেন। কমবেশী দিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রত্যেককেই বুদ্ধি দিয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন যে, তোমরা নিজ-নিজ জীবনের কাজ নিজ-নিজ বুদ্ধি অনুসারে কর। এই কারণে সারা পৃথিবী এমন উত্তমভাবে চলিতেছে যে, তিনি বিশ্রাম লইতেছেন এবং এতদূর বিশ্রাম লইতেছেন যে, লোকের সন্দেহও হয় যে পরমেশ্বর আছেন কি নাই! আমাদের রাষ্ট্রও এমনভাবে চলা চাই, যাহাতে শঙ্কা আসে যে রাষ্ট্রশক্তি আদৌ আছে কি নাই! লোকে যখন বলিবে যে, ভারতে বোধহয় কোন রাষ্ট্রশক্তি নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে আমাদের রাজ্যশাসন অহিংসক হইয়াছে। এইজন্য আমরা গ্রাম-রাজ্যের কথা বলিয়া থাকি আর এইজন্যই আমরা চাই যে, গ্রামেরই নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা হউক অর্থাৎ গ্রামের লোক নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা নিজের হাতে লউক। জনশক্তি সম্পর্কে ইহাও এক প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, গ্রামবাসীরা নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যদি ইহা স্থির করে যে, অমুক মাল আমরা উৎপাদন করিব এবং তাহারা সরকারের নিকট চাহে যে, অমুক মাল এখানে আসিতে দেওয়া হইবে না এবং উহার আসা বন্ধ করা হউক এবং যদি সরকার তাহা বন্ধ না করেন, তবে উহার বিরোধিতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার সাহস করিতে হইবে।”

॥ ৩০ ॥ ভূদানযজ্ঞ প্রেমের পথ

অন্যদেশে হিংসার পথে ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূর করা হইয়াছে। ভূদানযজ্ঞ প্রেমের পথে সেই বৈষম্য দূর করিতে চায়। ধনীর ধনিকত্ব দূর করা এবং গরীবের গরীবত্ব দূর করা—ইহাই ভগবানের প্রেমের রীতি। এই প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন, "ভগবান সকলকে সমান করিতে চান। উহা তাঁহার প্রেম—দ্বেষ নহে। আমি যে-কাজ করিতেছি তাহা ভগবানের কাজ। আমি বড়র অহঙ্কার দূর করিতে চাই এবং ছোটকে উঁচুতে উঠাইতে চাই। বড়র নিকট হইতে জমি লইয়া ভূমিহীন দরিদ্রকে জীবিকার জন্য দিতে চাই। ইহাতে এরূপ ভাবা ঠিক নহে যে, বড়দের সঙ্গে আমার শত্রুতা আছে! আমি তো তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিতে চাহিতেছি। তাঁহাদের নিকট হইতে জমি লইয়া গরীবদের পবিত্র প্রেম তাঁহাদিগকে দেওয়াইতে চাহিতেছি। সমাজে বৈষম্য রহিয়াছে বলিয়া ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই অনিষ্ট হইতেছে ও সমস্ত মিলিয়া দেশের ক্ষতি হইতেছে। অন্য দেশে এই বৈষম্য দূর করিতে গিয়া ধনীদের হত্যা করা হইয়াছে। রুশিয়ায় হাজার-হাজার ধনীকে হত্যা করা হইয়াছে ও তেলঙ্গানাতে শত-শত ধনীকে খুন করা হইয়াছে। বিনা হত্যায় ও বিনা খুন-জখমে আমি ভারতে এই কার্য সাধন করিতে চাহিতেছি। আমার কাজ প্রেমের পথে হইবে। ভগবানের ইচ্ছা এই যে, আমরা যেন সুখ এবং দুঃখ উভয়কে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লই। যদি গ্রামের সকলে নিজ-নিজ স্বার্থের কথা চিন্তা করে এবং প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার না করে তাহা হইলে ঐরূপ গ্রাম গ্রামই নহে—উহা শ্মশান—উহা জঙ্গল।"

॥ ৩১ ॥ ভূমিসমস্যা সমাধানে অহিংসপথের বিচার

মানুষকে বিচার বুঝাইলে সে বুঝিতে পারিবে এবং যখন সে তাহা বুঝিবে তখন সে তদনুযায়ী আচরণ ও কার্য করিবে। এই বিশ্বাসই অহিংসার ভিত্তি। মানুষ পশু নহে। পশুকে বিচার বুঝাইলে সে তাহা বুঝে না। মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য এইখানেই। পশুকে ভগবান স্বাধীন

বোধশক্তি দেন নাই। মানুষকে তিনি তাহা দিয়াছেন। পশুকে ভগবান যেটুকু বুদ্ধি ও চেতনা দিয়াছেন তদনুসারে সে আচরণ করিবে—তাহা ভাল হউক আর মন্দ হউক। কিন্তু মানুষকে তিনি অপরিমিত বোধশক্তি দিয়াছেন। এই বোধশক্তির মধ্যে আত্মজ্ঞানের শক্তিও নিহিত। মানুষ তাহার আত্মজ্ঞানকে অনন্তগুণ বিকশিত করিতে পারে। নিজেকে আপন দেহে সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবা আত্মজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা সংকুচিত অবস্থা। সারা জগতকে—সারা সৃষ্টিকে নিজেরই বিস্তার বলিয়া গ্রহণ করা হইল আত্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকশিত অবস্থা। আত্মজ্ঞান যতই বিকশিত হইবে ততই হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ হইবে এবং ততই জীবন প্রেমময় হইবে। এই প্রেমের শক্তিতে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত হয়। আবার জীবন যতই প্রেমময় হইতে থাকিবে আত্মজ্ঞানের বিকাশ-সাধন ততই সহজ হইবে। এজন্য প্রেমকে জীবনের মূলতত্ত্ব বলা হয়। আত্ম-জ্ঞানের বিকাশ তথা প্রেমের বিকাশসাধনই ভূদানযজ্ঞের মূল উদ্দেশ্য।

অহিংসার পথে ভূমি-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব কি? বিনোবাজী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজমান এবং আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার নিয়মন তিনিই করিয়া থাকেন এবং সারা প্রেরণা তিনিই দান করিয়া থাকেন, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, সকলের হৃদয় পরিবর্তন করিতে পারা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে। যদি কালাত্মা দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন এবং তিনি পরিবর্তন করাইতে চাহেন তবে পরিবর্তন নিশ্চয় হইবে। মানুষ চাহুক বা না-ই চাহুক, যখন মানুষ প্রবল স্রোতের মধ্যে পড়ে তখন তাহার নিজের সাঁতার দেওয়ার শক্তি কোন কাজে আসে না—তখন স্রোতের শক্তিই কার্যকরী হয়। সেইরূপ মনুষ্যহৃদয়ে পরিবর্তন আনাইবার জন্য কালপ্রবাহ সহায়করূপে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। আজ তো সকলের ভূমি উত্তপ্ত হইয়া আছে। এই উত্তপ্ত ভূমির উপর দুই বিন্দু প্রেমবারি সিঞ্চন করিবার কাজ ভগবান আমার দ্বারা যদি করাইয়া লইতে চান তবে আমি তাহা আনন্দের সহিত করিব।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, "লোকে জিজ্ঞাসা করে, প্রেমের পথে, অহিংসার পথে সফলতা পাওয়া সম্ভব কি? যাঁহাদের সারা জীবন পরিবার-পরিজনদের স্নেহ-প্রীতির মধ্যে অতিবাহিত হয়, তাঁহারা প্রেমের শক্তির প্রতি

কেমন করিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন তাহাই আমার কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের জীবনই তো প্রেমময়। প্রেমই জীবনের মূলতত্ত্ব, যেমন সত্য জীবনের মূলতত্ত্ব। আসল কথা এই যে, কেহই দুর্জন নহেন। যাঁহাকে আমরা দুর্জন বলি তিনি দুর্জনতার প্রবাহে অগতিকভাবে বাহিত হইতে থাকেন এবং এইজন্যই তাঁহার মধ্যেও পরিবর্তন সৃষ্টি করা যাইতে পারে। সদ্‌গুণ আত্মায় বিদ্যমান। সত্য এবং আলো ভাবরূপ। অসত্য এবং অন্ধকার অভাবরূপ। আলোর সম্মুখে অন্ধকার টিঁকিতে পারে না।"

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভূদানযজ্ঞে এ যাবৎ ৪৩ লক্ষ একরের অধিক ভূমি পাওয়া গিয়াছে। সমস্যার তুলনায় কম হইলেও ভূমিবানেরা এত অল্পসময়ে নিঃস্বার্থভাবে যে এত অধিক পরিমাণ ভূমি প্রেমভরে ভূদানযজ্ঞে অর্পণ করিয়াছেন ইহা এক অভাবনীয় ব্যাপার। জগতে বা এই দেশে ভূমি-দান নূতন নহে চিরদিনই মানুষ ভূমিদান করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু লোকে এতদিন যে ভূমিদান কয়িয়াছেন তাহা এই মনোভাব হইতে করিয়াছেন যে, ভূমি তাঁহাদেরই অর্থাৎ ভূমির মালিক তাঁহারাই। আর সেই ভূমিদান করা হইয়াছে—মন্দিরকে, মসজিদকে বা কোন দাতব্য-প্রতিষ্ঠানকে। 'ভূমি ভগবানের ভূমি সকলের, ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে—এইবোধ হইতে দরিদ্র ভূমিহীনের জন্য ভূমিদান করা কর্তব্য। দরিদ্র ভূমিহীনকে তাহার অধিকার প্রত্যর্পণ করা কর্তব্য।' এরূপ আবেদনে সাড়া দিয়া দরিদ্র ভূমিহীনের জন্য ভূমিদান করা জগতে এই প্রথম। এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ বিপ্লবাত্মক দানে এত ভূমি সংগৃহীত হওয়াতে অহিংস-পন্থার সফলতার ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট হইয়াছে। অহিংসার ক্রিয়া, প্রেমের ক্রিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে হইয়া থাকে এবং অপূর্ব সফলতায় উহা যখন প্রকাশ পায় তখন জগৎ চমৎকৃত হইয়া যায়। উড়িষ্যায় সমগ্র গ্রামদানের যে-অপূর্ব দৃশ্য দেখা দিয়াছে এবং তাহার দ্বারা ভূমি-ক্রান্তির দ্বার যেভাবে উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা অহিংস-প্রক্রিয়ার মহত্তম সম্ভাবনার সূচক। ভূদানযজ্ঞে এযাবৎ যাহা হইয়াছে তাহা অভাবনীয় হইলেও তাহাতে মানুষের গণিতই ক্রিয়া করিতেছে। এখনও ভগবানের গণিতের ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

॥ ৩২ ॥ হিংস্রপথের বিচার

ভূমি-সমস্যার সমাধান বা অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন এরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের মনের কোণে এই চিন্তাধারা আছে যে, মানুষ আজ যেমন আছে চিরদিন তেমনই থাকিবে। কিন্তু ইতিপূর্বে যেসব আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, এরূপ আশংকা করার কোন ভিত্তি নাই। মানুষ বিচারশীল মানুষকে সৎ-বিচার বুঝাইলে সে বুঝিবে এবং আজ না হউক কাল সে তদনুসারে আচরণ করিবে। মানুষ পশু নহে। অতএব হিংসার আশ্রয় লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি হিংসার পথ গ্রহণ করা হয়, তবে তাহাতে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব কি? যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, হিংসার পথে ধনীদের নিকট হইতে জমি ছিনাইয়া লইয়া উহা গরীবদিগকে দেওয়া যাইতে পারে তথাপি উহাতে জমি অর্থাৎ লক্ষ্মী মাত্র মিলিবে বটে, কিন্তু প্রেম পাওয়া যাইবে না অর্থাৎ হৃদয়-পরিবর্তন হইবে না। তাহাতে বিচার-বিপ্লব আসিবে না। হৃদয়-পরিবর্তন ও বিচার-বিপ্লব ব্যতিরেকে যেখানে ভূমি ধনীর হস্তচ্যুত হইবে সেখানে প্রতি-বিপ্লবের বা হিংস্র-প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে। উপরন্তু হিংসার দ্বারা কোন বিষয়ের সমাধান করিলে এক সমস্যার স্থলে আরও বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে। তাহাতে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় না, বরং সমস্যা আরও জটিল হইয়া উঠে। হিংসার নিষ্ফলতার কথা বুঝাইতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন যে, পরশুরাম ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে যাইলেন; কিন্তু সেই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি নিজেই ক্ষত্রিয় হইয়া গেলেন। উহার দ্বারা হিংসার নিষ্ফলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর এক দৃষ্টিতে পরশুরামের উপাখ্যানে হিংসার বিফলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরশুরাম একুশবার ধরাকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। একবার নিঃক্ষত্রিয় করা হইলে আবার নিঃক্ষত্রিয় করিবার অবকাশ থাকে কি? তাহার অর্থ আদৌ নিঃক্ষত্রিয় করা সম্ভব হয় নাই। ইহাতে হিংসার নিষ্ফলতা সূচিত হইতেছে। হিংসার পথে সমস্যার সমাধান সফল হউক বা না হউক, বর্তমান অবস্থায় এই দেশে হিংসার পথে ভূমি

ভূস্বামীদের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়া ভূমিহীনদিগকে স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত করানো সম্ভব কি? তেলঙ্গানায় জমিদার-জোতদারদের নিকট হইতে বলপূর্বক জমি কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র চাষীদিগকে দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সেইজমি আবার তাহাদের অধিকতর ক্ষতি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া ভূস্বামীগণকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। যতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেন্টের অস্তিত্ব আছে ততদিন হিংসার পথে জমি ছিনাইয়া লইয়া তাহা স্থায়ীভাবে রাখা সম্ভব হইবে না। এজন্য বিনোবাজী কমিউনিষ্টগণের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন যে তাঁহারা যদি তাঁহাদের পথে দরিদ্রকে ভূমি দেওয়াইতে চান তবে ছোট-ছোট হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া টোট্যাল ওয়ার-এর জন্য চেষ্টিত হউন। টোট্যাল ওয়ারে দেশ যদি কমিউনিস্টদের পদানত হয় তবেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। নচেৎ স্থানে স্থানে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির দ্বারা সাময়িকভাবে কিছু কার্যসিদ্ধি হইলেও তাহা অনতিবিলম্বে অধিকতর ধ্বংসসাধন করাইয়া তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে সন্দেহ নাই। সময়, অবস্থা, দেশের ঐতিহ্য ও দৃঢ়মূল সংস্কৃতি দেশের বিপ্লব বা ক্রান্তির প্রকৃতি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। রুশিয়ার তদানীন্তন অবস্থায় এবং সেইকালে যেভাবে ও যে-প্রকৃতিতে বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহা যে ভারতেও হইতেই হইবে— এমন কথা নাই! বরং কাল, অবস্থা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ভারতের ক্রান্তি ভারতের নিজস্ব পথে সংঘটিত হইবে। বিনোবাজী এই সম্পর্কে বলেন—"বিপ্লব (ক্রান্তি) শব্দের অর্থ সাম্যবাদীদের অপেক্ষা আমি বেশী বুঝি। ক্রান্তির প্রকৃতি দেশ ও কাল অনুসারে পরিবর্তিত হয়। মার্কস্ যেরূপ লিখিয়াছেন, সেরূপ ক্রান্তি প্রত্যেক দেশে এবং সব সময়ে হওয়া সম্ভব নহে। ভারতের ক্রান্তি ভারতের নিজস্ব পন্থায় হইবে। আমি ভারতীয় সংস্কৃতি অধ্যয়ন করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, অন্যান্য দেশ ভারতের নিকট হইতে বহু বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। আমি যে-ক্রান্তির জন্য প্রচেষ্টা করিতেছি তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকূল। ইহা কোন ছাঁচে-ঢালা উগ্রপন্থী ক্রান্তি নহে। এই চিন্তাধারা ভালভাবে উপলব্ধি করিয়া আমাদের কর্মীরা ভূদানযজ্ঞের কাজে আত্মনিয়োগ করুন ইহাই আমি

চাহিতেছি।" সমাজের একজনের জন্য অন্যকে ধ্বংস করিতে হইবে ইহা কিছুতেই উচিত নহে। ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থি। এই সংস্কৃতির ভিত্তির উপর অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতের ক্রান্তি আসিবে।

সাধারণত এরূপ মনে করা হয় যে, মার্কস-এর ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়া-লিজম্ স্বীকার করিলে সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত ও বিপ্লব সৃষ্টিতে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু বিনোবাজী সেরূপ মনে করেন না। এ সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অনেকের চোখ খুলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেন, "আমি ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়া-লিজম্‌কে 'বৈতর্কিক বস্তুবাদ' নাম দিয়াছি। 'ভৌতিকবাদ' নাম উপযোগী নহে ভৌতিকবাদী তাহাকে বলে যাহার কাছে পানাহার ও আমোদ-প্রমোদই জীবনের সার বলিয়া বিবেচিত হয়। বিতর্কবাদ (ডায়ালেক্টিস্) হইতেছে—কেবলমাত্র এক বিচারপদ্ধতি। উহা হইতে ক্রান্তির সিদ্ধান্তের উদ্ভব হইতে পারে—উপক্রান্তির সিদ্ধান্তও আসিতে পারে। টক্ লেবুর গাছে যদি মিষ্টি ফলের কলম তৈয়ারী করা হয় তবে তাহাতে অম্ল-মিঠা ফল উৎপন্ন হইবে। থিসিস্, এন্টিথিসিস্ ও সিনথিসিস্ ঐরূপ প্রক্রিয়া। এই থিওরী হইতে ক্রান্তির পক্ষে কি করিয়া উৎসাহ পাওয়া যায় বা ধনীদিগকে হত্যা করিতে হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত আসে তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

"প্রত্যেক জিনিসে গুণ ও দোষ উভয়ই বিদ্যমান থাকে। দোষময় বস্তুর উপর গুণময় বস্তুর আক্রমণ হইলে এক তৃতীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। যাহাতে ঐ দুই-এর দোষ থাকে না। পরন্তু ঐ দুই-এরই গুণ উহাতে থাকে। আজ সমাজে এই এক বিচার রহিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার যোগ্যতা অনু-সারে বেতন দেওয়া চাই। ইহাতে এই এক গুণ আছে যে, ইহাতে কাজ করিবার উৎসাহ জন্মে। কিন্তু ইহাতে এই এক অন্যায় রহিয়াছে যে, ইহার ফলে দুর্বলের সর্বনাশ হয়। এইজন্য এই বিচারের বিরুদ্ধে সমতার বিচার খাড়া করা হইয়াছে। তাহাতেও এই এক দোষ আছে যে, উহাতে অলস লোকেরা উৎসাহ পায়। সমগ্র ধন একজনের হাতে জমা করিবার যে প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আত্যন্তিক সমতার কথা উঠিয়াছে। পরন্তু তাহাতেও দোষ আছে। এইজন্য উহার ফল এই হইবে যে, এক তৃতীয়

বিচারের উদ্ভব হইবে—যাহাতে ঐ দুই-এর গ্রাহ্য অংশ বিদ্যমান থাকিবে, কিন্তু উহাদের ত্যাজ্য অংশ থাকিবে না। অতঃপর ঐ নূতন জিনিসে যদি দোষ থাকিয়া যায় তবে উহার বিরুদ্ধে আর একটি জিনিস খাড়া হইয়া যাইবে। তখন আবার ঐ প্রক্রিয়া শুরু হইয়া যাইবে। এইরূপে বিতর্কবাদ এক বিচার-প্রণালী মাত্র হইতেছে। উহা হইতে কোন বিশিষ্ট আচার প্রণালীরই উদ্ভব হইবে এমন কথা নাই, যদিও মার্কস্ সেই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত বিতর্কবাদের বিচার-প্রণালী হইতেই উদ্ভূত এবং মাত্র সাম্যবাদই ঐ বিচার-প্রণালী হইতে উদ্ভূত হইতে পারে—অন্য কিছুই নহে। কিন্তু এক বিচার-প্রণালী হইতে একটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের উদ্ভব অনিবার্য—একথা আমি মানি না।"

এক্সপ্রপ্রিয়েশান অর্থাৎ 'বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া'র দ্বারা রুশিয়া প্রভৃতি দেশে ক্রান্তি আসিয়াছে। কিন্তু ভারতের ক্রান্তি অপরিগ্রহ (নন্-পজেশন)-এর দীক্ষা গ্রহণের দ্বারা আসিবে। এই সম্পর্কে বলিতে গিয়া বিনোবাজী যে গভীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এইঃ—"আমি যে-বিচার-ধারা চালাইতে চাহিতেছি উহার বিরোধী যে-বিচার আজ সমাজে প্রচলিত আছে তাহাকে 'অপহরণ' বলে। যাঁহারা 'অপহরণ' বিচারধারায় বিশ্বাস করেন তাঁহাদের অভিমত এই যে, ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজের জন্য এবং সমাজের স্বার্থের জন্য ব্যক্তির সম্পত্তি 'অপহরণ' করা দোষ নহে—বরং ব্যক্তির সম্পত্তি 'অপহরণ'-কার্যে যাঁহারা বাধা দিতে চান তাঁহাদের চিন্তাধারা ভ্রান্ত। আজ ঐ বিচারের দিকে পৃথিবীর কয়েকটি দেশ আকৃষ্ট হইয়া আছে। উহার বিরুদ্ধে আমি 'অপরিগ্রহ'-বিচার খাড়া করিয়াছি। সাধারণত ইহা মনে করা হয় যে, 'অপরিগ্রহ' গান্ধী, বিনোবা প্রভৃতির ন্যায় সন্ন্যাসীদের জন্য এবং জনসাধারণের জন্য 'অপরিগ্রহ' নহে—লোভ। সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ আদর্শস্বরূপ গণ্য করা হয়। কিন্তু গার্হস্থ্য-জীবনেও 'অপরিগ্রহ'-আচরণ করা যায়। ধর্ম-বিচারকে ঐভাবে খণ্ডিত করিলে তাহার ফলও কেবল সংকুচিত আকারেই পাওয়া যায়। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, নির্লোভ লোভীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে সে নিজেই লোভী হইয়া পড়ে। পরশুরাম ক্ষত্রিয়ত্ব দূর করিতে গিয়া নিজেই ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছিলেন—এই দৃষ্টান্ত তো আমাদের কাছেই আছে।

যাহার বিরোধিতা করিতে হইবে, তাহার শাস্ত্র যদি আমরা মান্য করি তবে তাহার স্থূলরূপে নষ্ট করিতে আমরা সক্ষম হইতে পারি, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে আমরা উহাকে অমর করিয়া রাখিয়া দেই। আজ দুনিয়ায় লোভের ও পরিগ্রহের রাজ্য চলিতেছে। পরিগ্রহের আশপাশে এরূপ আইন খাড়া করা হইয়াছে, যাহাতে পরিগ্রহকে অন্যায় বলিয়া মনে করা না হয়। চুরিকে আমরা অপরাধ গণ্য করি। কিন্তু যেব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া চুরির প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে তাহার বৃত্তিকে আমরা চুরি বলিয়া মনে করি না। উপনিষদের এক উপাখ্যানে রাজা বলিতেছেন,—'আমার রাজ্যে কেহ চোর নাই—কৃপণও নাই।' কারণ কৃপণই চোর সৃষ্টি করে। চোরকে আমরা জেলে পাঠাই আর চোরের জন্মদাতাকে আমরা মুক্ত রাখি এবং সে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া গদীতে উপবিষ্ট থাকে। ইহা কেমন বিচার? গীতাও ইহাকে চোর বলিয়াছেন। কিন্তু আজ তো আমরা গীতাকে সন্ন্যাসীদের গ্রন্থ মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া বসিয়াছি।"

॥ ৩৩ ॥ ভূমির প্রশ্ন না উঠিবার কারণ

জমির মালিক বলিতে পারেন, 'অন্যেরা তাহাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, ধন-বাড়ী, ব্যাংক প্রভৃতিতে নিয়োগ করিয়া লাভবান হইতেছে। আমি সেরূপ আমার সঞ্চিত অর্থ ভূমিতে খাটাইতেছি। ইহাতে আমি কি দোষ করিলাম?' সকল ভূমির মালিক যে অন্যায়ভাবে ভূমি অর্জন করিয়াছেন তাহাও নহে। সে প্রশ্নও এখানে আসে না। তবে ভূদানযজ্ঞের বিচারধারা এই যে ন্যায়ভাবে হউক, অন্যায়ভাবে হউক, যেভূমি তাহার হাতে আসিয়াছে সেভূমি তাহার নহে—সেভূমি ভগবানের। সে ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি উঠানো হয়—যুগ-যুগ চলিয়া গেল, এতদিন সে প্রশ্ন উঠে নাই কেন? তাহা হইলে তো এমনভাবে তাহারা ভূমি-সংগ্রহ করিত না। এই প্রশ্ন এতদিন উঠানো হয় নাই এইজন্য যে যতদিন লোকসংখ্যা কম ছিল এবং ভূমি বেশী ছিল ততদিন এ প্রশ্ন উঠাইবার প্রয়োজন হয় নাই। আজ লোক বেশী, জমি কম। দারিদ্র্যের চাপে সারা সমাজদেহ নিষ্পেষিত। এজন্য এই প্রশ্ন উঠিতেছে। অবস্থার চাপে এই

বুনিয়াদী সত্যবোধ সমাজে জাগ্রত হইতেছে। আমেরিকায় এই প্রশ্ন উঠে নাই। অষ্ট্রেলিয়ায়ও এই প্রশ্ন উঠে নাই। কারণ সেখানে তাহা উঠিবার প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ডে এখনও উঠে নাই, কিন্তু তাহা অন্য কারণে। সেখানে ভূমির অভাবজনিত দারিদ্র্য অন্য উপায়ে দূর করার সুযোগ আসিয়াছিল। ভারতে আজ এই সত্যকে স্বীকার ও কার্যে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এজন্য এই প্রশ্ন আজ সর্বাপেক্ষা জরুরী।

॥ ৩৪ ॥ 'দান' শব্দে আপত্তি

দরিদ্রের প্রতি দয়া করা, দরিদ্রের উপকার করা পুণ্যকর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। সাধারণ লোকে পুণ্যকর্ম বলিতে কি বুঝে? যাহা মানুষের ব্যক্তিগত বা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না অথচ যাহা মানুষ দয়াপরবশ হইয়া অন্যের উপকারের জন্য করে—তাহা করা হইলে পুণ্য অর্জিত হইল বলা হয়। ইহার মধ্যে এই মনোভাব নিহিত আছে যে দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের জন্য ধনী কিছুমাত্র দায়ী নহে এবং দারিদ্র্য-মোচনের জন্য তাহার কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। অর্থাৎ ধনীর নিকট হইতে কিছু পাইবার অধিকার দরিদ্রের নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধনিকত্ব ও দারিদ্র্য উভয়ের যুগপৎ উৎপত্তি শোষণেই। একজনের দ্বারা অন্যে তাহার স্বাভাবিক জীবিকার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে তবেই একজন হয় ধনী ও অন্যজন হয় দরিদ্র। এজন্য দরিদ্রের অধিকারের দাবীতে ধনীর নিকট হইতে ভূমি চাহিতে হইবে। সাধারণ দান হিসাবে জমি দান চাওয়া হইলে সেই দান দরিদ্রের পক্ষে গ্রহণ করা ধনীর কৃপা গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছু নহে। ইহাতে দরিদ্রের অসম্মানই করা হয়। ইহা হইতেছে ভিক্ষার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা বর্তমান সমাজের রীতি। এজন্য মহাভারতের 'দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়' অথবা খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের 'চ্যারিটী' অথবা মুসলমানদিগের 'জাকাত' প্রভৃতি নীতিবাক্য আজ বঞ্চিতের সম্মুখে কোন আশার বাতি তুলিয়া ধরিতে পারে না। কারণ এই ভিক্ষালব্ধ অন্ন আসে উপর হইতে। সমাজের নিম্নের স্তরে যাহারা দুর্দৈবগ্রস্ত আছে তাহাদের হাতপাতা আর কোনদিন ঘুচে না। ইহার পিছনে নিষ্পেষণ-যন্ত্র নিঃশব্দে কাজ করিয়া যায়। এজন্য 'ভূদানযজ্ঞে' দান

শব্দের প্রয়োগে আপত্তি উঠিয়া থাকে। কারণ 'ভূদানযজ্ঞ' তো ভূমিহীন দরিদ্রের অধিকারের দাবীতে ভূমি দেওয়ার জন্য আহ্বান। এখানে 'দান' শব্দের প্রয়োগ কি অর্থে করা হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক। যজ্ঞ, দান ও তপঃ—এই তিন শব্দ ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহান্ স্থান অধিকার করিয়া আছে। উহা প্রয়োগ করিয়া ভারতের মানুষকে মহৎ কার্য সম্পাদনে যেরূপ প্রেরণা দান করা যায় সেরূপ অন্য শব্দ প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব হয় না। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনমত উহাদের অর্থের বিস্তার সাধন করা হইয়াছে। গীতায় 'যজ্ঞ'-শব্দ 'পরোপকার' বা 'নিস্বার্থ সেবা' অর্থে ব্যবহার করিয়া উহার অর্থের বিকাশ সাধন করা হইয়াছে। ইহাকে শব্দ-ক্রান্তি বলা যায়। মহাত্মা গান্ধীও বর্ণ-ব্যবস্থা, ট্রাস্টীশিপ্ ইত্যাদি শব্দকে অভিনব অর্থে প্রয়োগ করিয়া ঐসকল শব্দের ভাবার্থে ক্রান্তি আনয়ন করিয়াছেন। এজন্য শাস্ত্রজ্ঞ বিনোবাজীও 'দান'-শব্দ পরিত্যাগ না করিয়া উহা এক ক্রান্তি-কারক অর্থে 'ভূদানযজ্ঞে' সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শংকরাচার্য বলিয়াছেন—"দানং সংবিভাগঃ"। দান-এর অর্থ সম্যক বন্টন বা সংগত বণ্টন। এই অর্থেই 'ভূদানযজ্ঞে' দান শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। দানের অর্থ এই যে, নিজের কাছে যাহা আছে তাহার সংবিভাজন। এই-প্রকার দানের যিনি দাতা তাঁহার হৃদয়-পরিবর্তন হইয়া থাকে। দানের প্রচলিত অর্থ যাহা স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ আছে তাহা এই—"স্বস্বত্বধ্বংসপূর্বক পরসত্ত্বোৎপত্ত্যনুকূলত্যাগঃ দানম্" অর্থাৎ নিজের স্বত্ব নষ্ট করিয়া অন্যের সত্ত্ব সৃষ্টি করার জন্য দেওয়াকে দান বলে। দানের এই প্রচলিত অর্থে উহা ভূদানযজ্ঞে ব্যবহার করা হয় নাই। বিনোবাজী বলেন যে—দানের প্রচলিত যে-অর্থ তাহা দানের প্রকৃত অর্থের বিকৃত অর্থমাত্র। দানের প্রকৃত অর্থ সংবিভাগ। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—" আমি ভিক্ষা হিসাবে দান চাহিতেছি না। দান শব্দের অর্থ লোকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে —যেমন ধর্ম, বিজ্ঞান, ত্যাগ, নীতি ইত্যাদি শব্দের অর্থ বিকৃত করা হইয়াছে।" এই অর্থের মধ্যে দরিদ্রের অধিকারের দাবীতে ধনীর নিকট হইতে ভূমি চাওয়ারই ভাব রহিয়াছে। ভূমি ভগবানের দান ও ভূমি উৎপাদনের মৌলিক সাধন এই কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য এক দৃষ্টিতেও ভূদানযজ্ঞে 'দান' শব্দের

উক্ত অর্থ অত্যন্ত উপযোগী হইয়াছে। মনুষ্য সামাজিক জীব। কোন মানুষ যাহা পাইয়াছে বা যাহা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার ঐ পাওয়া ও করার ব্যাপারে সারা সমাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা রহিয়াছে। এজন্য মানুষ সমাজের নিকট ঋণী এবং সমাজ প্রত্যেক মানুষের নিকট হইতে ঐ সকলের অংশ পাইবার অধিকারী। সুতরাং এই দৃষ্টিতে 'দান' শব্দের এই অর্থ সহজে উপলব্ধি করা যায়। অতএব 'ভূদানযজ্ঞের' দ্বারা ধনীদের নিকট বিনোবার ভিক্ষার সংবাদমাত্র পেঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে এইরূপ যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের ধারণা ভুল।

ভূদানযজ্ঞের 'দান' শব্দ উহার প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া অন্য আরও এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন —"ভূদানযজ্ঞের 'দান'-শব্দে কোন-কোন লোকের খট্‌কা লাগিয়াছে। কতিপয় বন্ধু এক নূতন বিবাহবিধি রচনা করিয়াছেন। যখন তাঁহারা ঐ বিধি রচনা করিতে বসিলেন তখন কন্যাদান শব্দে তাঁহাদের খট্‌কা আসিল। গরু-মহিষের দানের মত কন্যার দান কিরূপে করা যায়? মূল বিবাহ-বিধিতে 'কন্যাদান' শব্দই নাই। সেখানে 'সম্প্রদান' অর্থবোধক শব্দ আছে। উহার অর্থ কেবলমাত্র 'দেওয়া হইল' এইমাত্র। ইঁহার দ্বারা দান করা হইল, উঁহাকে দান প্রদান করা হইল—এইরূপ অর্থ ইহাতে নাই। যে-জিনিসে আমার মালিকানা আছে তাহাতে আজ হইতে তোমার মালিকানা হইল—এইরূপ ভাব উহাতে নাই। 'দেওয়া হইল' কেবলমাত্র ইহা বলিলে কোন গৌণত্ব বুঝায় না। এইজন্য ঐ নূতন বিবাহবিধিতে 'কন্যা-সম্প্রদান' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেখানে 'সম্প্রদান' আছে সেখানে 'অপদান' আসিয়াই যায়।

"ভূদানযজ্ঞে এইপ্রকারের কল্পনা রহিয়াছে। জমির মালিক উহার স্বামী নহেন। তিনি কন্যার বাপেরই মত প্রতিপালকমাত্র। সৎ পাত্র দেখিয়া তাহাকে ঐ জমি সম্প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ সৎ পাত্রের খোঁজও করিতে হইবে। এই ব্যাপারে মালিকানার কল্পনা কোথাও নাই।"

॥ ৩৫ ॥ ভূদানযজ্ঞে 'যজ্ঞ'-শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য

গ্রন্থের প্রারম্ভে 'যজ্ঞ'-শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। উহা হইতেছে 'যজতি পূজয়তি' 'ইত্যর্থঃ' অর্থাৎ পূজা। কিন্তু গীতা যজ্ঞের

অর্থ বিকাশ করিয়াছেন। বিনোবাজী তাঁহার 'গীতা-প্রবচনে' যজ্ঞের গীতোক্ত অর্থ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপে এই-রূপঃ—আমরা তিনটি সংস্থা সঙ্গে লইয়া জন্মগ্রহণ করি। (১) এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বা এই অপার সৃষ্টি, যাহার এক অংশ আমরা। (২) যে-সমাজে আমাদের জন্ম হইয়াছে সেই সমাজ। উহা পিতা-মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, প্রতিবেশী ইত্যাদি লইয়া গঠিত। (৩) দেহ, মন ও বুদ্ধির সংগঠন। প্রতি-দিনের জীবনযাত্রায় আমরা আমাদের আশপাশের সৃষ্টিকে ব্যবহার করি। তাহার ফলে সৃষ্টিতে যে-ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করা যজ্ঞের প্রথম অর্থ বা উদ্দেশ্য। যথা হাজার-হাজার বৎসর যাবৎ চাষাবাদ করিয়া ভূমির উর্বরতার যে-ক্ষয়সাধন করা হইয়াছে তাহা পূরণ করা যজ্ঞ। যজ্ঞের দ্বিতীয় অর্থ সৃষ্টিকে ব্যবহার করার ফলে তাহাতে যে-অশুচি জমিয়া উঠে তাহার শুদ্ধিকরণ। যথা—কূয়া ব্যবহার করার ফলে আশপাশে নোংরা হইয়া থাকিলে তাহা পরিষ্কার করা। তৃতীয় অর্থ—কোন প্রত্যক্ষ নির্মাণ কার্য করা। যথা—তুলা উৎপাদন করত সূতা কাটিয়া ও বস্ত্র-বয়ন করিয়া বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করা বা নূতন বস্ত্র তৈয়ারী করা। সমাজে পিতা-মাতা, প্রতিবেশী, গুরু, মিত্র প্রভৃতি সকলের সেবাদ্বারা আমরা পুষ্ট হইয়াছি। তাঁহাদিগকে সেবা করিয়া তথা সমাজের সেই ঋণ পরিশোধ করিবার প্রক্রিয়াকে 'দান' বলা হয়। মন, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়যুক্ত শরীরের যে-ক্ষয়ক্ষতি প্রতিনিয়ত চলিতেছে তজ্জনিত যে বিকার বা দোষ উৎপন্ন হয় তাহার শুদ্ধি করাকে 'তপঃ' বলা হয়। কিন্তু দান, যজ্ঞ, তপঃ-কে এইরূপ পৃথক-পৃথক করিয়া দেখার প্রয়োজন নাই। কারণ আসলে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তিনে মিলিয়া এক দিব্য-সংস্থা রচিত হইয়াছে। সৃষ্টির মধ্যে সমাজ ও শরীর সমাবিষ্ট রহিয়াছে। এজন্য যজ্ঞের ব্যাপকতর অর্থ হইতেছে এই যে, সমাজ সম্পর্কে যে-দানক্রিয়া করা হয় তাহাও যজ্ঞ এবং শরীর সম্পর্কে যে-তপঃক্রিয়া করা হয় তাহাও যজ্ঞ।

বিনোবাজী ভূমিদানের ভিত্তিতে যে-ক্রান্তিকারী আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছেন তাহার দ্বারা যজ্ঞের এই তিন উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলিয়া এই

আন্দোলনের নামকরণ করা হইয়াছে ভূদানযজ্ঞ। ইহাতে ক্ষয়পূরণ, শুদ্ধিকরণ ও সংগঠন এই তিন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

(১) ক্ষয়পূরণ—বিকট ভূমি-ব্যবস্থা এবং কুটিরশিল্পসমূহ ধ্বংস হওয়ায় দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়া সমাজের যে-ক্ষয় হইয়াছে ভূদানযজ্ঞে ভূমির সমবণ্টন ও গ্রামীকরণ, কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠা ও বুনিয়াদী শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থাপনার দ্বারা উক্ত ক্ষয় পূরণ করা হইতেছে। ভূমি কতিপয়ের হাতে থাকার দরুন ভূমির সদ্‌ব্যবহার না হওয়ায় এবং ভূমি পতিত ও অব্যবহৃতরূপে পড়িয়া থাকায় সৃষ্টির যে-ক্ষতি হইয়াছে তাহাও ভূদানযজ্ঞের দ্বারা পূরণ করা হইতেছে।

(২) শুদ্ধিকরণ—ভূদানযজ্ঞ দাতাগণের হৃদয়ে ত্যাগ ও প্রেমের ভাব সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি সাধন করিতেছে। দরিদ্রগণ পরনির্ভরশীলতা ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বন বৃত্তিতে সমৃদ্ধ হইতেছে। ব্যক্তিগত মালিকানাবোধের বিলোপনের দ্বারা সমগ্র জনমানস পরিশুদ্ধ হইতেছে।

(৩) গঠনকার্য—ভূদানযজ্ঞের চরম পরিণতিতে সাম্যযোগী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহাই মহত্তম সংগঠন।

এরূপে ভূদানযজ্ঞের মাধ্যমে মহান 'যজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হইতেছে।

ভূদানযজ্ঞে 'যজ্ঞ ও দান' কি বুঝা গেল। ইহাতে তপের স্থান আছে কি? তপঃ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন, "প্রাচীন ঋষিগণ এবং গীতা তিনটি জিনিসের ব্যবস্থা করিয়াছেন—যজ্ঞ, দান ও তপঃ। ভূদানযজ্ঞের দ্বারা আমি যজ্ঞ ও দানের আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু যদি আমরা তপশ্চর্যা না করি, তবে দান ও যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে না। এই ত্রয়ী এক সম্পূর্ণ বস্তু। উহা অবিভাজ্য। কর্মিগণ 'তপঃ' করিবেন। দান ও যজ্ঞ জনগণ করিবেন। এজন্য আমাদিগকে তপঃ-এর পরাকাষ্ঠা সাধন করিতে হইবে।"

॥ ৩৬ ॥ প্রজাসূয় যজ্ঞ

সমাজে পরম্পরাগত এমন কতকগুলি পুরাতন মহান শব্দ প্রচলিত আছে যাহার প্রতি সমাজের লোকের শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। সেইসকল শব্দকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাতে সমাজের বর্তমান প্রয়োজন

অনুসারে নূতন অর্থ যোগ করা এবং উহাকে বিকশিতরূপ দান করিয়া উহাতে নব জীবন সঞ্চার করা অহিংস-প্রয়োগের এক উৎকৃষ্ট প্রক্রিয়া। উহা এরূপ মৃদুভাবে সাধন করা হয় যাহাতে লোকে ধরিতে পারে না যে, পুরাতন শব্দের মধ্যে নূতন অর্থ প্রবেশ করানো হইতেছে। ভারতীয় পরম্পরায় যে-সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহাও এই অহিংস-প্রক্রিয়ায়ই সাধন করা হইয়াছে। গীতায় 'যজ্ঞে'র অর্থও এইভাবে বিকাশ করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বর্ণ-ব্যবস্থার পুরাতন কল্পনায় সমাজের বর্তমান প্রয়োজন অনুসারে উহাতে নূতন অর্থ সংযোজিত করিয়াছেন। 'ট্রাষ্ট্রী'-শব্দের ব্যবহারও তিনি ঐভাবে করিয়াছেন। বিনোবাজীও ঐ প্রক্রিয়ার প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। 'ভূদানযজ্ঞ'-শব্দ উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। উহাতে দান, যজ্ঞ, তপঃ প্রভৃতির পরম্পরাকে বর্তমান সমস্যার সহিত সংযোগ করা হইয়াছে। ঐ প্রক্রিয়ায় তিনি 'রাজ-সূয়-যজ্ঞে'র কল্পনাকে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রগতিমূলক আদর্শের সহিত সংযোজিত করিয়া 'ভূদানযজ্ঞ'-কে 'প্রজাসূয়যজ্ঞ' আখ্যা দিয়াছেন। রাজসূয়যজ্ঞের অর্থ রাজার অভিষেক। সেরূপ প্রজাসূয়যজ্ঞের অর্থ প্রজার 'অভিষেক' অর্থাৎ আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা।

॥ ৩৭ ॥ ভূ-কুরবাণী

'ভূদানযজ্ঞ'-কে ইসলাম ধর্মের ভাষায় 'ভূ-কুরবাণী' বলা যায়। মুসলমান জনসাধারণের নিকট উহা অধিকতর বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। লেখক ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচারের জন্য মালদহ জেলায় পাদ-পরিক্রমা করিতেছিলেন তখন তাঁহার সভাগুলিতে অধিক সংখ্যায় কৃষকশ্রেণীর মুসলমান শ্রোতা উপস্থিত হইতেছিলেন। যদিও তাঁহারা আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত ভূদানযজ্ঞের ভাবধারার কথা শুনিতেন তথাপি 'ভূদানযজ্ঞ'-শব্দটি তাঁহাদের কাছে তেমন বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী হইত না—ইহা লক্ষ্য করা হয়। এজন্য লেখক মুসলমান শ্রোতাদের কাছে 'ভূদানযজ্ঞে'-র পর্যায় বা সমান অর্থবাচক শব্দরূপে 'ভূ-কুরবাণী' বলিতে থাকেন এবং তাহাতে ফল বেশ ভাল হয়। লেখক এ সম্পর্কে বিনোবাজীকে

লেখেন। বিনোবাজী তাহার উত্তরে লেখেন—"মুসলমানোঁকো সমঝানে কে লিয়ে যজ্ঞ কে বদলে 'কুরবাণী'-শব্দ কা ইস্তমাল কিয়া হ্যায় ওহ্ উচিত হী হ্যায়। ভূদান সে বঢ়কর কুরবাণী অওর ক্যা হো সকতী হ্যায়?"

অর্থাৎ "মুসলমানদিগের বুঝিবার সুবিধার জন্য আপনি 'যজ্ঞের' পরিবর্তে 'কুরবাণী'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ঐরূপ করা উচিতই। ভূমি-দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 'কুরবাণী' আর কি হইতে পারে?"

॥ ৩৮ ॥ না বুঝিয়া দান দেওয়া অনুচিত

এই আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বড় কথা দাতার অন্তরে ভাব-ক্রান্তি আনয়নের প্রয়োজনীয়তা। এজন্য বিনোবাজী প্রথম হইতেই সকলকে সতর্ক করিয়া আসিতেছেন যে, কেহ যেন ভূদানযজ্ঞের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া দান না দেন। কারণ না বুঝিয়া দান দেওয়া হইলে ভূমি পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু সমাজে ক্রান্তির অর্থাৎ ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। এজন্য তিনি সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া তাঁহার আবেদনে (ভারতবাসীর প্রতি) লিখিয়াছেন—"আমাদের তিনটি সূত্র আছেঃ—

(১) আমাদের কথা উপলব্ধি করিয়াও যদি কেহ ভূমি না দেন তবে আমাদের তাহাতে দুঃখ নাই। কারণ আমরা মনে করি, আজ যিনি দিতেছেন না তিনি কাল দিবেন। 'বিচার-বীজ' অঙ্কুরিত না হইয়া যায় না।

(২) আমাদের কথা বুঝিয়া যদি কেহ ভূমি দেন তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়—কারণ তাহার ফলে সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(৩) আমাদের কথা না বুঝিয়া কোনরূপ চাপে পড়িয়া যদি কেহ দেন তবে তাহাতে আমাদের দুঃখ হইবে; কারণ যেকোন রকমে জমি সংগ্রহ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু আমাদিগকে সর্বোদয়ের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে হইবে।"

ইহা সত্ত্বেও বহুলোক ঠিকমত না বুঝিয়া মাত্র অন্যদের দান দেওয়া দেখিয়া দান দিয়াছেন ও এরূপে ভবিষ্যতেও দিবেন। ঐ সব দানকে প্রকৃত ভূদানযজ্ঞের দান বলা যাইতে পারে কি? ঐ সব দান শ্রদ্ধায় দেওয়া হইয়াছে বা হইবে, কারণ অন্যকে দেখিয়া দেওয়ার অর্থ শ্রদ্ধায় দেওয়া। শ্রদ্ধায়

কোন কাজ করা ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করার এক প্রকৃষ্ট পন্থা। অতএব ঐ দান ভূদানযজ্ঞে গ্রাহ্য। তবে যাঁহারা দান দিয়াছেন বা দিবেন তাঁহারা সকলে দানের উদ্দেশ্য ঠিকমত উপলব্ধি না করা পর্যন্ত ভূদানযজ্ঞ সফল হইল বলিয়া গণ্য হইবে না।

॥ ৩৯ ॥ ধনীদের আন্তরিকতার প্রশ্ন

বলা হয় যে, ধনীরা যে-দান দিয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ কিছু আন্তরিকতা নাই, উহাতে কপটতা আছে। এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"মানুষের হৃদয়ে সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব অহরহ চলিতেছে। উহা অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। তাহাতে সৎ-এর রক্ষা ও অসতের নাশ হইয়া থাকে। ধনীর কৃতকার্যের মধ্যে কিছু-না-কিছু অন্যায় যে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যায় পন্থা অবলম্বন না করিলে কি কখনও হাজার হাজার একর জমি এক হাতে জমা হওয়া সম্ভব? যেসব ধনী দান দেন তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ প্রকারের দ্বন্দ্ব শুরু হইবে—'আমরা যাহা করিয়াছি তাহা কি ঠিক হইয়াছে?' পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি দান করিবেন। তাঁহারা অন্যায় পরিত্যাগ করিবেন। এইভাবে তাঁহাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হইবে।"

॥ ৪০ ॥ ধনীদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির প্রশ্ন

কেহ কেহ আক্ষেপ করেন যে, বিনোবাজী নিজেকে ধনীদিগের 'ভাই, পুত্র' ইত্যাদি রূপে অভিহিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছেন। ইহা ঠিক কাজ হইতেছে না। উহার উত্তরে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"তাহা হইলে কি আমি ধনীদের অপ্রতিষ্ঠা ঘটাইব? আমি তাঁহাদিগেরই দ্বারা তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করাইয়া লইয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিতেছি—ইহাতেই কি আপনাদের আপত্তি হইতেছে? তবে কি আমি তাঁহাদের দ্বারা বদমাশি করাইয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠার হানি করিব? এমনি তো তাঁহাদের বদমাশি রহিয়াছে। আরও বদমাশি করার জন্য কি তাঁহারা আমার কোন অপেক্ষা রাখেন? সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের কর্তব্য

করাইয়া লইতে হইবে। তাঁহাদের প্রতি প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করা উচিত। দান যিনি দেন আর যিনি গ্রহণ করেন তাঁহারা উভয়ে সমপর্যায় ভুক্ত—এই ভাব মনে রাখিয়া কাজ করিলে কল্প-বৃক্ষের সমান ফল মিলিবে। অন্যথায় একমুষ্টি মাটি মিলিবে মাত্র। ধমকানি দিয়া কাজ আদায় করায় কোন আনন্দ নাই। কোনরূপ লেন-দেনের ভাব যেন ইহাতে না থাকে। আমাদের অন্তরে এরূপ শ্রদ্ধা থাকা চাই যে, যদি আমার ত্যাগ করিবার শক্তি থাকে তবে অন্য লোকের ত্যাগ করিবার শক্তি থাকিবে না কেন? যে পরমেশ্বর আমাকে চাহিবার প্রেরণা দিয়াছেন সেই পরমেশ্বর অন্যকে দিবার প্রেরণা দান করিবেন না কেন?"

॥ ৪১ ॥ বামন-অবতার

তেলঙ্গানায় ভ্রমণ কালীন তেলঙ্গানার অন্তর্গত বারঙ্গল নামক স্থানে ভূদানযজ্ঞের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিনোবাজী বলেন যে, ভূদানযজ্ঞের দান চাহিবার জন্য তিনি 'বামন-অবতার'রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"আমি ব্রাহ্মণ ছিলামই, এক্ষণে আমি 'বামন-অবতার'-রূপ গ্রহণ করিয়াছি এবং ভূমিদান চাওয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছি।" পরে একবার তিনি এই 'বামন-অবতারের' উল্লেখ করিয়া ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে তাঁহার তিন-পাদের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—"ভূদানের পর 'সম্পত্তি-দান' বামনের দ্বিতীয় পাদ। উহার পরে তৃতীয় 'পাদ' যে উঠিবে—তাহা নিশ্চিত। সেই পুণ্য-কালের জন্য জনগণের প্রস্তুত হইতে হইবে। কেননা সেই পুণ্যযুগে তাঁহা-দিগকে মানবতার বিনম্র সেবক হইতে হইবে।" ইহাতে লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগিতে থাকে যে, তিনি কি অবতার-বাদে বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন তিনি একজন অবতার। বিনোবাজী তাঁহার লিখিত এক পত্রে এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এই আশংকা দূর করিয়াছেন। "কোন জীবনধারী মানুষের সম্বন্ধে অবতার কল্পনা আমি কদাপি করি না। দেহ-মুক্ত, বিভূতি-সম্পন্ন জ্ঞানদেবের ন্যায় পুরুষ যাঁহার প্রতি আমার পরমশ্রদ্ধা, তাঁহাকেও আমি অবতার বলিয়া মনে করি না। তাঁহাকে আমি শ্রেষ্ঠ সৎ-পুরুষ বলিয়া মানি। রাম ও কৃষ্ণ অবতার। কেননা শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী-রামায়ণ প্রভৃতি

গ্রন্থ রাম ও কৃষ্ণের মানবতার উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুগণ উপাসনার জন্য এক আধার পাইয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া মানিয়া থাকি। আর কোন অবতার আমি মানি না। 'বামন-অবতার' ব্যক্তিগত ভাষা নহে; উহা ভূদানযজ্ঞের বর্ণনা মাত্র। ভূদান-যজ্ঞের রূপ 'বামনে'র ন্যায় ক্ষুদ্র। কিন্তু 'বামন' যেরূপ বিরাট রূপ ধারণ করিয়াছিলেন সেরূপ ভূদানযজ্ঞের দ্বারা অহিংসক ক্রান্তি রচিত হইতে পারে। 'বামন' ভিক্ষা মাগিতেছেন এরূপ মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে তিনি বলিকে দীক্ষাই দিয়াছিলেন। ইহা সমগ্রই রূপক এরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। আমি এইপ্রকার অবতারের উল্লেখ তো না করিয়া পারি না। কেননা আমাদের সমাজ এবং আমি এই সংস্কারে ভরপুর হইয়া আছি। কেবল বামন-অবতারের উল্লেখই করিয়া থাকি, ইহা নহে। 'প্রজাসূয়-যজ্ঞ', 'ভূদানযজ্ঞের অশ্ব', নূতন 'ধর্মচক্র-প্রবর্তন' এইসবেরও উল্লেখ আমি করিয়াছি। এই সকল নিতান্ত ক্ষুদ্র বিষয়ও নহে। কিন্তু আমি এইসবের উল্লেখ এইজন্য করিয়া থাকি যে, ইহার দ্বারা আপনাদের সহায়তা মিলিবে। আপনারা ক্ষুদ্র নহেন, আপনারা মহান—আপনাদিগকে ইহা শিখাইতে চাই। আমার মধ্যে যে 'আমি' রহিয়াছে তাহা ব্যক্তিগত 'আমি' নহে। তাহা সমগ্র 'সর্বোদয়'-সমাজকে তাহার উদরে প্রবেশ করাইয়া লইয়া কথা বলিতেছে। উহা এইরূপ ভাষা বলিয়া বুঝিতে হইবে।"

সময় ও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে আত্মার এক-এক গুণের বিকাশ হয় এবং মন্ত্ররূপে উহা আবির্ভূত হইয়া থাকে। যুগের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত গুণ বিকশিত ও উক্ত মন্ত্র ফলবতী হয়। ঐরূপ গুণের বিকাশ বা মন্ত্রের আবির্ভাবই প্রকৃত অবতার আর ঐ ব্যক্তি নিমিত্তমাত্র অবতার। এ বিষয়ে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

॥ ৪২ ॥ ভূমিহীন দরিদ্র ধনীর ষষ্ঠপুত্র

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পরিবারের পরিধির ধারণাকে সম্প্রসারিত করাই ভূদানযজ্ঞের এক মূলগত কথা। ভগবান কাহাকেও এক পুত্র দেন, কাহাকেও দুই পুত্র, তিন পুত্র বা চার পুত্র দেন। যাঁহার চার পুত্র তিনি মনে করেন

—তাঁহার পুত্রগণ ধনসম্পত্তি চার ভাগে ভাগ করিয়া ভোগ করিবে। যদি তাঁহার পঞ্চম পুত্র জন্মগ্রহণ করে তবে কি তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান বা অনাদর করেন? তিনি তাহাকেও সস্নেহে অভ্যর্থনা করেন। সেইরূপ ধনী মনে করিয়া লউন—এই যুগে ভূমিহীন দরিদ্র তাঁহার ষষ্ঠ-পুত্র। ইহা এই যুগের ইঙ্গিত; ইহা 'যুগধর্ম' ও 'যুগকর্ম'। অন্যত্র বিনোবাজী বলিয়াছেন, "যদি আপনার চার পুত্র থাকে তবে আমাকে পঞ্চম পুত্র মনে করুন এবং আমার যাহা পাওনা তাহা আমাকে দিন। আজ যিনি দিতেছেন না, তিনি কাল দিবেন। তিনি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষে এমন কেহ নাই যিনি আমাকে ভূমিদান করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।"

বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন—"৬ একরের মধ্য হইতে ১ একর দিন। ১ একর দিলেও ৫ একর হইতে ফসল কম পাওয়া যাইবে না। একই পরিমাণ সার ও পরিশ্রম উহাতে পড়িবে এবং ভগবানের আশীর্বাদও পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক কৃষকই বুঝে যে, ৬ একর জমিতে যে ফসল জন্মে ৫ একর জমি হইতেও সেই ফসল পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য আমি বলি, ৬ একরের মধ্য হইতে ১ একর দিন। তাহাতে পরমেশ্বরও বরদান করিবেন এবং গরীবেরা খাইয়া বাঁচিবে।"

॥ ৪৩ ॥ ধনী নিমিত্তমাত্র হও

শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে বলিয়াছিলেন 'আমি সকলকে পূর্ব হইতেই মারিয়া রাখিয়াছি। হে সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।'—সেরূপ গভীর আত্ম-বিশ্বাসের সুরে বিনোবাজী ধনীদের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—'ভূমি ধনীর হাত হইতে গরীবের হাতে চলিয়া যাইবেই। প্রশ্ন এইমাত্র যে, কোন্ পথে ভূমি যাইবে? হে ধনী, তুমি নিমিত্তমাত্র হও—যাহাতে শান্তি ও প্রেমের পথে ভূমি-সমস্যার সমাধান হইতে পারে।' জনশক্তির অভ্যুদয়ের অনিবার্যতায় কত গভীর তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার এই দিব্যদৃষ্টিসূচক বাণী যে, অদূর ভবিষ্যতের দিকে সঠিক অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। ভূমিতে যে নিজে চাষ করিয়া ফসল উৎপাদন করিবে ভূমির মালিকানাও তাহারই হওয়া উচিত—এইবোধ সমাজে ক্রম-

বর্ধমানভাবে জাগ্রত হইতেছে। দেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতেও এই দাবী ক্রমশ উত্থিত হইতেছে। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে ভূমি-বণ্টনের জন্য সরকারের উপর ক্রমশ চাপ দেওয়া হইতেছে। সরকার কর্তৃক ভূমি-বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা অনভূত ও স্বীকৃত হইয়াছে। ভূমি-বণ্টনের জন্য সরকার কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে—যদিও তাহা পর্যাপ্ত নহে। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই ভূমির সঙ্গত বণ্টনের পক্ষে আগ্রহশীল। অন্যান্য দেশের পরিস্থিতিও ইহার অনুকূল। সুতরাং মানসিক অবস্থা ও বাস্তব অবস্থা উভয় দিক হইতেই সময়ের ইঙ্গিত বুঝা যাইতেছে। ভূমির সঙ্গত বণ্টন আর বেশী দিন ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। ধনীরা কি ইহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই? বৈশাখী সন্ধ্যার প্রাককালে বায়ুকোণে কাল মেঘ জমিয়াছে। বাতাসের গতি বন্ধ হইয়া গুমোট ভাব হইয়াছে। শীঘ্র কালবৈশাখী উঠিবে। কিন্তু তাহাতে যদি কেহ মনে করেন যে ঝড় উঠিবে না, তবে তাহার বুদ্ধি যেরূপ ভ্রান্ত সেরূপ আজ যদি ধনীরা মনে করিয়া থাকেন যে, জমি তাঁহাদের হাতে থাকিয়া যাইবে তবে তাঁহাদের বুদ্ধিও তদ্রূপই ভ্রান্ত বুঝিতে হইবে। ভূস্বামীগণ সময়ের ইঙ্গিত চিনিয়া লউন। আজ বিনোবাজীর মুখ দিয়া 'কালপুরুষ' কথা বলিতেছেন। আজ যুগদেবতা বিনোবাজীর দ্বারা নূতন যুগধর্ম প্রতিষ্ঠা করাইতেছেন—'ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন' করাইতেছেন!

॥ ৪৪ ॥ ধনীদের সম্মান রক্ষার প্রশ্ন

ভূমি তো ধনীর হাত হইতে চলিয়া যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ভূমির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মর্যাদা, সম্মান ও মনুষত্বও কি চলিয়া যাইবে, না তাহা রক্ষা পাইবে। যদি ভূদানযজ্ঞের পথে, শান্তি ও প্রেমের পথে ভূমি-সমস্যার সমাধান হয় তবে ধনীর ইজ্জত বাঁচিবে, তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, সমাজ তাঁহার বন্ধু হইবে। কিন্তু যদি ভূমি অন্য পথে চলিয়া যায়, তবে ভূমির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সম্মান, মনুষ্যত্ব সবই নষ্ট হইবে। আইনের পথে চলিয়া গেলেও তাঁহার সম্মান ও ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। এজন্য গয়া জেলার একস্থানে বিনোবাজী জমিদারগণকে এসম্পর্কে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—

"পাটনায় জমিদারদের কয়েকজন প্রতিনিধি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে এই সাফ কথা বলিয়া দিয়াছিলাম, 'যদি আপনারা সময়ের দাবী বুঝিয়া লইয়া এখনই ভূমিদান করেন, তবে আপনারা বাঁচিয়া যাইবেন।' আজ আমি পুননায় বড় জমিদারগণের নিকট এই আবেদন করিতেছি—আপনাদের শুধু ভূমিদান দিলে চলিবে না, ভূদানযজ্ঞের কাজকে আপনাদের নিজেদের কাজ বলিয়া গণ্য করিয়া উহাতে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আপনারা আমাকে আর কতদিন পর্যন্ত ঘুরাইবেন? আপনাদেরই এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই আমার সন্তোষ আসিবে। ইহাতে আপনাদের হৃদয়ে সত্ত্ব-গুণের প্রকাশ হইবে এবং সমাজের নেতৃত্ব করিবার, সমাজের সেবা করিবার সুযোগ আপনারা পাইবেন। এই সম্পর্কে ইংরেজদের নিকট হইতে আপনাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যখন ইংরেজগণ দেখিলেন যে ভারতবর্ষ ছাড়িতেই হইবে, তখন তাঁহারা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া একটি তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং সেইদিনই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিলেন। যদি তাঁহারা এইভাবে না ছাড়িতেন তবে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তাঁহাদিগকে ছাড়িতেই হইত এবং সেইসঙ্গে তাঁহারা সম্মান ও শ্রদ্ধা হারাইতেন। কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা ভারতবাসীর প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ব্যবসাও চালু আছে। গান্ধীজী অহিংসার দ্বারা স্বরাজ লাভ করাইয়াছেন ইহা যেরূপ ইতিহাসে লিখিত থাকিবে, সেরূপ ইংলন্ড সম্পর্কেও লিখিত থাকিবে যে, ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে ইংলন্ড বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। আমি ইহা মনে করি যে, আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে ইংলন্ডের নৈতিক বিজয় লাভ হইয়াছে। সত্যাগ্রহ ও অহিংস-যুদ্ধের মহত্ত্ব এই যে, উহাতে উভয় পক্ষেরই জয় হয়। হিংস্রযুদ্ধে এক পক্ষের জয় ও অন্য পক্ষের পরাজয় হইয়া থাকে। সুতরাং, ভ্রাতৃবৃন্দ, ইংলন্ডের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। যদি সম্মান, গৌরব, প্রেম, সৌহার্দ্য ও স্নেহভাব বজায় রাখিতে চাহেন তবে সময় ও সুযোগমত কাজ করা চাই। জমি তো যাইবেই, কিন্তু দানরূপে তাহা না যাইলে, আপনারা সম্মান ও প্রেম সবই হারাইয়া বসিবেন। গরীব আর কতদিন অপেক্ষা করিবে? প্রতীক্ষা করা বা অন্য সবকিছুরই একটা সীমা আছে।

এখন দরিদ্র জাগ্রত হইয়াছে। খুসী হইয়া দান দিলে তাহাতে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিবে। ঠিক সুযোগমত 'দেশে কালে চ পাত্রে চ' দান দেওয়া উচিত। আমি ঠিক পাত্র নহি কি? ঠিক সময়ে উচিত কাজ করিলে উহার ফল ভাল হয়।"

॥ ৪৫ ॥ ভয়-প্রযুক্ত দান

বলা হয় যে, ভূমির মালিকগণ যে এখন দান দিতেছেন তাহা ভয় পাইয়া দিতেছেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা পাইবে কিরূপে? এই আপত্তিও করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞের বাণী প্রচার প্রসঙ্গে যাহা বলা হয় তাহাতে ভূমির মালিকগণকে ভয় প্রদর্শনই করা হয়। ভূমির মালিকগণকে যে-ভয়ের কথা বলা হয় তাহা যে কিছু খারাপ, এমন নহে। উহাকে নৈতিক ভয় বলা যায়। ঐরূপ ভয় পাইয়া দান দেওয়া বিধেয়। শাস্ত্র বলে—"শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্, হ্রিয়া দেয়ম্, **ভিয়া দেয়ম্।" 'ভিয়া দেয়ম্'** অর্থাৎ ভয়ে দান দেওয়া যায়। এই সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"সেইভাবেই আমরা বলিতেছি যে, ভয় পাইয়াও দান দিন। ইহার অর্থ এই নহে—যদি দান না দাও তো তোমাকে খুন করিব। এরূপ ভয়ে ভীত হইয়া কেহ দান দেন ইহা আমরা কিছুতেই চাহি না। কিন্তু যদি আমরা কাহাকেও বলি যে, তোমার বিছানার উপর সাপ রহিয়াছে, এজন্য বিছানা ত্যাগ কর, তবে বাস্তবক্ষেত্রে যে ভয় রহিয়াছে তাহা তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইল। মানুষের যে-বিষয়ে ভয় থাকা কর্তব্য সেই ভয় করা ভাল এবং যে-বিষয়ে ভয় করা উচিত নহে সেই বিষয়ে ভয় না করা ভাল। ভয়ও একটি ভাল জিনিস। ভয়ে পড়িয়াও যদি কেহ খারাপ কাজ হইতে বিরত থাকে, তবে তাহা ঠিকই করা হইবে। কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কেন এরূপ বলেন 'যদি মিথ্যাকথা বল তবে ক্ষতি হইবে, যদি হিংসা কর তবে অনিষ্ট হইবে?' 'দুনিয়াতে বিনাশ হইবে' একথাও বা আপনি কেন বলেন?' কিন্তু ইহা তো ভয় নহে; ইহা এক বিচার-ধারা বুঝানো। মন্দ কাজ করিলে মন্দ ফল মিলিবে। এইজন্য মন্দ কাজ করিও না।—লোককে বুঝাইবার জন্যই আমরা এরূপ বলিয়া থাকি। ইহা যদি ভয় হয় তবে ইহা ধর্ম-ভয়। সমাজকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সময়ের

অবস্থা বুঝিয়া যদি উদার হৃদয়ে দান দেওয়া না হয় তবে বিপদ আছে। লোককে ভয় দেখাইয়া ধমক দিয়া আমরা একথা বলি না। পরন্তু ইহার দ্বারা বিচারই বুঝাইয়া থাকি। খারাপের ফল খারাপই হইয়া থাকে—ইহা বুঝাইয়া দেওয়া ভীতি প্রদর্শন করা নহে। ইহা তো কর্ম-বিপাক বা কর্ম-পরিণাম।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"ইহা কি ধমকানি হইল? আর ইহা যদি ধমকানি হয় তবে বেদও তো ধমকাইয়াছে।—

'মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রেচতাঃ
সত্যং ব্রবীমি বধ ইত্ স তস্য,
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি।'

"মূর্খ অনর্থক অন্নের স্তূপ করে। বেদ বলে, আমি সত্য বলিতেছি, সে অন্ন জমা করিতেছে না, সে নিজেকে হত্যা করিতেছে। যে-ব্যক্তি অন্ন জমাইয়া রাখিতেছে সে নিজের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছে। যে-ব্যক্তি একা-একা খায় সে-ব্যক্তি পুণ্য নহে, পাপই ভোগ করে।

"অতএব ভাইসব, যাহাতে বিপদ রহিয়াছে তাহা আমাদিগকে চিনিতে হইবে এবং তাহা শীঘ্রই চিনিয়া লইতে হইবে। বার্ধক্য আসিবার পর বার্ধক্যকে সকলেই চিনিতে পারে। কিন্তু যে যৌবনে বার্ধক্য কি তাহা বুঝিয়া চলে, সেইব্যক্তির সম্মান রক্ষা পায়। এইরূপে বিপদ আসিবার পূর্বে বিপদকে চিনিতে পারিলে তবেই সম্মান রক্ষা পাইবে।"

॥ ৪৬ ॥ ধনীর হৃদয়-পরিবর্তন

ধনীর হৃদয়-পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। ধনীদের হৃদয়-পরিবর্তনের কথায় কেহ কেহ অবিশ্বাসের সুরে হাসি-ঠাট্টা করিয়া থাকেন। ইহা ঠিক নহে। বাহিরের পরিস্থিতিতে মানুষের হৃদয়-পরিবর্তন হইতে পারে। হয়ও তাহাই। এইভাবে যাহার হৃদয়-পরিবর্তন হইয়াছে তাহার ভিতরে সেই বিচার-বীজ এতদিন উপ্ত ছিল। বাহিরের পরিস্থিতির বারিসিঞ্চনে তাহা অংকুরিত হইয়া উঠিয়াছে। একই পরিস্থিতি সকলের হৃদয়ে একইভাবে ক্রিয়া করে না। প্রবল অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও

অন্যের হৃদয় অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"কোন ব্যক্তি বৃদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, সেই কারণে তাহার বৈরাগ্য আসিল। বৃদ্ধত্ব ও পুত্রের মৃত্যুর কারণে বৈরাগ্য আসিয়াছে বলিয়া কি ঐ বৈরাগ্য খাঁটি নহে? হাঁ, উহা খাঁটি। যখন ঐব্যক্তি যুবক ছিল ও তাহার পুত্র জীবিত ছিল তখন তাহার আসক্তি ছিল। বহু লোক বৃদ্ধ হয় এবং তাহাদের পুত্রেরও মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের বৈরাগ্য আসে না। ইহার কারণ এই যে, যে-ব্যক্তির বৈরাগ্য আসিয়াছে তাহার হৃদয়ে প্রথম হইতেই ভাব ছিল এবং পুত্রের মৃত্যু এক নিমিত্তস্বরূপ হইয়াছে, যাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত ভাব জাগ্রত হইয়াছে। এইজন্য প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ভাল ভাব আছে এরূপ বিশ্বাস রাখিতে হইবে।"

॥ ৪৭ ॥ কে কত দান দিবে

এখন প্রশ্ন হইতেছে ভূমিদান কে দিবে? যজ্ঞে সকলকেই নিজ-নিজ 'হবির্ভাগ' আহুতি দিতে হয়। ভূদানযজ্ঞে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই ভূমিদান দিবার জন্য আহবান করা হইয়া থাকে। সকলের নিকট জমি চাওয়া হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সকলের নিকট হইতে সমান জমি চাওয়া হয় না।* মধ্যবিত্ত কৃষক ও জোতদারের নিকট হইতে এক-ষষ্ঠাংশ চাওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা বড়-বড় জোতদার বা জমিদার তাঁহাদিগকে বলা হয়, আপনারা নিজেদের জন্য কিছু রাখিয়া দিয়া বাকী সবই গরীবের জন্য দান করুন। যাঁহারা নিতান্ত গরীব তাঁহাদের নিকট হইতে দাবী করিয়া কিছু চাওয়া হয় না। তাঁহারা প্রেমপূর্বক যাহা দেন তাহা প্রসাদস্বরূপ গণ্য করিয়া গ্রহণ করা হয়। যেমন সুদামার নিকট হইতে খুঁদ-কুঁড়া পাইয়াও ভগবান প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেরূপ সামান্য জমি আছে এরূপ গরীব কৃষক যদি প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত কিছু দেন তবে ভারতমাতা প্রসন্ন হইবেন। সুতরাং ধনীর ভূমিদান হইতেছে 'দান' আর দরিদ্রের ভূমিদান হইতেছে 'যজ্ঞ'।

*এখন সকলের নিকট হইতে 'বিঘায় কাঠা' অর্থাৎ—বিশভাগের এক-ভাগ ভূমিদান চাওয়া হইতেছে।

আর একটি কথা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। ভূদানযজ্ঞে এক ক্রান্তি-কারক বিচারবোধকে সারা সমাজ-জীবনে রূপদান করিতে হইবে। এইজন্য যদি অল্পসংখ্যক লোকের দানের দ্বারা আবশ্যকীয় ভূমি প্রাপ্তি পূর্ণ হওয়া সম্ভবও হয় তথাপি তাহাতে ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। বিনোবাজী কেবলমাত্র প্রাপ্তব্য ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেছেন না, তিনি দাতার সংখ্যাও (কোটা) নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। বিনোবাজী বিহারে ৮ লক্ষ দাতা ও ৩২ লক্ষ একর ভূমি চাহিয়াছিলেন।

॥ ৪৮ ॥ দরিদ্র ভূমিদান দিবে কেন

আপত্তি করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞে গরীব কৃষকের নিকট হইতে দান লওয়া অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা। সাম্যবাদীরা তো এই আপত্তি করেনই, অন্যেরাও। —এমন কি যাঁহাদের রাজনৈতিক দল বা কোন অর্থনৈতিক মতবাদের সহিত সম্পর্ক নাই এমন গ্রামসেবক গঠনকর্মীরা পর্যন্ত আপত্তির সুরে এই প্রশ্ন করেন যে, গরীব কৃষকের এখন যে-জমি আছে তাহাতে তাহার নিজেরই পেট ভরে না। এই অবস্থায় তাহার নিকট জমি চাহিয়া ও তাহার নিকট হইতে জমি লইয়া তাহাকে আরও গরীব করিয়া দিলে কি লাভ হইবে? আপাতদৃষ্টিতে এই আপত্তি সংগত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে এই আপত্তি অমূলক এবং আর উঠানো হইবে না বলিয়া মনে হয়।

আজ পর্যন্ত মানুষের আত্মজ্ঞান বা আপন-বোধ সাধারণভাবে নিজের পরিবার পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। সেই কারণে মানুষ নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্য কতই না ত্যাগ করে ও দুঃখকষ্ট বরণ করে। কিন্তু মানুষ সাধারণত তাহার পরিবারের বাহিরে হৃদয়হীনের মত আচরণ করিয়া থাকে। মানুষ পরিবারেব মধ্যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু পরিবারের বাহিরে সাধারণত তাহার আচরণ পশু-প্রকৃতির সহিত তুলনীয়। ভূমি-সমস্যার মূলেও পরিবারবহির্ভূত মানুষের প্রতি মানুষের এই সহৃদয়তার অভাব। এই ব্যাপারে ধনীও যেমন দরিদ্রও তেমন। নিজের অপেক্ষা যে অধিক দরিদ্র তাহার প্রতি আজ দরিদ্র চাষীর সহানুভূতি নাই। নিজে দরিদ্র হইলেও

ভূমিহীন দরিদ্রের তুলনায় সে সুখী। সুখী ও দুঃখী কথা তো আপেক্ষিক-ভাবে বলা হয়। একজন দুঃখী হইতে পারে, কিন্তু অন্য দুঃখীর সহিত তুলনায় সে সুখী মনে হইতে পারে। ভূমিহীন দরিদ্র আজ সমাজে সর্বাপেক্ষা দুঃখী। সমাজে আজ কাহারও সহিত তুলনায় সে সুখী মনে হইবে না। এজন্য সে সমাজের সকলেরই চক্ষে দুঃখী। সমুদ্র সকলের নীচে আছে। সেজন্য পৃথিবীর সমস্ত জল সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। সেইরূপ আজ সমাজের অন্য সকলেরই দান ভূমিহীন দরিদ্রের প্রতি ধাবিত হওয়া উচিত। অল্প ভূমিসম্পন্ন কৃষকেরও তাহার জন্য যৎকিঞ্চিৎ ভূমি-দান দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য স্বামিত্ব-মোচনের দীক্ষা দান করা। যাহার দুই হাজার একর জমি আছে সে যেমন নিজেকে ভূমির মালিক মনে করে, যাহার দুই একর জমি আছে সেও সেরূপভাবে নিজেকে জমির মালিক মনে করে। এজন্য ধনীর ন্যায় দরিদ্র কৃষকেরও শুদ্ধির প্রয়োজন আছে। নচেৎ ক্রান্তির ভিত্তি কখনও দৃঢ় হওয়া সম্ভব নহে। মালিকানার মোহই মানুষকে পুঁজিবাদের গোলাম করিয়া রাখিয়াছে—সে বড় মালিকই হউক আর ছোট মালিকই হউক। যাহার সম্পত্তি দুইখানি মাত্র ল্যাঙ্গট তাহারও ঐ দুইখানি ল্যাংগটে আসক্তি থাকে। পুঁজিবাদের মূল এই। এজন্য কিছু-না-কিছু দান ভূদানযজ্ঞে অর্পণ করিয়া দরিদ্র কৃষকেরও মালিকানা বিসর্জনের দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

অত্যল্প জমির দরিদ্র মালিক অন্তর হইতে বৃহৎ জমির ধনী মালিকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকে। কেন? কারণ সে সমাজ হইতে ধনিকত্ব দূর করিতে চাহে না, বরং সে নিজে ধনী হইতে চাহে ও হাজার-হাজার একর জমি পাইবার লালসা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকে। ভূদানযজ্ঞে ভূমি আহুতি দিয়া দরিদ্র কৃষকগণ এই লালসা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। অত্যল্প করিয়া দিলেও যখন হাজার-হাজার দরিদ্র কৃষক ভূমিদান দিতে থাকিবে তখন এমন এক নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে যে, তখন বৃহৎ জোতদার এবং জমিদার দান দিতে প্রবৃত্ত হইবে। বিহারে ও অন্যত্র বড় জমিদার ও রাজারা যে হাজার-হাজার একর এমন কি লক্ষাধিক একর পর্যন্ত ভূমিদান দিয়াছেন তাহার পশ্চাতেও এই পটভূমিকা রহিয়াছে। বিহারে গরীব লোকে দুই বৎসর

যাবৎ বিনোবাজীর উপর দানের ধারা বর্ষণ করে। তাহা ধনীদের কাছে এক লজ্জার বিষয় হইয়া পড়িল। বিনোবাজী বলেন—"যাহার লজ্জা নাই, তাহার লজ্জা আসা ভাল। শাস্ত্র বলিয়াছেন 'হ্রিয়া দেয়ম্'। নৈতিক শক্তি প্রকাশ করিবার ইহা এক পদ্ধতি।" শ্রীদাদা ধর্মাধিকারী এক সুন্দর উপমা দিয়া এই বিষয়টি বুঝাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কৃষক খাইবার জন্য যে-শস্য রাখে তাহা পৃথক করিয়া রাখে এবং যে-শস্য বীজের জন্য রাখে তাহাও পৃথক করিয়া রাখে। তাহার খোরাকীর জন্য যে-শস্য রাখা হয় তাহা অপেক্ষা বীজ-শস্য অধিক গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। ধনীর দানে মালিকানার বাঁটোয়ারা হইবে। ধন ও ভূমির মালিকানার বণ্টন তাহার দ্বারা হইবে। কিন্তু মালিকানা বিসর্জনের ক্রান্তি গরীবের দানের দ্বারাই সম্ভব হইবে। গরীবের দানে ক্রান্তির বীজ-ধর্ম নিহিত থাকে, তাই অহিংস ক্রান্তির প্রক্রিয়ায় গরীবের স্বামিত্ব বিসর্জন এক মূলভূত বস্তু।"

দরিদ্র ঠিকমত বুঝিয়া অন্তরের সহিত যে-ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দান দিবেন তাহার মূল্য দানের পরিমাণে নহে, তাহা অমূল্য; কারণ সে-দান অভিমন্ত্রিত। সেই মহান দান সমাজের আবহাওয়াকে পূত ও পবিত্র করিয়া তুলিবে এবং তাহা বিচার-ক্রান্তি সৃষ্টি করিতে মহান প্রেরণা দান করিবে। সেই অমূল্য অভিমন্ত্রিত দান হইবে সমাজের পক্ষে স্পর্শমণি। তাহার পরশে সারা সমাজ সোনা হইয়া যাইবে। মহাভারতে অশ্বমেধ-যজ্ঞের নকুলের কাহিনী স্মরণ করিলে ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবার কয়েকদিন যাবৎ উপবাসী আছেন। ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে সামান্য পরিমাণ শক্তু (ছাতু) সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। পরিবারে চার জন—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণপুত্র ও পুত্রবধূ। উহাতে চার জনের উদরপূর্তি হওয়া দূরের কথা প্রত্যেকের কয়েক গ্রাস করিয়াও হইবে না। চার জনের জন্য উহা চার ভাগ করা হইল। স্নান সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ তাঁহার অংশের শক্তুটুকু ভোজন করিবার জন্য উপক্রম করিতেছেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, এক দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার ব্যক্তি তাঁহার দ্বারে উপস্থিত। ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র না খাইয়া তাঁহার অংশের সবটুকুই পরম

শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তাহাকে খাইতে দিলেন ও নিজে উপবাসী রহিলেন। ক্ষুধার্ত আগন্তুক সেটুকু খাইয়া লইল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার ক্ষুধার শান্তি হইল না। তখন ব্রাহ্মণী পরম স্নেহসহকারে তাঁহার অংশের খাদ্যটুকু অতিথির জন্য দিলেন। তাহাতেও তাহার ক্ষুধার জ্বালা প্রশমিত হইল না। তখন ব্রাহ্মণপুত্র অতীব সহানুভূতিসহকারে তাঁহার অংশের শক্তুটুকুও তাহার জন্য দিলেন। সে তাহা খাইল, কিন্তু তথাপি ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। তখন পুত্রবধূ পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার অংশের শক্তু-কণিকাগুলি তাহার জন্য দিলেন। সে তাহা খাইল এবং তাহাতে তাহার ক্ষুধার শান্তি হইল। এরূপে সে তৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেল। এক নকুল সেই ব্রাহ্মণের গৃহের মধ্যে বাস করিত। সে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঐ অভূত-পূর্ব দানের মহিমায় অভিভূত হইয়াছিল। যখন গৃহ হইতে সকলে চলিয়া গেল তখন নকুল তাহার গর্ত হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়া ভুক্তাবশিষ্ট জলসিক্ত শক্তুর উপর গড়াগড়ি দিল। তাহাতে তাহার মস্তক ও শরীরের অর্ধাংশ স্বর্ণময় হইয়া গেল। তাহাতে সে পুলকিত হইয়া তাহার অবশিষ্ট অঙ্গ স্বর্ণময় করিবার প্রত্যাশায় শত শত দান-যজ্ঞাদির স্থানে ঘুরিল। কিন্তু কোথাও তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। অবশেষে সে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা শুনিয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও উহার অতিথিশালায় ও দানাদির স্থলে বহুবার গড়াগড়ি দিল। কিন্তু তাহাতে তাহার শরীরের অতিরিক্ত অনুমাত্র অংশও স্বর্ণময় হইল না। যজ্ঞশেষে যুধিষ্ঠিরের মহাদানের পুণ্যের ফলে তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল, এমন সময় নকুল সেখানে উপস্থিত হইয়া সমবেত সকলকে সম্বোধন করিয়া গর্বিত-কণ্ঠে বলিল—"হে ভূপতিগণ, এই অশ্বমেধ যজ্ঞকে কুরুক্ষেত্র নিবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামান্য একটু শক্তুদানের তুল্যও বলা যায় না।" ইহাতে সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাহার এরূপ বলিবার কারণ কি তাহা জানিতে চাহিলেন। নকুল সমস্ত কাহিনী তাঁহাদিগকে শুনাইল ও অবশেষে বলিল —"এই নিমিত্ত আমি হাস্য করিয়া আপনাদিগকে বলিয়াছি যে এই মহাযজ্ঞ সেই মহাত্মা দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামান্য একটু শক্তুদানেরও তুল্য নহে।" এই বলিয়া নকুল প্রস্থান করিল। সুতরাং দরিদ্রের দানের মহিমা অতুলনীয়।

এইরূপ দান যেখানে দেওয়া হয় তাহার আশপাশের আবহাওয়াও পূত-পবিত্র হইয়া যায়।

আরও একটি কারণে স্বল্পভূমির মালিকের নিকট হইতেও জমি চাওয়া হয়। সে সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"আমি তো কয়েকবার বলিয়াছি যে, আমি আমার সেনা তৈয়ারী করিতেছি। উচ্চ-নীচভেদ আমাকে দূর করিতে হইবে এবং এমন সেনা তৈয়ারী করিতে হইবে যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা লড়াই করিতে সমর্থ হইব। যাঁহারা দান দিয়াছেন বা ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহারা আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারাই আমাদের সৈনিক হইবেন। আমাদের সেনা হিংসাশ্রয়ী নহে। সহিংস সেনাতে যাহার ছাতি ৩২ ইঞ্চি তাহাকে সৈন্যদলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আমাদের সৈন্যদলে ভর্তি হইতে হইলে ত্যাগের ছাতি থাকা চাই।"

ভূদানযজ্ঞে গরীবের নিকট হইতে ভূমিদান গ্রহণের প্রশ্ন সম্পর্কে বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন যে, ভূদানযজ্ঞে দান দেওয়া ধর্মকার্য। ধর্মের আচরণ একমাত্র ধনী করিবে আর গরীব তাহা করিতে পারিবে না—এমন হইতে পারে না। ধনীর অর্থ আছে বলিয়া গাড়ী চড়িয়া গিয়া কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু গরীবের গাড়ীভাড়া দিবার অর্থ নাই বলিয়া সে বিশ্বনাথ দর্শন না করিয়া থাকিবে কেন? সে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া আসিবে। এই কথা শুনিয়া হঠাৎ বিশ্বাস হয় না যে, ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কেও গরীব এইরূপ মনোভাব অবলম্বন করিতে পারিবে। কিন্তু আজ আর সেরূপ কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। বিনোবাজীর হাতে তো দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও সর্বস্ব অর্পণ করিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিতেছে। অতিসাধারণ কর্মীদের হাতেও প্রতি প্রদেশে শত-শত দরিদ্র কৃষক তাহাদের স্বল্পতম জোতের একাংশ দিয়া কোথাও বা সর্বস্ব অর্পণ করিয়া ধন্য হইতেছে। যেখানে কোনরূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা না রাখিয়া শুদ্ধ অন্তঃকরণে শত-শত দরিদ্র এরূপ ক্ষুদ্রতম দান দিতেছে, সেখানে বিচারক্রান্তি যে গভীর-ভাবে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

॥ ৪৯ ॥ আন্দোলনে দরিদ্রের কর্তব্য

সর্বাত্মক ক্রান্তি সাধনের কার্যক্রম এরূপ হওয়া চাই, যাহাতে তাহার মধ্যে দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য কার্যক্রম থাকে অর্থাৎ যাহাতে সর্ব-শ্রেণীর লোক ক্রান্তি সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। নচেৎ প্রকৃত ক্রান্তি সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। ভূমি চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি বা ধনদৌলত ও অর্থের অংশ না চাহিলে ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকে। সেই জন্য সম্পত্তিদানযজ্ঞের প্রবর্তন করা হইয়াছে। তাহাতে যাহাদের ভূমি নাই এমন ধনশালী ব্যক্তিদের পক্ষে এই ক্রান্তিকারক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ হইয়াছে। সুতরাং এই আন্দোলনে ভূমিহীন দরিদ্রের কর্তব্য কি?

বিনোবাজী চাহেন যে, ভূমিহীনেরা এখন তাঁহাদের ভূমি-ক্ষুধার কথা নিজেরাই বলুন। এজন্য তিনি মনে করেন যে, এখন ভূমিহীনদিগকে জাগ্রত করিবার সময় আসিয়াছে। তিনি বলেন—"আমি চৌদ্দ মাস বিহারে ভ্রমণ করিয়াছি। এতটা কাজ এখানে হইয়াছে। এখন গরীবরা নিজেরা তাঁহাদের নিজেদের ক্ষুধার কথা বলুন। সেই সময় এখন আসিয়াছে। আমি তো তাঁহাদের ক্ষুধার কথা বলিতেছি, কিন্তু এখন তাঁহাদেরই আগাইয়া আসিবার প্রয়োজন হইয়াছে। কোন কোন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—'আপনি দরিদ্রদিগকে জাগ্রত করিতে চাহেন না কি?' আমি বলি—'সেই জন্যই তো আমি পাদপরিক্রমা করিতেছি।' বিহারে তের লক্ষ একর ভূমি পাওয়া গিয়াছে। প্রতি মাসে এক লক্ষ একর করিয়া জমি পাওয়া গিয়াছে। আমি তাহার বিশেষ মূল্য দেই না। কিন্তু ভূমিহীন দরিদ্র যে জাগ্রত হইয়াছে ও বুঝিতে পারিয়াছে যে জমির উপর তাহাদের অধিকার আছে, শুধু অধিকার নহে—ঐ জমি আবাদ করা তাহাদের কর্তব্য—ইহার মূল্য আমি অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে করি।" বিনোবাজী চাহেন যে, ভূমি পাইবার জন্য ভূমিহীনদিগকে গ্রামে গ্রামে দাবী তুলিতে হইবে। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—"শিশু কাঁদিয়াই তাহার দাবী জানায়। মা ও শিশুর মধ্যে কতই না প্রেমের সম্বন্ধ! তথাপি শিশু কাঁদিলে তবে মা তাহার দিকে মন

দেন এবং তাহাকে দুধ পান করান। সেইজন্য ভূমিহীনদের পক্ষ হইতেও দাবী উত্থাপন করা প্রয়োজন। আমি তো তাহাদেরই হইয়া চাহিতেছি। তথাপি তাহাদেরও গ্রামে-গ্রামে সভা করিয়া ভূমি পাওয়ার জন্য দাবী জানানো উচিত। তবেই তাহদের জমি মিলিবে। অধিকারবোধ হইতে এই দাবী করিতে হইবে, ভালবাসার সহিত করিতে হইবে এবং জোরের সহিত করিতে হইবে। দরিদ্র ভূমিহীনের বলিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিলে দেশ-রক্ষায় জন্য দরিদ্রেরা প্রাণ দিবে এরূপ আশা করা হয়। যদি তাহা হয়, তবে সেই দেশমাতৃকার ভূমির সেবা করিবার অধিকার তাহার থাকিবে না—ইহা কিরূপ ন্যায় বিচার? এইজন্য গরীবের দাবী পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। আর এই দাবী দরিদ্রগণের নিজেদেরই উত্থাপন করিতে হইবে।"

ভূমিহীন দরিদ্রদের আরও কয়েকটি কর্তব্য আছে। সে সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন, "প্রথম কথা হইল, দরিদ্রকে আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে যে-সকল ব্যসন আছে তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। তবেই তাহাদের শক্তি বর্ধিত হইবে, নতুবা নহে। মনে করুন, কাল দরিদ্রদের মধ্যে ভূমি-বণ্টন করা হইল। যাহাদের ভূমি দেওয়া হইবে তাহারা যদি মদ্যপায়ী হয় তবে তো তাহারা জমি নিজের হাতে রাখিতেই পারিবে না। এইজন্য শহর হইতে যে-ব্যসন গ্রামের মধ্যে আসিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। এই আত্মশুদ্ধির কাজ দরিদ্রদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

"দ্বিতীয় কথা, আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে। আমার এই কথা শুনিয়া আপনারা হয়তো আশ্চর্যান্বিত হইবেন। আপনারা বলিবেন, দরিদ্রেরা তো সবসময়ই পরিশ্রম করে। আমি বলিব, তাহারা পরিশ্রম করে সত্য, কিন্তু তাহারা বাধ্য হইয়া তাহা করে। যেটুকু কাজ তাহারা করে তাহাতেও তাহা-দের আলস্য থাকে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহারা যে কাজ করে সে-সম্পর্কে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, সকালে ক্ষেতে যাওয়া এবং সন্ধ্যায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসা ইহার মধ্যে ৮ ঘণ্টা কাজ করা ব্যতীত বাকী সময়ই তাহারা আলস্যে কাটাইয়া দেয়। আলস্য এক মহারোগ। ধনীদের মধ্যে তো ইহা আছেই, উপরন্তু দরিদ্রদের মধ্যেও ইহা আসিয়া গিয়াছে। এইজন্য তাহাদিগকে আলস্য ত্যাগ করিয়া সর্বদা কাজে ব্যাপৃত থাকিতে

হইবে। তৃতীয় কথা, গ্রামে বিচার-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষে মিটাইতে হইবে। বিবাদে শক্তি ক্ষয় হয়। এইজন্য আমাদের মধ্যে যাহাতে ঝগড়া-বিবাদ না হয় তাহা দেখিতে হইবে। অবশ্য মতভেদ হইলে নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। কিন্তু সেগুলি গ্রামের সৎলোকের দ্বারা সমাধান করাইয়া লইতে হইবে। আপোষে যে-ঝগড়া মিটানো যায় তাহা বাহিরের লোকের নিকট লইয়া যাওয়া কেন? ঘরের বিবাদ বাহিরের লোকের নিকট লইয়া যাওয়া কি বিশ্রী ব্যাপার! প্রত্যেক গ্রামেই তো কোন-না-কোন প্রভাবশালী সৎলোক থাকেন। অতএব তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার বিচারই মানিয়া লওয়া উচিত।"

॥ ৫০ ॥ সাম্যবাদ ও ভূদানযজ্ঞ

এরূপ আপত্তি করা হয় যে, সাম্যবাদীদের আন্দোলন নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে। ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন সফল হইলে হিংস্র-বিপ্লব নিবারিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন প্রবর্তিত হয় নাই। অর্থাৎ উহা প্রতিক্রিয়াত্মক নহে। ইহা এক স্বতন্ত্র বিচার। ইহা বিধায়ক (পজিটিভ্), নিষেধাত্মক (নেগেটিভ্) নহে। যদি এমন হইত যে, সাম্যবাদীরা যে-পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহা অপেক্ষা ভারতের ভূমি-সমস্যা সমাধানের অন্য কোন ভাল পন্থা নাই এবং থাকিলেও ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের দ্বারা সেই পথে ভূমি-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করিয়া মাত্র হিংস্র-বিপ্লব ঠেকাইবার চেষ্টাই করা হইতেছে, তবে তাহা কাপুরুষতা হইত। কিন্তু সাম্যবাদীরা সংঘর্ষ, অশান্তি ও রক্তের পথে যাহা সাধন করিতে চায়, ভূদানযজ্ঞ শান্তি ও প্রেমের পথে তাহা সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। হিংস্র-বিপ্লবের দ্বারা মাত্র বাহ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু অহিংস-বিপ্লবে আন্তরিক ও বাহ্য উভয় বিপ্লবই সৃষ্ট হয়। হিংস্র-বিপ্লবে ভূমির বাঁটোয়ারা হইলে লক্ষ্মী লাভ হইতে পারে, কিন্তু সমাজের অন্তরে বিচার-বিপ্লব আসিবে না বা প্রেম-শক্তির সৃষ্টি হইবে না। উপরন্তু অহিংস-বিপ্লবে চিন্তা-বিপ্লবও আসিবে। সব ভূমি গোপালের, ভূমিতে সকলের সমান অধিকার—এইবোধ

সমাজের অন্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে এবং সেই বিচার-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ভূস্বামীগণ তাঁহাদের কৃত অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে স্বেচ্ছায় মালিকানা বিসর্জন দিবেন এবং তাহাতে সমাজরচনায় বিপ্লব আসিবে। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ইহাকে রেভলিউশান্ বাই কন্সেন্ট্ (সম্মতিক্রমে সাধিত ক্রান্তি) আখ্যা দিয়াছেন। বিরাট সমস্যার তুলনায় অত্যল্প হইলেও এই কয় বৎসরের মধ্যে মোটামুটি ৪৩ লক্ষ একর ভূমি ও সাড়ে ৪ হাজার গ্রামদান পাওয়া গিয়াছে। এই দেশের প্রায় সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে এই আন্দোলনের প্রতি অনুরাগ আসিয়াছে। দেশের হাওয়া পরিবর্তিত হইতেছে। উপরন্তু কেবলমাত্র ভূমি-সমস্যার সমাধানেই এই আন্দোলনের পরিণতি ঘটিবে না। ভূমি-সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ফলে অহিংস-সমাজরচনার ভিত্তি পত্তন হইবে এবং উহা অহিংস-সমাজ প্রতিষ্ঠায় পরিণতি লাভ করিবে। যদি এই পবিত্র পন্থায় ভারতের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়, তবে ভারত কোন খারাপ উপায় অবলম্বন করিবে না। বিনোবাজী বলেন—"কাহারও পিপাসা লাগিয়াছে, যদি তাহার পরিষ্কার জল মিলে তবে সে অপরিষ্কার জল পান করিবে না। কিন্তু নির্মল জল না পাইলে সে ময়লা জল পান করিতে পারে। ভারতে ভাল পথে গরীবের সমস্যার সমাধান হইলে খারাপ পথ গ্রহণ করা হইবে না।" মোট কথা যেখানে দারিদ্র্য থাকিয়া যাইবে সেখানে সাম্যবাদ আসিতে পারে। ভারতেও আসিতে পারে—পৃথিবীর অন্যত্রও আসিতে পারে। উহাতে বাহিরের আক্রমণের আবশ্যকতা নাই।

সাম্যবাদীরা এরূপ আপত্তি করেন যে, ভূদানযজ্ঞ ধীরে-ধীরে চলিবার রাস্তা। তাহাতে বিনোবাজী বলেন—"কিন্তু যে-স্থলে আজ পর্যন্ত লওয়ারই অভ্যাস ছিল, সেইস্থলে আমি তো সমাজকে দেওয়ার অভ্যাস শিক্ষা দিতেছি। অভ্যাস সৃষ্টির কাজ ধীরে-ধীরেই হইয়া থাকে। আমার আশা তো সারা পৃথিবীর ভূমি পুনর্বন্টন করা। আজ পৃথিবীর ছোট-বড় সব রাষ্ট্রই ভয়গ্রস্ত। এই ভয় হইতে মুক্তি পাইবার উপায় কাহারও জানা নাই। মুক্ত হইবার উপায় বাহিরের নহে, অন্তরের হওয়া চাই। ঐপথ আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি। কিন্তু লোকে বলে যে, আমার অহিংসার রাস্তা বড় লম্বা: যদি

তাঁহারা তাড়াতাড়ি পৌঁছিবার রাস্তা চাহেন, তবে ভুলিলে চলিবে না যে উহা মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইবে।"

বিহারে সাম্যবাদীরা ও ফরওয়ার্ড-ব্লকের লোকেরা জনসাধারণকে বিনোবাজীর কার্যক্রম সম্পর্কে সতর্ক হইবার জন্য বলিয়াছিলেন। সেই-বিষয়ে ইংগিত করিয়া বিনোবাজী বলেন—"ইঁহারা বলেন যে, সংঘর্ষই জীবনের বুনিয়াদ। তাঁহাদের কাছে সারা জীবন সংঘর্ষময়। মাতা পুত্রকে স্তন্য পান করান। তাহা হইলে তাহা কি মাতার স্তনের সহিত বালকের সংঘর্ষ বলিতে হইবে? সারা দুনিয়া সংঘর্ষে চলে না, প্রেমেই চলে। মুমুক্ষুঃ মৃত্যুর সময় নিজের প্রিয়জনকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে শান্তিতে তাহার মত্যু হয়। তবে উহা কি তাহার আঁখির সহিত প্রিয়জনের সংঘর্ষ? কিন্তু তাঁহারা ঠিকমত চিন্তাও করেন না। এইজন্য তাঁহাদের সব কাজই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়।

"তাঁহারা বলিয়াছেন যে, লোকেরা যেন আমার মোহজালে না পড়েন। কিন্তু তাঁহারা লোককে কী বলিতে চাহেন? যাঁহারা জমি পাইয়াছেন বা পাইবেন তাঁহাদিগকে কি ইহাই বুঝাইবেন যে সেইজমি যেন তাঁহারা গ্রহণ না করেন কিংবা যিনি ভূমিদান করিতে চান তিনি যেন তাহা না করেন? ইঁহারা এযাবৎ বরাবর শুভ সুযোগ নষ্টই করিয়াছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামেও সাম্যবাদীরা সহযোগিতা করেন নাই এবং তাহাতে এক মস্তবড় সুযোগ তাঁহারা হারাইয়াছিলেন। এইজন্য আমি তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ দান করিতেছি, —তাঁহারা যেন এইবারের সুযোগ নষ্ট না করিয়া এই আন্দোলনে সহযোগিতা করেন। তাঁহারা নিজেদের হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে তো দরজা সর্বদা খুলিয়া রাখা চাই।"

॥ ৫১ ॥ কমিউনিস্টগণের আপত্তির খণ্ডন

১৯৫৩ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে বিহারের মুঙ্গের জেলায় পীহট গ্রামে কমিউনিস্ট কর্মীদের পক্ষ হইতে বিনোবাজীর নিকট প্রেরিত এক পত্রে ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল। বিনোবাজী তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে তাহার উত্তর প্রদান করেন।

মার্কসপন্থীদের পক্ষ হইতে ভূদানযজ্ঞের বিরুদ্ধে সাধারণত যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হইয়া থাকে বিনোবাজীর উক্ত জবাবে সে সমস্ত খণ্ডিত হইয়াছে। উত্তরদান প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"প্রথমে কমিউনিস্টরা ভূদানযজ্ঞকে কেবল ভুলই মনে করিতেন না, উপরন্তু তাঁহারা বলিতেন যে, এই আন্দোলন তাঁহাদেরই বিরুদ্ধে করা হইতেছে। কিন্তু আনন্দের কথা এই যে, যেমন-যেমন ভূদানযজ্ঞের ভাবধারা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে, উহার ভাবধারার বিকাশ হইতেছে, দানপত্র পাওয়া যাইতেছে, দেশে জাগৃতি আসিতেছে এবং উহার প্রভাব সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইতেছে, তেমন-তেমন কমিউনিস্টদের মধ্য হইতেও কিছু-কিছু লোক আগাইয়া আসিতেছেন এবং আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে সহযোগিতা পাইতেছি। কয়েকটি স্থানে তাঁহারা আমাকে দানপত্র দিয়াছেন এবং মানপত্রও দিয়াছেন। আর এখন তো একজন বড় কমিউনিস্ট নেতা শ্রীগোপালন ঘোষণা করিয়াছেন—'যদিও ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন হইতে বিনোবাজী যতটা আশা করেন আমরা তাহা করি না এবং আমরা মনে করি যে, আইন ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান হইবে না, তথাপি এই আন্দোলন একটি ভাল আন্দোলন বলিয়া আমরা মনে করি।" আমি মনে করি যে, শ্রীগোপালনের এই উক্তি তাঁহাদের হৃদয়-পরিবর্তনের পরিচায়ক। যাঁহারা মনে করেন যে, কাহারও হৃদয়ের পরিবর্তন হইতে পারে না, তাঁহাদের এইরূপ মনে করা ঠিক নহে। যিনি স্বীকার করেন যে, হৃদয়-পরিবর্তন হওয়া সম্ভব তিনি গৌরবের পাত্র। যিনি নিজের হৃদয়কে অপরিবর্তনশীল বলিয়া মনে করেন তিনি জড়। কারণ এইরূপ ভাবা জড়ের লক্ষণ, চেতনের নহে। আমি জানি যে, কমিউনিস্টরা চেতন, জড় নহে। এজন্য তাঁহাদের কিছু হৃদয়-পরিবর্তন হইয়াছে। প্রথমে তাঁহারা এই আন্দোলনকে কেবলমাত্র অকার্যকর বলিয়াই মনে করিতেন না, উপরন্তু ইহাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন। আজ তাঁহারা ইহাকে অকার্যকর বলিয়া মনে করিলেও ইহাকে ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করেন না।"

কমিউনিস্টদের আপত্তির একটি কারণ এই যে, ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন সফল হইলে ভূমি ছোট-ছোট খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে ও তাহাতে ভারতের ক্ষতি হইবে। পুঁজিপতিরাও ঐরূপ মনে করেন এবং এই বিষয়ে তাঁহারা

কমিউনিস্টদের সহিত একমত। বিনোবাজী বলেন, "কমিউনিস্ট ও পুঁজিপতি উভয়েই চান যে, উৎপাদন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হউক। কিন্তু বণ্টনের বিষয়ে উভয়ের মধ্যেই পার্থক্য রহিয়াছে। পুঁজিপতিরা বলেন যে, দক্ষতা অনুসারে বণ্টন হউক আর কমিউনিস্টরা চান সমবণ্টন। উহাদের মধ্যে এই-টুকুই প্রভেদ। কিন্তু আমরা চাই যে, উৎপাদনও বিকেন্দ্রীকৃত হউক। এই বিষয়ে আমাদের সহিত বিরোধে তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া যান। এইরূপে যাঁহারা পরস্পর-বিরোধী তাঁহারাও কোন-কোন বিষয়ে এক হইয়া যাইতে পারেন।" এখানে কমিউনিস্ট ও পুঁজিপতি উভয়েই উৎপাদনব্যবস্থা কেন্দ্রীকৃত করিতে চান। এজন্য ভূমি-খণ্ড বৃহৎ হইলেই তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু ভূমির বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-ব্যবস্থায় ভূমির খণ্ড ছোট হইলেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিলে, উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা থাকিলে ও সার দিলে উৎপাদনের হার কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম হয় না, বরং অনেক স্থলে বেশী হয়।

কমিউনিস্টরা তাঁহাদের পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আপনার আন্দোলনে কয়েকটি ত্রুটি আছে। এজন্য উহা আমরা বিশ্বাস করি না।" তাহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"ইহার অর্থ এই যে, যদি ত্রুটি না থাকে তবে তাঁহারা এই আন্দোলনে বিশ্বাস করিবেন।"

কমিউনিস্টরা এই অভিযোগ করেন যে, বিনোবাজী দরিদ্রদের সংগঠনকে পছন্দ করেন না। তাহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"আমার সম্বন্ধে তাঁহাদের এই ধারণা ভুল। বরং আমি এই দাবী করিব যে, আমাদের এই দুই বৎসরের আন্দোলনে ভূমিহীনদের মধ্যে যে-জাগরণ আসিয়াছে তাহা অন্য কোন আন্দোলনে হয় নাই। আমার কাছে ভূমিহীনেরা হাজারে-হাজারে আসে। তাহারা স্বীকার করে যে, তাহাদেরই পক্ষ হইয়া আমি দাবী করিতেছি।"

বিনোবাজী ভূমি-ভিক্ষা চাহিয়া ভূমিহীনদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতেছেন —কমিউনিস্টদের এই আপত্তির উত্তরে বিনোবাজী বলেন, "আমি অধিকারই চাহিতেছি, ভিক্ষা নহে। আমি ষষ্ঠাংশ দাবী করিয়া থাকি। ইহাতে যদি কাজ সফল না হয় তবে অধিক চাহিব। ভিক্ষুক কখনও বলিতে পারে না

যে, আমাকে অতটা দাও। ভিক্ষুক যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। যদি আমরা আশ্রমের জন্য ভূমি প্রার্থনা করিতাম এবং যদি কেহ সামান্য কিছু ভূমি দিতেন, তবে আমরা তাঁহার উপকার স্বীকার করিতাম এবং আশ্রমের কার্য-বিবরণীতে তাঁহার দানের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিতাম যে, আমরা তাঁহার কাছে ঋণী। কিন্তু এই ব্যাপার অন্যরূপ। কেহ যদি এক হাজার একর ভূমিদান করেন এবং তাঁহার তদপেক্ষা অনেক গুণ বেশী ভূমি থাকে, তবে সেই এক হাজার একর ভূমি লইতেও আমি অস্বীকার করি। আমি বলি যে, ইহা তো ভিক্ষা দেওয়া হইল। আমি ভিক্ষা লইতে আসি নাই, দীক্ষা দিতে আসিয়াছি।"

কমিউনিস্টরা অনুযোগ করেন যে, ধনবানেরা বিনোবাজীকে কেবলমাত্র আবাদের অযোগ্য পতিত ভূমি দিয়াছেন। তাহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"আমি হনুমানের কাজ করিতেছি। সমগ্র পর্বতই আমি রামের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিব। তাহার মধ্য হইতে প্রয়োজনমত বনস্পতি বাছিয়া লওয়া যাইবে। আমি ধনবানদিগকে বলিয়াছি যে, তাঁহাদের নিকট হইতে ৩২ লক্ষ একর ভাল জমি পাইতে চাই। তাহা ছাড়া পাহাড় দিলে তাহাও লইব। কারণ উহাও আমাদের মাতৃভূমির অংশ। আমরা তাহাকে ভালবাসি। উপরন্তু খারাপ জমি দিলেও তো তিনি কিছু ছাড়িতেছেন। যাহাই দিন না কেন, যখন কেহ কিছু দেন তখন তাঁহার অঙ্গনে আমাদের প্রবেশ ঘটে। অতঃপর আমরা এক-পা দুই-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহার রন্ধনশালায় পৌঁছিব এবং বলিব যে, আপনার পুত্র আসিয়াছে, তাহাকে খাইতে দিন। তখন তিনি খাওয়াইতে বাধ্য হইবেন।"

ভূদানযজ্ঞের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে কমিউনিস্টগণের যে-আপত্তি ছিল তাহার উত্তরদান প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন যে, ধনবানদের মধ্যে যাঁহারা সৎলোক ও উদারচিত্ত তাঁহাদিগকে তিনি দান দিবার ও মালিকানা ত্যাগ করিবার প্রেরণা দান করিয়া ও তাঁহাদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার ভাবধারায় দীক্ষিত করিতেছেন এবং ধনবানদের মধ্যে যাঁহারা কৃপণ ও সঙ্কীর্ণ-হৃদয় তাঁহাদের নিকট হইতে উক্ত সৎব্যক্তিগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। কমিউনিস্টগণ ধনবানদিগকে দরিদ্রের শত্রু বলিয়া মনে

করেন এবং তাঁহাদের সহিত দরিদ্রের সংঘর্ষ ও লড়াই বাধাইতে চান। এজন্য কমিউনিস্টগণ ভেদ, বিরোধ ও লড়াই-এর ভাষা ব্যবহার করেন। সেই কারণে ঐরূপ ভাষার মাধ্যমে তাঁহাদিগকে বুঝানো সহজ হয়। তাঁহারা ভেদের ভাষা সহজে বুঝেন। এইজন্য বিনোবাজী অভেদবাদী হইয়াও ভেদের ভাষা ও লড়াই-এর ভাষা ব্যবহার করিয়া বলেন, "আমি দরিদ্রের শত্রুদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইতেছি। কমিউনিস্টরা দরিদ্রের সকল শত্রুকে এক করেন। ইহাতে সজ্জন ও দুর্জন এক হইয়া যায়। আর তাহাতে দুর্জনদেরই শক্তিবৃদ্ধি হয়। ধনবানদের মধ্যে অন্তত শতকরা দশজন তো ভাল লোক আছেন। যদি সেই দশজনকে পাওয়া যায়, তবে তাঁহাদের পুণ্যের ফল বাকী নব্বইজনের মিলিবে। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সজ্জন তাঁহাদিগকে আমি অহিংস-উপায়ে ভাঙ্গাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছি। ভেদনীতির এই প্রয়োগকৌশল যিনি বুঝেন না, তিনি রাজনীতি বুঝেন না, নীতিশাস্ত্রও জানেন না।" তিনি আরও বলেন যে, কুস্তি লড়িবার সময় সামনের লোকের সহিত হাত মিলাইতে হয়—জয় যাহারই হউক না কেন। আর সেইজন্য তিনি বড় বড় জমিদার ও রাজাদের সহিত কুস্তি লড়িবার জন্য হাত মিলাইয়াছেন। যদি তাঁহার পরাজয় ঘটে, তবে কমিউনিস্টদের এই মতই প্রমাণিত হইবে যে, ধনবানদের মধ্যে শতকরা একশতজনই দুর্জন। আর তাঁহার জয় হইলে দরিদ্রের মঙ্গল সাধিত হইবে। সুতরাং তিনি যে-হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন তাহাতে কমিউনিস্টদের কোন ক্ষতি নাই।

বর্তমান অবস্থায় আইনের দ্বারা ভূমি-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব কিনা এই সম্পর্কে তিনি বলেন—"প্রভাব তিন প্রকারের হয়। প্রথম—হত্যা করিয়া, 'ভূমি দাও নহিলে গুলি চলিবে'। দ্বিতীয়—আইনের প্রভাব; তৃতীয়—নীতির দ্বারা জনমতের প্রভাব। আমরা নৈতিক প্রভাব চাই। নৈতিক চাপ ব্যতীত হৃদয়-পরিবর্তন করিতে পারিব—এইরূপ দাবী আমি করি নাই। ইহার পরেই আইন তৈয়ারী করা যাইতে পারে। আপনারা আইনে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আইনে শক্তি আসে কোথা হইতে? আইনে হয় জনতা, না-হয় সৈন্য হইতে শক্তি আসিবে। যদি ২৫ একরের 'সিলিং' (ব্যক্তিগত মালিকানায় ভূমির উচ্চতম পরিমাণ) নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে হাজার-হাজার মধ্যবিত্তের

নিকট হইতে ভূমি লইতে হইবে। দুনিয়ায় মধ্যবিত্তরাই রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষিত। খবরের কাগজ তাঁহারাই পরিচালনা করেন। এইজন্য মধ্যবিত্তদের নিকট হইতে আইনের বলে বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি লওয়া যাইতে পারে না। তাঁহাদের নিকট হইতে যদি ভূমি লইতে হয়, তবে রক্তাক্ত-বিপ্লবের দ্বারাই লইতে হইবে। রক্তাক্ত-বিপ্লব এখানে অসম্ভব। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে যখন 'সিলিং'এর কথা উঠে তখন লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভূমি ভাগ করিয়া লয়। এইজন্য আইনের দ্বারা সমস্যার সমাধান তখনই সম্ভবপর হইবে, যখন বিনা ক্ষতিপূরণে ভূমি লওয়ার জন্য অন্যকোন উপায় বাহির হইবে। উহাও মধ্যবিত্তদের সম্মতি অনুসারে করিতে হইবে। ভারত-বর্ষের সংবিধানেও ক্ষতিপূরণের কথা আছে। উহাও কোন অনুচিত কথা নহে। কারণ আইন জনমতের উপর ভিত্তি করিয়া তৈয়ারী হইয়াছে। কমিউনিস্টদের বক্তব্য হইল 'উহা ভুল তৈয়ারী হইয়াছে'। কিন্তু যে-ভুল জনমত করে তাহাকে ভুল বলা উচিত নহে। এইজন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে আইন তৈয়ারী করিয়াও ভূমি পাওয়া যাইবে না। লোকেরা নিজেদের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া লইবে এবং যে-যৎসামান্য ভূমি পাওয়া যাইবে তাহাও খারাপ হইবে। আমি খারাপ ভূমি লওয়ার সংগে-সংগে ভাল ভূমিও লোকেদের নিকট চাই।"

মানবহৃদয়ের মৌলিক সততা ও অন্তিমে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি-সংঘটন সম্পর্কীয় এক আলোচনা প্রসংগে বিনোবাজী বলেন—"কমিউনিস্ট-ভাইরা সততার উপর বিশ্বাস না রাখিলে তাঁহাদের গুরু যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সফল হইতে পারে না। তাঁহাদের গুরু কার্ল মার্ক্স বলিয়াছেন যে, প্রথমে দরিদ্রের রাষ্ট্র হইবে এবং তাহার পর রাষ্ট্র আর থাকিবে না। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কাহারও হাতে কোনরূপ ক্ষমতা না থাকিলেও রাষ্ট্র চলিতে পারে। যদি ইহা বিশ্বাস করা যায় তবে জনসাধারণের উপরও বিশ্বাস রাখিতেই হইবে। তাঁহারা ইহা বলেন যে, অবশেষে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি হইবে। কোনরূপ অধিকারের প্রয়োজন থাকিবে না। আর জনগণ সৎভাবে জীবনযাপন করিতে থাকিবে। তাহা হইলে মনুষের সততার উপর বিশ্বাস রাখিতে হয়। মার্ক্স যে কথা বলিয়াছেন তাহা দশ লক্ষ বৎসর পরে ঘটিবে এরূপ নহে। তাহা এখনই ঘটিবার কথা। যদি মানুষের সততার উপর বিশ্বাস না থাকে তবে

রাষ্ট্রকে কায়েম রাখিতেই হইবে এবং স্বীকার করিতে হইবে যে, ষ্টেট্ উইল উইদার এওয়ে অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে—এই কথাটি ভুল। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করেন এমন লোক কেবল কমিউনিস্টদের মধ্যে নহে, কংগ্রেস এবং সর্বোদয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যেও আছেন। এই ভাবধারা সম্পর্কে তিনটি বিভিন্ন মত আছে। (১) কমিউনিস্টরা মনে করেন যে, অবশেষে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্র অত্যন্ত পাকা এবং মজবুত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য এখন সমস্ত অধিকার কেন্দ্রীভূত থাকা প্রয়োজন। উহাকে তাঁহারা ডিক্টেটর্শিপ্ অফ্ প্রোলেটারিয়ট্ (সর্বহারার একনায়কত্ব) বলেন। তাঁহারা মনে করেন যে, বর্তমানে একনায়কত্ব হইলেও অবশেষে ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। (২) দ্বিতীয় মত হইল আমাদের। আমরা মনে করি যে, রাষ্ট্র থাকিবে না এবং এখন হইতেই উহাকে ক্ষীণ করিবার কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। ধীরে-ধীরে অধিকার বিকেন্দ্রীকৃত হওয়া প্রয়োজন। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত অধিকার বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব। (৩) ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা স্বীকার করেন এইরূপ লোক পৃথিবীতে অনেক আছেন। কংগ্রেস ও প্রজা-সোস্যালিস্টদের মধ্যেও অনেকে এইকথা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য হইল যে, কোন-না-কোনরূপে রাষ্ট্র সর্বদাই থাকিবে। এইজন্য আমি কমিউনিস্টদের বলি যে, তাঁহাদের এবং আমাদের ভাবধারায় একস্থানে মিল আছে। তাহা হইল এই যে, অবশেষে রাষ্ট্র থাকিবে না। যদি তাঁহারা উহা জানেন ও ইহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহা কোন্ সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া? এই সিদ্ধান্তের উপর নহে কি যে, মানুষের হৃদয়ে সততা আছে আর এইজন্য অবশেষে রাষ্ট্রের প্রয়োজনই থাকিবে না? এইরূপ অবস্থায় মানুষের সততার উপর বিশ্বাস রাখাই উচিত।"

॥ ৫২ ॥ সাম্যযোগ

একথা পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সকল মানুষের সম্যক ও সমান বিকাশ সাধন করাই সর্বোদয়ের কাম্য। কেবলমাত্র সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যকের

সর্বাপেক্ষা অধিক হিত সাধিত হইলেই চলিবে না। কারণ তাহার অর্থ হইতেছে যে, অবশিষ্ট যাহারা থাকে তাহাদের বিলোপ হয় হউক, তাহাদের নাশ হয় হউক, তাহাতে উদ্বেগ বা চিন্তার কোন কারণ নাই। বরং অধিকাংশের সম্যক বিকাশের পথ সহজ করিবার জন্য তাহাদের বিলোপসাধন আবশ্যক বিবেচিত হইতে পারে! ইহা তো মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ আমি কি—ইহা যদি আমরা গভীরভাবে মনন করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা বুঝিব যে, আমি যাহা, অন্যেও তাহাই। আমি অন্যের মধ্যে ও অন্যে আমার মধ্যে সমানভাবে আছে। আমার বিকাশ বা অভ্যুদয় পূর্ণ হইতে পারে না, যদি ও যতক্ষণ অন্যের বিকাশ বা অভ্যুদয় না হয়। ইহার কারণ এই যে, সকল মানুষের মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান। এই আত্মা অনন্ত গুণসম্পন্ন এবং অনন্তভাবেই বিকাশশীল। অতএব সকলেরই সমান বিকাশ হইতে পারে, যদিও একই জীবনে তাহা সম্ভব হয় না। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। জীবনকে বিভক্ত করিয়া দেখা যায় না। তাই আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এই সমদর্শন হওয়া চাই ও সমতা সাধন করা চাই। আজ যদি আমরা ব্যক্তিগত জীবন তথা সামাজিক ও জাগতিক জীবনপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তবে আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব। আজ জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এত দ্বেষ, হিংসা ও দ্বন্দ্ব কেন? একদেশ অন্যদেশের ভয়ে ভীত কেন? ইহার মূলে ইহাই রহিয়াছে যে, একদেশ নিজেকে অন্যদেশ অপেক্ষা বড় মনে করে এবং তাহাকে বাদ দিয়া নিজেই উন্নতি ও সুখ ভোগ করিতে চায়। কারণ ঐদেশ মনে করে যে, অন্যের উন্নতি তাহার নিজের উন্নতির পথে বিঘ্নস্বরূপ হইবে। এই ভ্রমাত্মক মনোবৃত্তি হইতে হিংসা ও দ্বেষের উদ্ভব হয় এবং নিজের ধ্বংসকে ডাকিয়া আনে। সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, মানুষ যেখানে জন্মের জন্য নিজেকে উচ্চ মনে করিয়া অন্যের সংস্পর্শকে দূরে সরাইয়া রাখে, সেখানে সে নিজেই সংকীর্ণ হইয়া যায় এবং ঐ মনোবৃত্তি তাহাকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সংকুচিত করিয়া ফেলে। আমি যাহাকে নীচে বাঁধিবার বা দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিব সে-ও আমাকে নীচে টানিয়া

নামাইবে। যদি আমাদের আশপাশের সকলে নৈতিক দিক হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে, তবে তাহার প্রতিক্রিয়া আমার নৈতিক জীবনেও কিছু-না-কিছু না আসিয়া থাকিতে পারে না। অর্থনৈতিকক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির মানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান এইমূলে বিশ্বাস থাকিলে, তবেই নিজেকে সকলের মধ্যে ও সকলকে নিজের মধ্যে দেখার দৃষ্টি লাভ করা যায় এবং তাহা হইতে সুখে-দুঃখে সকলকে নিজের সহিত সমান করিয়া দেখার শিক্ষা লাভ হয়। বিনোবাজী ইহাকে "সাম্যযোগ" আখ্যা দিয়াছেন। সাম্যযোগই ভূদানযজ্ঞের মূল বিচারধারা।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ষষ্ঠ-অধ্যায়ের চারিটি শ্লোকে (২৯—৩২) 'সাম্যযোগ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উহা এইঃ—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

র্যিনি আমাকে (আত্মাকে) সর্বভূতে দর্শন করেন এবং সর্বভূতকে মধ্যে এবং সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দেখিয়া থাকেন।'

'যিনি আমাকে (আত্মাকে) সর্বভূতে দর্শন করেন এবং সর্বভূতকে আমাতে দেখিতে পান তিনি আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হন না এবং আমিও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হই না।'

'যিনি সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে (আত্মাকে) নিজের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া সাধনা করেন সেই যোগী যেকোন অবস্থায় অবস্থান করুন না কেন, তিনি আমাতেই অবস্থান করেন।'

'হে অর্জুন, যিনি সুখে বা দুঃখে সকল জীবকে নিজের সহিত সমান

করিয়া দেখেন সেই (সর্বভূতানুকম্পী) যোগী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহা আমার অভিমত।'

ইহাই সাম্যের সমগ্র দৃষ্টি। বিনোবাজী যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী। তাই তাঁহার প্রাথমিক দৃষ্টি আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে তাঁহার সাম্যের প্রাথমিক দৃষ্টি ছিল—সাম্যযোগ বা সাম্যের সমগ্র দৃষ্টি। এই মৌলিক আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। তাঁহার সমদৃষ্টি সামান্য হইতে বিশেষে, সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিতে সংক্রমিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতার সমগ্রতা অর্থাৎ আত্মার একত্ববোধ হইতে জীবনের বিশেষ-বিশেষ ব্যবহারিকক্ষেত্রে এই একাত্মবোধ পৌঁছিয়াছে। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী রাস্কিনের 'আন্ টু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থ হইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ জীবনের এক বিশেষ ক্ষেত্রে সমদৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন। ক্রমশ ঐ সমদৃষ্টি জীবনের অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় এবং অবশেষে উহা সাম্যযোগে বা সাম্যের সমগ্র দৃষ্টিতে পরিণতি লাভ করে। এজন্য মহাত্মা গান্ধীর জীবন-দর্শনের প্রগতির প্রণালী ইনডাক্টিভ্ (আরোহ) এবং বিনোবাজীর জীবন-দৃষ্টির প্রগতির প্রণালী ডিডাক্টিভ্ (অবরোহ)। তাঁহাদের নিজ নিজ জীবন-প্রারম্ভের বৈশিষ্ট্য হইতে দৃষ্টি-প্রগতির প্রণালীর এই পার্থক্য সংঘটিত হয়।

॥ ৫৩ ॥ সাম্যবাদ ও সাম্যযোগ

বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের মূল বিচারধারার নাম 'সাম্যযোগ' দিয়াছেন। ইহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। সাম্যযোগের ভিত্তির উপর সর্বোদয় সমাজ গঠন করিতে হইবে। আজ জগতে যে প্রধান-প্রধান বিচারপ্রবাহ চলিতেছে তাহার সহিত সাম্যযোগের তুলনামূলক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে সাম্যযোগের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ অনুধাবন করা সহজ হইবে। উপরন্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্যযোগ কিরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে তাহাও বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। উহাতে সর্বোদয়ের স্বরূপ আমরা সহজে বুঝিতে সক্ষম হইব।

পৃথিবীতে আজ তিনটি প্রধান বিচারপ্রবাহ চলিতেছে—(১) পুঁজিবাদ, (২) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও (৩) সাম্যবাদ। ইহার মধ্যে পুঁজিবাদ সর্বাপেক্ষা পুরাতন। যোগ্যতা বা কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করাই পুঁজিবাদের কাম্য। বিনোবাজী বলেন—"পুঁজিবাদ কেবলমাত্র কার্যদক্ষতাকেই স্বীকার করে। পুঁজিবাদ বলে যে, কিছুলোকের কার্যদক্ষতা কম, সুতরাং তাহাদিগকে কম করিয়া দিতে হইবে। আর কিছুলোকের কার্যদক্ষতা বেশী, এজন্য তাহাদিগকে বেশী করিয়া দেওয়া আবশ্যক। কার্যদক্ষতা অনুসারে পারিশ্রমিক দিয়া পুঁজিবাদ সমাজে যোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে চাহে। পুঁজিবাদ প্রচলিত থাকার ফলে কিছুলোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চতম স্তর পর্যন্ত উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার ফলে বহুতর লোকের জীবন অবনতির অধঃস্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। পুঁজিবাদের কাছে ইহার কোন প্রতিকার নাই। পুঁজিবাদ সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছে যে, যাহারা যোগ্য নহে তাহারা অবনতই থাকিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। যিনি যোগ্যতা-সম্পন্ন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার অধিকার কেবলমাত্র তাহারই—ইহা অনিবার্য। এইকারণে সারা জগৎ আজ দুঃখার্ত এবং এইজন্যই পুঁজিবাদের সমর্থকও নিতান্ত কম। আজ হউক কাল হউক, ইহার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী।"

গণতান্ত্রিক সমাজবাদে সার্বজনীন ভোটাধিকার সমাজ-কল্যাণ সাধনের একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু ভোটের বলে কাজ চলিলে বহুক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। তাহার প্রতিকার গণতান্ত্রিক সমাজবাদে নাই। বিনোবাজী বলেন—"গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির এক ভোট। এখানে ভোটের বলে কাজ চলিয়া থাকে। তাহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষা হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠেরই কল্যাণ সাধিত হয়। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ দাবী করে যে, উহাতেই সকলের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু গণতান্ত্রিকতার জন্য যেসব দোষ ঘটিয়া থাকে তাহা দূর করিবার উপায় সমাজবাদের হাতে নাই। যতদিন বহুসংখ্যকের রায়ের দ্বারা সংখ্যাল্পের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা হইবে ততদিন পূর্ণ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে না।"

এখন সাম্যবাদের কথা আলোচনা করা যাউক। বিনোবাজী বলেন—"সাম্যবাদ বলে যে, উচ্চশ্রেণীর বিলোপ না করিলে সাম্যপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব

হইবে না। শ্রেণী-সংঘর্ষ ব্যতীত এবং আজ যাহার হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে তাহার বিলোপ সাধন ব্যতীত উপায়ন্তর নাই। এতদূর পর্যন্ত হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক আর তাহাই হইতেছে ধর্ম। ইহা সুবিদিত যে ইহার দ্বারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ হিংসা হইতে প্রতিহিংসারই উদ্ভব হয়, যদিও হিংসার সাহায্যে তাহাকে কিছুদিন দাবাইয়া রাখা যায়। কেবলমাত্র তাহাই নহে, এই কারণে মনুষ্যত্বের মূল্য ক্ষুন্ন হইতেছে এবং মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাও নষ্ট হইতেছে।"

এখন সাম্যযোগের বিচারধারা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। সাম্যযোগ কি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"সাম্যযোগ বলে যে, সকল মানুষের মধ্যে একই আত্মা সমানভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। মানুষে-মানুষে কোনরূপ যে ভেদ আছে তাহা সাম্যযোগ স্বীকার করে না। উপরন্তু, মানুষের আত্মা এবং প্রাণীমাত্রের আত্মার মধ্যেও কোন মৌলিক ভেদ নাই। তবে, উহা এই পর্যন্ত স্বীকার করে যে, মানুষের আত্মার যে-বিকাশ হওয়া সম্ভব অন্য প্রাণীদের আত্মায় তাহা সম্ভব নহে। যদিও অনুশীলনের দ্বারা সকল মানুষের আত্মার বিকাশ সাধন করা যায় তথাপি একই জীবনে সকলের বিকাশ সমানভাবে হয় না। প্রাণীমাত্রেই একই আত্মা অধিষ্ঠিত। এজন্য যতদূর সম্ভব প্রাণীদিগকে রক্ষার জন্য প্রযত্ন করা কর্তব্য।

"সাম্যবাদ ও সাম্যযোগের পার্থক্য এই যে, সাম্যবাদ আত্মার অভিন্নতা বিশ্বাস করে না, কিন্তু সাম্যযোগ তাহা করে। সাম্যযোগ কেবলমাত্র আত্মার অভিন্নতা বিশ্বাস করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহা এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই আরও গভীর প্রদেশে প্রবেশ করে। তাহার ফলে নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকে।

"যখন আমরা কোন মৌলিক আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন তাহা জীবনের অনেক শাখায় অনুপ্রবেশ করিয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। আমাদের নিজেদের বুদ্ধিশক্তির মালিক আমরা নহি, তাহার মালিক একমাত্র ভগবান। আমরা যেসব গুণের অধিকারী হই তাহা সমাজেরই জন্য। অতএব আমরা যেসব শক্তি লাভ করিয়াছি তাহা সমাজের সেবায় নিয়োজিত করিতে

হইবে। আমরা তো নিজেদের শরীরেরও মালিক নহি। আমরা উহার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। যাহাকিছু সম্পত্তি আমাদের কাছে আছে তাহার মালিক আমরা নহি, তাহার মালিক ভগবান। ট্রাস্টীশিপ বা তত্ত্বাবধায়কতার বিচার-ধারা গ্রহণ করিলে পূর্ণ বিচার-ক্রান্তি আসিয়া যায়। আমাদের যাহাকিছু সবই সমাজকে সেবা করিবার জন্য। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমাজের চরণে অর্পণ করিয়া দেওয়া। সাম্যযোগ ও সাম্যবাদের মধ্যে এই বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।"

সাম্যযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তাহা আর্থিকক্ষেত্রে কিরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সৃষ্টি করে তাহার কিছু আলোচনা ইতিপূর্বে 'সর্বোদয় দর্শন ও সর্বোদয় সমাজের প্রতিষ্ঠা' প্রকরণে করা হইয়াছে। উহার ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"যেব্যক্তি নিজের সাধ্যমত পূরামাত্রায় সমাজের কাজ করিবে সেইব্যক্তি তাহার জীবন নির্বাহের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা পাওয়ার অধিকারী হইবে। যেব্যক্তির চক্ষু নাই সে যদি তাহার চক্ষু না থাকা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব কাজ করিয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ণভাবে ভরণপোষণ পাইবার অধিকার তাহারও আছে। যেব্যক্তি দৃষ্টিশক্তিহীন সেব্যক্তি সাধ্যমত পূর্ণভাবে কাজ করিলেও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নব্যক্তি অপেক্ষা তাহার কাজের পরিমাণ কম হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কাজ করিবার শক্তি ও তারতম্য অনুসারে ভরণ-পোষণের ব্যবস্থায় তারতম্য করা অন্যায়। পোষণ ভৌতিক বস্তু এবং সেবা নৈতিক বস্তু। নৈতিক বস্তুর মূল্য ভৌতিক বস্তুর মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে না। নিমজ্জমান ব্যক্তিকে যে উদ্ধার করিয়াছে তাহার সেই দশ মিনিটের সেবার মূল্য মজুরীর হিসাবে পরিমাপ করা যায় কি? মা সন্তানকে, পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, মন্ত্রী সমাজকে সেবা করেন, কিন্তু এইসব সেবাকার্যের মূল্য পয়সার হিসাবে নির্ধারণ করা যায় না। যে-সেবায় হৃদয় ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার মূল্য কেমন করিয়া পয়সার দ্বারা নিরূপণ করা সম্ভব হইবে? পুত্র মাতাকে যাহাকিছু দিয়াছে, ছাত্র গুরুকে যাহাকিছু দিয়াছে, কৃষক সমাজকে যাহাকিছু দিয়াছে তাহা অমূল্য। নৈতিক মূল্যের মত আর্থিকক্ষেত্রেও শ্রমের মূল্য সমান হওয়া চাই। কিন্তু আজ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। শারীরিক কাজ অপেক্ষা বুদ্ধির

কাজের মূল্য বেশী দেওয়া হইতেছে, উহার প্রতিষ্ঠাও অধিক। কিন্তু ঐ প্রকার বৈষম্য একেবারে ভিত্তিহীন। সাম্যযোগের বিচারধারা আত্মার সমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য উহাতে আর্থিকক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য স্বীকার করা হয় না। তবে সেবকের ভূমিকা অনুসারে সেবার প্রকার ভেদ হইতে পারে। যে-সেবা মা করিতে পারেন তাহা পুত্রের দ্বারা সম্ভব নহে, আবার যে-সেবা পুত্র করিয়া থাকেন তাহা মা করিতে পারেন না। যে-সেবা প্রভু করিতে পারেন তাহা ভৃত্যের দ্বারা সম্ভব নহে, আবার ভৃত্য যে-সেবা করেন তাহা প্রভু করিতে পারেন না। ভাই যে-সেবা করেন ভগ্নী তাহা করিতে পারেন না। আবার ভগ্নীর কাজ ভাই করিতে পারেন না। এরূপে ব্যক্তির পার্থক্য ও শক্তির পার্থক্য অনুসারে সেবার পার্থক্য খুবই হইতে পারে। কিন্তু সকলের জন্য সমানভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

"অঙ্গুলীসমূহ কমবেশী কাজ দেয় কিন্তু তাহারা সবই সমান। একটির দ্বারা যেকাজ হয় অন্যটির দ্বারা সেকাজ পাওয়া যায় না। এভাবে বুঝা আবশ্যক যে, সমাজে একের সেবা অন্যের সেবা হইতে ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহার আর্থিক মূল্য সমান হওয়া চাই।

"আমরা বুঝিয়াছি যে সাম্যযোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে যখন নৈতিক মূল্যের কোন পার্থক্য হয় না তখন আর্থিকক্ষেত্রেও পার্থক্য হওয়া উচিত নহে। উন্নতির জন্য প্রত্যেকের সমান সুযোগ পাওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার সুযোগ সমানভাবে পাওয়া আবশ্যক। শিক্ষার্থী তাহার গ্রহণশক্তি অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করিবে একথা সত্য, কিন্তু তাহাতে পারিশ্রমিকের পরিমাণ কম-বেশী করিলে সকলের উন্নতি ঠিকভাবে হইবে না। তাহাতে ক্ষেত্র পরিবর্তন করিয়া অন্যক্ষেত্রে যাইবার জন্য আকর্ষণ আসিয়া থাকে—আজকাল যেমন হইতেছে। সমান বেতনের ব্যবস্থা করিলে এই মনোবৃত্তি দমিত হইবে।

"আর্থিকক্ষেত্রে সাম্যযোগের পরিণাম এই হইবে যে, প্রত্যেক গ্রাম সম্পূর্ণ-রূপে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। শস্য, বস্ত্র, দুধ, ঘি প্রভৃতি যেসব জিনিসের মৌলিক প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা প্রত্যেক গ্রামে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইবে এবং তাহাতে গ্রাম স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। এই গ্রাম স্বাবলম্বী হইবে আবার ঐ গ্রামও স্বাবলম্বী হইবে। এইভাবে উভয়েই স্বাবলম্বী হইলে সাম্যের

উদ্ভব হইবে। ইহার পরিবর্তে যদি এই গ্রাম অপূর্ণ থাকে এবং ঐ গ্রামও অপূর্ণ থাকে, তবে উভয়ের অপূর্ণতার জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। যেসব জিনিসের মৌলিক প্রয়োজন আছে সেইসব জিনিস গ্রামে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। ভগবান সকলকে পরিপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধি ও শক্তি কমবেশী আছে। কিন্তু ভগবানের ব্যবস্থা এমন বিকেন্দ্রিত যে, তাহাতে সকলের উন্নতি হইতে পারে। এরূপ বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা আর্থিক-ক্ষেত্রেও হওয়া প্রয়োজন।"

রাজনৈতিকক্ষেত্রে সাম্যযোগের ফল ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন, "সাম্যযোগের ফলে রাজনৈতিকক্ষেত্রেও বর্তমান মূল্যের পরিবর্তন হইবে। আমরা মাত্র শোষণহীন সমাজ চাহি না, আমরা শাসনহীন সমাজও চাহি। সাম্যযোগের সিদ্ধান্ত অনুসারে শাসনক্ষমতা গ্রামে-গ্রামে বন্টন করা হইবে। অর্থাৎ গ্রামে-গ্রামে নিজেদেরই রাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। মুখ্যকেন্দ্রে নামে মাত্র ক্ষমতা থাকিবে এবং এরূপ হইতে হইতে অবশেষে শাসনহীন সমাজ গড়িয়া উঠিবে।"

সাম্যযোগ সামাজিকক্ষেত্রে যে-বিপ্লবাত্মক পরিণাম সৃষ্টি করিবে তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"সামাজিকক্ষেত্রেও জাতিভেদ বা উচ্চনীচ ভেদ থাকিবে না। যদি কাহারও ব্রাহ্মণের গুণ থাকে তবে তাহাকে তদনুরূপ কাজ দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অন্যের অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া গণ্য করা হইবে না। সেইরূপ মেথর, মুচি প্রভৃতিকে নীচ বলিয়া গণ্য করা চলিবে না। কারণ তাহাদের অবর্তমানে সমাজ চলিতে পারে না।"

সুতরাং প্রকৃত ক্রান্তি বা বিপ্লব একমাত্র সাম্যযোগের দ্বারাই আসিতে পারে। ইহা দাবী করিয়া বিনোবাজী বলেন—"এইভাবে নৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় উক্তরূপ পরিবর্তন আনয়ন করা সাম্য-যোগের কাম্য। ইহাকে ক্রান্তি বলা হয়। আজকাল হিংসাকেই বিপ্লব বা ক্রান্তি বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু যেখানে মৌলিক বিষয়ে ক্রান্তি হয় না সেখানে মাত্র উপরে উপরে পরিবর্তন আসিলে তাহাকে বিপ্লব বলা ভুল। বিপ্লব তখনই হইবে যখন আমরা নৈতিক জীবনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হইব। আমরা এই দাবী করি যে, সাম্যযোগ নৈতিক মূল্যের

পরিবর্তন সাধন করে। কারণ সাম্যযোগের ভিত্তি আধ্যাত্মিক এবং উহা জীবনের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় ক্রান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে।” অর্থাৎ আত্মার একত্ব মানিয়া লইলে তবেই নৈতিকক্ষেত্রে সমতার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইতে পারে —নচেৎ নহে। যেখানে নৈতিকক্ষেত্রে সমতার মনোবৃত্তির অভাব সেখানে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে মৌলিক সমতা সৃষ্টি করা সম্ভব নহে।

সাম্যযোগের ব্যাপক দৃষ্টি ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—“সাম্য-যোগের বিচার হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমে মোহ-মমতা হইতে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ভূদানযজ্ঞ মোহ-মমতামুক্ত হওয়ার উপায়স্বরূপ। কিরূপে মোহমুক্ত হওয়া যাইবে? জমির মালিকানা বিসর্জন দিয়া এই মুক্তির সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে। ভূমিদান দেওয়া কাহারও প্রতি কৃপা করা নহে। আরও অগ্রসর হইয়া আমি বলিব যে, কোন প্রদেশে যদি জমি কম ও লোকসংখ্যা বেশী থাকে, তবে একপ্রদেশের লোক অন্যপ্রদেশে গিয়া বসবাস করিতে পারিবে। তদ্রূপ একদেশ হইতে অন্যদেশেও লোক গিয়া বসবাস করিতে পারিবে। পৃথ্বী-মাতার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। যিনি যেখানে থাকিতে চান তিনি সেখানে থাকিতে পারিবেন। এইভাবে আমরা জগতের নাগরিক হইতে চাই এবং সর্বপ্রকার আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভেদ দূর করিতে চাই। জমি অল্প হউক, ছোট টুকরা হউক কিংবা বড় হউক, তৎ সমস্তই পরমেশ্বরের দান। আমরা তাহার মালিক হইতে পারি না। ভারত-বর্ষের অধিবাসী ভারতবর্ষের মালিক, জার্মাণীর অধিবাসী জার্মাণীর মালিক এ ধারণা ভুল। পৃথিবীতে যত বায়ু, যত জল, যত আলো ও ভূমি আছে, উহা সকলেরই সম্পত্তি—ইহা সাম্যযোগের ব্যাপক দৃষ্টি।”

কাঞ্চীপুরম সর্বোদয়-সম্মেলনের সময় তথায় তাঁহার প্রথম দিনের প্রার্থনা প্রবচনে বিনোবাজী সমগ্র দৃষ্টিতে সাম্যবাদ ও সাম্যযোগের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন,—“সাম্যবাদ হইতেছে বৈষম্যবাদের প্রতিক্রিয়া, উহা সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সাম্যযোগ হইতেছে এক জীবন-বিচার, উহা স্বয়ম্ভূ। ইউরোপে পুঁজিবাদী সমাজ-রচনায় যে বিচারধারা প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহাতে কয়েকটি ত্রুটি ছিল। এজন্য তাহার প্রতিক্রিয়াসরূপ সেখানে সাম্যবাদের উদ্ভব হয়। কোন

প্রতিকারাত্মক বিচারধারা জীবন-বিচার হইতে পারে না। কারণ উহা এক তাৎকালিক বস্তুমাত্র, কোন এক সময়-বিশেষের জন্য উহা উপযোগী থাকে। আমার ধারনা এই যে উহার কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। উহার মধ্যে যে সার ছিল তাহা জগৎ আজ গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। তাহা আজ জগতকে আকৃষ্ট করিতেছে। আমরা উহাকে সর্বোদয় বলিয়া থাকি। আমি উহার নাম দিয়াছি 'সাম্যযোগ'। চিরদিনই উহার উপযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কারণ উহার ভিত্তি হইতেছে আত্মার একত্ব। আত্মার একত্ব ভারতের ঋষি-গণের অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। তাঁহারা মনুষ্য সমাজকে আত্মার একত্বের বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছেন।"

॥ ৫৪ ॥ এখন সখ্য-ভক্তির যুগ

অনাদিকাল হইতে মানবসমাজের বিকাশ হইয়া আসিতেছে। আত্মা অনন্ত-গুণসম্পন্ন। এক-এক যুগের প্রয়োজন অনুসারে আত্মার এক-এক গুণের বিকাশের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তখন সেইগুণের বিকাশ হয় এবং সেইসময়ে সমাজে সেইগুণের চিন্তন ও মনন চলিতে থাকে। এরূপে সমাজে এক সময়ে পরিচ্ছন্নতা-গুণের বিকাশের আবশ্যকতা হইয়াছিল। সেইযুগে সমাজে পরিচ্ছন্নতাকেই ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হইত। অন্য এক যুগে কাম-নিয়মনের প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন কাম-নিয়মনের প্রচেষ্টায় বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। গুণমাত্রকেই লোকে আদর করে সত্য, কিন্তু যুগের প্রয়োজন অনুসারে ও পরিস্থিতির পরিণতির ফলস্বরূপ সমাজে যে গুণের বিকাশের প্রয়োজন হয় সেই গুণের অনুশীলন করিবার জন্য সমাজ উৎসুক হইয়া উঠে। পরিচ্ছন্নতাকে আজ মানুষ আদর করে। কাম-নিয়মনকে মানুষ নিশ্চয়ই আদর করে। কিন্তু আজ আর উহার বিকাশের জন্য সমাজ উৎসুক হইয়া নাই। যে-গুণের প্রয়োগ ও বিকাশের জন্য সমাজ আজ উৎসুক হইয়াছে তাহা কি বা কি কি তাহা জানা প্রয়োজন। বিনেবাজী বলেন যে, আজ তিনটি গুণের প্রয়োজন হইয়াছে—(১) নির্ভয়তা, (২) সমতা ও (৩) সমাজনিষ্ঠা। সমতার বিষয় আমরা এখানে আলোচনা করিব। একযুগে ভাল

উদ্দেশ্য লইয়া শ্রেণী সৃষ্টি করা হইয়াছিল। বিনোবাজী এ সম্পর্কে বলেন—"এরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, প্রত্যেকে যেন নিজ-নিজ যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। সেইযুগে মানুষের যোগ্যতা দেখা হইত। সেইযুগের লোকে মনে করিতেন যে, যাহার বুদ্ধি কম তাহার লেখাপড়ার আবশ্যকতা কি? তাহাকে শ্রমের কাজে লাগাইলে ভাল কাজ হইবে। যদি তাহাকে বুদ্ধির কাজে লাগানো হয় তবে তাহার দ্বারা বুদ্ধির কাজও হইবে না, পরিশ্রমের কাজও হইবে না।" এজন্য শ্রেণী বা বর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কাহারও উপর রাজ্যভার ও দেশরক্ষার ভার দেওয়া হইল। কাহারও উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারার্পণ করা হইল। আর কাহারও উপর দৈহিক শ্রমের কাজ করিবার ভার দেওয়া হইল। অন্যান্য বর্ণের সেবা করার কাজ অন্য এক শ্রেণীর উপর অর্পিত হইল। এখন আমাদের মনে হইতে পারে যে, শ্রেণী সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল ছিল না। ইহা ঠিক নহে। কোন খারাপ উদ্দেশ্য লইয়া শ্রেণী বা বর্ণের সৃষ্টি করা হয় নাই। বিনোবাজী বলেন—"পরে অসমতা বৃদ্ধি পাইল এবং লোকেরা মনে করিল যে, প্রত্যেকেরই যোগ্যতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যে যুগে বিজ্ঞান ছিল না, সেইযুগে শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের বিকাশ হইতে লাগিল তখন হইতে মনে হইতে লাগিল যে, বিজ্ঞানের সহায়তায় সকল মানুষের সমান বিকাশ হইতে পারে। অতএব শ্রেণীর আর কোন প্রয়োজন নাই।" সমাজের অন্যান্য অসমতামূলক বা সমতার পরিপন্থী যেসব ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল বা যাহা সৃষ্টি করা হইয়াছিল তৎসম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ আজ বিজ্ঞানের যুগে ঐসব অসম-ব্যবস্থা রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। এজন্য আজ সমাজে সমতার তীব্র বুভুক্ষা জাগিয়াছে। সমতা বিরোধী কোন কথা সমাজের ভাল লাগে না। আজ সমাজে সমতা আনিবার যে-কোনও আন্দোলন জনগণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়া থাকে। কারণ আজ তাহা যুগের প্রয়োজন।

আজ সমতার যুগ আসিয়াছে। এজন্য সমাজে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যে প্রেম, শ্রদ্ধা বা ভক্তি বিদ্যমান ছিল তাহার ভূমিকায়ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিতে বাধ্য। পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন হয়,

পারস্পরিক প্রেম, ভক্তি বা শ্রদ্ধার প্রকারও তেমনি হইবে। পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হইতেছে। এজন্য প্রেম, শ্রদ্ধা বা ভক্তির প্রকারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিতেছে। সমতার যুগে ভক্তির প্রকার হইতেছে—'সখ্য-ভক্তি'। শাস্ত্র বলে যে, প্রেমভাব বা ভক্তিভাব পাঁচ প্রকার। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। শান্তভাব হইতেছে ঋষিদের ভাব। 'স্বানন্দভাবে পরিতুষ্ট'। 'আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ'। মায়ের সন্তানের প্রতি যেভাব তাহা হইতেছে বাৎসল্যভাব। যেমন ননীগোপালের প্রতি যশোদার ভাব। মধুর ভাব হইতেছে শ্রীমতীর ভাব, গোপিনীর ভাব। দাস্য-ভাব হইতেছে স্বামীর প্রতি সেবকের ভাব। রামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের ভাব হইতেছে দাস্যভাব। আর সখ্যভাব হইতেছে বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, সখার প্রতি সখার ভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের যে ভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রেমের ভাব তাহা হইতেছে সখ্য-ভক্তি। যেব্যক্তি অন্যকে যেমন দেখে বা ভাবে সেইব্যক্তির ভাবও তেমন হয়। যে যেমন দেখে তাহার ভাবও তেমনি। আবার যাহার যেমন ভাব সে-ও তেমনি। 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ"। যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেইপ্রকার হয়। আজ সমতার যুগ। ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন—"অর্জুন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সখ্য-ভক্তির ভূমিকা ছিল। একে অন্যের সমান এইভাব লইয়া উভয়ে কাজ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন। অর্জুনের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শক্তি পরিমিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি অসীম ছিল। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সখ্যতা ছিল, উভয়ের মধ্যে সমতার সম্পর্ক ছিল। ভগবানের প্রতি অর্জুনের মনে আদর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু উহার মূল ছিল সমতার। উহার পূর্বে এক যুগ ছিল, যাহা দাস্যভক্তির যুগ। ঐযুগে প্রভু-সেবকের ভাব ছিল। প্রভু এবং সেবকের পরস্পরের মধ্যে প্রেম ছিল। কিন্তু প্রভু সেবকের পালনপোষণ করিতেন এবং সেবক প্রভুকে ভক্তি করিতেন। উহা হনুমানের যুগে ছিল। হনুমান রামকে যে-ভক্তি করিতেন তাহা ছিল দাস্য-ভক্তি। আজ পৃথিবীতে সখ্যভক্তির ক্ষুধা খুব বেশী। ইহার অর্থ এই নহে যে, যিনি পূজ্য-পুরুষ তাঁহার প্রতি ভক্তি থাকিবে না। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে-সঙ্গে এখন সমতার সম্বন্ধ থাকিবে। যখন যুদ্ধ আসিল তখন অর্জুন

শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আমাকে সাহায্য করিবেন কি? আপনি আমার সারথি হউন এবং আমার অশ্বগুলির দেখাশুনা করুন।' এইরূপে অর্জুন তাঁহার পরম পূজ্য ব্যক্তিকে অশ্বসেবার কাজ দিয়াছিলেন। মিত্রতার সম্বন্ধ ছিল বলিয়া এরূপ করিয়াছিলেন।

"হনুমানের আমলে সমাজের গঠন এরূপ ছিল যে, শক্তিশালীব্যক্তি প্রভু হইতেন এবং সেবাপরায়ণ ব্যক্তি দাস হইতেন। প্রভু এবং দাসের মধ্যে প্রেম ও আদর থাকিত, কোনরূপ বিবাদ থাকিত না। কিন্তু সেইযুগে উন্নতির সীমা নির্দিষ্ট ছিল।

"রামচন্দ্র রাজারাম ছিলেন কিন্তু কৃষ্ণ রাজাকৃষ্ণ ছিলেন না। তিনি গোপালকৃষ্ণ ছিলেন, বন্ধুই ছিলেন। বর্তমান যুগে পরস্পরের মধ্যে যতই প্রেম থাকুক না কেন প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক উপযোগী বলিয়া মনে করা হয় না। মধ্যে এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন প্রভু অত্যাচারী হইয়াছিল এবং সেবকের মনে প্রভুর প্রতি কোন শ্রদ্ধার ভাব ছিল না। আজ প্রভু-সেবকের সম্বন্ধ ভাল হইতে পারে, কিন্তু আজ যুগের দাবী হইতেছে সখ্য-ভক্তি। প্রভু-সেবকের সম্বন্ধ এইযুগে পর্যাপ্ত নহে।

"এই জন্য আমরা যখন দান চাহি তখন ইহা বলি না যে, 'আপনি শ্রেষ্ঠ, আপনি প্রভু, আপনি মালিক, আমাদিগকে দান দিন। আমরা আপনার সেবা করিব। আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।' আমরা তো ইহা বলি যে, সকলে ভাই-ভাই। আমি সম-অংশীদার। আমাকে আমার অংশ দিন। দানের অর্থ সম-বিভাজন, সমান বন্টন। ইহা শঙ্করাচার্যের অর্থ। এইজন্য যখন কেহ আমাকে একশত একরের মধ্য হইতে দুই একর দান দেন তখন আমি তাহা গ্রহণ করি না। যদি আমি দাসের মনোভাব লইয়া চাহিতাম, তবে দুই একরও গ্রহণ করিতাম এবং তাঁহাকে প্রণাম করিতাম, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতাম, তাঁহার উপকার মানিতাম। কিন্তু আজ আমরা সখার সম্বন্ধের ভিত্তিতে চাহিতেছি। আজকার সমাজ-গঠন সখ্যভাবকে মানিয়া লইবে। আজ গুরু-শিষ্য একে অন্যের মিত্র হইবে। একের অন্যের প্রতি প্রেম থাকিবে। গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন এবং শিষ্যও গুরুকে শিক্ষা দিবেন। যাহার কাছে যাহা আছে তাহা অন্যকে দিবেন। উভয়ে উভয়ের উপকার

স্বীকার করিবেন। গুরু ও শিষ্য, মালিক ও শ্রমিক এবং প্রভু ও সেবকের মধ্যে এরূপ সমতার সম্পর্কই থাকিবে।

"এক সময় ছিল যখন পত্নী পতিকে পতিদেব বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজেকে দাসী ভাবিতেন। সেসময় খারাপ ছিল না। কিন্তু আজ আমরা একপদ অগ্রসর হইয়াছি। বর্তমান যুগের পত্নী পতিব্রতা হইবেন এবং পতি পত্নীব্রত হইবেন। একে অন্যকে দেবতা মনে করিবেন। যাঁহার যোগ্যতা বেশী তিনি আদরণীয় হইবেন। যদি পতির যোগ্যতা বেশী হয় তবে পত্নী তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের সম্পর্ক হইবে সমানতার সম্পর্ক। ইহাকেই আমি সখ্য-ভক্তির যুগ বলিতেছি।"

বর্তমান যুগের এই পরিবর্তনের লক্ষণ আরও দুই-একটি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে। পূর্বে বাঙ্গালী-পরিবারে ভ্রাতৃবধূকে কন্যাস্থানীয়া মনে করা হইত এবং ভ্রাতৃবধূ স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃসম জ্ঞান করিতেন, আর সেইমত পরস্পর পরস্পরকে সম্বোধন করিতেন। আজ-কাল আধুনিক রুচিসম্পন্ন বাঙ্গালী পরিবারে ভ্রাতৃবধূ স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদরকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদরও ভ্রাতৃবধূকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা বা ভক্তির অভাব হয় নাই, তবে আজ তাহা সখ্য-ভক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। আধুনিক রুচিসম্পন্ন গুজরাটী পরিবারে পুত্র বিশেষত বালক-বালিকা পিতাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। যথা—পিতার নাম 'মনুভাই'। পুত্র পিতাকে সম্বোধন করে 'মনুভাই'। এখানে পিতা-পুত্রের মধ্যে প্রেমভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। যুগের পরিবর্তনে উহার প্রকার ভেদ হইয়াছে মাত্র।

বিনোবাজী আরও বলেন—"যুগের দাবী অনুসারে আমাদিগকে সমাজ গঠন করিতে হইবে। আজ তো ইহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক যে, পুরাতন যুগের যেমূল্য ছিল তাহা ঠিক তেমনিভাবে আজ টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। তুলসী-রামায়ণের সময়ে যাহার যেমূল্য ছিল, আজকার যুগে তাহার সেই মূল্য আর থাকিবে না। সেইযুগে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু বর্তমান যুগের রামায়ণে কেবল ব্রাহ্মণই যে শ্রেষ্ঠ—ইহা মানা হইবে না। যিনি ভাল

হইবেন তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবেন (কিন্তু সমতার সম্বন্ধ থাকিবে)।

"বর্তমান যুগে কারখানার মালিক এবং শ্রমিক থাকিবেন। একজনের বুদ্ধি অধিক অন্যের শারীরিক শক্তি অধিক। শ্রমিক মালিককে ইহা বলিবেন না—'আপনি মালিক এবং আমি আপনার চাকর'। এই সম্পর্ক আর চলিবে না। এখন তো উভয়েই অংশীদার হইবেন। বুদ্ধির জন্য মালিকের যে-পারিশ্রমিক মিলিবে, শারীরিক পরিশ্রমের জন্য শ্রমিকেরও সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক মিলিবে। পারিশ্রমিক সমান হইবে, কিন্তু যাহার যোগ্যতা বেশী তিনি আদরণীয় হইবেন। একে অন্যের মিত্র হইবেন, সাথী হইবেন।

"বর্তমান যুগে ভাই-ভাই-এর, গুরু-শিষ্যের, পতি-পত্নীর সম্বন্ধ নূতন ঢঙে গঠিত হইবে। উহাতে এক নূতন রুচি আসিবে। পুরাতন যুগেও পারস্পরিক সম্পর্কে স্বাদ ছিল। কিন্তু এখন উহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। পতি মহারাজ বিগড়াইয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করা হইয়াছে এবং পত্নী সাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার আদর নাই। যেখানে সম্বন্ধই খারাপ হইয়াছে, সেখানে নূতন যুগের দাবী সম্মুখে আসিয়াছে।

"আজ যদি স্বয়ং রামচন্দ্রও পৃথিবীতে আসিয়া রাজারাম হইতে চাহেন তবে আমরা তাহা স্বীকার করিব না। মহাত্মা গান্ধীও যদি আসেন আমরা তাঁহাকে রাজা গান্ধী করিব না। তিনি মহাত্মা গান্ধী হইয়া থাকিবেন। পুরাকালে ভাল রাজা ছিলেন, কিন্তু উহা অপেক্ষা অনেক বেশী খারাপ রাজাও ছিলেন। পূর্বে প্রজার উন্নতি সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ সময় আগাইয়া গিয়াছে। যেব্যক্তি সময়ের পরিবর্তন অনুসারে চলিতে শিখে না, সেব্যক্তি হারও খায়, মারও খায়। প্রবাহের মধ্যে পড়িয়া যদি মানুষ সাঁতারও না দেয় তথাপি প্রবাহ তাহাকে আগে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি সে প্রবাহের বিপরীত দিকে যাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহার কিছু ব্যায়াম হইবে সত্য, কিন্তু সে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

"মানুষ যতই বড় হউক না কেন, তাহার পুরাতন প্রতিষ্ঠা ও আড়ম্বর আজ আর চলিবে না। আমাদের কাছে ইহার এক উদাহরণ আছে। পরশুরাম কত বড় মহান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিরাট খ্যাতিও ছিল। তিনি

একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তিনি অবতার ছিলেন। কিন্তু যখন রামচন্দ্র আসিলেন তখন তাঁহার চিনিয়া লওয়া আবশ্যক ছিল যে নূতন অবতার আসিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহা চিনিলেন না এবং রামচন্দ্রের সহিত লড়াই করিতে অগ্রসর হইলেন। উহাতে তিনি পরাজিত হইলেন। পরশুরামের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ যুগের বিরুদ্ধে যাইয়া যখন টিকিতে পারিলেন না তখন অন্য কেহ টিকিবে কিরূপে? পুরাতন রীতি যতই ভাল হউক না কেন তাহা নূতন যুগে ভাল প্রতিপন্ন হইবে না।

"আজ যখন কর্মীদের সহিত আমার কথা হইয়াছিল তখন আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি —আমি যে এক-ষষ্ঠাংশ চাহি তাহা যেন ট্যাক্স আদায় করা হইতেছে বলিয়া মনে করা না হয়। আমি তো বিচার বুঝাইতেছি যে, জমি সম্পত্তি ও উৎপাদনের সাধনের উপর এখন সকলের সমান অধিকার। যুগের দাবীর কথা যেব্যক্তি বলিয়া থাকে তাহাকে লোকে উদ্ধত বলে। যদি উহাকে উদ্ধত বলিয়া মনে করা হয়, তবে সে উদ্ধত হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি যুগের ক্ষুধাকে চিনিয়া লওয়া হয়, তবে যাঁহাদের কাছে চাহিতে আসিবে তাঁহারা নম্র হইয়া থাকিবেন এবং তাহা হইলে ছোট বড়কে শ্রদ্ধা করিবে।"

পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিনোবাজী বলেন—"লোকে বলে যে, আজকাল সন্তানেরা মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করে না। সন্তান তো বাল্যাবস্থা হইতেই মায়ের উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়া চলিয়া থাকে। মা যদি বলেন যে, উহা চাঁদ তবে ছেলে তাহা মানিয়া লয়। ছেলে তখন ইহা বলে না—থাম, আমি অনুসন্ধান করিয়া দেখি সত্যসত্যই উহা চাঁদ কি না। এত শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও লোকে বলে যে, সন্তানেরা মা-বাপকে মানে না। আমি তো ইহা বলিব যে, মাতাপিতা যুগের প্রকৃতি বুঝেন না। মাতাপিতা সন্তানের সহিত সমানতার সম্বন্ধ রাখিয়া চলুন এবং সমতার ভিত্তিতে তাহাদিগকে স্নেহ করুন। তাহাদিগকে যেন মাতাপিতা হুকুম না দেন, পরামর্শ দেন। আজ্ঞা না দেন; প্রহারও না করেন। পূর্বেও মাতাপিতা প্রহার করিতেন এবং ভালবাসার ভাব লইয়াই প্রহার করিতেন। এ যুগে উহা আর চলিবে না। এইযুগে মাতা বলিবেন—আমি তোমাকে শাস্তি দিব না, আমি নিজেকে দণ্ড দিব, আমি উপবাসী থাকিব।

"সকলেরই আপন আপন বিশেষত্ব আছে। শ্রমিকের বুদ্ধি কম হইলেও তাহার হৃদয়বত্তা অধিক হইতে পারে। কাহারও জন্য সে মরণকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের বুদ্ধি অধিক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দৈহিক দুর্বলতা আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু-না-কিছু দুর্বলতা আছে আবার কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। এইজন্য সমতার সম্বন্ধের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে প্রেম থাকা চাই।"

এই দৃষ্টিতে যদি ভূদানযজ্ঞকে দেখা যায়, তবে ইহা যে এইযুগের দাবী তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। যদি ইহা যুগের দাবী না হইত, তবে গরীবেরাও দান দিতেন না এবং ধনী লোকেরাও বিনোবাজীকে বাধা দিতেন। এজন্য বিনোবাজী এ সম্পর্কে বলেন—"এই নব বিচার আমি আমার থলীর মধ্য হইতে বাহির করি নাই। যুগ-প্রবাহ হইতে আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছি। এই বিচারধারাকে প্রসার করিবার দৃষ্টি লইয়া কাজ করুন—কেবলমাত্র কোটা পূর্ণ করিবার দৃষ্টিতে নহে। কেবলমাত্র কোটা পূর্ণ করিলে কাজ চলিবে না। যখন আপনারা জনগণকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন যে, সখ্য-ভক্তির যুগ আসিয়া গিয়াছে, তখনই আপনাদের কার্যে সফলতা লাভ হইল বলিয়া মনে করিবেন।"

॥ ৫৫ ॥ সাম্যের স্বরূপ

বর্তমানের সমাজ-সংগঠন নিতান্ত বিকারগ্রস্ত। বিনোবাজী বলেন, উহা সংগঠন নহে, উহা বিধ্বংস। উহার সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি—বিরাট বৈষম্য। এই বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সাম্য কিরূপ হইবে? বিনোবাজী বলেন—"আমাদিগকে নূতন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য হাতের পাঁচ অঙ্গুলীর নিকট হইতে আমাদিগকে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। এই অঙ্গুলীগুলি পুরাপুরি সমান নহে, আবার একেবারে অসমানও নহে। প্রত্যেক অঙ্গুলীর নিজের স্বাধীনতা আছে। উপরন্তু অন্য অঙ্গুলীর সহযোগিতা লইয়া উহারা প্রত্যেক কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ঐ ভিত্তিতে আমাদিগকেও সমাজ রচনা করিতে হইবে—যাহাতে সেই নূতন সমাজে অত্যন্ত অসাম্য না থাকে অথচ অত্যন্ত

সমানতাও না হয়। সেই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক-পৃথক ব্যক্তিত্ব থাকিবে, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে এবং প্রত্যেকেই অন্যের সহযোগিতায় কাজ করিবে। ইহা বুঝাইবার জন্যই আমি দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" সমাজে সাম্য-প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া আমাদিগকে পার্থক্য বুঝিবার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা হাতের পঞ্চ-অংগুলীর শিক্ষা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব। বিনোবাজী এক উদাহরণ দিয়া উহা বুঝাইয়াছেন। মাতা তাঁহার সন্তানদিগকে গণিতের হিসাবে সমান খাদ্য খাইতে দেন না। সর্বাপেক্ষা ছোটকে শুধু দুধ খাইতে দেন। তাহার বড়কে কিছু দুধ ও কিছু রুটি দেন এবং সর্ব জ্যেষ্ঠকে শুধু রুটি দেন। ইহাই বিবেকযুক্ত সমতা। অহিংসার পথে সমতা আসিলে এই প্রকার সমতা আসিবে। কিন্তু অন্য দেশে হিংসার পথে যে-সমতা আনয়নের চেষ্টা হইয়াছে সে-সমতা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিনোবাজী বলেন—"ঐ প্রকার সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষুধা ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তি দেখিয়া উহার খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে হিংসার দ্বারা সমতা স্থাপন করা হইয়াছে সেখানে সকলকেই এক ছাঁচে ঢালা হইয়া থাকে। আমরা এই রকম সকলকে এক ছাঁচে ঢালা কখনও পছন্দ করিব না। আমরা বিবেকের দ্বারা সমতা আনিতে চাহিতেছি। আধ্যাত্মিক সমতা প্রতিষ্ঠা করা আমাদের লক্ষ্য।" আধ্যাত্মিক সমতার ভিত্তি হইতেছে মালিকানার মোহ ত্যাগ। এ জমি আমার, এ গৃহ আমার, এ কৃষিক্ষেত্র আমার—এরূপ মোহ বিসর্জন দিতে হইবে। আমার এইসব যাহা রহিয়াছে তাহা সবই সকলের সেবার জন্য, আমি উহার রক্ষক মাত্র। আমি ট্রাস্ট্রী মাত্র। এরূপ বিচারবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তবেই সাম্যের আদর্শ সার্থক হইতে পারিবে। সম্পদ যাহা আছে তাহাতে যদি সকলের সংকুলান না হয়, তবে সকলেই কিছু-কিছু কম করিয়া ভোগ করিবে। একখানা রুটি হইলে তবে পেট ভরে। আট জন লোক, কিন্তু আছে মোট ছয়খানা রুটি। একজনের তিনখানা, অন্য একজনের দুইখানা এবং বাকী ছয়জনের কাছে মাত্র একখানা রুটি আছে। এই অবস্থার পরিবর্তন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে সকলেই কিছু কম করিয়া খাইতে স্বীকৃত হয় এবং কেহ পৌনে একখানার বেশী না খায়। এরূপ সমতাত্মক

মনোবৃত্তির একটি দৃষ্টান্ত বিনোবাজী দিয়াছেন—"এক তামিল সাধু ছোট কুঁড়ে ঘরের বাহিরে শুইয়া রাত্রি যাপন করিতেন। এক রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় তিনি উঠিয়া ভিতরে গিয়া শুইলেন। তখন বাহির হইতে একজন দরজায় ধাক্কা দিল। সাধু বলিলেন—'ভাই এসো, ঘরে একজন শুইতে পারে কিন্তু দুইজন বসিয়া থাকিতে পারে।' তিনি তাঁহাকে ভিতরে লইলেন এবং উভয়ে বসিয়া রহিলেন। ইহার পর এক তৃতীয় ব্যক্তি বাহির হইতে দরজায় ধাক্কা দিল। সাধু বলিলেন—'একজন শুইতে পারে, দুইজন বসিতে পারে, কিন্তু তিনজন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। অতএব এসো, আমরা তিনজনই দাঁড়াইয়া থাকিব।' তাঁহাকেও তিনি ভিতরে আসিতে দিলেন এবং তিনজনেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।" ভারতে সাম্যের এইরূপ আদর্শ গড়িয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গে রুমীর মসনবীর সুন্দর একটি গল্পের কথা মনে পড়ে।* এক ছিল সুফী। সে তার বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া দরজায় আঘাত করিল। বন্ধু বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—'হু ইজ্ দেয়ার' (কে)? উত্তরে সুফী বন্ধু বলিল, 'আই অ্যাম' (আমি তোমার বন্ধু)। বন্ধুটি তখন তার উত্তরে বলিল, 'বিগন্ অ্যাট মাই টেব্ল্ দেয়ার্ ইজ্ নো প্লেস ফর দি টু' (ফিরিয়া যাও বন্ধু, আমার টেবিলে দুইজনের স্থান হইবে না)। সুফী বন্ধু তখন মনে দুঃখ লইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু বিরহের আগুনে তাহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল। এজন্য সে ভয় ও শ্রদ্ধা লইয়া আবার আসিল এবং আবার তাহার বন্ধুর দরজায় আঘাত করিল। ভিতর হইতে পূর্বের মতই শব্দ আসিল, 'হু ইজ্ দেয়ার' (কে)? সুফী উত্তর দিল, 'দাউ বিলাভেড্ দাউ' (হে প্রিয়তম, তুমি)। তখন দরজা খুলিয়া গেল এবং বন্ধু বলিল—'সিন্স দাউ আর্ট আই, কাম্ ইন্, দেয়ার ইজ্ নো রুম ফর টু আইজ ইন দিস রুম্' (তুমি যখন আমার সঙ্গে এক হইয়াছ, তোমার আমিত্ব যখন ঘুচিয়া গিয়াছে তখন ভিতরে আইস। কেননা আমার ঘরে দুইজন 'আমি'র স্থান নাই)।

* 'বিশ্ববাণী'—কার্তিক, ১৩৫৯। পৃঃ ৩৯৫—'মন ও মানুষ' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

॥ ৫৬ ॥ ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ

অবস্থার প্রকার ভেদে সত্যাগ্রহ প্রক্রিয়ার পার্থক্য

কেহ কেহ এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে ভূমিসমস্যা সমাধানের জন্য যদি কোন বলপ্রয়োগ না করিয়া অথবা আইন প্রণয়নের অপেক্ষায় না থাকিয়া কেবল অহিংস উপায়ের আশ্রয় লইতে হয়, তবে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা হইবে না কেন। তাহার উত্তরে বলা হয় যে ভূদানযজ্ঞে যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা সত্যাগ্রহের পর্যায়ভুক্ত। অশেষ ক্লেশ বরণ করিয়া বৎসরের পর বৎসর নিরন্তর পদযাত্রা করিয়া নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত নব বিচারধারা বুঝাইয়া জনমানসে বিচারক্রান্তি সৃষ্টি করিবার প্রযত্ন করা, সংশ্লিষ্ট সকলের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা করিতে থাকা এবং অধ্যবসায়ের সহিত প্রেমপূর্বক জমিদান চাহিয়া যাওয়া প্রভৃতি এসবই সত্যাগ্রহ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাহা মানিয়া লইয়াও কেহ কেহ বলেন যে ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনে আর বেশী কিছু হইবার আশা নাই, উহাতে যাহা হইবার ছিল তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতএব স্বাধীনতা আন্দোলনে যে প্রকারের সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা হইয়াছিল ভূমির মালিকদের বিরুদ্ধে এখন সেইরূপ সত্যাগ্রহ অবলম্বিত হইতেছে না কেন? আবার কেহ কেহ মনে করেন যে ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয় আন্দোলনে সুফল হইতেছে সত্য, কিন্তু উহার পরিপূরকরূপে স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহ চালানো উচিত। তাহা হইলে খুব তাড়াতাড়ি অধিকতর সুফল পাওয়া যাইবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যে প্রকারের সত্যাগ্রহ হইয়াছিল, ভূমিসমস্যার সমাধানের জন্য সেই প্রকার সত্যাগ্রহের কথা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। ইহা অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। এ সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। নচেৎ অনেকের মনে একটা সংশয়ের ভাব থাকিয়া যাইবে। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা হইতেছে আক্রমণাত্মক (এগ্রেসিভ), নিষেধাত্মক ও উগ্র সত্যাগ্রহ।

প্রথমত বুঝা উচিত যে, যে অবস্থায় স্বাধীনতা লাভের জন্য সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল এবং যে অবস্থায় ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন করা হইতেছে—এই

দুই অবস্থার মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য রহিয়াছে। ইংরেজের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র স্বাধীনতা লাভ করা প্রয়োজন—এই বিচারবোধ দেশের লোকের মনে পূর্ব হইতে জাগ্রত ছিল। ভারতের বুক হইতে ইংরেজের অবিলম্বে সরিয়া যাওয়া উচিত একথা যে ইংরেজ বুঝিতেন না তাহাও নহে। সুতরাং সেক্ষেত্রে কোন বিচার-বিপ্লবের প্রশ্ন ছিল না। সেখানে কেবলমাত্র এই প্রশ্ন ছিল যে কোন কার্যপন্থা অবলম্বন করিলে যথাসম্ভব শীঘ্র পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। এই অবস্থায় সত্যাগ্রহের ঐ উগ্র ও নিষেধাত্মক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিচার-ক্রান্তি অর্থাৎ প্রচলিত বিচারধারার আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে সেখানে উগ্র সত্যাগ্রহ চলিতে পারে না। ভূমি হউক বা অন্য সম্পত্তি হউক ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তির উপর উহা বর্তমান সমাজে অধিষ্ঠিত। ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয় আন্দোলনের দ্বারা উহার বিপরীত বিচারধারা সমাজমানসে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রযত্ন করা হইতেছে। এরূপ ক্রান্তিকারক বিচারবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য কোনরূপ উগ্র ও নিষেধাত্মক সত্যাগ্রহ যে নিষ্ফল তাহা বুঝা কষ্টসাধ্য নহে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় জমির মালিক বা ধনের মালিকদের বিরুদ্ধে উগ্র সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা হইলে তাহা জবরদস্তি হইবে ও তাহার দ্বারা বিচারবোধ জাগ্রত বা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে না। ইহার অর্থ এই যে 'এস্টাব্লিশ্‌ড্‌ ভ্যালুজ্‌'-এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে কোন মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে সেখানে উগ্র সত্যাগ্রহ হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু যেখানে নূতন মূল্যবোধ জাগ্রত করিবার প্রশ্ন, সেখানে উগ্র সত্যাগ্রহ করিলে বিপর্যয় সৃষ্টি করা হইবে মাত্র। মাদকতা ভারতের নৈতিক পরম্পরায় নিষিদ্ধ বস্তু, ইহা ভারতের মানুষকে বুঝাইতে হয় না। মাদকতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে ভারতে মদ্যাদির দোকানে পিকেটিং-এর ন্যায় উগ্র সত্যাগ্রহ চলিয়াছে। কিন্তু যদি হঠাৎ পাশ্চাত্য দেশে মদের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করা হয় তবে তাহা সত্যাগ্রহ হইবে না—জবরদস্তি হইবে। কারণ মদ্যপানে যে কোন দোষ থাকিতে পারে এ ধারনা পাশ্চাত্যে নাই। সেখানে মাদকতা দূরীকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইলে কোনরূপ উগ্র প্রক্রিয়া চলিবে না। সেখানে ভূদানযজ্ঞের ন্যায় সৌম্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া মদ্যপানের বিরুদ্ধে

বিচারবোধ জাগ্রত করিবার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং যেখানে নব মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন সেখানে যে সত্যাগ্রহ উপযোগী তাহা সাধারণত স্থূল অর্থে যাহাকে সত্যাগ্রহ বলা হয় তাহার ক্ষেত্রের বহির্ভূত। সেখানে ব্যাপক ও সূক্ষ্ম অর্থে যে সত্যাগ্রহ তাহাই চলিতে পারে। ভূদানযজ্ঞের প্রক্রিয়া সেই ব্যাপক ও সূক্ষ্মতর অর্থে সত্যাগ্রহ।

সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ

দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের (এস্টাব্লিশ্‌ড্ ভ্যালুজ) ক্ষেত্রে বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় (অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পর যেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) স্বাধীনতা সংগ্রামকালের মত উগ্র সত্যাগ্রহ চলিতে পারে কি? ধরুন, মাদকতা দূরীকরণ সম্পর্কে সরকারের যে কর্তব্য ছিল সরকার তাহা করেন নাই ও করিতেছেন না। ইহার জন্য বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে যেরূপ সত্যাগ্রহ চলিয়াছিল, সেইরূপ সত্যাগ্রহ চলিতে পারে কি? অন্য একটি দৃষ্টান্ত। অনেকে মনে করেন যে দুই-দুইটি জাতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ অতীত হইয়া গেল। দেশের দরিদ্র লোকদের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মোচনের জন্য সরকারের যাহা করা একান্ত কর্তব্য ছিল সরকার তাহা করেন নাই। এই কারণে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে ইংরেজ আমলে যেরূপ সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল, সেই প্রকারের উগ্র সত্যাগ্রহ করা যাইতে পারে কি? এই বিষয় গভীরভাবে বিচার করা উচিত। বিনোবাজী বলেন—"স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা ছিল চাপ প্রয়োগ করিয়া ইংরেজের রাজশক্তি ধ্বংস করিবার নেগেটিভ (নিষেধাত্মক) কাজ। ভারতবর্ষ নিরস্ত্র হইয়া থাকিতে থাকিতে সেই সময় ও সেই অবস্থায় নিরাশায় ডুবিয়া গিয়াছিল। কিছু লোক ভ্রান্ত হইয়া এদিক-সেদিক কিছু ছোট-বড় হত্যাকাণ্ড চালাইতেছিল। তখন হয় হিংসার পথ গ্রহণ করা, না হয় নিরাশ হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া লোকে অন্য কথা ভাবিতে পারিতেছিলেন না। সেই অবস্থায় অহিংসার বিচার আসিল ও লোকে যতটা মাত্রায় পারিল ততটা অহিংসা গ্রহণ করিল। সুতরাং সেই অবস্থায় সত্যাগ্রহের যে প্রক্রিয়ার প্রয়োগ

করা হইয়াছিল তাহাই যে সত্যাগ্রহের পরিপূর্ণরূপ একথা মনে করা ঠিক হইবে না।”

তিনি আরও বলিয়াছেন, “সত্যাগ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। গান্ধীজী ইংরেজদিগকে বলিলেন—‘ভারত ছাড়’, আর তাঁহাদিগকে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু আমরা নিজেদের দেশের পুঁজিপতি বা জমির মালিকদের ঐভাবে ‘ভারত ছাড়’ বলিতে পারি না। সুতরাং এখন যে সত্যাগ্রহ করিতে হইবে তাহা গান্ধীজীর সময়ের মত নিষেধাত্মক (নেগেটিভ্) হইতে পারে না। এখন তো সত্যাগ্রহ বিধায়ক হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ উহা সৌম্য হইতে সৌম্যতর হওয়া আবশ্যক।” এ সম্পর্কে তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—“আমি একথাও বলিতে চাই যে গান্ধীজীর সময়ে যে সত্যাগ্রহ হইয়াছিল যদি তাহাকে আদর্শ বলিয়া মানিয়া লই তবে আমরা ভুল করিব। কারণ স্বাধীনতা লাভের পর যেখানে গণতন্ত্র চলিতেছে সেখানে যে সত্যাগ্রহ করিতে হইবে তাহা অধিক স্পষ্ট, শক্তিশালী ও অধিক বিধায়ক হওয়া চাই।” নেগেটিভ্ (নিষেধাত্মক) প্রক্রিয়ায় ইংরেজকে বলা যাইত—‘চলিয়া যাও’। জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সরকারকে আমরা সেরূপ নিষেধাত্মক প্রক্রিয়ায় বলিতে পারি না—‘গদী ছাড়’। ছাড়িবার বা ছাড়াইবার এক বিশিষ্ট প্রক্রিয়া (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিধান) দেশ মানিয়া লইয়াছে ও দেশ তদনুসারে চলিতেছে। এখন সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে ঠিক তদ্রূপ কথা বলা চলে না। নেগেটিভ্ (নিষেধাত্মক) প্রক্রিয়া হইতেছে ‘মেন্ড অর এন্ড’ (হয় তুমি নিজেকে সংশোধন কর, নচেৎ শেষ হও, চলিয়া যাও)। সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়া এখন বিধায়ক (পজিটিভ্) হওয়া উচিত। বিধায়ক প্রক্রিয়ায় বলা হইবে—‘নিজেকে সংশোধন কর।’ উপরন্তু, নিষেধাত্মক প্রক্রিয়ায় সফলতা বা পূর্ণ সফলতা না হইলে উগ্রতর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা চলিত। যেমন লবণ সত্যাগ্রহে উগ্র হইতে উগ্রতর প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া ধর্ষনা লবণগোলা আক্রমণ করা হইয়াছিল। বিধায়ক প্রক্রিয়ায় তাহা হইতে পারে না। বিধায়ক সত্যাগ্রহ সৌম্য প্রক্রিয়ায় আরম্ভ করা হয়। আরও শক্তিশালী করিতে হইলে উহাকে সৌম্যতর করিতে হয়। সত্যাগ্রহের সৌম্য, সৌম্যতর ও সৌম্যতম প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

দেশের সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ

দেশের সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে কিরূপ সত্যাগ্রহ অবলম্বিত হইতে পারে তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"গান্ধীজী ইংরেজদিগকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ইংরেজ এদেশ হইতে চলিয়া যাইতে পারিয়াছেন। কারণ তাঁহারা বাহির হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এদেশের মুসলমান, ব্রাহ্মণ, কারখানার মালিক, জমির মালিক প্রভৃতি কাহারও এদেশ হইতে চলিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। যদি তাঁহারা অন্যায় করেন তবে তাহার অর্থ এই যে আমরাও অন্যায় করিতেছি এবং এজন্য সব দিক হইতে রাষ্ট্রের শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন আছে। এজন্য এখন যে সত্যাগ্রহ হইবে তাহা খুব কোমল হইবে এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে তাহা করিতে হইবে। কারণ আমাদের সকলেরই এখানে মিলিয়া-মিশিয়া একসঙ্গে থাকিতে হইবে। এজন্য 'মেন্ড্ অর এন্ড্', হয় তুমি নিজেকে সংশোধন কর না হয় তুমি ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাও বা নিপাত যাও—এরূপ আমরা বলিতে পারি না। আমরা একটি মাত্র কথা বলিতে পারি—'সংশোধন কর'। আমাদের সম্মুখে এখন এই একটিমাত্র পথ। সত্যাগ্রহের ইহা একদিক, যাহার সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন।" সুতরাং দেশের কোন শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধে নিষেধাত্মক বা উগ্র সত্যাগ্রহ করা চলে না। দেশের কেহ অন্যায় করিলে সেই অন্যায়ের জন্য দেশের সকলে অল্পাধিকভাবে দায়ী—এই ভাবনা সর্বোদয়ের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দৃষ্টির মূলে রহিয়াছে। এই ভাবনা থাকিলে সত্যাগ্রহ বিধায়ক ও কোমল না হইয়া পারে না।

সত্যাগ্রহ শাস্ত্রের সংশোধন

তবে কি বলিতে হইবে—সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রের সংশোধন হওয়া উচিত? বিনোবাজী সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রের সংশোধনের কথাই বলেন। তিনি বলেন—"যদি আমরা বুঝিতে পারি যে এখন নিষেধাত্মক সত্যাগ্রহ চলিবে না তবে আমরা সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রের সংশোধন করিব। নচেৎ ইহা বলিতে হইবে যে সত্যাগ্রহ-শাস্ত্র গান্ধীজীর যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে খতম হইয়া গিয়াছে এবং এখন উহার পূর্ণ

বিরতি হইয়াছে। গান্ধীজী নিজে স্বীকার করিতেন যে সত্যাগ্রহের জন্য তিনি যে সব প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকটি প্রয়োগ সফল হয় নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে তিনি রাজকোটের উপবাস করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। আহ্মেদাবাদে শ্রমিকগণের জন্য যে উপবাস করা হইয়াছিল তাহার দ্বারা কিছু চাপ দেওয়া হইয়াছিল। এজন্য ঐ উপবাস ত্রুটিপূর্ণ হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ পরিবর্তন করাইবার জন্য তিনি যাহা করিয়াছিলেন তাহার ফলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর অনুচিত চাপ পড়িয়াছিল। সত্যাগ্রহে কোনরূপ চাপ কাহারও উপর পড়া উচিত নহে।" সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রের সংশোধনের প্রশ্ন উঠায় এরূপ মনে হইতে পারে যে গান্ধীজী হয় তো সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রের সংশোধন চাহিতেন না। কিন্তু তাহা নহে। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"বাপু বহুবার বলিতেন, 'আমি সত্যাগ্রহের শাস্ত্র লিখিতে পারিব না। উহা ধীরে ধীরে বিকশিত হইতেছে।"

সৌম্য, সৌম্যতর ও সৌম্যতম সত্যাগ্রহ

এক্ষণে সৌমতর ও সৌম্যতম সত্যাগ্রহের বিষয় আলোচনা করা যাউক। বিহারের প্রথম পদযাত্রার সময় বিনোবাজী বলিয়াছিলেন যে তিনি বর্তমানে যাহা করিতেছেন তাহা হইতে আর এক পা-ও অগ্রসর হইবেন না এমন নহে। অর্থাৎ বিফলতায় তিনি এক বা একাধিক পা অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু সেই পরবর্তী পদক্ষেপ কি প্রকারের হইতে পারে তাহার আভাস তিনি তখন দেন নাই। ১৯৫৫ সালে পুরী সর্বোদয়-সম্মেলনে তিনি তাহা বলেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেন যে সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর সৌম্য করিতে হইবে। ইহা সৌম্য হইতে সৌম্যতর, সৌম্যতর হইতে সৌম্যতম— এইভাবে অগ্রসর হইবে। এরূপে তিনি সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রের উপর এক অভিনব আলোকসম্পাত করিয়াছেন। তাহাতে সত্যাগ্রহের গতি ও প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা খুবই পরিষ্কার হইয়াছে। হিংসার শক্তি নির্ভর করে উগ্রতার উপর। হিংসার প্রথম প্রয়োগ বিফল হইলে পরবর্তী প্রয়োগে উহার উগ্রতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়। তবেই উহা অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকরী হয়। অন্যদিকে অহিংসার শক্তি ও কার্যকরিতার উৎস হইতেছে

সৌম্যতা। সৌম্যতার উপরেই উহার শক্তি নির্ভর করে। এই জন্য অহিংসার প্রথম প্রয়োগ বিফল হইলে পরবর্তী প্রয়োগে উহা অধিকতর সৌম্য করা প্রয়োজন, উপরন্তু প্রয়োগে যদি কিছু উগ্রতা থাকিয়া যায় তবে পরবর্তী প্রয়োগে তাহা বরং নিষ্কাশিত করা প্রয়োজন। তাহা হইলে উহার শক্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে ঔষধের সূক্ষ্মতার উপর ঔষধের শক্তি নির্ভর করে। এজন্য প্রথম মাত্রা প্রয়োগ করিয়া যদি ভাল ফল না পাওয়া যায় তবে পরবর্তী মাত্রা প্রয়োগের সময় ঔষধ অধিকতর সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। তাহাতে ঔষধের শক্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অহিংসা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সেইরূপ করা প্রয়োজন। পুরী সম্মেলনে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"এখন সত্যাগ্রহশাস্ত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। যাঁহারা সত্যাগ্রহের কথা চিন্তা করেন, তাঁহারা মোটামুটি ইহা মনে করেন যে, মানবসমাজ ক্ষুদ্র হিংসা হইতে বৃহৎ হিংসা এবং বৃহৎ হিংসা হইতে অতিহিংসার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রথমে সৌম্য সত্যাগ্রহ করিতে হইবে। আমার এই পদযাত্রাকে আমি সত্যাগ্রহ বলিয়া মনে করি। লোকে বলে—হাঁ, ইহা সৌম্য সত্যাগ্রহ, কিন্তু ইহাতে ঠিকমত কাজ না হইলে তীব্র সত্যাগ্রহ করিতে হইবে। তাহাতে কাজ না হইলে তীব্রতর সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হইবে। এইভাবে তীব্রতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিন্তা ঠিক উহার বিপরীত হওয়া আবশ্যক। আমরা যে সৌম্য সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে কাজ না হইলে তাহা অপেক্ষা সৌম্যতর সত্যাগ্রহের অন্বেষণ করিতে হইবে যাহাতে তাহার শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাতেও কাজ না হইলে শক্তি আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য সৌমতম সত্যাগ্রহ করিতে হইবে। আপনারা জানেন, হোমিওপ্যাথি এই শিক্ষা দেয় যে ঔষধ কম মাত্রাতেই ব্যবহার করিতে হয়। বার-বার ডায়ালিউশান করিতে করিতে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়াই উহা অধিক ফলদায়ী হয়। হিংসার ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, সহজ অস্ত্রে কাজ না হইলে তীব্র অস্ত্র ব্যবহারে শক্তিবৃদ্ধি হইবে এবং তাহাতে কাজ হইবে। হিংসার এই প্রক্রিয়া হইতে আমাদের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের দৃঢ় ধারণা থাকা চাই যে, আমরা যাহা করিতেছি তাহাতে কাজ

না হইলে এবং তাহাতে সফলতা না পাইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের সৌম্যতাতেই ন্যূনতা রহিয়াছে। সুতরাং সৌম্যতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইহাই সত্যাগ্রহের স্বরূপ। স্বাধীনতা লাভের পূর্বের পরিস্থিতিতে সত্যাগ্রহের উগ্র প্রক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আজ যে অবস্থা দেখা যাইতেছে এবং সারা জগতে আজ যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে সূক্ষ্মভাবে তাহা নিরীক্ষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, সত্যাগ্রহের মাত্রা আমাদিগকে উত্তরোত্তর অধিকতর সৌম্য করিতে হইবে। সৌম্য হইতে সৌম্যতর ও সৌম্যতর হইতে সৌম্যতম এইভাবে যদি সত্যাগ্রহ অগ্রসর হয়, তবে তাহা অধিক কার্যকরী ও শক্তিশালী হইবে। তুলসীদাসকৃত রামায়ণে সুরসা রাক্ষসীর গল্প আছে।—'সুরসা নাম অহিনকী মাতা'। সুরসা হনুমানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক যোজন হাঁ করিল। তাহা দেখিয়া হনুমান দুই যোজন হইয়া গেল। তখন সুরসা দুই যোজন হাঁ করিল। তাহা দেখিয়া হনুমান চার যোজন হইল। তখন সুরসার মুখ আট যোজন হইল। তাহাতে হনুমান ষোল যোজন হইল। তখন সুরসা 'বত্তীশ ভয়উ'। হনুমান বুঝিতে পারিল যে ইহার কাছে এইভাবে গুনন ক্রিয়া করিতে থাকিলে কোন কাজ হইবে না। বত্রিশ হইলে চৌষট্টি হইবে আর চৌষট্টি হইলে তাহার দ্বিগুন একশত আঠাশ হইবে, এরূপে বাড়িতে বাড়িতে ইহার কোন অন্তই থাকিবে না। 'নিউ ক্লিয়ার ওয়েপন্' পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। ইহাতে কোন সার নাই। তখন 'অতি লঘুরূপ ধরউ হনুমান'। হনুমান তখন অতি লঘুরূপ ধারণ করিল এবং সুরসার মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহাতে ব্যাপার চুকিয়া গেল। আমাদের-বুঝিতে হইবে যে, যেখানে বিশাল সুরসা ভয়ংকর রূপ ধারণ করিয়া 'এটম-হাইড্রোজেন বোমা'-রূপে মুখব্যাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান, সেখানে আমা-দিগকে অতি সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং তাহার নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া আসিতে হইবে। আমি এই প্রেরণাই পাইতেছি।"

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে নিষেধাত্মক বা উগ্র সত্যা-গ্রহের অবকাশ এখন আর বিশেষ নাই। এখন সত্যাগ্রহ বিধায়ক হওয়া

উচিত। বিধায়ক হইতে হইলে উহাকে সৌম্য হইতে হইবে এবং উহার বিকাশের গতি সৌম্য হইতে সৌম্যতর ও সৌম্যতমের অভিমুখে হইবে। এই সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। অহিংসার দৃষ্টিতে দেখিলে নিষেধাত্মক ও বিধায়ক সত্যাগ্রহের মধ্যে কি কোন পার্থক্য থাকে? পার্থক্য থাকিলে তাহা কিরূপ? অহিংসার দুই দিক—অভাবাত্মক (নেগেটিভ্) ও বিধায়ক (পজিটিভ্)। অহিংসার অভাবাত্মক দিকে কেবলমাত্র হিংসা বা বৈরভাবের অভাব থাকে। কিন্তু বিধায়ক দিকে শুধু হিংসা বা বৈরভাবের অভাব থাকিলে চলিবে না। উহাতে জীবন্ত প্রেম থাকা চাই। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ বিধায়ক অহিংসার নমুনা। অন্যদিকে সাধারণ লোকের পরস্পরের মধ্যে যে নির্বৈর সম্পর্ক তাহাই নিষেধাত্মক অহিংসা। সত্যাগ্রহ অহিংসার প্রয়োগ। সুতরাং নিষেধাত্মক সত্যাগ্রহে অহিংসার মাত্র নেগেটিভ্ দিকের প্রকাশ হয়। কিন্তু বিধায়ক সত্যাগ্রহে অহিংসার বিধায়ক দিক অর্থাৎ প্রেমের প্রকাশ হইয়া থাকে। গ্রামের এক ব্যক্তি গ্রামের লোকের প্রতি ভীষণ অন্যায় করিতেছিলেন। গ্রামের লোক তাঁহাকে বার বার বুঝাইয়াও সংশোধন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা তাঁহার সহিত অহিংস অসহযোগ করিলেন। অবশেষে তিনি গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। পক্ষান্তরে মায়ের এক সন্তান কুপথে যাইতেছিল। মা তাহাকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার সংশোধন হইল না। মা তাহাকে সস্নেহে গৃহে রাখিলেন। নিজহস্তে রান্না করিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন এবং কত আদর যত্ন করিলেন, কিন্তু তিনি নিজে নীরবে উপবাসী থাকিতে লাগিলেন। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে নিষেধাত্মক সত্যাগ্রহ হইল। উহাতে হিংসার কোন স্থান ছিল না বটে কিন্তু প্রেম প্রকাশ পায় নাই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের বিধায়ক ও সৌম্য প্রক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সজীব প্রেমই উহার প্রেরক শক্তি।

অশোভনীয় পোস্টারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ

'ভূদানযজ্ঞের ক্রমবিকাশ' অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে অশোভনীয় পোষ্টার-বিরোধী আন্দোলনে গত ১৯৬০ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে

বিনোবাজীর অনুমতিক্রমে সত্যাগ্রহ করিয়া ইন্দোর রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখস্থ প্রকাশ্য স্থান হইতে অশোভনীয় পোষ্টার ও অশ্লীল চিত্র অপসারণ করা হয় এবং উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিরূপ অবস্থা ও ঘটনা-ক্রমে এই সত্যাগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা বিনোবাজী নিজেই বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"আমি ইন্দোরে অনেকদিন থাকায় সেখানে অশোভনীয় পোষ্টার আমার দৃষ্টিতে পড়িতে থাকে। তাহাতে আমি আমার আত্মায় গভীর গ্লানি অনুভব করি। আমি বলিলাম, এই সব পোষ্টার অপসারণ করা চাই। যদি আইনের বলে উহা অপসারণ করা সম্ভব না হয় তবে ধর্মের বলে উহা সরানো উচিত। ধর্মের স্থান আইন অপেক্ষা বহু উচ্চে। যে আইন ধর্মকে রক্ষা করিতে পারে না তাহা সংশোধনের জন্য আইন অমান্য করার প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি।

"ইন্দোরে আমি দুই চারিবার এই বিষয় সম্পর্কে বুঝাইয়া বলি। আমি সেখানকার জনসভায়ও এ সম্পর্কে বলি। পরে আমি যেদিন দ্বিতীয়বার ইন্দোরে যাই, সেইদিন আমি সিনেমার মালিকদিগকে ডাকাইয়া আনি ও তাঁহাদের সহিত ঐ সম্পর্কে আলোচনা করি। স্থির হয় যে ঐ কাজের জন্য ইন্দোরে শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত এক সমিতি থাকিবে। সিনেমার মালিকগণ আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে সমিতি যে সব পোষ্টারের বিরুদ্ধে আপত্তি করিবেন ও যে সব পোষ্টার অশোভনীয় বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করিবেন—সে সমস্ত পোষ্টার সিনেমার মালিকগণ অপসারিত করিয়া লইবেন। কিন্তু পরে লোভের জন্য হউক বা চাপে পড়িয়া হউক তাঁহারা পিছাইয়া যান।

রঘুপতি রীতি সদা চলি আয়ী,
প্রাণ যায় বরু বচন ন জায়ী।

এইভাবে সিনেমার মালিকেরা কথা রক্ষা করিলেন না। এজন্য তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদেরই প্রতিশ্রুতি পালন করানো আমার কর্তব্য হইয়া পড়িল। একটি তারিখ স্থির করিয়া ঐ সব পোষ্টার অপসারণ করা হইল এবং 'অগ্নিমালে পুরোহিতং। যজ্ঞস্য দেবং ঋত্বিজম। হোতারং রত্নধাত্তমম্।'—এই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে উহা পুড়াইয়া ফেলা হইল।"

স্বাধীনতা লাভের পর বর্তমান গণতন্ত্রের আমলে কি প্রকারের ও কিরূপ পদ্ধতিতে সত্যাগ্রহ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিনোবাজীর বিচার-ধারা কি তাহা উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইতে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে—বিনোবাজী এই সত্যাগ্রহের অনুমতি কেমন করিয়া দিলেন? তিনি কেন ও কিরূপ অবস্থায় এই সত্যাগ্রহের অনুমতি দিয়াছিলেন সে সম্পর্কে তিনি নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন—"এই বার বৎসরের মধ্যে যদি কেহ দেশের মধ্যে সত্যাগ্রহ ঠেকাইয়া থাকে তবে আমিই তাহা করিয়াছি। আর আমার যদি কোন প্রসিদ্ধি (রেপুটেশন্) লাভ হইয়া থাকে তবে সত্যাগ্রহীরূপে তাহা হইয়াছে। বাপু ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ উপলক্ষে আমার নাম প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে আমি ধ্যান-ধারণা, গ্রামসেবা, নয়ীতালীম, খাদি-পল্লীশিল্প ইত্যাদি কাজ লইয়া থাকিতাম। দেশের লোক আমাকে জানিতেন না। কিন্তু যখন বাপু প্রথম সত্যাগ্রহী রূপে আমার নাম প্রকাশ করিলেন, তখন হইতে দেশের লোক আমাকে চিনিলেন। তাহা সত্ত্বেও এই বার বৎসরের মধ্যে আমি কোন সত্যাগ্রহে উৎসাহ দান করি নাই। উহার অর্থ এই নয় যে ঐ সকল সত্যাগ্রহ সবই অনুচিত ছিল। তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে আমার তাহা ভাল লাগে নাই। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। রায়পুরে একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেখানে কিছু লোক উপবাস করিয়া ছিলেন। তাহাতে আমি আমার অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। কারণ কাজটি অনুচিত হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম যে কংগ্রেসের সম্মুখে উপবাস করিবেন না। কারণ আমার মনে হইয়াছিল যে বিনা চিত্তশুদ্ধিতে ঐ উপবাস করা হইতেছিল। মোট কথা, আমি গণতন্ত্রকে সত্যাগ্রহের কষ্টিপাথর করিয়াছি। অন্যের কাছে হয়তো অন্যকিছু সত্যাগ্রহের কষ্টিপাথর হইতে পারে। সত্যাগ্রহের ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রত্যেকের নিজ বিচার অনুসারে চলা উচিত।

"আমাকে নরম, মৃদু লোকের মধ্যে ধরা হইয়া থাকে। আমার সঙ্গীরা ও অন্য লোকে আমাকে বলেন, 'আপনি খুব নরম, আপনি একটু কঠোর হউন।' সেই আমি বলিতেছি যে এই ব্যাপারে (অশোভনীয় পোস্টারের বিরুদ্ধে) সত্যাগ্রহ ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

"আমার এই কথা সারা ভারতে পৌঁছিয়া যাউক যে আমি ইহা চাই। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও ইন্দোরে তাঁহারা প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন না। এই জন্য ইন্দোরের সত্যাগ্রহে স্বীকৃতিদান করিতে হইয়াছে।"

সে যাহাই হউক, ইন্দোরের ঐ সত্যাগ্রহ উগ্র ও নিষেধাত্মক সত্যাগ্রহের পর্যায়ে পড়ে। গণতন্ত্রের যুগে সত্যাগ্রহের গণ্ডী সংকুচিত হইয়াছে। নিষেধাত্মক ও উগ্র সত্যাগ্রহের আর স্থান নাই মনে হইতেছিল। এখন এক-মাত্র বিধায়ক ও সৌম্য সত্যাগ্রহ চলিতে পারে। বিনোবাজীর গত কয় বৎসরের সত্যাগ্রহসম্পকীয় আলোচনা হইতে ঐরূপ মনে হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝা গেল যে এখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে যেখানে উগ্র বা নিষেধাত্মক সত্যাগ্রহের আশ্রয় লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। তবে ছোটখাটো ব্যাপারেই এরূপ অবস্থা আসিতে পারে।

আর একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করা অনিবার্য মনে হইতে পারে। গ্রামদানী গ্রামে যে সব অনুপস্থিত (যিনি অন্যত্র বাস করেন) ভূমির মালিক অথবা গ্রামবাসী ভূমির মালিক গ্রামদানে যোগদান করেন নাই, অথচ যাঁহাদের জমি গ্রামদানে যোগদানকারী গ্রামের অধিবাসীরা গ্রামদানের সময় পর্যন্ত ভাগচাষী স্বরূপ বা অন্যরূপে চাষ-আবাদ করিয়া আসিয়াছে, সেই সব মালিক বহুক্ষেত্রে তাহাদিগকে বেদখল করিয়া দিয়াছেন বা দিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সেই সব প্রজার পৃথক বা সমবেতভাবে সত্যাগ্রহ করিয়া জমির উপর বসিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যেখানে বেদখলের সময় এরূপ সত্যাগ্রহ করা হইবে সেখানে কোন জটিলতা থাকিবে না। কিন্তু যেখানে বেদখলের সময় বিনা বাধায় বেদখল করা হইয়া গিয়াছে এবং ভূমি বাহিরের লোককে দেওয়া হইয়া গিয়াছে ও তাহারা উহা দখল করিতেছে, সেখানে গ্রামদানী গ্রামের লোক পরে সত্যাগ্রহ করিয়া জমির দখল উদ্ধার করিতে যাইলে প্রচলিত আইনের সহিত সংঘর্ষ বাধিবে। কারণ যিনি বর্তমানে জমি দখল করিতেছেন আইন তাঁহাকেই রক্ষা করিবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ করিয়া জমির দখল উদ্ধার করিতে যাইলে আইন অমান্য করা হইবে। ইহা এক সমস্যা। এরূপ ক্ষেত্রে বিনোবাজী সত্যাগ্রহের অনুমতি দিবেন কি? সত্যই এখন গণতন্ত্র সত্যাগ্রহের কষ্টিপাথর হওয়া

উচিত। গণতন্ত্রে সত্যাগ্রহের টেক্‌নিক (কলা) ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করিতে থাকিবে। তবে ইহা নিশ্চিতভাবে বুঝা গিয়াছে যে নিষেধাত্মক বা উগ্র প্রক্রিয়া অবলম্বন ছাড়া যেখানে গত্যন্তর থাকিবে না সেখানেও তাহা শুদ্ধ বুদ্ধিতে এবং বিশুদ্ধ চিত্তে করিতে হইবে। উপরন্তু উহা এমন বিষয় হওয়া চাই যাহাতে প্রায় সকলের একমত থাকে এবং যাহাতে বিচার পরিবর্তন বা মানস পরিবর্তনের কোনও প্রশ্ন নাই, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত (এস্টাব্লিস্‌ড্‌ ভ্যালুজ)। বিনোবাজী বলিয়াছেন যে সিনেমা-মালিকগণ কথা দিয়া তাহা পালন করেন নাই। সুতরাং সেই প্রতিশ্রুতি পালন করানো তাঁহার কর্তব্য হইয়া পড়ে। এজন্য তিনি ঐ সত্যাগ্রহে অনুমতি দিয়াছিলেন। যদি সিনেমা-মালিকেরা পোষ্টার অপসারণের জন্য প্রতিশ্রুতি না দিতেন তবে তিনি কি ঐ সত্যাগ্রহে অনুমতি দিতেন না? এমন হইতে পারে যে সিনেমা-মালিকগণের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য আরও কিছুদিন প্রযত্ন করা হইত এবং তাহার পর সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত করা হইত। যাহা হউক, ছোটখাটো ব্যাপারে এরূপ সত্যাগ্রহের প্রয়োজন হইতে পারে। বিনোবাজী ঐ সত্যাগ্রহের ঔচিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই বলিয়াছেন—"বড় জিনিসের পরিবর্তনের জন্য জনমত সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সত্যাগ্রহের বিষয় ছোট।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি কথা স্পষ্ট করিয়াছেন। যদিও উহা উপরে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে। উহা এই—"সত্যাগ্রহের ঔচিত্য সম্পর্কে প্রত্যেকের নিজের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলা উচিত।" যাহার যেরূপ সত্যের দর্শন হইবে তদনুসারে তিনি পরিশুদ্ধ চিত্তে নম্রভাবে চলিলে যদি তাহাতে কোন ভুল থাকে তবে তাহা অচিরেই তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত না হইয়া থাকিবে না। সত্য-অনুসরণের পথই এই। আরও একটি কথা। অন্য এক দৃষ্টিতে তিনি ঐ পোষ্টার সত্যাগ্রহকে সত্যাগ্রহ বলিয়া মানিতে রাজী নহেন। তিনি মনে করেন যে গৃহের সম্মুখে দুর্গন্ধ ময়লা ফেলিলে তাহা সাফ করা যেরূপ অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়ে, উক্ত পোষ্টার অপসারণ সম্পর্কে সেরূপ অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"আমি ইহা ঘোষণা করিতে চাই যে আমি ইহাকে সত্যাগ্রহ আখ্যা দিতে

চাহি না। কাহারও ঘরের সম্মুখে যদি মৃত শূকর পড়িয়া থাকে ও উহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকে এবং যদি মিউনিসিপ্যালিটী তাহা অপসারণ করিবার ব্যবস্থা না করেন, তবে গৃহের মালিক তাহা অপসারণ করিলে তাহাকে সত্যাগ্রহ আখ্যা দেওয়া যায় কি? ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক কার্য তো সত্যাগ্রহ। আমি সাড়ে নয় বৎসরকাল ধরিয়া পদযাত্রা করিতেছি। উহাও এক সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহীর জীবনে প্রত্যেক পদক্ষেপ সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে।"

যাহা হউক,বর্তমান গণতন্ত্রের অবস্থায় সত্যাগ্রহের আদর্শ ও সত্যাগ্রহীর যোগ্যতা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। পরবর্তী অধ্যায়ে সেই আলোচনা করা যাইতেছে।

॥ ৫৭ ॥ লোকতন্ত্রে সত্যাগ্রহের স্থান

সত্যাগ্রহ উত্তরোত্তর কোন্‌দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিনোবাজী যে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন তাহা পূর্ব-প্রকরণে আলোচনা করা হইয়াছে। কালড়ী সর্বোদয় সম্মেলনের সময় তথায় যে লোকসেবক শিবির অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে বিনোবাজী সত্যাগ্রহের অর্থ কি এবং স্বাধীনতা-লাভের ফলে অবস্থার যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে সত্যাগ্রহের স্থান কিরূপ হওয়া উচিত ও কি প্রকারের সত্যাগ্রহ হওয়া বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধেও দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন।

বিনোবাজী বলেন যে সত্যাগ্রহ শব্দ উচ্চারিত হইলেই সকলের অন্তরে 'আকর্ষণ' (অনুকূলতার ভাব) উৎপন্ন হওয়া চাই। কিন্তু আজকাল কাহারও দ্বারা সত্যাগ্রহ করার কথা শুনিলেই 'বিকর্ষণ' (প্রতিকূল ভাব) হয়, অর্থাৎ মনে হয় যেন তিনি কোন অন্যায় কাজ করিতে যাইতেছেন। অবশ্য উপবাস চলিবার সময় সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া হয়তো সেই ধারণা বদলাইতে পারে ও তখন মনে হইতে পারে যে উপবাস করা ঠিকই হইতেছে। সুতরাং যেক্ষেত্রে প্রথম প্রতিক্রিয়ায় এরূপ বিরূপভাব উৎপন্ন হয় সে ক্ষেত্রে সাধারণ লোক যাঁহারা সমাজের বর্তমান অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন চাহেন না, তাঁহাদের

মনে সত্যাগ্রহের নামে কিরূপ বিরূপভাব জন্মে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

সত্যাগ্রহে এক শক্তি আছে। সেই শক্তি কি তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। তবেই আমরা সত্যাগ্রহের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে পারিব। যাহার জন্য বা যাহার সম্বন্ধে সত্যাগ্রহ করা হয়, সত্যাগ্রহের ফলে তাহার বৈরভাব তিরোহিত হইয়া থাকে। বিনোবাজী বলিয়াছেন—সত্যাগ্রহ সূর্যের মত। সূর্য্যের উদয়েই যেমন সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত হয় তেমন সত্যাগ্রহের এরূপ শক্তি আছে যে, যে ব্যক্তি চিন্তা করিতেও রাজী ছিলেন না অথবা বিপরীত চিন্তা করিতেছিলেন সেই ব্যক্তিও সত্যাগ্রহ হইবামাত্রই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাঁহার চিন্তাও নির্মল হইবে। তাঁহার বুদ্ধির পর্দা খুলিয়া যাইবে। তাঁহার মোহের আবরণ দূর হইবে। তাঁহার অন্তরে অনুকূলতা আসিবে। যদি এরূপ হয় তবে তাহা সত্যাগ্রহ।

সত্যাগ্রহে কোনরূপ চাপ দেওয়ার ভাব যেন না থাকে। যাঁহার সম্বন্ধে সত্যাগ্রহ করা হইতেছে তিনি যেন এরূপ অনুভব না করেন যে তাঁহার উপর চাপ দেওয়া হইতেছে। যদি তাহা হয় তবে সত্যাগ্রহের শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বিনোবাজী মহাত্মা গান্ধীর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের (কম্যুন্যাল এওয়ার্ড) বিরুদ্ধে যে উপবাস করিয়াছিলেন তাহার কথা উল্লেখ করেন। 'কমিউন্যাল য়্যাওয়ার্ডে' হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উহার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩২ সালে পুণা জেলে থাকাকালীন উপবাস করেন। হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিগণ যাঁহারা হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের পক্ষে মত দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম ছিলেন। গান্ধীজীর উপবাসে তিনি বিচলিত হন এবং পুণায় গিয়া উপস্থিত হন। উপবাস চলিতে থাকায় সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে যদি হিন্দু সমাজের সংশ্লিষ্ট নেতৃবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে ঐ সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করিতে চাহেন তবে সরকার তাহা মানিয়া লইবেন। তদনুসারে সংশ্লিষ্ট সকলে মিলিয়া স্থির করেন যে হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হউক। উহাকে 'পুণাচুক্তি' (পুণাপ্যাক্ট্) বলা হয়। পুণাপ্যাক্টে রবীন্দ্রনাথও

স্বাক্ষর করেন। পুণাপ্যাক্ট্ স্বাক্ষরিত হইলে মহাত্মা গান্ধী উপবাস ভঙ্গ করেন। কিন্তু পরে প্রকাশ পায় যে পুণাচুক্তির সর্ত রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয় নাই। তিনি দুঃখ করিতেন যে ইহাতে বাংলার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তথাপি মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার চাপে পড়িয়া তিনি উহাতে স্বাক্ষর করেন। ইহাতে বিনোবাজী মনে করেন যে মহাত্মা গান্ধীর 'উপবাস-সত্যাগ্রহে' নিশ্চয় কোন ত্রুটি ছিল। নচেৎ উপবাসের পরিণামস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহান ব্যক্তির কাছে উহা অন্যায্য চাপ বলিয়া বোধ হইত না। এ সম্পর্কে বিনোবাজী মহাত্মা গান্ধীর সহিত একাধিকবার আলোচনা করিয়াছিলেন। এইসব কথা শুনিয়া অনেকের মনে হইতে পারে যে যখন মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহে ত্রুটি ঘটিতে পারে তখন সাধারণ ব্যক্তির সত্যাগ্রহে কিছু ত্রুটি তো ঘটিবেই। সুতরাং সাধারণ লোকের কাছে সত্যাগ্রহের পূর্ণ আদর্শ পালনের আশা করা বৃথা। অতএব সাধারণ লোকে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে যে সত্যাগ্রহ করিতেছে তাহাতে চাপ বা অন্য কোন ত্রুটি থাকিলেও তাহা সহ্য করিয়া লওয়া উচিত। ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন যে এখন তাহা হইতে পারে না। কারণ এখন সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি বলেন যে ঘনঘোর নিশার অবসানে যখন সবে মাত্র সূর্যের উদয় হইতেছে তখন সূর্যের তেজ তেমন প্রখর থাকে না। কিন্তু বেলা বাড়িলে সূর্যের তেজ প্রখর হইয়া উঠে। বিনোবাজীর এই কথার অর্থ কি? উহার অর্থ এই যে যতদিন আমরা পরাধীন ছিলাম ততদিন পরিপূর্ণ আদর্শ অনুসারে সত্যাগ্রহ করিবার সুযোগ অনেকক্ষেত্রে থাকিত না। মহাত্মা গান্ধীর ঐ উপবাসের কথা ধরা যাউক। মহাত্মা গান্ধী তখন জেলে ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে দেশের যাঁহারা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সম্মতি দিয়াছিলেন তাঁহাদের কাছে গিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া তাঁহাদের মত বা হৃদয় পরিবর্তন করিবার সুযোগ ছিল না। সরকারের কাছে চাহিয়াও সে সুযোগ তিনি তখন পাইতেন না। আর তাঁহাদের মত পরিবর্তন হইলেও সরকার অবনমনীয় হইয়া থাকিতেন। উপরন্তু বৈদেশিক শাসনের সময় নিষেধাত্মক সত্যাগ্রহ করা হইত। ইংরেজ সরকারকে 'ভারত ছাড়' বলা চলিত। এজন্য তখনকার সত্যাগ্রহে কিছু ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নহে।

তখনকার সত্যাগ্রহ-সূর্য ক্ষীণপ্রভ ছিল। এখন দেশ স্বাধীন হইয়াছে। মত প্রচার ও বিচার-প্রচারের সর্ব প্রকার সুবিধা হইয়াছে। ঘরে ঘরে যাইয়া যেরূপ খুসী বিচার বুঝানো যায়। গান্ধীজীর সময় সেরূপ ছিল না। এই অবস্থায় এখন গণতন্ত্রের যুগে সত্যাগ্রহের অবকাশ খুব কম এরূপ অনেকে মনে করেন। বিনোবাজী বলেন যে ইহা উড়াইয়া দিবার মত কথা নহে। এজন্য এখন একথা বলিলে চলিবে না যে সাধারণ লোক (যাহাদের যোগ্যতা কম) ত্রুটিপূর্ণ সত্যাগ্রহ করিলেই তাহা মানিয়া লওয়া আবশ্যক। বরং দৃঢ়ভাবে এই কথা বলা উচিত যে যাঁহাদের ঠিক আদর্শ অনুসারে সত্যাগ্রহ করিবার যোগ্যতা নাই তাঁহাদের সত্যাগ্রহ করিবার অধিকার নাই। তাঁহারা যেন সত্যাগ্রহ না করেন ও শান্ত হইয়া থাকেন। সংশোধনের দৃষ্টিতে প্রকৃত সত্যাগ্রহ কাহাকে বলা উচিত সে সম্বন্ধে বিনোবাজী বলেন—"যদি আমি বলি যে আমি আগামী কাল হইতে সত্যাগ্রহ করিব তবে আমার প্রতি লোকের মনে যে সহানুভূতি আছে তাহা হাজারগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া উচিত আর আমার প্রতি যে বিরোধভাব আছে তাহা কমিয়া যাওয়া উচিত। 'সত্যাগ্রহের' কথা শুনিলেই তাহার প্রথম প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়া প্রয়োজন। যখন সত্যাগ্রহ করা হইবে তখন আরও ভাল ফল হওয়া চাই। কিন্তু 'সত্যাগ্রহ' শব্দ শ্রবণমাত্রই এরূপ মনে হওয়া চাই যে বড় সুন্দর কাজ হইতেছে। যেমন কেহ কাহারও প্রতি প্রেম বা করুণা প্রদর্শন করিলে অথবা প্রেম, করুণা ও দয়ার কার্য করা হইলে তাহা শুনিয়া অন্তরে অমৃতের স্পর্শ অনুভূত হয়, সত্যাগ্রহেও সেইরূপ হওয়া উচিত। ইহা দয়ার কাজ হইয়াছে, ইহা করুণার কাজ হইয়াছে, ইহা বাৎসল্যের কাজ হইয়াছে এরূপ ভাবিয়া প্রথমে অন্তরে আনন্দ অনুভব করা হয়। পরে হয়তো উহার যোগ্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে মূল্য-নিরূপণ করা হইয়া থাকে। খুনের কথা শুনিলে কাহারও কানে উহা ভালো লাগে না, উহা শুনিতেই অনিচ্ছা হইয়া থাকে। পরে হয়তো ঐ খুনের কারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে ভাবা হয় এবং খুনের সঙ্গত কারণ ছিল কি-না এ সম্বন্ধে পরে মতভেদও হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথম শ্রবণে সকলের একমত থাকে যে অন্যায় কার্য করা হইয়াছে। কোন প্রেমের কাজ করা হইলে তাহার কথা শুনিয়াই সব লোক মনে করে যে ভাল কাজ হইয়াছে। সেইরূপ সত্যা-

গ্রহের কথা শুনামাত্রই সমগ্র জগতের মনের উপর ভাল প্রভাব পড়া চাই। এই শক্তি যে-সত্যাগ্রহে থাকিবে তাহাকেই সত্যাগ্রহ বলা হইবে। সেইরূপ সত্যাগ্রহ গণতন্ত্রে চলিবে। সত্যাগ্রহের যে পুরাতন রূপ ছিল তাহার স্থান গণতন্ত্রে নাই। পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় এতটা পার্থক্য ঘটিয়াছে।"

॥ ৫৮ ॥ সত্যাগ্রহ ও সত্যের আগ্রহ

পূর্বের দুই অধ্যায়ে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রের বিকাশ হইতেছে। এ পর্যন্ত সত্যাগ্রহের বিকাশের তিনটি ক্রমের উল্লেখ করা হইয়াছেঃ—(১) 'নেগেটিভ' (নিষেধাত্মক) সত্যাগ্রহ অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বকালে ইংরেজ-শাসন উচ্ছেদ করিবার জন্য যে উগ্র সত্যাগ্রহ করা হইত—তাহা। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে তখন যাহা করা হইত তাহা আর এখন করা চলিতে পারে না। অর্থাৎ এখন আর নেগেটিভ্ সত্যাগ্রহের বিশেষ স্থান নাই। (২) হিংসা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক প্রক্রিয়া বিফল হইলে তাহা অপেক্ষা উগ্র প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হইয়া থাকে এবং তাহাতে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অহিংসার ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়া বিফল হইলে তদপেক্ষা সৌম্য (অর্থাৎ কোমল) পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন ও উচিত। অন্যথায় অহিংসাত্মক ফললাভের আশা থাকে না। এজন্য সত্যাগ্রহের সৌম্য হইতে সৌম্যতরের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া উচিত। (৩) সত্যাগ্রহের কথা শুনিলেই প্রথম প্রতিক্রিয়ায় মনে আনন্দের সঞ্চার হওয়া চাই। যদি তাহা না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে সত্যাগ্রহ ঠিক হইতেছে না।

১৯৫৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী ইয়ালওয়াল নামক স্থানে (জেলা ধারওয়ার, মহীশূর রাজ্য) বিনোবাজী সর্বসেবা সংঘের সদস্যগণের সহিত আলোচনাক্রমে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে এক মন্তব্য করেন যাহা হইতে মনে হয় যে তিনি সত্যাগ্রহ-শাস্ত্রকে আরও উচ্চ সোপানে উন্নীত করিতে চাহিতেছেন। তিনি বলেন, 'সত্যাগ্রহে আমাদের দিক হইতে নহে, সত্যের দিক হইতেই আগ্রহ হওয়া উচিত।' আমরা এ যাবৎ সত্যাগ্রহের যে অর্থ বুঝিয়া আসিয়াছি তাহাতে সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহীরই সত্য সম্বন্ধে কিংবা সত্যের প্রতি আগ্রহ থাকা প্রয়োজন বলিয়া বুঝিয়াছি। কিন্তু এখন বিনোবাজী এই

শিক্ষা দিতেছেন যে সত্যাগ্রহে সত্যাগ্রহীর দিক হইতে সত্য সম্বন্ধে আগ্রহ থাকা উচিত নহে। সত্যকেই আগ্রহ করিতে দিতে হইবে। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া বিনোবাজী কি বুঝাইতে চাহিতেছেন তাহা ভালভাবে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহার অর্থ এই নহে যে আমাদিগকে সত্য-চিন্তন বা সত্য-আচরণ করিতে হইবে না। তিনি এ সম্পর্কে বলিয়াছেন—"আমাদিগকে সত্য-চিন্তন ও সত্য আচরণ অবশ্য করিতে হইবে, কিন্তু আগ্রহ সত্যকেই করিতে হইবে। আমরা যেন মধ্যে আসিয়া না পড়ি। আমরা মাঝখানে থাকিলে সত্য দুর্বল হইয়া যাইবে।" এই কথার স্পষ্টীকরণ করিবার জন্য লেখক তাঁহাকে অনুরোধ করিলে বিনোবাজী বলেন—"আমি বা আমরা 'মিথ্যা আমি' কিংবা 'মিথ্যা আমরা' হইতে পারি। সে ক্ষেত্রে সত্যের সহিত ঐ 'মিথ্যা আমি' বা 'মিথ্যা আমরা'-র সংযোগ হইলে সত্য কলুষিত হইবে এবং সত্যের প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইবে। অতএব সত্যকে নিরপেক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য সুযোগ দেওয়া উচিত।" ভূদানযজ্ঞ ও গ্রামদান সম্বন্ধে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ কি প্রকারে করা যাইতে পারিবে তাহা লেখক জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে, গ্রামদান সম্পর্কে সত্যাগ্রহের রূপ হইবে বিচার-প্রচার।

গ্রামদান আন্দোলনে ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ ও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা হইতেছে সত্যস্বরূপ। এই সত্যের প্রতিষ্ঠাই আমাদের কাম্য। এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সত্যাগ্রহের রূপ কি হওয়া উচিত তাহা দেখা যাউক। যদি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের আগ্রহ (জিদ) থাকে আর সেই-সঙ্গে আমাদের অন্তরে মিথ্যাও থাকে তবে সত্যাগ্রহে আমাদের নিজেদের আচরণের ফলে সত্য দুর্বল হইয়া পড়িবে। কারণ আমাদের ভিতরে মিথ্যা আছে বলিয়া আমাদের আগ্রহে ফলাসক্তি থাকিবে এবং ফলাসক্তির কারণে আমরা যে উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিব তাহাতে মিথ্যা থাকার সম্ভাবনা থাকিবে। ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জন দেওয়াইবার জন্য যদি আমাদের অত্যাগ্রহ (ফলাসক্তি) থাকে তবে আমরা উগ্র-সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিব না। উপরন্তু, যদি আমরা উপবাসও করি, তবে আমাদের অন্তরে ফলাসক্তি থাকিবার ফলে উপবাসের দ্বারা চাপ দিবার উদ্দেশ্য আমাদের

থাকিবেই। অতএব সত্যাগ্রহে আমাদের নির্লিপ্ত থাকাই উচিত। এই বিষয়ে আমাদের নিজেদের দিক হইতে আমরা সত্য-চিন্তন ও সত্য-পালন করিতে থাকিব। অর্থাৎ তাহা হইবে নিরন্তর পর্যটন এবং নিঃস্বার্থ ও বিনম্র বিচার-প্রচার। ইহার পরিনামস্বরূপ সত্য (অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগ ও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি) জন-হৃদয়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হইবার সুযোগ পাইবে। সত্য নিজ আগ্রহে ক্রমে জন-হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিবে। সত্যকে আগ্রহ করিতে দেওয়ার অর্থ এই।

বিনোবাজী আরও বলিয়াছেন যে সত্যাগ্রহ বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে 'সত্যাগ্রহ' শব্দ ঠিক উপযোগী ও সঠিক অর্থব্যঞ্জক নহে। বিশেষত 'আগ্রহ' শব্দ উপযোগী নহে। কিন্তু 'সত্যাগ্রহ' শব্দ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এজন্য ঐ শব্দ রাখিতে হইবে। সুতরাং উহার সমাস ভাঙ্গিয়া 'সত্যের জন্য আগ্রহ কিংবা সত্যের প্রতি বা সত্যের সম্বন্ধে আগ্রহ' এরূপ না করিয়া 'সত্যের আগ্রহ' এইরূপ করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে।

॥ ৫৯ ॥ একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস

যদি ভূদানযজ্ঞ পূর্ণভাবে সফল না হয় তবে তিনি কি করিবেন এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে বিনোবাজী বলিয়াছেন, "যদি ধনীদের হৃদয় না খুলে তবে আমি আরও এক পা অগ্রসর হইব। আজ আমি যাহা করিতেছি তাহা হইতে আমি আর এক পদও অগ্রসর হইব না এইরূপ বন্ধন বা সীমারেখা আমি আমার জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখি নাই। এইরূপ বন্ধনের প্রতি আমার বিশ্বাসও নাই। আমাদের প্রেমের শক্তি থাকা চাই। মা তাঁহার সন্তানের জন্য কতই না ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে তাঁহার সন্তান খারাপ পথে যাইতেছে। তখন তিনি কি করেন? তিনি উপবাসী থাকেন এবং নিজেই সন্তানকে বুঝাইতে থাকেন। অন্যকে দুঃখ না দিয়া নিজে দুঃখ বরণ করা ও তাহাকে বুঝাইতে থাকা—ইহারই নাম সত্যাগ্রহ।"

বিচারধারার সমগ্রতার সুস্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য বিনোবাজী সত্যাগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না যে এইরূপ

সত্যাগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইবে। সকলের মনে বিশেষত কর্মীদের মনে অনুরূপ বিশ্বাস থাকা চাই এবং এই বিশ্বাস অন্তরে সদা জাগ্রত রাখিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া চাই। বিফলতায় সত্যাগ্রহ হইতে পারে এই কথা মনে রাখিলে তাঁহাদের একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া যাইবে এবং উহাতে আন্দোলনের ক্ষতি হইবে। সন্তানের অসুখ হইলে মা মনে করেন যে, তাঁহার সন্তান নিশ্চয় বাঁচিবে এবং এই বিশ্বাসে তিনি চলিতে থাকেন। সন্তানের অবস্থা যত খারাপ হউক তাঁহার ঐ বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে। উহাতে সন্তানের সেবা-শুশ্রূষা সুষ্ঠুভাবে চলিতে থাকে। সন্তান বিপথে যাইলে মা মনে করেন যে, তাঁহার সন্তান নিশ্চয় একদিন-না-একদিন সংশোধিত হইবে এবং বার বার বিফলতায়ও তাঁহার সে-বিশ্বাস টলে না। তিনি সন্তানকে অবিরত বুঝাইতে থাকেন। বৃদ্ধ পিতার অসুখ হইয়াছে। পুত্র তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধাদি খাওয়াইবার ভার লইয়াছে। যদি সে মনে করে যে বাবা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি না বাঁচিতে পারেন আর তাঁহার মৃত্যু হইলে খাটিয়া ও কাঠের প্রয়োজন হইবে এই ভাবিয়া পুত্র তাহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টিত হয়, তবে বাবাকে নিয়মিত ঔষধ ও পথ্য দিতে তাহার আগ্রহ অজ্ঞাতসারে কম হইবে। নিয়মিত ঔষধ খাওয়াইতে সবসময় তাহার খেয়াল থাকিবে না এবং তাহাতে বাবার মৃত্যু আগাইয়া আসিবে। এইক্ষেত্রেও সেইরূপ। বিশেষত অহিংসার কাজের সফলতায় শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রাখা চাই।

॥ ৬০ ॥ সম্পত্তিদানযজ্ঞ

ভূদানযজ্ঞের সঙ্গে-সঙ্গে সম্পত্তিদানযজ্ঞ প্রবর্তনের কথা বিনোবাজী বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভূমি-সমস্যা বুনিয়াদী সমস্যা। ভূমি-সমস্যার সমাধানের জন্য তেলঙ্গানায় তখনই কিছু করা জরুরী ছিল। উপরন্তু ভূমি ভগবানের দান, উৎপাদনের মৌলিক সাধন। এইজন্য তিনি গরীবের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা প্রথমে ভূমি-সমস্যায় সীমাবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"পরন্তু আমি ভাবিলাম যে, প্রথম হইতে দুইটি ব্যাপার একসঙ্গে উঠানো ঠিক নহে। উপরন্তু উভয় কাজ একসঙ্গে আরম্ভ করিবার ইঙ্গিতও আমি পাই নাই। যদি বিনা ইঙ্গিতে কোন কাজ

হাতে লই, তবে তাহা অহঙ্কার হইবে। তাহাতে কোন ফলও হইবে না এবং আমার যেশক্তি আছে তাহা ভাঙিগয়া পড়িবে। সেই সময় আমি কেবলমাত্র ভূদানের ইঙিগতই পাইয়াছিলাম।” কিন্তু ভূদানযজ্ঞের কাজ যখন অগ্রসর হইতে থাকিল তখন ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ভূমির সঙ্গে-সঙ্গে অর্থের অংশ না চাহিলে আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যখন তিনি বিহারে পদার্পণ করিলেন তখন তিনি সম্পত্তিদানযজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিলেন এবং যে সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের বিচারকে রূপদান করিয়াছিলেন তাঁহারই পাটলীপুত্র শহরে ১৯৫২ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে বিনোবাজী সম্পত্তিদানযজ্ঞের প্রবর্তন করিলেন ও আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দিবার জন্য আবেদন জানাইলেন। নিজের পরিশ্রমের দ্বারা ধন-অর্থ উপার্জন করা হইলেও উহা কেবল নিজের জন্য নহে; পরন্তু সকলের ভোগের জন্য ভগবান উহা অর্পণ করিয়াছেন। যে-বুদ্ধি, শক্তি ও পুরুষার্থের সাহায্যে ঐ ধন উপার্জন করা হইয়াছে তাহা পরমেশ্বরেরই দান। উপরন্তু সারা সমাজের সহযোগিতা ভিন্ন কাহারও পক্ষে ধন-অর্থ উপার্জন করা সম্ভব নহে। উপার্জিত অর্থের অংশ চাহিবার পশ্চাতে এই ভাবধারা রহিয়াছে।

সম্পত্তিদানযজ্ঞে ‘সম্পত্তি’ শব্দের অর্থ কি তাহা জানা প্রয়োজন। এখানে ‘সম্পত্তি’-শব্দ হিন্দী-শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলাভাষায় ‘সম্পত্তি’ বলিতে ভূমিসমেত অন্যান্য সমস্ত ধন-সম্পত্তিও বুঝায়। হিন্দীতে ‘সম্পত্তি’ শব্দের অর্থ ধন-দৌলত বা টাকা-পয়সা, কিন্তু ভূমি নহে। অতএব সম্পত্তি-দানের অর্থ ধনদান, অর্থদান, আয়দান ইত্যাদি। সম্পত্তিদানযজ্ঞে আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ চাওয়া হইয়াছে। এই যজ্ঞের মারফৎ কোনও একটি ধনভাণ্ডার সংগ্রহ করিবার কল্পনা নাই। কিরূপ মনোভাব লইয়া সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দেওয়া কর্তব্য ও উহা কি পদ্ধতিতে পরিচালনা করা উচিত তাহা বুঝাইয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি নিত্য জীবনের বিচার উপলব্ধি করিয়া সম্পত্তিদান করিবেন তাঁহারই সম্পত্তির ব্যবহার আমরা করিতে চাই। কাহারও উৎসাহবশে সম্পত্তিদান করিবার কথা নহে, পরন্তু উহা চিন্তা করিয়া, বিচার করিয়া করিবার কথা। বর্তমান বর্ষে ব্যক্তিগতক্ষেত্রে উহাকে সীমাবদ্ধ রাখিবার

কথা আমি ভাবিয়াছি। যিনি সম্পত্তিদানকে নিত্য-ধর্মস্বরূপ মনে করিবেন তাঁহারই দান স্থায়ী হইবে। উহা সহজ ধর্ম হওয়া চাই। ইহাতে ভারবোধ যেন না হয়। আমাদের শরীরের ওজন যদি ঠিক পরিমাণ মত হয় তবে উহার বোঝা অনুভূত হয় না। সেইরূপ সম্পত্তিদানযজ্ঞে সহজ দান হওয়া চাই। ঘরে শিশু জন্মিলে সে পান-আহার করে, কিন্তু তাহার বোঝা অনুভূত হয় না। গার্হস্থ্য-জীবনের উহা সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ—এইরূপ মনে করা হয়। উহাতে সকলের আনন্দ হয়। সেইরূপ সম্পত্তিদানযজ্ঞে যিনি দান দিবেন তাঁহার আনন্দ হওয়া চাই। এইজন্য সম্পত্তিদানযজ্ঞ ব্যক্তিগতভাবে চালাইবার কাজ —অন্তত এই বৎসর পর্যন্ত। আগামী বৎসরের কথা পরে চিন্তা করা যাইবে।” তিনি বলেন—“যিনি দিবেন তিনি যেন সারা জীবনের জন্য দেন। একবার দান দিলে সারা জীবনের জন্য দিতে হইবে—এই বিচারের মর্ম অনেকে উপলব্ধি করেন না। কিন্তু তাঁহারা একথা চিন্তা করেন না যে, একবার বিবাহ করিলে তাহার দ্বারা সারা জীবনের বন্ধন হইয়া যায়।” সম্পত্তিদানযজ্ঞ কেন প্রথম হইতে আরম্ভ করা হয় নাই ও কেন উহার উপর এখনও জোর দেওয়া হয় নাই সেসম্পর্কে বিনোবাজী অন্যত্র বলিয়াছেন—“গঙ্গা অপেক্ষা যমুনা ছোট, কিন্তু যমুনা গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। তেমনি আজ সম্পত্তিদানযজ্ঞ যমুনার মত। ভূমি যেমন উৎপাদনের অনিবার্য উপায় টাকা-পয়সা সেরূপ অনিবার্য উপায় নহে। টাকা-পয়সা তো মোহময় উপায়। টাকা-পয়সার কোন মূল্যই নাই। উহা তো নাসিকের প্রেসে তৈয়ারী হয়। কিন্তু কোন প্রেস ভূমি তৈয়ারী করিতে পারে না। এইজন্য ভূমির সঙ্গে টাকা-পয়সার তুলনা হইতে পারে না। অর্থশালীদের অর্থকে আমরা মূল্যহীন করিয়া দিতে পারি। এজন্য ভূমির তুলনায় ধন-দৌলত বহুগুণ গৌণ। ভূমি বুনিয়াদী। এই চিন্তা করিয়া আমরা ভূমিসমস্যায় প্রথমে হাত দিয়াছি। সম্পত্তিদানযজ্ঞের উপর এখন এই কারণে বেশী জোর দিতেছি না যে, উহা এমন একটি চারা গাছ যাহার শীঘ্র উদ্ভেদ হয়, কিন্তু যাহা আবার শীঘ্র শুকাইয়া যায়।”

বিনোবাজী অর্থ গ্রহণ করেন না। অথচ এখন তিনি অর্থ চাহিতেছেন। এই দুয়ের সামঞ্জস্য কি ভাবে করা যায়? বিনোবাজী দাতার নিকট হইতে অর্থ নিজের হাতে লইবেন না। উহা দাতারই নিকট থাকিবে এবং

দাতা বিনোবাজীর নির্দেশ অনুসারে উহা ব্যয় করিয়া তাহার হিসাব বিনোবাজীকে দিবেন। এইসম্পর্কে তিনি তাঁহার আবেদনে বলিয়াছেন—"আমি ঐ অর্থ নিজের হাতে লইব না এবং উহা রাখিবার দায়িত্বও লইব না। উহা খরচ করিবার বা উহার হিসাব রাখিবার দায়িত্বও আমি গ্রহণ করিব না। ইহা হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিব। জনসাধারণের উপকারার্থে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য সাধারণত ট্রাষ্ট সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। আমি সেরূপ ট্রাষ্ট গঠন করিবারও কল্পনা করিতেছি না। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ফান্ড ও এই সম্পত্তিদানযজ্ঞের মধ্যে একটি গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে, আয়ের একটি অংশ প্রতি বৎসর এই যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে। এজন্য আমি স্থির করিয়াছি যে, দাতার কাছেই এই অর্থ রাখা হইবে। তিনি আমার নির্দেশ অনুসারে উহা ব্যয় করিবেন এবং তাহার হিসাব প্রতি বৎসর আমার কাছে পাঠাইবেন। ইহার অর্থ এই যে, দাতা কেবলমাত্র তাঁহার ধন-অর্থের একাংশ দিয়া মুক্তি পাইবেন না। পরন্তু ব্যয়ের ব্যাপারেও তাঁহার বুদ্ধি খাটাইতে হইবে। ইহা সত্য যে, আমার অভিপ্রায় অনুসারে দাতাকে তাঁহার প্রদত্ত অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে তাঁহার নিজের অভিপ্রায় কি তাহা তিনি আমাকে জানাইতে পারিবেন।"

এই ব্যাপারে দাতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। সমালোচকেরা এই ব্যবস্থায় দোষ দেখিতে পারেন। এজন্য বিনোবাজী বলিয়াছেন—"কিন্তু বিশ্বাসই ধর্মপ্রেরণার আধার। মানুষকে বিশ্বাস করিলে তাহার সততা সম্বন্ধে যতটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কোনরূপ আইনের বন্ধন দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। এই দৃষ্টিতে সম্পত্তি-দানের এই নিয়ম আমি স্থির করিয়াছি।"

এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর 'ট্রাষ্টীশিপ থিওরী'র কথা মনে উদিত হয়। মহাত্মা গান্ধী ধনীদিগের উদ্দেশ্যে বলিতেন—'দেখ ধনিক, তোমার হাতে যে ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত হইয়াছে তাহার মালিক তুমি নহ। তাহা সকলের। তাহা দরিদ্রের। দরিদ্রের ধন ভগবান তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। তুমি দরিদ্রের ট্রাষ্টী। অতএব তুমি তোমার ধন-সম্পত্তি দরিদ্রদের হিতার্থে

বিনিয়োগ কর।' মহাত্মা গান্ধী বিশ্বাস করিতেন যে, একদিন ধনীরা শুভ-বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি দারিদ্রের কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ করিবেন। উহা মহাত্মা গান্ধীর ট্রাষ্টীশিপ থিওরী (বিশ্বস্ত বৃত্তি) বলিয়া আখ্যাত হয়। উহার মধ্যেই ভূদানযজ্ঞ ও সম্পত্তিদানযজ্ঞের বীজ নিহিত ছিল। সম্পত্তিদানযজ্ঞ ও ভূদানযজ্ঞের দ্বারা গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপ থিওরীর (বিশ্বস্ত বৃত্তির) প্রয়োগ করা হইতেছে। ট্রাষ্টীকে কোনও ক্ষতিপূরণ দিবার প্রশ্নই উঠে না। যিনি ট্রাষ্টী, ট্রাষ্ট-সম্পত্তি তো তাঁহার বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। উহা নিজের করিয়া রাখা চলে না। ট্রাষ্টীও আমাদের ভাই। তাঁহার জীবন নির্বাহের জন্য কিছু পাওয়াও চাই। এজন্য ভূদানযজ্ঞ বা সম্পত্তিদানযজ্ঞে সম্পূর্ণ ভূমি বা আয় চাওয়া হয় না। দরিদ্রনারায়ণের ভাগই চাওয়া হইয়া থাকে। তখন লোকে ট্রাষ্টীশিপ থিওরীর কথায় উপহাস করিত। আজ তাহার সফলতা মানুষ প্রত্যক্ষ করিবে। বিনোবাজী 'ট্রাষ্টীশিপ্' শব্দ ব্যবহার করিবার পক্ষপাতী নহেন। তবে ট্রাষ্টীশিপের ভাবধারা, যাহা সম্পত্তিদানযজ্ঞে নিহিত রহিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"ইহা ভূমিদানের মত একবার দান দেওয়ার ব্যাপার (সম্পত্তিদান) নহে। ইহাতে প্রতি বৎসর আয়ের এক অংশ দিতে হইবে। অতএব উহার জন্য জীবনকে নৈষ্ঠিক করিয়া তোলা প্রয়োজন। ইহাতে অন্তরের নিষ্ঠার বিকাশ হওয়া চাই। যখন ভরত রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার উপক্রম করিতেছিলেন সে সময় কখন তিনি রামের সহিত মিলিত হইবেন এইভাবে তাঁহার অন্তর পূর্ণ ছিল। কিন্তু তিনি কিছুক্ষণের জন্য থামিলেন। রাজ্যের তত্ত্বাবধায়কগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আমি রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। যতদিন আমি ফিরিয়া না আসি ততদিন আপনারা রাজ্য ঠিকমত পরিচালনা করুন।' তুলসীদাস লিখিতেছেন যে, ভরত এত নিস্পৃহ হইয়াও এরূপ করিলেন, কেননা সকল সম্পত্তি রামের। এইজন্য তাহার ঠিকমত তত্ত্বাবধান করা ভরতের কর্তব্য। যেমন গান্ধীজী বলিতেন যে, নিজেদের সম্পত্তির ট্রাষ্টী হইয়া আমাদের থাকা উচিত। ট্রাষ্টী কথাটি আধুনিক। উহার বহু অপপ্রয়োগ হইয়াছে। এইজন্য আমি ট্রাষ্টী-শব্দ ব্যবহার করি নাই। কিন্তু গান্ধীজী ট্রাষ্টী-শব্দ ব্যবহার করিতেন, কেননা

তিনি আইনজ্ঞ ছিলেন। এইজন্য ঐ শব্দের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল। অতটা আকর্ষণ আমার নাই। কিন্তু আমি সেই বিচার উপনিষদের ভাষায় প্রকাশ করিতে চাই। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—যাহা ভোগ করিতে হইবে তাহা ত্যাগ করিয়াই ভোগ করা চাই। তুলসীদাসজীও বলিয়াছেন যে, সব সম্পত্তি রঘুবরের। অতএব এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়া গৌণ। নিজের সমস্তই সমাজকে দেওয়া প্রয়োজন। নিজের শরীরের প্রয়োজনের জন্য তাহা হইতে মাত্র কিছু গ্রহণ করিতে পারা যায়। কিন্তু এখন সমাজের মধ্যে এইপ্রকারের ব্যবস্থা নাই এবং শীঘ্র তাহা করাও যাইবে না। এইজন্য এখন এক-ষষ্ঠাংশ দিতে হইবে এবং বাকী যাহা থাকিবে তাহা হইতে আরও কিছু দেওয়ার জন্য ভাবিতে হইবে। ষষ্ঠাংশ দান দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, সারা জীবনের মত নিশ্চয় করিয়া উহা দিতে হইবে। যদি অতটুকু অংশ না দেওয়া যায়, তবে আমরা পাপী বিবেচিত হইব এবং আমাদের জীবনও পাপময় হইয়া উঠিবে। এইজন্য সম্পত্তিদান দেওয়া কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।"

যাঁহারা সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান করিতে চান তাঁহারা যেন তাঁহাদের পরিবারের সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং এই বিষয়ে সকলে আনন্দিত এরূপ নিশ্চিত হইয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে দান করেন। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"এখন এখানে যেসব ভাই বসিয়া আছেন তাঁহাদের অন্তরে যদি ধর্ম-ভাব আসিয়া থাকে, তবে তাঁহারা নিজেদের ঘরের সকলের সঙ্গে—মাতা, পত্নী এবং সন্তানদের সঙ্গে কথা বলিয়া সম্পত্তিদান দিতে পারেন। এইকাজের জন্য তাঁহাদের পরিবারের সকলের অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করা চাই। তাঁহাদের এইরূপ লাগা চাই যে, তাঁহারা যেন আজ মিষ্ট আম ভক্ষণ করিয়াছেন এবং উহার মধুত্বের আস্বাদ পাইয়াছেন। সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ দেওয়াতে তাঁহাদের খুবই আনন্দ হওয়া চাই। তাঁহাদের হৃদয় নৃত্য করিতে থাকিবে। কোন প্রকারের চাপে পড়িয়া দেওয়া অথবা লজ্জায় অথবা ভয়ে দেওয়া উচিত নহে। কেননা সারা জীবন ধরিয়া পঞ্চমাংশ বা ষষ্ঠাংশ ত্যাগ করিতে হইবে।"

ভূদানযজ্ঞে ভূমিদান লওয়া হয় এবং সেই ভূমি ভূমিহীনকে দেওয়া হয়। ভূমি কোন ভোগ্য দ্রব্য নহে। উহা উৎপাদনের সাধন (উপায়) এবং মৌলিক

সাধন। উহাতে হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিলে তবে ভোগ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। আবার দানপ্রাপ্ত ভূমি ভূমিহীনকে যে দেওয়া হয়, তাহা যেকোনও ভূমিহীনকে দেওয়া হয় না। যে ভূমিহীন দরিদ্র, চাষ করিতে জানে ও চাষ করিয়া জীবিকা উপার্জন করিবে এবং যাহার অন্য কোন জীবিকা নাই মাত্র তাহাকেই ঐ ভূমি দেওয়া হয়। ভূদানযজ্ঞে যিনি অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে চান তাঁহার নিকট হইতে নগদ অর্থ লওয়া হয় না। তাঁহার চাষের যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি খরিদ করিয়া দিতে হয়। সুতরাং ভূদানযজ্ঞের মূলগত উদ্দেশ্য—উৎপাদনের সাধন (উপায়) উৎপাদকের হাতে আনিয়া দেওয়া, অর্থের প্রতিষ্ঠার বিলোপ সাধন করা ও উৎপাদক-শ্রমের প্রতিষ্ঠা সৃজন করা। কিন্তু সম্পত্তিদানযজ্ঞে এরূপ কোন ক্রান্তিকারক উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। সম্পত্তিদানযজ্ঞে অর্থ দান লওয়া হয়—যদিও ঐ অর্থ দাতার হাতে থাকিয়া যায়। অর্থ উৎপাদনের সাধন নহে। উহা উপভোগ্য দ্রব্যাদি খরিদ করিবার মাধ্যম। উপরন্তু একজন বড় কারখানার মালিক যিনি শ্রমিকদিগকে শোষণ করিয়া অর্থ উপার্জন করেন, তিনি তাঁহার এক-ষষ্ঠাংশ আয় সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান করিলেন; কিন্তু তাঁহার শ্রমিক-শোষণ ও উক্ত কলকারখানা সমানভাবেই চলিতে থাকিল। এরূপ দান গ্রহণ করা হইলে বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষে পরোক্ষভাবে সম্মতিদানই করা হয়। এক নর্তকী, এক বেশ্যা, এক মাদকদ্রব্য বিক্রেতা—তাহাদের উপার্জনের এক-ষষ্ঠাংশ করিয়া দান করিল; কিন্তু তাহাদের উপার্জনের পথ তাহারা ত্যাগ করিল না। ইহাতেও তাহাদের উপার্জনের পন্থায় পরোক্ষভাবে সম্মতি দেওয়া হয়। এই অবস্থায় বিনোবাজীর এই নূতন আন্দোলনের অর্থ কি? শ্রীদাদা ধর্মাধিকারী তাঁহার সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কীয় এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং উহাতে তিনি উহার সদুত্তরও প্রদান করিয়াছেন। দাতাকে বিনোবাজীর নির্দেশ অনুসারে দানকৃত অর্থের বিনিয়োগ করিতে হইবে। ইহার মধ্যেই সম্পত্তিদানযজ্ঞের ক্রান্তিকারক গতি নিহিত রহিয়াছে। কারখানার মালিক যদি দাতা হন, তবে বিনোবাজী তাঁহাকে নির্দেশ দিতে পারেন যে, উক্ত অর্থের দ্বারা কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যোন্নতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ব্যবস্থা

করিতে হইবে। সংগে সংগে তাঁহাকে এই উপদেশও দিতে পারেন যে, তিনি যেন এমন ভাবে চলেন যাহাতে ক্রমে-ক্রমে ঐ কারখানা বিনোবাজীর হাতে সঁপিয়া দিতে পারেন। তিনি মহাজন-দাতাকে এই নির্দেশ দিতে পারেন যে দাতা যেন ঐ অর্থে চাষের বা অন্যরূপ উৎপাদনের সরঞ্জামাদি খরিদ করিয়া চাষী বা অন্য উৎপাদককে দান করেন। সেইসংগে বিনোবাজী দাতাকে ইহাও বলিতে পারেন 'আপনার এই উপার্জন পাপময়। এই উপার্জন ক্রমে-ক্রমে বন্ধ করিবার চেষ্টা করুন।' তিনি যে কোন অনুৎপাদক-দাতাকে ঐভাবে উৎপাদনের সহায়তায় নিয়োজিত করিয়া তাঁহার অনুৎপাদক ব্যবসায় বিসর্জন দিবার জন্য প্রেরণা দান করিতে পারেন।

অপরিগ্রহ ও অস্তেয়ের অনুসরণ ব্যতীত অর্থনৈতিকক্ষেত্রে অহিংস বিপ্লব অর্থাৎ অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। এজন্য সম্পত্তিদান-যজ্ঞের মূল বিচারধারা অপরিগ্রহ ও অস্তেয়ের ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"'অস্তেয়' ও 'অপরিগ্রহ' উভয়ে মিলিত হইলে অর্থ-শুচিত্ব পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব নহে। সত্য ও অহিংসা তো মূল, কিন্তু আর্থিকক্ষেত্রেও এই দুইয়ের আবির্ভাব কেবলমাত্র অস্তেয় ও অপরি-গ্রহের মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। আর আর্থিকক্ষেত্র জীবনের এক খুব বড় অংশ। এইজন্য ধর্মশাস্ত্র উহাকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। পরন্তু উহা নিয়মন ও নিয়োজন করিবার দায়িত্ব ধর্মবিচারের উপর আসিয়া পড়ে। এজন্য মনু বিশেষভাবে বলিয়াছেন—'যঃ অর্থশুচিঃ স শুচিঃ'। অর্থাৎ যাঁহার জীবনে আর্থিক শুচিতা সাধিত হইয়াছে তাঁহার জীবনে শুচি আসিয়াছে।

"অস্তেয় অর্থ-প্রাপ্তির পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং অপরিগ্রহ উহার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। অস্তেয় বলে যে, প্রধানত শরীর-শ্রমের দ্বারা অর্থাৎ উৎপাদক-শ্রমের দ্বারা শরীর নির্বাহ করা চাই। শরীর-শ্রম ব্যতীত যদি আমরা অন্ন গ্রহণ করি, তবে আমরা এক বিপদ সৃষ্টি করিয়া থাকি। শরীর-শ্রম করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনব্যক্তি কোনরূপ শরীর-শ্রম করিতে না পায়, তবে অন্যদিকে তাহার খুব কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। তবেই সেই বিপদ্ দূর হইবে। ঐ পরিশ্রম এরূপ শক্ত হইবে অর্থাৎ উহা

এতই তপস্যায় ভরা হইবে যে, উহার তুলনায় শরীর-শ্রম কম কষ্টসাধ্য হইত অর্থাৎ সাধারণ লোকের পক্ষে অস্তেয় পালন তখনই সম্ভব হইবে যখন যাহার শরীর-ক্ষুধা আছে সে শরীর-শ্রম করিবে। পৃথিবীতে আজিকার বহুতর বৈষম্য, বহুতর দুঃখ-কষ্ট ও বহুতর পাপের হেতু হইতেছে শরীর-শ্রম না করিবার অভিলাষ। শরীর-শ্রম হইতে বিরত থাকা যাহার সংকল্প সে ব্যক্তির গুপ্ত অথবা প্রকাশ্যভাবে চুরি করিতে হয়।

"শরীর-শ্রমের দ্বারা যে-উৎপাদন হইবে কেবলমাত্র তাহাই ব্যবহার করিবে—এই নিয়ম যদি আমরা মানিয়া চলি, তবে তদ্দ্বারা অপরিগ্রহ বহু-পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। কারণ শরীর-শ্রমের দ্বারা এত অধিক উৎপাদন হইতে পারে না, যাহার দ্বারা মানুষ বহু সংগ্রহ করিতে পারিবে। তথাপি ইহাতে অস্তেয় হইতে পৃথকভাবে অপরিগ্রহের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা থাকিয়া যায়। কারণ যদিও শরীর-শ্রমের দ্বারা উৎপাদন অত্যধিক হইতে পারে না, তথাপি উৎপাদন অধিক হওয়া সম্ভব। আর যদি সেই অধিক উৎপাদনের ব্যবহার অপরিগ্রহের দ্বারা করা না হয়, তবে বিপদ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় না। বাল্যকাল হইতে আমরা অনেকের উপকার গ্রহণ করিয়াছি। ঐ উপকারের ঋণ পরিশোধের জন্য শরীর-শ্রমের মান্য পন্থায় আমরা যাহা উপার্জন করিয়াছি, উহার অংশ সমাজকে প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। উহাতে সম্যক বিভাজনের উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। এজন্য যদিও উহা একরূপ ঋণমুক্তি তথাপি উহাতে দানের স্বরূপ রহিয়াছে।"

সম্পত্তিদানযজ্ঞে আয়ের (বা ব্যয়ের) এক-ষষ্ঠাংশ চাওয়া হয়। তাহা হইলে পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ যাহা থাকে তাহা মানিয়া লওয়া হয় না কি? উহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন যে, উহা মানিয়া লইবার প্রশ্নই আসে না। দাতা ছয়-ষষ্ঠাংশেরই সংগ্রহ মানিতেছিলেন। এক-ষষ্ঠাংশ চাহিয়া তাঁহার সেই সঞ্চয়-স্পৃহাকে ধাক্কা দেওয়া হইতেছে। বিচার বুঝিবার জন্য তাহাকে প্রেরণা দান করা হইতেছে। ভক্ত বলেন, যিনি একবার হরিনাম করিয়াছেন তিনি মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। যিনি এক-ষষ্ঠাংশ সমাজকে যাবজ্জীবন অর্পণ করিবার নিয়ম এক জীবন-নিষ্ঠাস্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি, নিজের সমগ্র জীবন, এমন কি

নিজের শরীরও সমাজকে অর্পণ করিবার পথে পদার্পণ করিয়াছেন। ইহাই ধর্মনীতি। ধর্ম আসক্ত মানুষকে আসক্তি ত্যাগ করিবার দীক্ষাদানের পর একটু-একটু করিয়া আসক্তি ত্যাগ করাইয়া মোক্ষের দিকে অগ্রসর করাইয়া দেয়। এইজন্য ভোগ ও মোক্ষের মধ্যে ধর্ম সেতুস্বরূপ কাজ করে। ধর্মনীতির এই বিচারধারা হৃদয়ঙ্গম করিলে এক-ষষ্ঠাংশ চাহিবার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে পারা যায়। ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"শরীর ও আত্মার মধ্যে, অথবা ব্যবহার ও তত্ত্ববিচারের মধ্যে, অথবা বর্তমান স্থিতি ও প্রাপ্তব্য স্থিতির মধ্যে ধর্ম সেতুস্বরূপ কাজ করিয়া থাকে। সেতু নদীর একপারে খাড়া করা যায় না। পরন্তু উহা নদীর দুই পারেই খাড়া করিতে হয়। ভোগ এপারের, মোক্ষ ওপারের, আর ধর্ম উভয় পারের। সমাজের বর্তমান অবস্থায় ধর্মকে আদর্শের অভিমুখে লইয়া যাওয়ার জন্য যে-বিচার প্রস্তুত করা হইবে তাহাও ধর্ম-বিচার হইবে। ঐ বিচার কেবল পরিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ গ্রহণ করিবে না, পরিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যও উহা বাহনস্বরূপ হইবে। পথ ও ঘরের মধ্যে যে পার্থক্য ও সম্বন্ধ, ধর্ম ও মোক্ষের মধ্যে সেই সম্বন্ধ।"

যিনি সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দিবেন তিনি সারা জীবন উহা দিয়া যাইবেন। সারা জীবন আয়ের এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-অষ্টমাংশ কিংবা তাহার কম হইলেও তাহা দিয়া যাওয়ার সংকল্প অনেকের কাছে কঠিন বলিয়া বোধ হয়। বিনোবাজী তাঁহাদিগকে বলেন—"কিন্তু তাঁহারা ভাবেন না যে, একবার বিবাহ করিলে সারা জীবনের জন্য তাঁহারা বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া যান"। এ সম্পর্কে তিনি পরে আরও যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই প্রেরণাদানকারী। তিনি বলিয়াছেন—"লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে—'আজীবন দান দিয়া যাওয়া সম্ভব কি?' আমি জিজ্ঞাসা করি, আজীবন ভোজন করিয়া যাওয়া সম্ভব হয় কেমন করিয়া? আপনি এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন যে, জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত ভোজন করিয়া যাইবেন। আজীবন ব্রত গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার। বেদ বলিয়াছেন—মরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাপূর্বক শ্বাস লইতে থাকিবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্রত কঠিন ব্রত। এই ব্রত গ্রহণ করার কথা এই উদ্দেশ্যে বেদ বলিয়াছেন যে, শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে রামনাম

করিতে হইবে। যেন বৃথা শ্বাস গ্রহণ করা না হয়। রামের কাজের জন্য প্রতিটি ক্ষণ নিয়োজিত করা আবশ্যক। ঐ প্রতিজ্ঞার এই অর্থ। আমাদের চক্ষু আজীবন দর্শন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের পদযুগল আজীবন চলিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ঐ ব্রত তাহাদের কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাহা নৈসর্গিক ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। ঐরূপে ত্যাগের ব্রতও নৈসর্গিক এবং স্বাভাবিক। ঘরে-ঘরে মা এই ব্রত প্রতিপালন করিতেছেন। মা সন্তানকে কতই না আদর করেন। কিন্তু আমরা তাঁহার ঐ ধর্মভাবকে ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া প্রসারিত করিতে চাহিতেছি। আমরা বলি,—'মা, তুই মূর্তিমতী ধর্ম, তুই মূর্তিমতী ত্যাগ। তুই এত ত্যাগ করিতেছিস্, আর একটু ত্যাগ কর্। যাহার খাওয়ার কিছু নাই তাহার জন্য তুই কিছু ত্যাগ কর্।' ত্যাগের ব্রত কঠিন নহে। ত্যাগের দ্বারা ভোগ অধিকতর রুচিকর হইয়া থাকে।"

সম্পত্তিদান কে করিবে? সর্বাপেক্ষা অর্থশালী ব্যক্তি দান করিবেন, আবার অন্যদিকে দরিদ্রতম ব্যক্তিও দান দিবেন। এই ত্যাগ-ধর্ম পালন করিবার সুযোগ সকলেরই রহিয়াছে। বালক-বালিকারাও এইযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতেই ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হইতে পারে।

সম্পত্তিদানযজ্ঞের মধ্যে এক গভীর জীবন-বিচার নিহিত রহিয়াছে। উহা গার্হস্থ্য-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়। যিনি সম্পত্তি-দান দিবেন তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের সকলের অন্তরে পরম আনন্দের সঞ্চার হওয়া চাই। এই কারণে প্রথম পর্যায়ে সম্পত্তিদানযজ্ঞকে ব্যক্তিগত-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, যাহাতে উহা জীবনের গভীরদেশে প্রবেশ করিয়া ধীরে-ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে। এইজন্য উহাকে প্রথমে সার্বজনিক আন্দোলনস্বরূপ ব্যাপক রূপ দেওয়া হয় নাই। বিহারে ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলন যখন আশাতীত অগ্রগতি লাভ করিল তখন গত ১৯৫৩ সালের শরৎকালে বিনোবাজী সম্পত্তিদানযজ্ঞের সার্বজনিক আকার দান করিয়া সর্ব-সাধারণকে সম্পত্তিদানযজ্ঞে দান দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। বুদ্ধগয়া সম্মেলনের সময় হইতে দেশের সর্বত্র উহা ব্যাপকভাবে চালাইবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করা হইল।

সম্পত্তিদানযজ্ঞের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়া বিনোবাজী লিখিয়াছেন—"আমি বিশ্বাস করি, যদি ভক্তজন বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা লইয়া এইযজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন, তবে এই কল্পনায় যে-নূতন জীবন-বিচার উন্মুক্ত হইতেছে উহা দেশের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে এবং সাম্যযোগের অভিমুখে সমাজ সহজেই অগ্রসর হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমি সজ্জন ও সাধু ব্যক্তিগণের সুবিবেচনার জন্য এই বিচারধারাকে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি।"

যাঁহাদের নিকট ভূমিদান ও সম্পত্তিদান চাওয়া হয় তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বিনোবাজী ঋগ্বেদের এক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলেন—

"অদিৎসন্তং চিৎ আঘৃণে।
পূষন্ দানায় চোদয়।
পণেশ্ চিৎ বি ম্রদা মনঃ।"

"অন্তর হইতে মানসিক তাপ, বাহির হইতে পরিস্থিতির তাপ—এই উভয়বিধ দহন-দানে শুদ্ধিদানকারী হে দেব! যিনি আজ দান দিতে চাহিতেছেন না, তাঁহার মনকে দান দিবার জন্য প্রেরিত কর। কৃপণের মনকেও মৃদু করিয়া দাও।"

॥ ৬১ ॥ ব্যবসায়ীদের কাছে বিনোবাজীর প্রত্যাশা

আমাদের দেশের সংস্কৃতির আদর্শ হইতেছে ত্যাগ। বিনোবাজী বলেন,—"এই আদর্শ সিদ্ধ করিবার দায়িত্ব যদি জগতে কাহারও বিশেষভাবে থাকে তবে তাহা হইতেছে বৈশ্যের। ব্রাহ্মণের কাজ হইতেছে প্রেরণা দেওয়া। মহান আচার্যগণ সেই কাজ করিয়া আসিয়াছেন। আর তাহাকে সাকার রূপ দান করা, ব্যবহারিক দিক হইতে তাহাকে মূর্তিমান করিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজ হইতেছে ব্যবসায়ীদের। এজন্য আমি ব্যবসায়ীদের নিকট যাইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিব না—আপনার কত সম্পত্তি দান দিবেন? আমি তাঁহাদের নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বড় জিনিস প্রত্যাশা করিয়া থাকি।

আমি চাহি যে আমার ভূদানের কাজ পূর্ণ করিবার দায়িত্ব ব্যবসায়িগণ গ্রহণ করুন। তাহাতে ব্যবসায়িগণের প্রতিষ্ঠা হইবে।"

বিনোবাজী ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে এতদূর পর্যন্ত প্রত্যাশা করেন কেন তাহা ভালভাবে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। ব্যবসায় না হইলে কোথাও কাহারও চলে না। এইজন্য সব দেশেই ব্যবসায়ের স্থান রহিয়াছে। অন্যসব দেশে ব্যবসায়ের স্থান হইতেছে ব্যবহারিক স্থান মাত্র। কিন্তু ভারতে ব্যবসায়কে কেবলমাত্র ব্যবহারিক স্থান দেওয়া হয় নাই। উপরন্তু উহাকে আধ্যাত্মিক স্থানও দেওয়া হইয়াছে। ভারতের এক বড় বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে ব্যবসায়কেও ধর্ম বলা হইয়াছে। যেমন নিষ্কামতা ও অনন্য প্রীতির সহিত বেদাধ্যয়ন করিলে মোক্ষ লাভ হয়, সেইরূপ যদি সততা, নিষ্কামতা ও সেবাবুদ্ধি সহকারে ব্যবসায় করা হয় তবে তাহার দ্বারাও মোক্ষলাভ হইবে। নিষ্কাম ও কর্তব্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ যে মোক্ষ পাইবেন, নিষ্কাম ও কর্তব্যপরায়ণ বৈশ্যও সেই মোক্ষ লাভ করিবেন। ইহাতে সমাজ-সেবার বিভিন্ন বিভিন্ন কাজের সমান প্রতিষ্ঠাই দেওয়া হইয়াছে। ইহা এক অদ্ভুত যোজনা। কর্তব্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ হউক, ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক আর শূদ্র হউক, যিনিই হউন না কেন, যদি তিনি নিষ্কাম হইয়া সেবা করেন তবে তিনি সমান মোক্ষ-লাভ করিবেন। এইরূপে ভারতে বৈশ্য বা ব্যবসায়ীকে এক সাধক ও ভক্ত শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ভারতে ব্যবসায়িগণকে প্রথম হইতেই এরূপ এক মহান দায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরিণামও ভাল হইয়াছে।

ভারতে যে আধ্যাত্মিক বিচার চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে কারুণ্যের আধিক্য দেখা যায়। অন্য প্রাণীদের প্রতি মানব-সমাজের প্রীতি থাকা চাই। মানবের ধর্ম হইতেছে করুণা প্রণোদিত হইয়া অন্যান্য প্রাণীকে রক্ষা করা। এই দৃষ্টি হইতে ভারতে অসংখ্য লোক স্বেচ্ছায় বিচারপূর্বক মাংসাহার পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে আজকাল কিছু লোক ব্যক্তিগতভাবে অথবা সংঘবদ্ধভাবে মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতে যেরূপ এক এক সমাজের বা শ্রেণীর সমস্ত লোক মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছেন এরূপ জগতে আর কোথাও হয় নাই। ভারতে কারুণ্য প্রেরিত হইয়া যে কোটী

কোটী লোক মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছে তন্মধ্যে বৈশ্য বা ব্যবসায়ীর সংখ্যাই সর্বাধিক। এই অহিংসা বা করুণার বিচার বিশেষত জৈনধর্মে প্রসার লাভ করে ও ভক্তিমার্গেও তাহা গ্রহণ করা হয়। ব্যাপারী শ্রেণীর উপর উহার খুব প্রভাব পড়ে। ইহা ছোটখাট ব্যাপার নহে। এক দেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর অধিকাংশ লোক দয়াভাবের দ্বারা প্রেরিত হইয়া মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছেন—ইহা এক মহান প্রয়োগ। আমাদের শাস্ত্রকারগণ ব্যবসায়ীদের উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার সুফল এইরূপই হইয়াছে। অবশ্য একথা ঠিক যে তাঁহাদের ব্যবসাসম্বন্ধীয় আচরণে বহু নিষ্ঠুরতা দেখা যায়। আমাদের সমাজ রচনা, বিশেষত সমাজের আর্থিক রচনা এতই ত্রুটিপূর্ণ যে মানুষকে স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক নিষ্ঠুর হইয়া পড়িতে হয়। তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতের ব্যবসায়িগণের মধ্যে দয়াভাবের আধিক্যই রহিয়াছে। এখন এই বিরাট সমাজের দয়াভাবকে কিরূপে দেশের কল্যাণের কাজে লাগানো যায় তাহাই চিন্তা করিতে হইবে। ব্যবসায়িগণের বিশেষ গুণ হইতেছে সংগঠনশক্তি ও ব্যবস্থাশক্তি। এই গুণ সব দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যেই আছে। কিন্তু এই দেশের ব্যবসায়ীবর্গের একটি বিশিষ্ট গুণ আছে। তাহা হইতেছে সরল ও সাদাসিধা জীবনযাত্রা। অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরা যেরূপ আরাম বিলাসে ও জাঁকজমকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন এদেশের ব্যবসায়ীশ্রেণী সেরূপ করেন না। ইহা ভারতের ব্যবসায়ীশ্রেণীর এক মহৎ ও বিশিষ্ট গুণ।

এরূপে আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের অন্তরে করুণা রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রচুর সংগঠনশক্তিও আছে। উপরন্তু তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীও সাদা-সিধা, সরল। বিনোবাজী বলেন যে যাঁহাদের মধ্যে এই তিন গুণের সমাবেশ হইয়াছে তাঁহাদের দ্বারা করুণার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না কেন। যদি তাঁহারা তাঁহাদের সংগঠনশক্তি, সম্পত্তি ও বুদ্ধির প্রয়োগ সেবার্থে করিতে থাকেন এবং যদি তাঁহারা তাঁহাদের করুণাবৃত্তির প্রয়োগ সেবার্থে করেন তবে তাঁহারা সহজেই করুণার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য রক্ষী রাখিতে হয়। উপরন্তু তাঁহাদের কাজ-

কারবার যাহাতে নিরাপদে চলিতে পারে এজন্য তাঁহারাই মিলিটারীর (সৈন্য-দলের) প্রয়োজন অধিক অনুভব করেন। কিন্তু যদি তাঁহাদের করুণা, শক্তি, বুদ্ধি ও সম্পত্তি সমাজ-সেবায় প্রযুক্ত হইতে থাকে তবে তাঁহাদের রক্ষীর প্রয়োজন হইবে না আর মিলিটারীরও প্রয়োজন হইবে না। তখন তাঁহারা অনুভব করিবেন যে ব্যক্তির স্বার্থ ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে কোন হিত-বিরোধ নাই। এজন্য শিল্পের ক্ষেত্রে পাবলিক সেক্টরের (সরকারী বিভাগ) বৃদ্ধিতে ও প্রাইভেট সেক্টরের হ্রাসে তাঁহাদের স্বার্থহানি হইল বলিয়া তাঁহারা বোধ করিবেন না।

এইজন্য বিনোবাজী অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে আমাদের দেশের ব্যবসায়িগণ তাঁহার বাকী কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। এইজন্য তিনি ব্যবসায়ীদিগের উদ্দেশ্যে বলেন,—"বলদের দ্বারা যে কাজ হইবার কথা ঘোড়ার দ্বারা তাহা হওয়া সম্ভব নহে। যদি কৃষিক্ষেত্রে কাজ করিতে হয় তবে বলদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি সবেগে দৌড়াইতে হয় তবে ঘোড়া চাই। আমি ঘোড়া ও আপনারা বলদ। আমি অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়ার মত ঘুরিব। আমি ভ্রমণ করিতে থাকিব এবং বিভিন্ন স্থানে গিয়া বিচার প্রচার করিব। কিন্তু যে জমি পাওয়া যাইবে তাহার উন্নয়ন করিবার কাজ ও ব্যবহারে আনাইবার কাজ ব্যবসায়ীদিগের।" বিনোবাজী আরও বলেন যে ভারতের ব্যবসায়ীদিগের সম্মুখে এক মহান সুযোগ আসিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন। ভূদানযজ্ঞের মাধ্যমে মালিকানা ঘুচাইবার মহাযজ্ঞ চলিতেছে। এই অবস্থায় করুণাপ্রেরিত, বৈশ্যবৃত্তিসম্পন্ন সকলের পক্ষে করুণার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ আসিয়াছে। এইজন্য তিনি নিতান্ত বিশ্বাস লইয়া ভারতের ব্যবসায়িগণকে আহ্বান জানাইয়াছেন। তাঁহার উদাত্ত আবাহন এই:—

"হে ব্যবসায়িগণ, আপনারা চলিয়া আসুন! আপনাদের ধর্ম-নিষ্ঠা আছে। শাস্ত্রকারগণ আপনাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। আপনাদের যে যে গুণ রহিয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া আপনারা দেশ ও জগতকে বাঁচান। আপনারা জনগণের সেবক হউন। আপনারা সেবকরূপে জন-গণের কাছে যান এবং সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করুন।"

॥ ৬২ ॥ শ্রমদানযজ্ঞ

সম্পত্তিদানযজ্ঞের পর বিনোবাজী শ্রমদানযজ্ঞ প্রবর্তন করেন। সম্পত্তি-দানের ন্যায় শ্রমদানের বিচারধারায়ও গভীর অর্থ নিহিত আছে। যাহার জমি নাই, অর্থও নাই, তাহার কি দিবার মত কিছুই নাই? তাহার কি কোন সম্পত্তিই নাই? সে কি এতই নিঃস্ব, এতই কাঙ্গাল? ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন যে, ভূমিবান বা অর্থশালী লোকের দান দিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু যাহার জমি নাই বা অর্থ নাই, অথচ যাহার শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্য আছে তাহার দানের শক্তি অপরিসীম। জমি বা অর্থের সমস্তই একেবারে দান করিয়া দেওয়া যায়। তাহার পর দেওয়ার মত তাহার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যাহার ভগবান প্রদত্ত সুস্থ ও সবল দেহ আছে তাহার দানশক্তি কখনও নিঃশেষ হয় না। সমগ্র জীবন প্রতিদিন সে দান করিতে পারে। বিনোবাজী বলেন—"তাহার মত আর কে দান করিতে পারে? ভূদানযজ্ঞে ভূমিদান পাওয়া গেল। কিন্তু ভূমিতে পরিশ্রম না করিলে তাহা আবাদযোগ্য হইবে না। গ্রামের চরিত্রবান ও সম্মানিত ব্যক্তিরা একযোগে শোভাযাত্রা করিয়া ঐ জমিতে মাটি খুঁড়িতে গেলেন। শুধু তাহা নহে। ভূমি বিতরণ করা হইল। যাহাকে ভূমি দেওয়া হইল সেই ব্যক্তি কোন আকস্মিক কারণে ভূমি ভালভাবে আবাদ করিতে পারিতেছে না। গ্রামের চরিত্রবান ও সেবাপরায়ণ প্রভাবশালী ব্যক্তিরা একযোগে ঐ জমিতে আবাদের কাজে সাহায্য করিতে গেলেন। ইহার ফলে সমস্ত গ্রামে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে যে, গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রমদানের কাজে যোগদান করিতে গৌরব বোধ করিবেন। লোকে বুঝিতে পারিবে যে, ইহা কেবল রামের জমি লইয়া শ্যামকে দেওয়া নহে। কেন-যে জমি দেওয়া হইতেছে সে-সম্পর্কে গ্রামবাসীরা চিন্তন ও মনন করিতে থাকিবে। এরূপে শ্রমের লুপ্ত মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ সুগম হইবে।" এই কারণে বিনোবাজী দুর্বল ও অসুস্থ শরীরে ১০।১২ মাইল পদযাত্রা করিয়া আসিয়া ক্লান্তি ভুলিয়া গিয়া কিছুদিন প্রত্যহ একঘন্টা কোদালী চালাইতেন ও ঐরূপে শ্রমদানযজ্ঞ করিয়া সমাজে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দান করিতেন।

॥ ৬৩ ॥ প্রেম ও বুদ্ধিদানযজ্ঞ

মনুষ্যের পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে। সেরূপ মানুষ পঞ্চবিধ ধনেরও অধিকারী। যথা—হৃদয়, মস্তিষ্ক, দেহ, স্থাবর-সম্পত্তি ও অস্থাবর-সম্পত্তি অর্থাৎ প্রেম, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা, শারীরিক শ্রম, ভূমি ও অর্থ। তবে একই ব্যক্তি সকল রকম ধনের অধিকারী না হইতে পারেন। কিন্তু এমন ব্যক্তি নাই যাঁহার এই পঞ্চবিধ ধনের মধ্যে কোন এক প্রকারেরও ধন নাই। নিঃস্ব ও সর্বপ্রকারে অক্ষম হইলেও মানুষের হৃদয় থাকিবে এবং হৃদয়ে প্রেম থাকিবে। এজন্য বিনোবাজী পঞ্চবিধ ধনের জন্য পঞ্চপ্রকার যজ্ঞ প্রবর্তন করিয়াছেন। ভূদান, সম্পত্তিদান ও শ্রমদানযজ্ঞের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রেমদান ও বুদ্ধিদানযজ্ঞের বিষয় এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। যাঁহার আর কিছুই নাই তিনি নিজের প্রতিবেশীকে অন্তর হইতে নিজের মত করিয়া দেখিবেন ও তাহার প্রতি প্রেমভাব পোষণ করিবেন। তাঁহার সাধনা হইবে নিজের আত্মজ্ঞানের বিকাশ সাধন করা। উহা প্রেমদানযজ্ঞ। যাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আছে, তাঁহারা প্রত্যহ কিছু সময় তাঁহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি নিঃস্বার্থ সেবায় নিয়োজিত করিয়া বুদ্ধিদানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। বিচারক আপোষে বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবেন। আইনজীবী কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া অত্যাচারিত দরিদ্রের পক্ষাবলম্বন করিবেন। চিকিৎসক দরিদ্রকে বিনা খরচে চিকিৎসা করিবেন। শিক্ষক ও ছাত্র অবসর সময়ে দরিদ্রকে শিক্ষাদান করিবেন। হিসাবনবীশ বিনা বেতনে কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে হিসাব সংক্রান্ত কাজ করিয়া দিবেন।

॥ ৬৪ ॥ জীবনদান

সেবকের জন্য আরও একটি মহত্তম যজ্ঞের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা হইতেছে—জীবনদান।

বিপ্লবের এক লক্ষণ এই যে, উহা এক বিষয় লইয়া আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু অচিরে উহা জীবনের অন্যান্যক্ষেত্রেও প্রসারিত হয় এবং অবশেষে সর্বগ্রাসী হইয়া উঠে। জীবনের একক্ষেত্রে আরম্ভ হইয়া উহা তথায় নিবন্ধ

থাকিলে তাহা বিপ্লব নহে। আচার্য কৃপালনী বুদ্ধগয়া সর্বোদয় সম্মেলনে ভূদানযজ্ঞের বৈপ্লবিক প্রকৃতির কথা আলোচনা করিতে গিয়া বিপ্লবের এই লক্ষণের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, বুদ্ধদেব নির্বাণের একপথ আবিষ্কার করিলেন। যদিও উহা ধর্মের ব্যাপার ছিল, তথাপি উহার স্বরূপ ছিল বৈপ্লবিক। এইজন্য উহা জীবনের অন্যান্য-ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইল। নূতন রাজ্য সৃষ্টি হইল, নূতন সমাজ-ব্যবস্থা রচিত হইল, নূতন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিকক্ষেত্রে তাঁহার কাজ শুরু করিলেন। দেশকে বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি ক্রমশ উহার ভিত্তিতে দেশকে সার্বজনিক মুক্তির পথ দেখাইলেন। সেরূপ ভূমি-সমস্যার সমাধানকল্পে ভূদানযজ্ঞ আরম্ভ হয়। এখন উহার ভিত্তিতে সমাজের কায়া পাল্টাইবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সর্বোদয়ের সমস্ত দিকই উহার রঙে রাঙিয়া উঠিতে লাগিল। ভূমির মালিকানা ব্যক্তিগত হইতে পারে না। ভূদানযজ্ঞের বিচারধারার ভিত্তিভূমি আধ্যাত্মিকতা—আত্মার একত্ব। জগতে যাহা কিছু সবই ভগবানের। ভূমির মালিক আমরা নহি, ভগবান। তেমনি আমাদের বুদ্ধির মালিকও আমরা নহি। আমাদের সম্পত্তি, ধন, অর্থের মালিকও আমরা নহি। আমাদের শরীরের মালিকও আমরা নহি। আমাদের ভূমি, ধন-সম্পত্তি, বুদ্ধি, শরীর যাহা কিছু সবই সমাজসেবার জন্য অর্পণ করা চাই। এজন্য ভূদানযজ্ঞের বৈপ্লবিক তড়িৎপ্রবাহ, ভূদানযজ্ঞের মৌলিক বিচারধারা সমাজ জীবনের সর্ব-দিকে সঞ্চারিত হইয়াছে। এই পরম অভীষ্ট সাধন প্রসারিত হইল সম্পত্তি-দানে, শ্রমদানে, বুদ্ধিদানে ও প্রেমদানে। এখানেই উহা সীমাবদ্ধ থাকিল না। আমাদের জীবনও কি আমাদের? আমাদের জীবন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থেই যাপিত হইবে? জীবনও আমাদের নহে—ভগবানের। উহা ভগবানের দান। তাঁহার কাজে, সমাজসেবার কাজে উহাকে উৎসর্গ করা চাই। এরূপে যজ্ঞ সর্ব-গ্রাসী হইল। জীবনদানে উহার পরিণতি না হইয়া থাকিল না। বুদ্ধগয়া সর্বোদয়-সম্মেলনের এক মহান অবদান—জীবনদান। কিন্তু বিনোবাজী এই জীবনদানের আভাস উহার কয়েকমাস পূর্বে তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"আজ নূতন মানুষ, নূতন সমাজ

তৈয়ারী করিতে হইবে। এইজন্য ভূদান, সম্পত্তিদান, শ্রমদান প্রভৃতি আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে। এই কাজের জন্য এমন বিচারধারা সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে লোকে জীবন সমর্পণ করিতে অগ্রসর হয়।"

সর্বাঙ্গীন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে, দেশের আবহাওয়ায় বৈপ্লবিক তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু এই পরম অভীষ্ট সাধন করিবার মত উৎসগীকৃত-প্রাণ, পর্যাপ্ত সংখ্যক সাধক কোথায়? বুদ্ধগয়া সর্বোদয়-সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বক্তৃতা করিতেছিলেন। আন্দোলনে তীব্রতা আনাইবার প্রেরণা দিবার জন্য তিনি বলিলেন যে, বর্তমান যুগ এই আন্দোলনের জন্য অধিক সময় দিবে না। অহিংস-ক্রান্তি হইবে বলিয়া ইতিহাস দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিবে না। জয়প্রকাশজী পূর্বে বৎসর ছাত্রগণকে এই আন্দোলনে এক বৎসর সময় দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বলিলেন যে বৎসরের কথা বলিলে এখন আর কাজ চলিবে না। এখন তো জীবন অর্পণ করিবার সময় আসিতেছে। অতঃপর তিনি তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে আপনার জীবনদান ঘোষণা করিলেন। সমগ্র সম্মেলন-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব গাম্ভীর্য পরিব্যাপ্ত হইল। বিনোবাজীর হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ধীর, স্থির, গম্ভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমরা এইমাত্র এক ভাষণ শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় কথা বলিতেছিল। ইহাতে আমার রুক্মিণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল। রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। আজকাল পত্র-সাহিত্যকে সাহিত্যের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয়। রুক্মিণীর পত্র পত্র-সাহিত্যে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া আছে। ঐ পত্রকে শুকযোগী কবিতাবদ্ধ করিয়াছিলেন। পত্রে রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লিখিয়াছিলেন—'আমার শতবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় করিব, প্রাণ পরিত্যাগ করিব, শরীর কৃশ হইতে কৃশতর করিয়া জীবনধারণ করিব, কিন্তু তথাপি তোমাকেই বরণ করিব।'* এইরূপ শুভ

*রুক্মিণী দেবীর পত্রের অংশ ঃ

* * * যস্যাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো,
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোহপহত্যৈ।

সংকল্পের কথা শুনিলে হৃদয়ে আনন্দ আসে। আমি মনে করি যে, এই যজ্ঞ সফল হইতে হইতে আমাদের জীবনকেও সফল করিবে।" এইখানেই ইহার শেষ হইল না—হইবারও কথা নহে। তখন হইতে বুদ্ধগয়া সম্মেলন-ক্ষেত্রের হাওয়া বদলাইয়া গেল। সকলের হৃদয় শীতল হইয়া গেল। পরদিন ভোরে বিনোবাজী চিন্তা করিলেন যে, ঐবিষয়ে তাঁহার কিছু করা চাই। সুতরাং তিনি প্রত্যুষেই জয়প্রকাশ নারায়ণজীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেনঃ "ভূদানযজ্ঞমূলক, গ্রামোদ্যোগ-প্রধান, অহিংসক ক্রান্তির জন্য আমার জীবন সমর্পণ।" সম্মেলনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনের প্রারম্ভেই বিনোবাজীর উক্ত পত্র পঠিত হইল। অতঃপর নেতৃবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের সাধারণ কর্মী পর্যন্ত অনেকে তাঁহাদের জীবনদানের সংকল্প লিখিত-ভাবে ঘোষণা করিলেন। সেইখানেই জীবনদানকারীর সংখ্যা সাড়ে তিন-শতেরও উপর উঠিল।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই জীবনদানের অর্থ কি?—কায়, বাক্য, মন ও বুদ্ধি সবই এই মহান কার্যের জন্যই উৎসর্গ করা। ইহা ঠিক। কিন্তু শুধু কি এই? জীবনদানকারীদের মধ্যে এমন কেহ-কেহ ছিলেন, যাঁহারা পূর্বেই তাঁহাদের জীবনদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুনরায় জীবন-দানের তাৎপর্য কি? বিনোবাজী সম্মেলনের উপসংহারে তাহা পরিষ্কার-ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন। জীবনদানের তাৎপর্য কি তাহার আভাস কৃপালনীজী পূর্বদিনের প্রার্থনা-সভায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দিয়াছিলেন। বিনোবাজী সেই কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"উহার মধ্যে

যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

—উমাপতি ভগবান শংকরের ন্যায় মহাপুরুষগণও আত্মশুদ্ধিলাভের জন্য আপনার চরণকমলের ধূলিতে স্নান করিতে চাহেন। যদি আমি আপনার ঐ প্রসাদ, আপনার ঐ চরণধূলি লাভ করিতে না পারি, তবে ব্রতের দ্বারা শরীরকে শুষ্ক করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি উহার জন্য শত-শতবার জন্ম লইতে হয়, তবে তাহাই লইব। কখনও-না-কখন আপনার ঐ প্রসাদ নিশ্চয় লাভ করিব।—শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, ৫২-তম অধ্যায়।

গভীর জিনিস রহিয়াছে। যাহার আভাস কৃপালনীজী গতকল্য প্রার্থনা-সভায় দিয়াছেন। তিনি এক বিশিষ্ট প্রকৃতির মানুষ এবং তাঁহার বলিবার ভঙ্গিও বিশিষ্ট। তিনি উপনিষদের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু সহজে বুঝা যায় না তিনি কি বলিলেন। লোকের মনে হয় যে তিনি উপহাস বা বিদ্রূপ করিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে এবং আমি বলিব যে, অহিংসভাবে বুঝাইয়াছেন—ভাইসব, জীবন তো দান করিতেছেন। কিন্তু কোন ময়লা জিনিস দান করিতেছেন না তো? এই খেয়াল যেন থাকে। শুদ্ধ বস্তু অর্পণ করিতে হয়। জীবনদানের বিচার ভাল। কিন্তু যিনি অন্তরে জীবনদানের সংকল্প করিবেন, তাঁহার এই দৃষ্টি থাকা চাই যেন আবর্জনা দান করা না হয়। জীবনদানের সংকল্পের অর্থ জীবনের শুদ্ধি সম্পাদন—এইকথা তিনি অত্যন্ত রুচিকরভাবে আমাদের সামনে রাখিয়াছেন। উহা কোনরূপ ঠাট্টা-তামাশা নহে। আজ যে আপনারা আমার সম্মুখে এবং আপনাদের নিজেদের সম্মুখে একে অন্যকে সাক্ষী রাখিয়া জীবন অর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার সংগে-সংগে জীবনশুদ্ধির সাধনা করা চাই। আমরা সার্বজনিক কাজ করিয়াছি। এখন ভূদানযজ্ঞের ন্যায় বুনিয়াদী কাজের জন্য (যাহার দ্বারা দেশের কায়া বদলাইবে) যদি জীবনদান করা হয় তবে এযাবৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য যতটা প্রয়াস করা হইত তদপেক্ষা অধিক প্রয়াস করিতে হইবে।"

ইহার কয়েক মাস পরে বিহারে জীবনদানী-শিবির উদ্ঘাটন করিবার সময় বিনোবাজী জীবনদান যে আরও গভীর অর্থপূর্ণ এবং সেজন্য জীবন-দাতাকে যে উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া বলেন। আমরা কে? সারা জাগতিক ব্যাপার কে পরিচালনা করিতেছেন? জাগতিক ব্যাপারের যোজনা কাহার এবং উহা কি? এই যোজনায় কি মনুষ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরই সমস্ত জাগতিক ব্যাপার পরিচালনা করিতেছেন। সবই তাঁহার যোজনা। আমরা কিছুই নহি। মনুষ্য তুচ্ছ। ঈশ্বর যদি তাঁহার কাজের জন্য কাহাকেও যন্ত্রস্বরূপ বাছিয়া লন তবেই তাহার কিছু মূল্য হয়। কেবলমাত্র তখনই মনুষ্য তাঁহার যোজনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। নচেৎ মনুষ্য তুচ্ছ থাকিয়া যায়। কি

করিলে বা কিরূপ হইলে মনুষ্য ভগবানের হাতের যন্ত্র হইবার যোগ্য হয়? বীজ নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলে তবেই বৃক্ষ জন্ম গ্রহণ করে। বীজের অস্তিত্ব থাকিতে বৃক্ষ জন্মিতে পারে না। তদ্রূপ মনুষ্য আপনার 'আমিত্বের' বিনাশসাধন করিয়া নবজীবন লাভ না করিলে ঈশ্বরের যোজনায় অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্য হয় না এবং ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করেন না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন—"যদি ঈশ্বরের যোজনায় যোগদান করিতে হয়, তবে বীজের মত আপনাকে নিঃশেষ করিতে হইবে, আপনাকে বিলুপ্ত করিতে হইবে। বীজ বিলুপ্ত হইলে তবে বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এইজন্য বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত এই যে, একটি বিনাশ হইতে একটি অস্তিত্বের জন্ম হয়। যদি আমরা নিজেদের রূপ বজায় রাখি, তবে আমরা ঈশ্বরের কাজের যোগ্য হইব না। কিন্তু লোককে প্রায়ই খালি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার অহম্-এর চারিদিকে কল্পনাজাল, কর্তব্যক্ষেত্র এবং মমত্ব ঘিরিয়া থাকে। যদি কেহ উহাদিগকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ঈশ্বরের যোজনায় যোগদান করিতে চায় তবে ঈশ্বর বলেন, 'তুই আমার জন্য জায়গা খালি করিয়া রাখিস্ নাই। যদি তুই খালি হইয়া যাস্, তবেই আমার জন্য স্থান হইবে!' এই হইল জীবনদাতার স্বরূপ। যিনি খালি হইয়াছেন, যিনি নিজেকে শূন্য করিয়া ফেলিয়াছেন, যিনি নিজের জায়গা ছাড়িয়া দিয়াছেন, কেবলমাত্র তিনিই জীবনদাতা হইতে পারেন। যিনি শূন্য হন নাই, তাহাতে তাঁহার নিজেরই চলিতে পারে, ঈশ্বরের চলিবে না। তুলসীদাসজী বলেন—'বাবা, অপনে করত মেরী ঘনী ঘটী ভঈ, আমি নিজে করায় আমার ইজ্জত নষ্ট হইয়াছে। এইজন্য এখন হইতে আপনিই করিবেন, আমি করিব না। আমাকে দিয়া করাইয়া লইবেন, আমি শূন্য হইয়াছি।' যখন মন এই অবস্থায় উপনীত হয় তখনই মনুষ্য জীবনদাতা হয়। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলিলেন—'যথেচ্ছসি তথা কুরু' অর্থাৎ তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় সেরূপ কর। এই কথা বলিয়া ভগবান পরীক্ষা করিতে চাহিলেন যে, অর্জুনের ইচ্ছা বলিয়া কিছু অবশিষ্ট আছে কি না। যদি অর্জুন বলিতেন 'আমার এই ইচ্ছা', তবে ভগবান বলিতেন —'তুমি অযোগ্য, তুমি আমার যোগ্য নহ'। অর্জুন বলিলেন—'আমার আবার ইচ্ছা কি? নষ্টো মোহঃ—আমার মোহ দূরীভূত হইয়াছে। এইজন্য

করিষ্যে বচনং তব—অর্থাৎ তোমারই আজ্ঞা পালন করিব।' গীতা-প্রবচনের শেষের দিকে দাদুর এক বচন উল্লেখ করা হইয়াছে। ছাগ 'ম্যায়, ম্যায়' (আমি, আমি) করিয়া ডাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর যখন ছাগদেহের অংশ বিশেষ হইতে তাঁত তৈয়ারী করিয়া পিঞ্জনে লাগানো হয়, তখন তাহা হইতে 'তু-হী, তু-হী' (তুই, তুই) শব্দ নির্গত হয়। অহংকারের অন্ত হইবার পর 'তু, তু,' (তুই, তুই) শুরু হয়। তখনই ভগবান ঐব্যক্তির দ্বারা তাঁহার কাজ করাইয়া লন।"

এই জগৎ এক রঙ্গমঞ্চ। এখানে এক নাটকের অভিনয় চলিতেছে। প্রত্যেক মানুষ এক-একজন অভিনেতা। অভিনয় করিবার সময় যদি অভিনেতার মনে থাকে যে, সে প্রকৃতপক্ষে অমুক লোক, তবে তাহার অভিনয় সফল হয় না। সেরূপ ভগবানের কাজ করিবার সময় যদি আমরা আমাদের আমিত্বকে স্মরণ রাখি, তবে ভগবানের কাজ আমরা করিতে পারিব না। বিনোবাজী বলেন—"বিনোবা যদি কাল হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা অভিনয় করে তবে সেসময় তাহার ইহা স্মরণ করা উচিত হইবে না যে, সে বিনোবা।"

মানুষ নিঃশেষে তাহার অহংকার বিসর্জন দিলে তবেই জীবনদাতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার চরম প্রমাণ জীবন থাকিতে হইতে পারে না। মৃত্যুর পর ইহা নির্ণীত হইবে—কে সত্যই তাহার জীবন সমর্পণ করিয়াছিল, আর কে করে নাই। এজন্য 'অমুক জীবনদাতা'—একথা বলা যাইতে পারে না। 'অমুক জীবনদাতা হইবে'—একথা একমাত্র অন্তর্যামী বলিতে পারেন। কেবলমাত্র মৃত্যুর পর বলা যাইতে পারে যে, অমুক জীবন-দাতা ছিল। এই বিচার বুঝাইয়া বিনোবাজী বলেন—"যিনি বলিবেন 'আমি জীবনদাতা', 'ম্যাঁয় জীবনদানী হুঁ' তাঁহার 'হুঁ' খতম হইবে এবং 'ম্যাঁয়' 'আমি' থাকিয়া যাইবে। এইজন্যই ইহা বলা ঠিক নহে যে, আমি জীবনদাতা। সুতরাং জীবনদাতাগণের সভা একমাত্র স্বর্গে হইতে পারে। পৃথিবীতে আমাদের ন্যায় সামান্য মনুষ্যদেরই সভা হইবে। জীবনদাতাদের সম্মেলন হইবে স্বর্গে। মৃত্যুর পরে, পূর্বে নহে।"

মনুষ্যের পূর্বেকার চরিত্র দেখিয়া বলা যাইতে পারে না যে, তিনি জীবনদানের সংকল্প গ্রহণ করিয়া জীবনদাতার যোগ্য-অবস্থা লাভ করিতে

সক্ষম হইবেন কি না। এমন হইতে পারে যে, একজন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক জীবনদান করিয়া শেষ পর্যন্ত অহং ত্যাগ না করিতে পারায় জীবন-দানের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইলেন। আবার অন্যদিকে এক রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক শ্রদ্ধার সহিত জীবনদানের সংকল্প গ্রহণ করিবার পর তাঁহার এমন পরিবর্তন আসিয়া গেল, যাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম হইল এবং তিনি নিজেকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের হাতে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিয়া প্রকৃত জীবনদাতা হইলেন। অতএব জীবনদাতাদের মধ্যে যাঁহারা রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়, তাঁহা-দিগকে বাদ দিবার প্রশ্ন উঠে না। বিনোবাজী বলেন—"কাহাকেও বাদ দিবার আমি কে? মৃত্যুর পর আমিই জীবনদাতা ছিলাম কি-না সেই বিচার হইয়া তবেই আমার কোন্ স্থান পাওয়া উচিত তাহা নির্ণীত হইবে।" অতএব যিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি জীবনদান করিতেছেন, তিনিই জীবনদাতা ইহা মানিয়া লওয়া উচিত। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—" আমরা শব্দ প্রমাণ মানিয়া থাকি। লোক-গণনার সময় কে হিন্দু, কে মুসলমান তাহা লেখা হইয়া থাকে। মুখে যে যাহা বলে তাহাই সত্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। এসম্পর্কে শাস্ত্রের প্রমাণ চাওয়া হয় না। লোকে বলে—আমি জানি অমুক কেমন লোক; সে বৃথা নাম দিয়াছে। অর্থাৎ আমরা যেন মানুষের অন্তর্যামী।"

কাঠ পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবার পর বুঝিতে পারা যায় না উহা কি ছিল। সেরূপ আজ যে যে-প্রকৃতিরই হউক না কেন, জীবনদান ঘোষণার পর যদি সে নিজেকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া ফেলে অর্থাৎ নিজেকে নিঃশেষে ভগবানের হাতে সমর্পণ করে, তবে সেই অবস্থায় বুঝা যায় না (এবং তাহা জানিবার প্রয়োজনও থাকে না) যে সেই ব্যক্তি পূর্বে কোন্ প্রকৃতির ছিল। এই বিচার বুঝাইয়া বিনোবাজী বলেন—"কাষ্ঠে অগ্নি প্রয়োগ করা হইল। কাষ্ঠ পুড়িয়া অংগারে পরিণত হইল। তখন উহা বকুল বা আম থাকে না। দেখিয়া যদি কেহ বলিতে পারে যে, উহা অমুক কাষ্ঠ ছিল তবে বুঝিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ অংগার হয় নাই। ভিতরের কাষ্ঠ এখনও পুড়িয়া ছাই হইতে বাকী আছে।"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—যাঁহারা জীবনদান দিয়াছেন তাঁহাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি হইবে? ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"ইহার উত্তর এই যে, যিনি বিশ্বম্ভর তিনিই সেই ব্যবস্থা করিবেন। 'যোহ সৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স ভক্তান্ কিং উপেক্ষতে?'—ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিবেন না। তিনি বিশ্বম্ভর, ইহা কখনও মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই। যদি জীবনদাতাগণ ভক্ত হন তবে বিশ্বম্ভর তাঁহাদের চিন্তা করিবেন। ইংরেজী ভাষায় বলিলে আমাদের এই কাজ 'সার্ভিস' নহে। ইহা পরিশুদ্ধ সেবা। অতএব জীবিকার ব্যবস্থার জন্য কোনরূপ গ্যারান্টি ইহাতে নাই। শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা যে করা হইবেই—ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে না। কাজের মাধ্যমে তাঁহাদের শিক্ষা হইবে। জীবনদাতাগণের মিত্র-মণ্ডল যথেষ্ট বড়। ঐ মিত্র-মণ্ডলের দ্বারা তাঁহাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা হইয়া যাইতে পারে। ঐ মিত্র-মণ্ডল হইতেছে বিশাল জনতা। সুতরাং জীবনদাতাগণের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু ব্যবস্থা করিতেই হইবে এবং ঐজন্য চিন্তা করিতে হইবে—এরূপ আমি মনে করি না। ভগবানের হাতে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা—ইহাই বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ। প্রথমেই আমি বলিয়াছি যে, যদি অহঙ্কার থাকিয়া যায়, তবে জীবনদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। ভক্তির সংকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। ভক্তিলাভ হইবার পর যাহার যতটুকু শক্তি সেরূপ কাজ হইবে। কাজ করিতে করিতে শক্তি বৃদ্ধি হইবে। এইরূপে বুদ্ধিরও বিকাশ হইবে। যাঁহারা জীবনদান করিয়াছেন তাঁহাদের শক্তি ও বুদ্ধি কম থাকিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের ভক্তি যেন কম না থাকে।"

যাঁহারা জীবনদান করিয়াছেন তাঁহাদের দ্বারা কিভাবে কাজ করাইয়া লওয়া যায়? এসম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"যিনি জীবনদান দিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি সেইক্ষণ হইতে এইকাজে লাগিয়া গিয়াছেন—এরূপ মনে করিয়া লইতে হইবে। অতএব আমার নিকট হইতে যদি কোন পরামর্শ চান তবে আমি নিশ্চয়ই তাহা দিব। যদি আমার সাহায্য চান তবে আমি নিশ্চয়ই সাহায্য দিব। যিনি জীবনদান করিয়াছেন তিনি কোন ব্যক্তির হাতে তাঁহার জীবন সমর্পণ করেন নাই।" অতএব তাঁহাদের পরিচালক কেহ নাই

বা থাকিবে না। বিনোবাজী বলেন যে, তাঁহারা ভেড়ার দল নহেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ব্যাঘ্র। তাঁহারা নিজেদের শক্তিতে কাজ করিবেন। তাঁহাদের জন্য কোন মেষ-পালকের প্রয়োজন হইবে না। যাঁহারা জীবনদান করিয়াছেন তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া চলিবেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে উপদেশ ও পরামর্শের আদান-প্রদান হইবে। বিনোবাজী বলেন—"ইহা ভক্তের এক লক্ষণ। 'বোধয়ন্তি পরস্পরম্'। বোধ দিবার জন্য কোন ধর্ম-কর্তৃপক্ষ থাকিবেন না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে উপদেশ দিবেন, পরামর্শ দিবেন।"

জীবনদান যে কেবলমাত্র পরিণত বয়সের ব্যক্তিরা করিবেন এমন নহে। বালক-বালিকাগণও জীবনদান করিতে পারেন।

বিনোবাজী আরও বলেন—"জীবনদানের অর্থ অন্তিম প্রবাস। ইহা অন্তিম কার্য। যিনি জীবনদান দিয়াছেন তিনি অখণ্ড পথিক হইয়া গিয়াছেন। তিনি শুধু সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। কখনও পশ্চাদ্ধাবন করিবেন না। এই অন্তিম কার্যে কাহারও জন্য কেহ অপেক্ষা করিবেন না। কাহারও জন্য কেহ পিছাইয়া থাকিবেন না। চলিতে চলিতে যিনি পড়িয়া গেলেন, তিনি পড়িয়াই থাকিলেন। চলিতে চলিতে যিনি চলা বন্ধ করিলেন, তিনি থামিয়াই গেলেন। কাহারও জন্য কেহ অপেক্ষা করিবে না।" এই সম্পর্কে তিনি পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ-যাত্রার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী চলিতে লাগিলেন। ভীম পড়িয়া গেলেন এবং ধর্মরাজকে বলিলেন, 'সাহায্য করুন'। ধর্মরাজ বলিলেন—'ভাই, উঠিয়া দাঁড়াও। তবে কিছু সাহায্য করা সম্ভব।' তিনি ভীমের জন্য থামিলেন না। একে-একে অন্য সকলেই এইভাবে পড়িয়া থাকিলেন। স্বর্গদ্বারে তাঁহার একজন মাত্র সঙ্গী থাকিল। সে হইতেছে তাঁহার কুকুর। তাহাকে ছাড়িয়া তিনি স্বর্গের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন না। এসম্পর্কে বিনোবাজী আরও বলেন—"এই ব্যাপারে সকলেই মুক্ত। মুক্ত থাকিয়া সম্মুখে ঐ-যে একমাত্র কার্য তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এরূপ বিচার অন্তরে গ্রহণ করিলে কাজ সহজ হইয়া যাইবে এবং এই কাজের কোন দুষ্পরিণামের আশঙ্কা থাকিবে না। প্রত্যেকেরই পরীক্ষা হইবে। যে টিকিয়া গেল তো গেল! যে টিকিল না তো টিকিল না! যিনি আমাদের সঙ্গে

চলিতে চাহিবেন তাঁহার সঙ্গে আমরা আছি। যিনি আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন তাঁহার ঐরূপ করিবার অধিকার আছে এবং আমাদের আগাইয়া যাইবারও অধিকার আছে।"

সর্বোদয়ের কাজের জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহাদিগকে পরে সত্যাগ্রহী লোকসেবক বা লোকসেবক নামে অভিহিত করিবার ব্যবস্থা হয়। এবং সংকল্প পত্রে তাঁহাদিগকে স্বাক্ষরদান করিতে হয়। উহাতে জীবনদানের ভাবনা নিহিত আছে বলিয়া তখন হইতে পৃথকভাবে জীবনদান করা বন্ধ হইয়া যায়।

॥ ৬৫ ॥ শান্তি-সেনা

শান্তি-সেনা মহাত্মা গান্ধীর কল্পনা

শান্তি-সেনার কল্পনা মহাত্মা গান্ধীর। তখনকার পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক অশান্তির প্রতিকার করা শান্তি-সৈনিকের প্রধান কাজ ছিল এবং উহাই তাঁহার প্রধান কাজ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু বিনোবাজী শান্তি-সেনার বিচারকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করিয়াছেন এবং উহাকে সমাজ-বিপ্লব সাধনের জন্য পরিপূর্ণ সমাজ-সেবার এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থাস্বরূপ দেশের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

বিনোবাজী কর্তৃক শান্তি-সেনা সংগঠনের কল্পনা

১৯৫৭ সালে বিনোবাজী যখন কেরল রাজ্যে পাদপরিক্রমা করিতেছিলেন তখন দেশব্যাপী শান্তি-সেনা সংগঠন করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদিত হয়। এই কল্পনার পৃষ্ঠভূমিকা কি ছিল তাহা জানা আবশ্যক। বড় বড় যুদ্ধ বাধিবার প্রশ্ন বাদ দিলেও দেশের আভ্যন্তরীন অশান্তি কম দুশ্চিন্তার বিষয় নহে; বরং আভ্যন্তরীন অশান্তি অধিকতর বিপজ্জনক এবং উহাতে ভয়ের কারণও বেশী। কারণ, আণবিক অস্ত্র-শস্ত্র সৃষ্টি হওয়ায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের অন্তরে এরূপ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে যে এখন পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার দ্বারা সাময়িকভাবে বিশ্বযুদ্ধ ঠেকাইয়া রাখা সহজ সাধ্য হইয়াছে।

কিন্তু যতদিন দেশে আর্থিক ও সামাজিক কারণে আভ্যন্তরীণ অশান্তি সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন সমগ্র দেশ এক বিরাট বারুদ-স্তূপের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে। যে কোন সময়ে উহার বিস্ফোরণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। তাহার ফলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িতে পারে ও সমগ্র জগৎ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে পারে। উপরন্তু, দেশের মধ্যে অশান্তি চলিতে থাকিলে যে-সব গ্রামদান পাওয়া গিয়াছে ও গ্রামদানের ভিত্তিতে গ্রাম-স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার যে-সব রচনাত্মক কাজ চলিতেছে তৎসমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে গ্রামদান পাওয়ার সম্ভাবনা বিনষ্ট হইবে। ফলে, গ্রাম-স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া যাইবে। কেরলে পাদপরিক্রমার সময় বিনোবাজী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন অসুস্থ থাকেন। তখন তাঁহার মনে এইসব চিন্তা চলিতেছিল। এইজন্য তিনি অবিলম্বে দেশব্যাপী শান্তি-সেনা সংগঠন করার সিদ্ধান্ত করেন। ঐ সময় কেরল ও তামিলনাদে যে অশান্তিময় আবহাওয়া চলিতেছিল তাহাও বিনোবাজীর দেশব্যাপী শান্তি-সেনা সংগঠনের সিদ্ধান্তকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

শান্তি-সেনার প্রথম সমাবেশ

কেরলে বিনোবাজীর পাদপরিক্রমার শেষ দিন ১৯৫৭ সালের ২৩শে আগষ্ট তারিখে কেরলের শ্রীকেলপ্পনজী ও তাঁহার ৭ জন সহকর্মী শান্তি-সৈনিকের নিষ্ঠাপত্রে স্বাক্ষর দান করিয়া শান্তি-সৈনিক হন। অতঃপর দেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তি-সৈনিক ভর্তি হইতে থাকে। গত ১৯৫৯ সালের আজমীর সর্বোদয় সম্মেলনের সময় শান্তি-সৈনিকদের এক সমাবেশ হয়। সম্মেলনান্তে বিনোবাজী ২রা মার্চ (১৯৫৯) ভোরে পুনরায় তাঁহার পদযাত্রা শুরু করিয়া আজমীর হইতে সাড়ে নয় মাইল দূরবর্তী গগওয়ানা নামক স্থানে গমন করেন। আজমীর সম্মেলন উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত শান্তি-সৈনিকগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে তাঁহার অনুগমন করেন, একথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরোভাগে সন্ত বিনোবা ও তাঁহার পশ্চাতে শ্রেণী-বদ্ধভাবে প্রায় নয় শত শান্তি-সৈনিক উপযোগী ধ্বনি ও 'শান্তিকে সিপাহী চলে, শান্তিকে সিপাহী চলে; বৈরভাব তোড়নে, দিলকো দিলসে জোড়নে,

শান্তিকে সিপাহী চলে' এই সংগীত মধুর সুরে গাহিতে গাহিতে চলিতেছিলেন। অগ্রে মহিলা শান্তি-সৈনিকদের সারি ও তাহার পশ্চাতে পুরুষদের সারি। এই দৃশ্য অপূর্ব হইয়াছিল। সমগ্র দেশে তখন পর্যন্ত প্রায় এক হাজার শান্তি-সৈনিক হইয়াছিল। তন্মধ্যে র‍্যালীতে যোগ দিয়াছিলেন মোট ৮৮৩ জন। অতঃপর ঐ স্থানেই ঐদিন সমবেত শান্তি-সৈনিকগণের এক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিনোবাজী উহা উদ্বোধন করিবার সময় বলেন,—আজ খুবই শুভদিন! শান্তি-সেনার আরম্ভ বাপুই করিয়াছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধুপুরুষগণ শান্তি-সেনা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। আমি শান্তি-সৈনিক স্বরূপ এই আট বৎসরকাল পদযাত্রা করিয়া ঘুরিতেছি। আমি আশা করিয়াছিলাম যে র‍্যালীতে পাঁচ শতের অধিক সৈনিক যোগদান করিবেন না কিন্তু প্রায় নয়শত সৈনিক উহাতে যোগদান করিয়াছেন। শান্তি-সৈনিকের মোট সংখ্যা এক হাজারের মত হইয়াছে। আমি আশা করি, ভারতের জনগণের দুঃখ দূর করা সম্বন্ধে আমাদের এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল কাজে আসিবে।"

শান্তি-সেনা শিবিরে বিনোবাজীর উপদেশ

শিবিরে আলোচনাপ্রসংগে বিনোবাজী শান্তি-সৈনিকের কর্তব্য সম্পর্কে এক অপূর্ব মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে শান্তি-সৈনিকের রোগাক্রান্ত হইবার অধিকার নাই। ইহার অর্থ এই যে শান্তি-সৈনিক যেন সর্বদা অন্যের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারেন, এইভাবে তাঁহার চলা উচিত ও সতর্ক থাকা উচিত। এজন্য তাঁহার জীবন সমন্বযুক্ত ও শান্ত হওয়া চাই। তাঁহার জীবন সমাজ-সেবার জন্য অর্পিত। শান্তি-সৈনিক নিজের অসাবধানতাবশত অসুস্থ হইয়া সমাজ-সেবার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে উহা তাঁহার প্রাথমিক অযোগ্যতা বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

শান্তি-সেনার প্রয়োজনীয়তা

সর্বোদয় সমাজে অর্থাৎ অহিংস সমাজে পুলিশ ও সৈন্যদল থাকিবে না—এরূপ কল্পনা করা হয়। এজন্য যাহাতে পুলিশ বা সৈন্যদলের আবশ্যকতা না থাকে সমাজে ও দেশে সেরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। গ্রামদানের দ্বারা গ্রাম-স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পথ সুগম হইবে। গ্রাম-স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত

হইলে গ্রামের লোকেরাই অহিংস পন্থায় গ্রামের শান্তিরক্ষা করিবেন। শহরের লোকও সর্বোদয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং সর্বোদয়ের পথে চলিয়া অহিংসার পথে শহরের শান্তিরক্ষা করিবেন। যদি এইরূপে গ্রামে-গ্রামে ও শহরে-শহরে আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়া যায় তাহা হইলে লোকের মনে এই বিশ্বাস আসিবে যে বহিরাক্রমনের জন্যও সৈন্যদলের আর প্রয়োজন নাই। এরূপ অবস্থা সৃষ্টি করা যাইতে পারে। এজন্য যতদিন দেশে অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে, ততদিন অহিংস পন্থায় শান্তিরক্ষার জন্য গ্রামে-গ্রামে ও শহরে-শহরে এক অহিংস সেবকদল থাকা প্রয়োজন। এই অহিংস সেবকদলকে 'শান্তি-সেনা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শান্তি-সেনার কেন প্রয়োজন সে সম্বন্ধে বিনোবাজী আরও একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"সরকারের বিলুপ্তি ঘটাইতে হইবে একথা আমি বার বার বলিয়া আসিতেছি। ইহা এক মন্ত্রের মতো। উহার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের কাজে মাঝে মাঝে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইবে, আমরা কিছু সরকারী সাহায্য লইবও। কিন্তু আমাদের নিরন্তর এই আদর্শ সম্মুখে রাখিতে হইবে যে সরকারের বিলুপ্তি ঘটাইতে হইবে, অর্থাৎ লোকেরা নিজেরা হইবে নিজেদের রক্ষাকর্তা। দেশের বড় কাজ হইতেছে প্রতিরক্ষা। ইহা না করিলে লোক অসহায় হইয়া যাইবে। দেশের রক্ষণশক্তি স্থানে স্থানে বিকেন্দ্রিত হওয়া উচিত। আমি যে রক্ষণশক্তির কথা বলিতেছি, তাহা হইতেছে শান্তি-সেনা।"

বিনোবাজী সংগঠন ও রক্ষণ উভয় কার্যই শান্তি-সেনার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে চান। শান্তি-সৈনিক নিরন্তর পর্যটন করিতে থাকিয়া জনগণের সেবা করিবেন, জনগণের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিবেন এবং যাহাতে অশান্তি সংঘটিত না হয় সেইজন্য প্রযত্ন করিতে থাকিবেন। তাহা সত্ত্বেও অশান্তি ঘটিলে তিনি নিজের জীবন বলিদান দিয়াও অশান্তি প্রশমিত করিবেন। তাঁহার নিত্যধর্ম হইবে লোকসেবার কাজ, ভূদান-গ্রামদানের কাজ অর্থাৎ অহিংসার সংগঠন (কন্‌স্ট্রাক্‌টিভ্‌ নন-ভায়লেন্স)। আর অশান্তির বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁহার নৈমিত্তিক ধর্ম হইবে প্রাণ দিয়াও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। বিনোবাজী বলেন যে তিনি সর্বসময়ের সৈনিক হইবেন।

সাধারণ অবস্থায় তিনি 'সেবা-সৈনিক' এবং অশান্তির বিশেষ অবস্থায় তিনি 'শান্তি-সৈনিক'। মহাত্মা গান্ধীও অনুভব করিয়াছিলেন যে শান্তি-সৈনিক সর্বসময়ের জন্য 'সেবা-সৈনিক' হইবেন।

সেনা নাম দেওয়া হইল কেন

এখন প্রশ্ন, উহাকে 'সেবা-সেনা' বলা হয় কেন?— 'সেবা-সমাজ' বা 'সেবা-মণ্ডল' বলিলে তো হয়। 'সেনা' বলিলে আক্রমণের ভাব মনে আসে। শান্তি-সৈনিক যে সেবা করেন তাহা আক্রমণাত্মক। এইজন্য 'সেবা-সেনা' বলা হইয়াছে। তবে উহা হিংসাক্রমণ নহে, উহা 'প্রেমাক্রমণ'। দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য মানুষ দুইভাবে অগ্রসর হইতে পারে। দুঃখী যদি কাহারও কাছে আসিয়া তাহার দুঃখ জানায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুঃখীর দুঃখের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অথবা, তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া কোথায় দুঃখী আছে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এই শেষোক্ত প্রকারের সেবাই শান্তি-সেনার সেবা-কাজ। উহা আক্রমণের ন্যায়। এজন্য সেবা-সেনা বলা হইয়াছে। বিনোবাজী আরও বলেন যে 'সেনা' শব্দ বেদপূত শব্দ। কারণ ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডল, সূক্ত ১০৮) 'সেনা' শব্দের উল্লেখ আছে।—"অসেন্যাঃ বঃ প্রণয়ো বচাংসি।—হে কৃপণগণ, তোমরা যাহা বলিতেছ তাহা অসৈন্য, সেনা-রহিত।" ইহার এক অর্থ—'তোমাদের বাণীতে শক্তি নাই' এবং ইহার দ্বিতীয় অর্থ—'তোমাদের কথায় সংগতি নাই, তোমাদের কথা অসংগত।' সেনা শব্দের দ্বারা তাহাদের বুঝায় যাহারা একই উদ্দেশ্যে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া একত্রিত হইয়াছে। এই শব্দ পুরাতন ও পবিত্র। 'সমাজ' শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদে নাই।

শান্তি-সেনার কর্তব্য

সমাজে যে যে কারণে অশান্তি সংঘটিত হইতে পারে তাহা দূর করা শান্তি-সেনার প্রাথমিক কাজ। বৈষম্য, ব্যক্তিগত মালিকানা, 'ইহা আমার উহা তোমার' ভাব, উচ্চ-নীচ ভেদভাব, জাতিভেদ, ধর্মভেদ—এই সব অশান্তির কারণ। আজকাল ঐ সংগে দলগত রাজনীতি যোগ হইয়াছে। শান্তি-সৈনিক অশান্তির ঐ সব কারণ নিরন্তর দূর করিবার প্রযত্ন করিবেন। ইহার ফলে দেশের চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং দেশের ভিতর স্নেহভাব বর্ধিত হইবে।

ইহার ফলে সরকার সৈন্য বিভাগের জন্য ক্রমশ কম ব্যয় করিতে পারিবেন। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাদির জন্যও কম খরচ হইবে। ফলে দেশের নৈতিক শক্তি বাড়িবে এবং আন্তর্রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দেশের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। তাহাতে শান্তি-সেনার প্রতি জন-হৃদয়ে প্রেমভাব বিদ্যমান থাকিবে এবং যেখানে সাধারণ অবস্থায় সংঘর্ষ হইবার কথা, সেখানে প্রেমের আবহাওয়ায় সদা শান্তি বিরাজ করিবে। ইহা যুদ্ধের আশংকা নিবারণের পক্ষে সহায়ক হইবে। আর যদি কোন অশান্তি ঘটিয়াও যায় তবে শান্তি-সৈনিক নিজেকে বলিদান দিয়াও তাহা প্রশমিত করিবেন। মোট কথা, শান্তির সময়ে শান্তি-সৈনিকের কাজ হইবে অশান্তি প্রতিষেধ বা নিবারণ (প্রিভেন্টিভ্) আর অশান্তির সময় তাঁহার কাজ হইবে অশান্তির প্রতিকার (কিউরেটিভ)।

শান্তি-সৈনিকের অস্ত্র

শান্তি-সৈনিকের অস্ত্র কি? সাধারণ সৈনিকের হাতে বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্র থাকে। শান্তি-সৈনিকেরও অস্ত্র থাকিবে। তাহা হইবে নিরন্তর প্রেমময় সেবা। সাধারণ সৈনিক সেবা-বিহীন। এই কারণে বস্তুত সে অস্ত্রহীনের মত। এ জন্য তাহার দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয় না।

শান্তি-সৈনিকের অনুশাসন

শান্তি-সৈনিকের অনুশাসন কি হইবে? অহিংসা ও সত্যের অনু-শাসন ব্যতীত শান্তি-সৈনিকের আর কোন অনুশাসনের প্রয়োজন থাকিবে না। শান্তি-সৈনিককে সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সত্যা-গ্রহীর হৃদয়ে অহিংসার অনুশাসন ভিন্ন আর কিছু থাকিতে পারে না। সত্য ভিন্ন আর কোন শক্তি তাঁহার উপর অধিকার চালাইতে পারে না। শাসন-মুক্ত সমাজের পূর্ণরূপ শান্তি-সৈনিকদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে। তাঁহারাই জনগণকে গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণাদান করিতে সমর্থ হইবেন।

শান্তি-সৈনিকের আধার

শান্তি-সৈনিকের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উভয় আধার (বুনিয়াদ) থাকা চাই। যাহাদিগকে সেবা করিতে হইবে তাহাদের নিকট হইতে সেবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ইহা হইবে তাঁহার আধ্যাত্মিক আধার। যাহাদের সেবা করিতে হইবে তাহাদের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। সেব্যের

বিনা সম্মতিতে সেবা করা হইলে তাহা অত্যাচার বলিয়া পরিগণিত হইবে। সাধারণ সৈনিক ভোটের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট হইতে তাহার সেবার অধিকার পাইয়া থাকেন এরূপ মনে করা হয়। কিন্তু এই অধিকারের আধার খুব দৃঢ় নহে। কারণ, যে সব দেশে গণতন্ত্র প্রচলিত আছে সেই সব দেশেও আংশিক ভোটের বলে শতকরা একশত জনের উপর শাসনকার্য ও ক্ষমতা চালানো হইয়া থাকে। সুতরাং, সেই আংশিক ভোটের দ্বারা প্রাপ্ত অধিকারের বুনিয়াদ অত্যন্ত ক্ষীণ। তথাপি উহা এক বুনিয়াদ। ইহা ছাড়া সরকারের পশ্চাতে সত্যিকারের এক শক্তি রহিয়াছে। বিনোবাজী বলেন—"সেই শক্তি হইতেছে এই যে স্বেচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক প্রত্যেক ব্যক্তি সরকারকে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকে। জনগণের সেই সম্মতিই সরকারের শক্তির প্রকৃত আধার। কেহ কোথাও ট্রেনে চড়িয়া যাইতেছে। উহার মাধ্যমে সরকার সেই ব্যক্তির সম্মতি পাইতেছেন। এমন কি সন্ন্যাসীর নিকট হইতেও সরকার সেই সম্মতি পাইয়া থাকেন। কারণ সন্ন্যাসী অন্তত ল্যাংগট পরিধান করিয়া থাকেন। ল্যাংগট খরিদ করিতে হইলেও তাহার জন্য পরোক্ষ ট্যাক্স দিতে হয়। উহা দ্বারা তাঁহার পক্ষেও সরকারকে সম্মতিদান করা হয়। এক বালক চা-পান করিতেছে। উহার মাধ্যমেও সরকার তাহার নিকট হইতে ঐভাবে সম্মতি পাইতেছেন। কারণ ঐসব জিনিসের উপর ট্যাক্স রহিয়াছে।" ঐরূপ সম্মতিই সরকার ও সরকার-আশ্রিত সকলের আধ্যাত্মিক বুনিয়াদ। শান্তি-সেনার পশ্চাতেও সেইরূপ কোন আধ্যাত্মিক আধার থাকা চাই। এই কারণে সর্বোদয়ের কাজের জন্য হউক বা শান্তি-সৈনিকের সেবা-কাজ ও রক্ষণের কাজের জন্য হউক জনগণের নিকট হইতে কোনরূপ সম্মতি পাওয়া চাই। কিন্তু সেই সম্মতি স্বেচ্ছাপূর্বক ও প্রেমের সহিত প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক, ট্যাক্সের মত বাধ্যতামূলকভাবে নহে। অন্য এক দৃষ্টিতে শান্তি-সেনার সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে হইতে পারে। সর্বোদয়ের কাজ যাঁহারা করেন তাঁহাদের পশ্চাতে কি আছে—এরূপ প্রশ্ন করা হইলে বলিতে পারা যায় যে সর্বোদয়ের কাজের সংকল্প বিশ্বসংকল্প। যাহা নির্মল, শুদ্ধ সংকল্প তাহাকে বিনোবাজী 'বিশ্বসংকল্প' আখ্যা দিয়াছেন। বিশ্বসংকল্প

সাধনের জন্য কোন পৃথক সম্মতি লইবার প্রয়োজন হয় না। ইহা ঠিক কথা। কিন্তু ইহা যদি লোকের মধ্যে যাইয়া কেবলমাত্র মরিয়া যাইবার কাজ হইত তবে কাহারও সম্মতির প্রয়োজন হইত না। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কেবল তাহা নহে। বিনোবাজী বলেন—"আমাদের উদ্দেশ্য হইল, আমাদের উপস্থিতিই যেন লোকের মনে এরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে যাহাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজসাধ্য হয়। সুতরাং কেবল সেবার অধিকার থাকিলে চলিবে না। লোক-হৃদয়কে নৈতিক প্রভাবে উদ্বুদ্ধ করা চাই। এজন্য জন-সাধারণের পক্ষ হইতে আমাদের কোনও প্রকারের সম্মতির প্রয়োজন আছে। আমাদিগকে রক্ষণের অধিকার দেওয়ার মতো ভোটের প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু আমাদের করণীয় কাজ যদি সকলের পছন্দ হয় তবে আমি তাহার নিদর্শনস্বরূপ সকলের নিকট হইতে সম্মতিদান চাহিতেছি। 'সর্বোদয়-পাত্রে'র ব্যাপক প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে সর্বোদয় তথা শান্তি-সেনার কাজের জন্য জনগণের সম্মতি লওয়ার উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে।"

সাধারণ সৈনিকের বৈষয়িক বুনিয়াদ হইতেছে বেতন। শান্তি-সৈনিকেরও এরূপ কিছু বৈষয়িক আধারের প্রয়োজন আছে। শান্তি-সৈনিক যাঁহাদের সেবা করিবেন তাঁহাদের ঘর হইতে তাঁহার কাজের সমর্থন স্বরূপ প্রতি মাসে কিছু-না-কিছু দেওয়া উচিত। যাঁহারা সর্বোদয়ের সেবা করিবেন তাঁহাদিগকে সমগ্র ভারতের সহিত মিলিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ শান্তি-সৈনিকের বৈষয়িক আধার (আর্থিক ব্যবস্থার উপায়) হইতেছে সর্বোদয়-পাত্র, সম্পত্তিদান, সূত্রদান, সূতাঞ্জলি ইত্যাদি।

শান্তি-সেনার যে কল্পনা বিনোবাজী আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা ক্রান্তিমূলক সমাজ-সেবার এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। ভূদানযজ্ঞ আজ যে স্তরে উন্নীত হইয়াছে তাহাতে উহা এক স্থায়ী বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং স্থায়ী বস্তু হিসাবে উহার সম্বন্ধে এক স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়া উচিত। শান্তি-সেনার কল্পনায় সেই যোজনা রহিয়াছে। এইজন্য বিনোবাজী হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রতি পাঁচ হাজার লোকের সেবার জন্য একজন করিয়া শান্তি-সৈনিকের প্রয়োজন। অর্থাৎ, দেশের সমস্ত লোকের সেবার জন্য ৭৫ হাজার শান্তি-সৈনিকের প্রয়োজন।

শান্তি-সৈনিকের যোগ্যতা

বিনোবাজী শান্তি-সেনার প্রধান সেনাপতি। শান্তি-সেনার সংগঠন ও পরিচালনার জন্য তিনি 'অখিল ভারত শান্তি-সেনা মণ্ডল' গঠন করিয়া দিয়াছেন। শান্তি-সৈনিক সরূপ ভর্তি হইতে হইলে, শান্তি-সৈনিকের জন্য নির্ধারিত নিষ্ঠাপত্রের নিষ্ঠাসমূহ মানিয়া লইয়া তাহাতে স্বাক্ষর দান করিতে হয়। উক্ত নিষ্ঠাপত্রে উল্লিখিত ষষ্ঠবিধ নিষ্ঠা হইতেছেঃ—(১) সত্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ ও শরীরশ্রমে দৃঢ় নিষ্ঠা থাকা এবং তদনুসারে জীবন-যাপনের চেষ্টা করা; (২) লোকনীতিতে বিশ্বাস ও কোনরূপ দলীয় রাজ-নীতিতে বা ক্ষমতার রাজনীতিতে যোগদান না করা; (৩) সমর্পণ বুদ্ধিতে নিষ্কাম লোকসেবা; (৪) জাতি, শ্রেণী বা ধর্মমতের ভেদকে জীবনে স্থান না দেওয়া; (৫) সম্পূর্ণ সময় 'চিন্তন সর্বস্ব' (সমগ্র চিন্তা) সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ উপায়স্বরূপ ভূদানযজ্ঞমূলক পল্লীশিল্পপ্রধান অহিংস ক্রান্তির কাজে নিয়োজিত করা; এবং (৬) শান্তি-সেনার কাজের জন্য কোথাও যাইবার আদেশ পালন করা ও ঐ কাজের জন্য আবশ্যক হইলে জীবন বলি-দান দিবার জন্য প্রস্তুত থাকা।

শান্তি-সৈনিকের 'মাতৃবৎ' সেবা

বিনোবাজী বলেন যে শান্তি-সৈনিক তিনিই হইতে পারিবেন যিনি 'মাতৃবৎ' সকলের সেবা করিবেন। তিনি 'মাতৃবৎ' শব্দটি এ ক্ষেত্রে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। 'মাতৃবৎ' সেবার অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রনিধানযোগ্য। সংকটের সময় মা যেভাবে সন্তানকে বাঁচাইবার চেষ্টা করেন তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ধরুন, ব্যাঘ্রীর শাবককে শিকারী ধরিয়া লইয়াছে। শিকারী বন্দুক খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। তাহা জানিয়াও ব্যাঘ্রী-মা সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। যতক্ষণ শিকারীর গুলিতে সে নিহত না হয় ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই। এই হইতেছে মায়ের পক্ষে সন্তানকে রক্ষা করিবার রীতি। ইহা করুণার পরাকাষ্ঠা। সেবকদের মধ্যে যাঁহারা শান্তি-সৈনিক হইবেন তাঁহাদেরও স্বভাবত এইরূপ প্রবৃত্তি থাকা চাই যে মা যেভাবে সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া যান সেইরূপ কোথাও বিপদ উপস্থিত হইবামাত্র শান্তি-সৈনিকও জনগণকে রক্ষা করিবার

জন্য ছুটিয়া যাইবেন। এই প্রচেষ্টায় আত্মরক্ষার চিন্তামাত্রও আসিতে পারিবে না। বিনোবাজী বলেন, "কেহ যদি তলোয়ার দ্বারা শান্তি-সৈনিকের গলায় আঘাত করিতে উদ্যত হয়, তবে গলায় যেন আঘাত না পড়ে এরূপ চিন্তা তো শান্তি-সৈনিকের হইবেই না, বরং তাঁহার এই চিন্তা করিতে হইবে যে আঘাতকারীর হাতে যেন কোন প্রকারের ব্যথা না লাগে।"

সেনাপতির আদেশ পালন

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সত্যাগ্রহী লোক-সেবকের যে যে পঞ্চবিধ নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন, শান্তি-সৈনিকেরও তাহা থাকা চাই। উপরন্তু অতিরিক্ত একটি নিষ্ঠা তাঁহার থাকা প্রয়োজন। তাহা হইতেছে সেনাপতির আদেশ মান্য করা। শাসনমুক্ত সমাজ, বিচার-স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি-সৈনিকের পক্ষে সেনাপতির আদেশ মান্য করার অনুশাসন আরোপ করা বিসদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। সর্বোদয়-ব্যবস্থায় সর্বত্র শাসন-বিভাজন ও কর্তৃত্ব-বিভাজনের নীতি মানিয়া চলিবার কথা। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীত হইবে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকলেরই নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অনুসারে চলিবার অধিকার থাকিবে। এই অবস্থায় শান্তি-সৈনিকের জন্য সেনাপতি খাড়া করা হইলে ও শান্তি-সৈনিককে সেনাপতির আদেশ মান্য করিয়া চলিতে হইলে সেই নীতি ক্ষুণ্ণ করা হয়—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। কিন্তু বিনোবাজী বলেন যে বিচার-শাসন ও কর্তৃত্ব-বিভাজনের নীতি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না। নিজ ক্ষেত্র সম্বন্ধে দায়িত্ব শান্তি-সৈনিকের নিজের উপর থাকিবে। তিনি নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে নিরন্তর সেবা করিবেন, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিবেন, সকলের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখিবেন, সকলের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবেন, তাঁহার নিজের সুখ-দুঃখ বলিয়া কিছুই থাকিবে না এবং সুযোগ আসিলে প্রেমপূর্বক নিজেকে বলিদান দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। নিজেকে বলিদান দিবার সময় অন্তরে শুধু নির্বৈরভাব থাকিলে চলিবে না, মাতৃবাৎসল্য ভাবও থাকা চাই। ইহা ছাড়া অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ তাঁহার উপর থাকিবে না। এইভাবে বিচার-শাসন ও কর্তৃত্ব-বিভাজনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা তাঁহার নিজক্ষেত্রে থাকিবে। শান্তি-সৈনিক তাঁহার নিজের

ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় বাহিরের কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করিতে পারেন এবং বাহির হইতে সেই সাহায্য চাহিতে পারেন। কিন্তু সেই অবস্থায়ও বাহির হইতে যাঁহাকে পাঠানো হইবে তাঁহাকে স্থানীয় সেবকের পরামর্শ অনুসারে চলিতে হইবে। কারণ তিনি স্থানীয় শান্তি-সৈনিকের সাহাযার্থ সেখানে যাইবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে এক্ষেত্রেও তাঁহার বিচার-স্বাতন্ত্র্য খর্ব করা হইবে না। যদি তাহা হয়, তবে সেনাপতি বা আদেশকারী থাকিবার কি প্রয়োজন আছে? ইহার প্রয়োজন এই জন্য যে কোন ব্যাপক অশান্তির ব্যাপারে যেখানে বাহির হইতে সাহায্য চাহিয়া পাঠানো হইবে, সেখানে জরুরীভাবে বহুলোক পাঠাইতে হইবে এবং তাড়াতাড়ি সেখানে বহু শান্তি-সৈনিককে একত্রিত হইয়া কাজ করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা করিবার জন্য কোন একটি এজেন্সি বা মাধ্যম থাকা প্রয়োজন। সেই এজেন্সি হইতেছেন সেনাপতি। আদেশ দেওয়ার এজেন্সি বা মাধ্যম কোন ব্যক্তি হইবে, না অব্যৈক্তিক কোন সংস্থা হইবে তাহা বিবেচ্য। আদেশ হইলেই শান্তি-সৈনিক যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন (হয়ত তাঁহার পত্নী মৃত্যুশয্যায় সেই অবস্থায়ও) তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে হইবে এবং আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াই যাইতে হইবে। কিন্তু শান্তি-সৈনিক সেই আদেশ অমান্য করিলে তাঁহার কোন শাস্তি হইবে না। তাহা সত্ত্বেও তিনি নিশ্চয় যাইবেন। আদেশদানকারীর প্রতি শান্তি-সৈনিকের কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকিলে তবে মানুষ এতদূর পর্যন্ত করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। কোন্ ব্যক্তির প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিতে পারে? সংস্থার প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং আদেশদাতা কোন ব্যক্তি না হইলে চলে না। ব্যক্তির গুণ থাকে (সগুণ)। কিন্তু সংস্থার গুণ থাকে না (নির্গুণ)। সুতরাং আদেশদানকারী ব্যক্তির এমন গুণ থাকা প্রয়োজন যাঁহার প্রতি সকলে পরম শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহার কথায় মানুষ হাসিমুখে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে পারেন। সুতরাং বিনোবাজী কেন শান্তি-সেনার প্রধান সেনাপতি তাহা এক্ষনে বুঝা যাইতেছে। এখন প্রশ্ন এই—অন্য কাহারও আজ্ঞায় নিজের মধ্যে আত্মবলিদানের প্রেরণা আসা সম্ভব কি? এবং আজ্ঞার বলে যদি

কেহ আত্মবলিদান দিতে অগ্রসরও হন তবে তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমভাব জাগ্রত হওয়া সম্ভব কি? ইহার উত্তরে বিনোবাজী দৃঢ়তার সহিত বলেন যে কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বতন্ত্র চিন্তনের দ্বারা এরূপ করিতে পারা যতটা সম্ভব অন্যের আজ্ঞায়ও ততটাই সম্ভব। উহা লেশমাত্র কম সম্ভব নহে। বিনোবাজী এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। উপবাসে তাঁহার বিশ্বাস না থাকিলেও তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদেশে প্রেমের সহিত জেলের মধ্যে আমরণ উপবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর এই সংকল্প ছিল যে তাঁহাকে যদি জেলে আবদ্ধ করা হয় তবে তিনি জেলে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন না। যেখানে ইংরেজকে এদেশ হইতে চলিয়া যাইতে বলা হইতেছে সেখানে তাঁহাদের আদেশে জেলে আবদ্ধ থাকার কোন প্রশ্ন হয় না। এজন্য তিনি জেলে গিয়াই আমরণ উপবাস আরম্ভ করিবেন, এরূপ স্থির ছিল। সেক্ষেত্রে অন্য সকলেও যেন জেলে গিয়া আমরণ উপবাস করেন ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। বিনোবাজী মহাত্মা গান্ধীর পর জেলে গিয়াই উপবাস আরম্ভ করেন। কারণ তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল যে মহাত্মা গান্ধী জেলে গিয়া উপবাস করিতেছেন। কিন্তু কিছু পরে মহাত্মা গান্ধী এই সংবাদ পাঠান যে তিনি জেলে উপবাস করার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সংবাদ পাইয়া বিনোবাজী উপবাস ভঙ্গ করেন।

শান্তি-সেনার সেনাপতির বৈশিষ্ট্য

সাধারণ সেনার সেনাপতি মৃত্যুর মুখে আগাইয়া যাইবার জন্য আদেশ দেন কিন্তু নিজে পিছাইয়া থাকেন। শান্তি-সেনার সেনাপতির কম্যান্ড (আদেশ) হইতেছে তাঁহার আত্মাহুতি। বিনোবাজী বলেন যে মহাত্মা গান্ধী শান্তি-সেনার প্রথম শান্তি-সৈনিক ও প্রথম সেনাপতি। আর ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী তাঁহার আত্মবলিদান হইতেছে তাঁহার সুপ্রীম কম্যান্ড।

সেনাপতি ও মুখ্যগণ

বিনোবাজী বলেন যে শান্তি-সেনার সংগঠনে সেনাপতি থাকিবে। সেনাপতি ছাড়া সৈনিকদের মধ্যেও মুখ্য ব্যক্তিরা থাকিবেন। স্থানে স্থানে

নেতা সৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্থানে স্থানে মার্গদর্শক থাকিবার প্রয়োজন আছে। সাধারণত পরামর্শদাতা বা মার্গদর্শকের প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে উহা কাজে আসিবে। 'রেফারেন্স'-এর (সন্দর্ভের) জন্য অভিধান পড়িয়া রহিয়াছে। উহা সর্বসময়ে কাজে লাগে না। কিন্তু প্রয়োজন হইলেই অভিধান সেই প্রয়োজন মিটায়। প্রয়োজন হইলে উহা ব্যবহার করা যায় এবং তখন উহা ব্যবহার না করিলে চলে না। মধ্যবর্তীস্বরূপ বিভিন্ন সৈনিকদলের মুখ্য রাখিবার উদ্দেশ্যও তদ্রূপ।

কম্যান্ডের তাৎপর্য

শান্তি-সৈনিককে যে নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহার সম্বন্ধে বিনোবাজী 'কম্যান্ড' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতেও কিছু সংশয় উদ্ভব হইতে পারে। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন যে, বিষয়টি ঠিকমত বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই 'কম্যান্ড' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট 'কম্যান্ড' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। অন্তিম সময়ে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন—পরস্পরের প্রতি প্রেম কর। পারস্পরিক প্রেমভাব পোষণ করার উপদেশকেও তিনি 'কম্যান্ড' আখ্যা দিয়াছিলেন, যথা—'এ নিউ কম্যান্ডমেন্ট আই হ্যাভ গিভন্ টু ইউ'। এখানে 'কম্যান্ড' একেবারেই প্রেমের পরিভাষা। তথাপি কম্যান্ড শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছিল। শান্তি-সেনা সম্বন্ধেও সেই কথা। মৃত্যুবরণ করিবার সময় উপস্থিত হইলে সেনাপতি নিজে প্রথমে আত্ম-বলিদান দিবেন। তাঁহার আত্মবলিদানই অন্যান্য সৈনিকের পক্ষে কম্যান্ড হইবে। যেমন মহাত্মা গান্ধীর আত্মবলিদান তাঁহার 'সুপ্রীম কম্যান্ড' সরূপ হইয়াছে।

দেশের অর্থব্যবস্থার সহিত শান্তি-সেনার সম্পর্ক

শান্তি-সেনার দ্বারা আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ হইলে সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে। যদি অহিংস উপায়ে দেশের আভ্যন্তরীণ অশান্তির প্রতিকার করা যায় এবং তজ্জন্য পুলিশবাহিনীর প্রয়োজন না হয় তাহা হইলে লোকের মনে ক্রমশ এই বিশ্বাস জাগ্রত হইবে যে দেশরক্ষাও অহিংস উপায়ে সম্ভব। তখন দেশের আর্থিক ব্যবস্থা অহিংসার ভিত্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হইবে। পক্ষান্তরে দেশ-রক্ষায় যদি সৈন্যবলকে প্রধান স্থান দেওয়া হয় তবে অর্থব্যবস্থাকেও ভারী শিল্প-প্রধান করিতেই হইবে। কারণ সৈন্যবলকে কার্যকরী করিতে হইলে ভারী শিল্পেরই (হেভী ইন্ডাস্ট্রিজ) প্রয়োজন। বিনোবাজী বলেন,—"দেশকে যিনি রক্ষা করিবেন, রাজ্য তাঁহারই হইবে; উহা হিংসক রক্ষণ হউক বা অহিংসক রক্ষণ হউক। যদি দেশরক্ষার জন্য সৈন্যবলকে প্রধান স্থান দেওয়া হয় তবে দেশের সমগ্র অর্থব্যবস্থা তদনুসারে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেক্ষেত্রে 'ওয়ার পোটেন্সিয়াল' সরূপ ভারী শিল্পসমূহের প্রয়োজন হইবে। সে অবস্থায় পল্লীশিল্পের কথা কেহ আর মুখে আনিবে না। যদি সর্বোদয়-সেবকগণ দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ বলিয়া লোকের বিশ্বাস হয় তবে তখনই পল্লী-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। সর্বোদয়-বিচার অনুসারে চলিলে দেশ-রক্ষা হইতে পারে—ইহা যদি প্রমাণ করা যায় তবে ঐ বিচার চলিবে। এই-জন্য শান্তি-সেনার কল্পনা আমার মনে আসিয়াছে। ইহা বুঝা আবশ্যক যে ভারতের প্রকৃত বিপদ বাহির হইতে নহে, ভিতর হইতে।"

॥ ৬৬ ॥ সর্বোদয়-পাত্র

ভূদানযজ্ঞের উপায় সরূপ বিনোবাজী সম্পত্তিদান, শ্রমদান ইত্যাদি প্রবর্তন করেন। ঐ সম্পর্কে তিনি সর্বশেষে যে উপায় প্রবর্তন করেন তাহা হইতেছে 'সর্বোদয়-পাত্র'। প্রতি ঘরে 'সর্বোদয়-পাত্র' নামে একটি পাত্র স্থাপন করা হইবে। বাড়ীর ছোট ছেলে প্রতিদিন এক মুষ্টি চাউল বা অন্য কোন খাদ্যশস্য ঐ পাত্রে রাখিবে। এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ বা এক-মাস অন্তর গৃহস্থ ঐ জমা শস্য বা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পেঁছাইয়া দিবেন অথবা স্থানীয় সর্বোদয়-মিত্রগণ (সর্বোদয়-অনুরাগী যাঁহারা স্থানীয়ভাবে সর্বোদয়-পাত্রের শস্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিবার দায়িত্ব লইয়াছেন) উহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবেন। সর্বোদয়-পাত্রের আয় অহিংস ক্রান্তির আন্দোলনাত্মক কাজে ব্যয়িত হইবে। যেখানে সর্বোদয়-পাত্র বা অন্য কোন খাদ্যশস্য রাখা সম্ভব নয় সেখানে একটি করিয়া ক্ষুদ্র মুদ্রা (যথা এক বা দুই নয়া পয়সা) রাখা যায়।

অহিংস সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সকলেরই কমবেশী ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে হইবে। কিন্তু এখনই এতদূর অগ্রসর হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু সকলের অন্তরে এই শুভকামনা থাকা প্রয়োজন যে সর্বোদয়-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হউক, প্রেমের পথে অশান্তি দূর করা হউক এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেবকগণ সেবা করিতে থাকুন। গৃহে 'সর্বোদয়-পাত্র' প্রতিষ্ঠা এই শুভ কামনার নিদর্শন।

'সর্বোদয়-পাত্র' সর্বোদয়-সেবকগণের সেবাকার্যে জনগণের সম্মতির প্রতীক স্বরূপ। সর্বোদয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যে সেবাকার্য করা হয় তাহাতে জনগণের সম্মতিলাভের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এরূপ মনে হইতে পারে —সর্বোদয় সংক্রান্ত সেবাকার্যের ন্যায় নিষ্কাম ও বিপ্লবাত্মক সেবাকার্য করিবার জন্য জনগণের সম্মতিলাভের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে জনগণের পক্ষে এরূপ সম্মতিদানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সমাজ-সেবকগণ যে সব সাধারণ সেবাকার্য করেন তাহার জন্য জনগণের সম্মতি লইবার কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহাতে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেবলমাত্র সংস্কারাত্মক কাজ করা হইয়া থাকে এবং জনগণ তাহাতে উপকৃত বোধ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রোগীদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা ধরা যাউক। এই দেশে যেসব রোগ হয় তাহার অধিকাংশের মূল কারণ হইতেছে দারিদ্র্য। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার জন্য ঐ সব রোগ হইয়া থাকে। দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। ইহা সমাজ-ক্রান্তির কাজ। কিন্তু যতদিন উহা না হইতেছে এবং বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাই চলিতে থাকিতেছে, ততদিন রোগও হইতে থাকিবেই এবং উহার জন্য হাসপাতাল ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে। এজন্য যাঁহারা এরূপ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবেন বা উহার জন্য সেবাকার্য করিবেন তাঁহাদের দ্বারা লোকে উপকৃত হইতেছেন বলিয়া মনে করিবেন ও তাঁহাদের প্রতি জনগণ কৃতজ্ঞ থাকিবেন। সুতরাং এরূপ সেবাকার্যের জন্য জনসাধারণের সম্মতি গ্রহণ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যেখানে মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তনের কাজ আসিবে সেখানে

সকলকে অল্পবিস্তর দুঃখকষ্ট ভোগ কবিবার ও ত্যাগ স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইবে। তাহা সকলের ভাল না লাগিতে পারে ও তাহাতে সকলের সম্মতি না থাকিতে পারে। এজন্য সমাজ-বিপ্লবমূলক সেবাকার্যে জনগণের সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন হয়। জনগণের সম্মতিদানের প্রতীকস্বরূপ সর্বোদয়-পাত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা হইয়াছে।

এরূপ মনে হইতে পারে যে যদি সমাজে ক্রান্তিমূলক সেবাকার্যের জন্য সম্মতিদানের প্রতীকস্বরূপ কিছু করিতে হয় তবে প্রতি মাসে নিজ হাতে কাটা কিছু সূতা দেওয়া অথবা বিপ্লবমূলক অন্য কিছু করার ব্যবস্থা করা উচিত। সর্বোদয়-পাত্রে দৈনিক এক মুঠি করিয়া চাউল রাখার মত কাজ নিতান্ত সহজ ব্যাপার। ইহার কি সার্থকতা আছে? সর্বোদয়-পাত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনার পূর্বে বিনোবাজী বলিয়াছিলেন যে মাসে হাতে কাটা এক গুণ্ডি সূতাদানের দ্বারা ঐ সম্মতিদান করা যায়। তথাপি এই ব্যবস্থা কেন করা হইল তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। যাঁহারা সর্বোদয়ের বিচারধারা পছন্দ করেন ও চাহেন যে সর্বোদয়-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হউক এবং সেই উদ্দেশ্যে সেবাকার্য চলিতে থাকুক, তাঁহাদের সকলের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় নিজ হাতে কাটা সূতা অর্পণ করা সম্ভব নহে। এজন্য এমন কিছুর ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন যাহা সকলের পক্ষে করা সম্ভব। এই দৃষ্টিতে সর্বোদয়-পাত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে সর্বোদয়-পাত্র রাখা সম্ভব ও সহজসাধ্য। এইজন্য সর্বোদয়-পাত্রকে সর্বোদয়ের সমর্থনসূচক কার্যসমূহের জি সি এম্ (গ্রেটেষ্ট কমন্ মেজার) অথবা গ সা গু (গরীষ্ঠ সাধারণ গুণীয়ক) বলা যাইতে পারে।

সমাজ-ক্রান্তির কাজের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক যোগ্য, সদগুণ-সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান কর্মী প্রয়োজন। বিনোবাজী কর্মী-ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশের সম্মুখে এক নূতন কল্পনা রাখিয়াছেন। প্রতি পাঁচ হাজার লোকের জন্য অর্থাৎ এক হাজার পরিবার পিছু একজন সেবকের প্রয়োজন। এই হিসাবে সমগ্র দেশে ৭৫ হাজার বিচারশীল ও আচারনিষ্ঠ লোকসেবক গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাঁহাদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক-ব্যবস্থা প্রধানত সর্বোদয়-পাত্রের

দ্বারা হইতে পারে। নিধিমুক্তি প্রবর্তনের সময় বিনোবাজী আশা করিয়াছিলেন যে সম্পত্তিদানের দ্বারা ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের ব্যয়-নির্বাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা হইয়া যাইবে এবং তজ্জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সর্বোদয়-অনুরাগী ধনবান ব্যক্তি সম্পত্তিদান দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিবেন। কিন্তু তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। এই অবস্থায় সর্বোদয়-পাত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা হইয়াছে এবং শান্তি-সৈনিক তথা লোকসেবকদের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন লইয়া দেশের দরিদ্রতম লোকের দুয়ার পর্যন্ত পেঁছানো হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে সর্বোদয়-পাত্র প্রতিষ্ঠার প্রযত্ন করা সৌম্যতর সত্যাগ্রহ-স্বরূপ হইবে।

আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে সর্বোদয়-পাত্রের আধার বা বুনিয়াদ রহিয়াছে। আমাদের দেশে এই ধার্মিক প্রথা প্রচলিত আছে যে খাওয়া আরম্ভ করার পূর্বে খাদ্যের থালা হইতে কিছু উঠাইয়া লইয়া একদিকে রাখিয়া দিতে হয়। দেবতাকে অর্পণ করার জন্য ঐরূপ করা হইয়া থাকে অথবা গোগ্রাসস্বরূপ কেহ কেহ উহা ঐভাবে উঠাইয়া রাখেন। ইহা এক গভীর আধ্যাত্মিক ভাবধারার সংকেতমাত্র অথবা উহার বিকৃতরূপ। সমাজের জন্য প্রথমে অর্পণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে কেবলমাত্র তাহাই ভোগ করা উচিত। এই ধর্ম-বিচারের বুনিয়াদের উপর সর্বোদয়-পাত্র অধিষ্ঠিত। আমাদের সমস্ত ধর্মাবরণ বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা প্রতীকমাত্র হইয়া রহিয়াছে। কোন বিশেষ তিথিতে উপবাস করিলে বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান করিলে ধর্মপালন করা হইল এইরূপ মনে করা হয়। বিনোবাজী সর্বোদয়-পাত্রের মাধ্যমে আমাদের ধর্মের পুরাতন ভাবধারাকে নবরূপদান করিয়া উহাতে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে আমাদের দেশে যে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন ছিল বা এখনও কোথাও কোথাও আছে সর্বোদয়-পাত্র তাহার নব সংস্করণ মাত্র। এরূপ চিন্তা করা ভুল। উহা যদি ভিক্ষা হইত তবে ছোট ছেলের এক মুষ্টি চাউল দেওয়ার নিয়ম করা হইত না। বড় মুষ্টির কথাই হইত। যে কোনও কার্যের জন্য উহা লওয়া হউক না কেন তাহাকে ভিক্ষা মনে করা ঠিক নহে। সর্বোদয়-পাত্র ভিক্ষা নহে। উহা দীক্ষাদান করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া। সাধারণ মুষ্টিভিক্ষার পশ্চাতে

কোন বিপ্লবাত্মক ভাবনা নাই। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, মুষ্টিভিক্ষার সহিত সর্বোদয়-পাত্রের কোন সাদৃশ্য বা সম্পর্ক নাই।

সর্বোদয়-পাত্রে খাদ্যশস্য রাখার কাজ বাড়ীর ছোট ছেলের হাত দিয়া করানোর ব্যবস্থাও এক ক্রান্তিকারক পদ্ধতি। ইহা বালক-বালিকাদের পক্ষে এক শিক্ষাক্রমস্বরূপ হইবে। তাহারা শৈশব অবস্থা হইতে সমাজের জন্য কিছু অর্পণ করার শিক্ষা লাভ করিতে থাকিবে এবং ঐভাবে সর্বোদয়-বিচারের বীজ তাহাদের তরুণ হৃদয়ের উর্বর ভূমিতে উপ্ত হইবে। কি প্রকারে শিশুর এই শিক্ষা হইতে থাকিবে তাহা বিনোবাজী যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"ছোট ছেলের কথা আমি কেন বলিয়াছি জানেন? ছোট ছেলের কথা এইজন্য বলিয়াছি যে প্রতিদিন ছেলেকে খাইতে দেওয়ার পূর্বে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'আরে, সর্বোদয়ের ভাঁড়ে চাউল রেখেছিস?' যদি ছেলে ভুলিয়া গিয়া থাকে তবে মা বলিবেন, 'যা, প্রথমে সর্বোদয়-পাত্রে চাউল রেখে আয় তবে খেতে পাবি।' এইভাবে ধর্ম-প্রতিষ্ঠার খুব বড় কাজ হইবে বলিয়া আমি মনে করি।"

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে সর্বোদয়-কর্মীকে যদি তাঁহার আর্থিক ব্যবস্থার জন্য সর্বোদয়-পাত্রের উপর নির্ভর করিতে হয় তবে তাহা ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করার মতই হইবে। এই আশঙ্কাও ভিত্তিহীন। সর্বোদয়-সেবক নিষ্কাম সেবা করিবেন, শরীর-শ্রমনিষ্ঠ হইবেন। সমাজ-সেবার জন্য সেবক ক্ষেতের কাজও করিবেন। কিন্তু শ্রমমূলক হউক বা অন্য-কিছু হউক সেবার কাজ করিয়া তাহার জন্য সেবক সাক্ষাৎভাবে কোন পারি-শ্রমিক লইবেন না। সেবক প্রয়োজনমত অন্যান্য সেবাকার্যের কাজের সহিত শরীর-শ্রমেরও কাজ করিয়া যাইবেন এবং সমাজ স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা করিবেন—ইহাই বাঞ্ছনীয়। নচেৎ সেবক যদি শরীর-শ্রম করিয়া পারিশ্রমিকের উপর তাঁহার যোগক্ষেমের জন্য নির্ভর করিয়া থাকেন তবে তাঁহার দ্বারা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বাজারদর ও রীতি এবং বর্তমান সমাজগঠন অক্ষুণ্ণ রাখারই কাজ হইবে। সর্বোদয়-সেবকের আর্থিক ব্যবস্থাও সমাজ-ক্রান্তির পরিপোষক হওয়া চাই। এই

দৃষ্টিতে সর্বোদয়-পাত্রের মাধ্যমে সর্বোদয়-কর্মীর তথা শান্তি-সৈনিকের যোগক্ষেমের ব্যবস্থা যে আদর্শ ব্যবস্থা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপরে বলা হইয়াছে যে সর্বোদয়-পাত্র সর্বোদয়ের গ সা গু (গরীষ্ঠ সাধারণ গুণীয়ক) মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও বিনোবাজী আশা করেন যে যাঁহাদের ঘরে 'সর্বোদয়-পাত্র' থাকিবে, তাঁহারা যেন উহাকে ক্রমশ 'সংস্কৃত সর্বোদয়-পাত্রে' পরিণত করেন। যাঁহাদের ঘরে সর্বোদয়-পাত্র থাকিবে তাঁহারা নিজদিগকে যেন ক্রমশ 'সর্বোদয়-পাত্রে' পরিণত করেন, অর্থাৎ তাঁহারা নিজেরা যেন সর্বোদয়ের পাত্র হন, তাঁহাদের জীবন যেন ক্রমশ নির্মল ও সর্বোদয়ের পরিপোষক হইতে থাকে। উপরন্তু, সর্বোদয়-পাত্র শান্তি-সেনার জন্য। সুতরাং যাঁহারা সর্বোদয়-পাত্র রাখিবেন তাঁহারা যেন কোনপ্রকার অশান্তির কাজে অংশ গ্রহণ না করেন।

ভূদানযজ্ঞরূপ কার্য সম্পাদনে সর্বোদয়-পাত্রের স্থান কোথায় তাহা বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। গীতায় বলা হইয়াছে যে, কার্য সম্পাদন করিবার জন্য পাঁচ প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। তাহা হইতেছে এইঃ—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধং।
বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্।"

--অর্থাৎ (১) অধিষ্ঠান, (২) কর্তা, (৩) বিবিধ করণ, (৪) নানাবিধ চেষ্টা (প্রয়াস) ও (৫) দৈব। অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়, অবলম্বন। কর্তা অর্থাৎ যিনি কার্য সম্পাদন করিবেন। করণ অর্থাৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সাধন বা উপায়। বিবিধ চেষ্টা অর্থাৎ কর্ম-প্রচেষ্টা। দৈব অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপা। স্বাধীনতা লাভের পর বিনোবাজী আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সামূহিক অহিংসার প্রয়োগরূপে যে কার্য সম্পাদন করিতেছেন তাহার অধিষ্ঠানস্বরূপ ভূমি সমস্যাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভূমিকে অবলম্বন করিয়া সমাজে অহিংসা প্রয়োগের কার্য চলিতেছে। উহার জন্য কর্তা প্রয়োজন। সেবকগণ উহার 'কর্তা। বিভিন্ন উপকরণ বা সাধনের প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত বিনোবাজী কর্ম-সাধনের জন্য দুই প্রধান করণ বা উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম হইতেছে সম্পত্তিদান ও দ্বিতীয় হইতেছে সম্মতিদান। সর্বোদয়-পাত্রের মাধ্যমে জনগণের সম্মতি পাওয়া যাইতেছে।

গৃহে সর্বোদয়-পাত্র রাখিলে প্রতিদিনই সর্বোদয়ের কথা স্মরণ করিতে হইবে। সর্বোদয় হইতেছে এই যুগের মন্ত্র। সর্বোদয় মন্ত্রের নিয়মিত স্মরণে উহার জপ করা হইবে। আর সর্বোদয়-পাত্রে চাউলাদি রাখা ও উহা নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজ হইবে তপস্যা। লক্ষ লক্ষ গৃহে এরূপে সর্বোদয় মন্ত্রের জপ ও তপ চলিতে থাকিলে এক বিরাট শক্তির উদ্ভব হইবে এবং সমাজে সামূহিক অহিংসা-ধর্মের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পথ সুগম হইবে।

দেশের বিভিন্নস্থানে লক্ষাধিক সর্বোদয়-পাত্র চলিতেছে। বহু লক্ষ সর্বোদয়-পাত্র বিভিন্নস্থানে স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে সর্বোদয়-পাত্র প্রতিষ্ঠা করানো সহজ, কিন্তু উহাদিগকে রক্ষা করা ও ঠিকমত চালু রাখা কঠিন। এজন্য অধিকাংশ সর্বোদয়-পাত্র কিছুদিন ধরিয়া চলিবার পর বন্ধ হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইতেছে সর্বোদয়-পাত্রের চাউলাদি নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা রাখা ও যাঁহারা সর্বোদয়-পাত্র রাখিয়াছেন তাঁহাদের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলা। সর্বোদয়-পাত্রের চাউলাদি সংগ্রহ করার জন্য তিনরকমের ব্যবস্থা এ যাবৎ পরীক্ষা করা হইয়াছে।—(১) যিনি সর্বোদয়-পাত্র রাখিয়াছেন তিনি নিজে এক নির্দিষ্ট সময় অন্তর জমা শস্যাদি কিংবা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোন এক নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন, (২) স্থানীয় সর্বোদয়-অনুরাগী ব্যক্তিগণ (তাঁহাদিগকে 'সর্বোদয়-মিত্র' বলা হয়) উহা সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং (৩) সর্বোদয়-কর্মিগণ নিজেরা উহা সংগ্রহ করিবেন। প্রথমত, যাঁহারা গৃহে সর্বোদয়-পাত্র রাখেন তাঁহাদের আগ্রহ, উৎসাহ ও ধৈর্য বেশী-দিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। প্রতিদিন চাউলাদি রাখা যায়, কিন্তু অন্যত্র পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব পালন করা সহজ নহে। দ্বিতীয়ত, সর্বোদয়-মিত্রগণও বেশী-দিন নিয়মিতভাবে এই কার্য চালাইবার উৎসাহ বজায় রাখিতে পারেন নাই। তৃতীয়ত, বহুস্থানে কর্মীরা সর্বোদয়-পাত্রের চাউলাদি নিজেরা সংগ্রহ করিয়া উহা নিজেদের যোগক্ষেমের জন্য লইতে কুণ্ঠা বোধ করেন। এজন্য তাঁহারা নিজেরা সর্বোদয়-পাত্রের জমা শস্যাদি সংগ্রহ করিতে বেশী উৎসাহ বোধ করেন না। কিন্তু তেনালী অঞ্চলের সর্বোদয়-পাত্রের ব্যবস্থা দেখিলে বা উহার কথা জানিলে তাঁহাদের এই মনোভাব দূর হইবে আশা করা যায়। দেশে যে

সব স্থানে সর্বোদয়-পাত্র চলিতেছে তাহার মধ্যে অন্ধ্র রাজ্যের তেনালী অঞ্চলের সর্বোদয়-পাত্র সর্বাপেক্ষা সুব্যবস্থিত ও নিয়মিতভাবে চলিতেছে। তেনালী, বেজওয়াদা ও গুন্টুর—এই তিনটি শহরে ১৬ হাজারের মত সর্বোদয়-পাত্র কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। তেনালীর ডাঃ সূর্যনারায়ণ ও তাঁহার সহকর্মিগণ উহা সংগঠন করিয়াছেন। সর্বোদয়-কর্মীরা নিজেরা সর্বোদয়-পাত্রের চাউল সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাহাতে কর্মীদের কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করিবার কারণ থাকে না। বরং তাহাদের উৎসাহ ও নিষ্ঠা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহার কারণ হইতেছে এই যে কর্মীরা সেইখানেই সর্বোদয়ের কার্যে রত থাকেন। তাঁহারা সাফাই-এর কাজ করেন, চরকা লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘোরেন, সাহিত্য প্রচার করেন ও সর্বোদয়ের বিচার-প্রচার করেন। এইভাবে তাঁহারা নিরন্তর সেইস্থানে সেবাকার্যে ব্যাপৃত থাকেন। সর্বোদয়-পাত্রের চাউল সংগ্রহ তাঁহাদের বহু সেবাকাজের মধ্যে অন্যতম কাজ। তাহাতে যাঁহারা সর্বোদয়-পাত্র রাখিয়াছেন তাঁহাদের সহিত কর্মীদের (শান্তি-সৈনিক-দের) যোগাযোগ বজায় থাকে ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে যাঁহাদের সেবা করিতেছেন তাঁহাদের নিকট হইতে নিজেদের যোগক্ষেমের জন্য কিছু লইতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। তেনালী অঞ্চলের ব্যবস্থা-প্রণালী অন্যত্র অনুসৃত হইলে সর্বোদয়-পাত্রের স্থায়ীত্বের সুব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বোদয়-পাত্রের নাম দিয়াছেন 'শান্তি-পাত্র'। সর্বোদয়-পাত্রের আয় শান্তি-সৈনিকদের যোগক্ষেমের জন্য ব্যয়িত হয়। উপরন্তু সর্বোদয়-পাত্র যাঁহারা রাখেন তাঁহারা কোনরূপ অশান্তির কাজে অংশ গ্রহণ করিবেন না—এরূপ প্রত্যাশা করা হয়। এই অবস্থায় সর্বোদয়-পাত্রকে 'শান্তি পাত্র'ও বলা যাইতে পারে।

॥ ৬৭ ॥ ষষ্ঠাংশদানের রহস্য

ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে কেহ-কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে, জমিদার-জোতদারেরা এক-ষষ্ঠাংশ ভূমিদান করিয়া অবশিষ্ট পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ আরামে ও

নিরাপদে ভোগ করিতে থাকিবে এবং তাঁহাদের জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলিবে। ইহাতে সমাজে ক্রান্তি আসার সম্ভাবনা কম।—যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ভূদান-যজ্ঞ ভূমি ও সম্পত্তির মালিকানা বিসর্জনের দীক্ষাদানের আন্দোলন। যিনি আজ এক-ষষ্ঠাংশ দান করিলেন তিনি কাল উহা অপেক্ষা অধিক দান করিবেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁহার সম্পত্তির মালিকানা-বিসর্জন সম্পূর্ণ না হয় ততদিন তাঁহার দান চলিতে থাকিবে এরূপ আশা করা হয়। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"রবারকে আরম্ভেই খুব বেশী করিয়া টানিলে উহা ছিঁড়িয়া যায়। অতএব ধীরে-ধীরে উহা টানা চাই। এইজন্য আমি এখন মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ চাহিতেছি। আজ তো সবটাই মালিক নিজের কাছে সঞ্চিত রাখিয়া থাকে। সমাজের এই রীতি চলিতেছে। এইজন্য আমি প্রথমে এক-ষষ্ঠাংশ চাহিতেছি। পরে অধিক চাহিব। ব্যক্তির গুণ বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া আবশ্যক।" বিনোবাজী সম্পত্তিদান সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছেন। ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। তিনি রাঁচীতে বিহার প্রদেশের ভূদানকর্মীদের শিবিরে যে ভাষণ দেন তাহাতে এই কথা আরও স্পষ্টভাবে বলেন। তিনি বলেন—"বিহারে আমরা অধিক গভীরতায় প্রবেশ করিতেছি। আমি এখানে কেবলমাত্র জমি ও দানপত্রের কোটা বৃদ্ধি করি নাই, পরন্তু গ্রামবাসীদিগকে এইরূপ বুঝাইতেছি—গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্রদিগকে ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা আপনাদিগকে করিতে হইবে এবং সকলে মিলিয়া আপনাদের ইহা করা চাই। প্রথমে আমি বলিব, প্রত্যেক গ্রাম হইতে ৫।১০ একর পাওয়া চাই। পরে আরও এক-পা অগ্রসর হইব। গভীরতায় প্রবেশ করিতে হইলে ধীরে-ধীরে যাইতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে দানপত্র লইতে হইবে। অতঃপর আমি চূড়ান্ত পদক্ষেপ করিব এবং লোককে বলিব—'এখন মালিকানা একেবারেই বিসর্জন দিতে হইবে। কর্মীদের ভূদানযজ্ঞের দর্শনের পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই। আপনাদের সকলের এই দৃষ্টি থাকা চাই এবং ক্রমে-ক্রমে এক-এক পা অগ্রসর হওয়া চাই।" এ সম্পর্কে তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন—"লোকে জিজ্ঞাসা করে যে, এক-ষষ্ঠাংশ দিলে পরে আবার চাহিবেন না তো? আমি বলি, ধর্মকার্যের কি কখনও

শেষ আছে? তাহাতে বন্ধন আসে। শেষে সর্বকিছু দিয়া গরীবের সেবায় লাগিয়া যাওয়া চাই। বামনের তিনটি পা। বামনের তৃতীয় পদক্ষেপে যেরূপ হইয়াছিল তদ্রূপ অবশেষে আমাদিগকে গরীব হইয়া যাইতে হইবে এবং জীবনকে সাদাসিধা করিয়া তুলিতে হইবে।

"সন্তানকে উঠাইবার সময় মাতাকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয়। সেইরূপ গরীবকে উঠাইতে গিয়া আমাদের জীবনযাত্রার মানকে কিছু নীচু করিতে হইবে। এক-ষষ্ঠাংশ দানের দ্বারা ইহার আরম্ভ হইয়াছে।"

সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কেও অনুরূপ আপত্তি উঠিয়া থাকে। বিনোবাজী উপরোক্তরূপে উহা খণ্ডন করিয়াছেন।

॥ ৬৮ ॥ ভূমি-বিতরণ

ভূদানযজ্ঞের কর্মীদের শক্তি, সামর্থ্য ও সময় যাহাতে একনিষ্ঠভাবে ভূমিদান সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভূমিদান সংগ্রহের সঙ্গে প্রথমে ভূমি-বিতরণের কাজ আরম্ভ করা হয় নাই। পরে উহা যখন আরম্ভ করা হয় তখনও সর্বত্র উহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই। বুদ্ধগয়া-সম্মেলনের পর হইতে ভূমি-বিতরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ভূমি-বিতরণের ফলে ভূদানযজ্ঞের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ স্বরূপ জনগণের নিকট প্রতিভাত হইবে। ভূমি-সংগ্রহ অপেক্ষা ভূমি-বিতরণের কাজ অধিক শ্রমসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ। ভূমি-বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের ন্যায়-পরায়ণ, নিরপেক্ষ মনোভাবসম্পন্ন ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইবে। উপরন্তু বিনোবাজী বিতরণ সম্পর্কে যে সব নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা যথাযথ পালন করিতে হইবে। নচেৎ বিতরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। বিতরণ সম্পর্কীয় নিয়মাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—(১) বিতরণকার্য গ্রামের সার্বজনিক সভায় করিতে হইবে। (২) বিতরণের নির্দিষ্ট তারিখের সাতদিন পূর্বে একবার এবং একদিন পূর্বে আরেকবার বিতরণের বিজ্ঞপ্তি ঢোল-শোহরৎ দ্বারা প্রচার

করিতে হইবে। (৩) গ্রামের অধিবাসীদের সর্বসম্মতিক্রমে, অন্যথায় ভূমিহীনদের সর্বসম্মতিক্রমে ভূমি বিতরণ করিতে হইবে। তাহাতে মতভেদ ঘটিলে লটারি করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সব কার্যই একই সভায় শেষ করিতে হইবে। (৪) ভূমি-বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মী সভায় মাত্র সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত থাকিবেন, সেবকস্বরূপ থাকিবেন, নির্ণায়কস্বরূপ নহেন। এই ব্যাপারে যেন কিছুমাত্রও পক্ষপাতের ভাব না থাকে। (৫) যতদূর সম্ভব দানপ্রাপ্তভূমির এক-তৃতীয়াংশ হরিজনদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। (৬) সাধারণত যে-গ্রামে ভূমিদান পাওয়া গিয়াছে সেই গ্রামেরই ভূমিহীন দরিদ্রেরা ভূমি পাইবে। ভূমিহীনদের মধ্যে যে-ব্যক্তির কখনও জমি ছিল না তাহার দাবী সর্বাগ্রগণ্য হইবে। বিতরণের পর ভূমি উদ্বৃত্ত থাকিলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভূমিহীনগণ ভূমি পাইতে পারে।*

ভূমি-বিতরণ ব্যাপারে একটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ভূমি-প্রাপকের মনে যেন এরূপ ধারণা না জন্মে যে, গরীব বলিয়া দয়া করিয়া তাহাকে ভূমি দেওয়া হইতেছে। গরীবকে যে-অধিকার হইতে এতদিন বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল সেই অধিকারই মাত্র তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইতেছে। কর্মীদের সমস্ত কাজের মধ্য দিয়া এরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে লোকে মনে করিবে যে, আজ পর্যন্ত ভূমিহীনকে ভূমি দিতে না পারায় সমাজের পক্ষে এক মস্তবড় অন্যায় করা হইতেছিল এবং ভূদানযজ্ঞের দ্বারা সেই ভুলেরই সংশোধন করা হইতেছে।

জমি যিনি নিজে চাষ করেন না এবং বিনা পরিশ্রমে জমির উৎপন্ন ফসল ভোগ করিতে চান, তিনি জমির মালিক হইতে পারেন না। যিনি শ্রম করিতে পারেন তিনি আজ তাঁহার অধিকার ফিরিয়া পাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার যেন স্মরণ থাকে যে, অধিকারের অপর দিক হইতেছে কর্তব্য। কর্তব্য যথাযথ পালন করিলে তবেই অধিকারলাভ সার্থক হয়। ইহা ভূমি-প্রাপকের

* 'বিঘায় কাঠা ভূমিদান' অভিযানে প্রাপ্ত ভূমির বিতরণ সম্পর্কে এই নিয়ম করা হইয়াছে যে দাতা উহা বিতরণ করিবেন। তিনি তাঁহার পছন্দমত যে কোন ভূমিহীন দরিদ্রকে উহা দিতে পারিবেন। কর্মীরা তাঁহাকে বিতরণ সম্পর্কে সাহায্য করিতে পারেন।

শেষ আছে? তাহাতে বন্ধন আসে। শেষে সবকিছু দিয়া গরীবের সেবায় লাগিয়া যাওয়া চাই। বামনের তিনটি পা। বামনের তৃতীয় পদক্ষেপে যেরূপ হইয়াছিল তদ্রূপ অবশেষে আমাদিগকে গরীব হইয়া যাইতে হইবে এবং জীবনকে সাদাসিধা করিয়া তুলিতে হইবে।

"সন্তানকে উঠাইবার সময় মাতাকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয়। সেইরূপ গরীবকে উঠাইতে গিয়া আমাদের জীবনযাত্রার মানকে কিছু নীচু করিতে হইবে। এক-ষষ্ঠাংশ দানের দ্বারা ইহার আরম্ভ হইয়াছে।"

সম্পত্তিদানযজ্ঞ সম্পর্কেও অনুরূপ আপত্তি উঠিয়া থাকে। বিনোবাজী উপরোক্তরূপে উহা খন্ডন করিয়াছেন।

॥ ৬৮ ॥ ভূমি-বিতরণ

ভূদানযজ্ঞের কর্মীদের শক্তি, সামর্থ্য ও সময় যাহাতে একনিষ্ঠভাবে ভূমিদান সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভূমিদান সংগ্রহের সঙ্গে প্রথমে ভূমি-বিতরণের কাজ আরম্ভ করা হয় নাই। পরে উহা যখন আরম্ভ করা হয় তখনও সর্বত্র উহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই। বুদ্ধগয়া-সম্মেলনের পর হইতে ভূমি-বিতরণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ভূমি-বিতরণের ফলে ভূদানযজ্ঞের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ স্বরূপ জনগণের নিকট প্রতিভাত হইবে। ভূমি-সংগ্রহ অপেক্ষা ভূমি-বিতরণের কাজ অধিক শ্রমসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ। ভূমি-বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের ন্যায়-পরায়ণ, নিরপেক্ষ মনোভাবসম্পন্ন ও বৈপ্লবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হইতে হইবে। উপরন্তু বিনোবাজী বিতরণ সম্পর্কে যে সব নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা যথাযথ পালন করিতে হইবে। নচেৎ বিতরণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। বিতরণ সম্পর্কীয় নিয়মাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ—(১) বিতরণকার্য গ্রামের সার্বজনিক সভায় করিতে হইবে। (২) বিতরণের নির্দিষ্ট তারিখের সাতদিন পূর্বে একবার এবং একদিন পূর্বে আরেকবার বিতরণের বিজ্ঞপ্তি ঢোল-শোহরৎ দ্বারা প্রচার

করিতে হইবে। (৩) গ্রামের অধিবাসীদের সর্বসম্মতিক্রমে, অন্যথায় ভূমিহীনদের সর্বসম্মতিক্রমে ভূমি বিতরণ করিতে হইবে। তাহাতে মতভেদ ঘটিলে লটারি করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। সব কার্যই একই সভায় শেষ করিতে হইবে। (৪) ভূমি-বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মী সভায় মাত্র সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত থাকিবেন, সেবকস্বরূপ থাকিবেন, নির্ণায়কস্বরূপ নহেন। এই ব্যাপারে যেন কিছুমাত্রও পক্ষপাতের ভাব না থাকে। (৫) যতদূর সম্ভব দানপ্রাপ্তভূমির এক-তৃতীয়াংশ হরিজনদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। (৬) সাধারণত যে-গ্রামে ভূমিদান পাওয়া গিয়াছে সেই গ্রামেরই ভূমিহীন দরিদ্রেরা ভূমি পাইবে। ভূমিহীনদের মধ্যে যে-ব্যক্তির কখনও জমি ছিল না তাহার দাবী সর্বাগ্রগণ্য হইবে। বিতরণের পর ভূমি উদ্বৃত্ত থাকিলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভূমিহীনগণ ভূমি পাইতে পারে।*

ভূমি-বিতরণ ব্যাপারে একটি বিষয় সম্পর্কে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ভূমি-প্রাপকের মনে যেন এরূপ ধারণা না জন্মে যে, গরীব বলিয়া দয়া করিয়া তাহাকে ভূমি দেওয়া হইতেছে। গরীবকে যে-অধিকার হইতে এতদিন বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল সেই অধিকারই মাত্র তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইতেছে। কর্মীদের সমস্ত কাজের মধ্য দিয়া এরূপ আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে লোকে মনে করিবে যে, আজ পর্যন্ত ভূমিহীনকে ভূমি দিতে না পারায় সমাজের পক্ষে এক মস্তবড় অন্যায় করা হইতেছিল এবং ভূদানযজ্ঞের দ্বারা সেই ভুলেরই সংশোধন করা হইতেছে।

জমি যিনি নিজে চাষ করেন না এবং বিনা পরিশ্রমে জমির উৎপন্ন ফসল ভোগ করিতে চান, তিনি জমির মালিক হইতে পারেন না। যিনি শ্রম করিতে পারেন তিনি আজ তাঁহার অধিকার ফিরিয়া পাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার যেন স্মরণ থাকে যে, অধিকারের অপর দিক হইতেছে কর্তব্য। কর্তব্য যথাযথ পালন করিলে তবেই অধিকারলাভ সার্থক হয়। ইহা ভূমি-প্রাপকের

* 'বিঘায় কাঠা ভূমিদান' অভিযানে প্রাপ্ত ভূমির বিতরণ সম্পর্কে এই নিয়ম করা হইয়াছে যে দাতা উহা বিতরণ করিবেন। তিনি তাঁহার পছন্দমত যে কোন ভূমিহীন দরিদ্রকে উহা দিতে পারিবেন। কর্মীরা তাঁহাকে বিতরণ সম্পর্কে সাহায্য করিতে পারেন।

মনে ভালভাবে অঙ্কিত করিতে হইবে। এইজন্য জমি লইয়া যাহা খুশী তাহা করিবার অধিকার তাঁহার নাই। জমি নষ্ট করিলে, জমিতে কম ফসল উৎপন্ন করিলে অথবা জমি পতিত রাখিলে তিনি ঈশ্বরের নিকট এবং সমাজের নিকট অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন।

সর্বোপরি, ভূমি-বিতরণের সময় হইতে ভূমি-প্রাপককে সর্বোদয়ের দীক্ষা দান করিতে হইবে, তাঁহাকে সর্বোদয়ের ভাবধারায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই দায়িত্ব কর্মীদের। তাঁহার পরিবারকে 'সর্বোদয়-পরিবার' স্বরূপে সংগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। এইজন্য মাদকতার ছোঁয়াচ পর্যন্ত যেন তাঁহার না লাগে। জীবিকার পরিপূরক উপায়স্বরূপ তাঁহার বস্ত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাঁহাকে ঢেঁকিতে চাউল তৈয়ারী করিয়া লইতে ও চাকিতে গম পিষিয়া লইতে হইবে। এরূপে সর্বোদয়ের পথে তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই ভূমি-বিতরণের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে।

॥ ৬৯ ॥ ভূমির বিখণ্ডীকরণ

এরূপ আপত্তি করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞের দ্বারা ভূমি আরও টুক্‌রা হইয়া যাইতেছে, কারণ দুই-চারি কাঠা ভূমিদানও গ্রহণ করা হয়। ঐ আপত্তি দূর করিবার জন্য বিনোবাজী বলিয়াছেন—"কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আজ হৃদয় টুকরা-টুকরা হইয়া আছে, ইহা কি আপনাদের ভাল লাগিতেছে? আজ সকলেরই হৃদয় টুকরা-টুকরা হইয়া রহিয়াছে। যদি হৃদয়ের টুকরা জুড়িয়া দেওয়া যায় তবে জমির টুকরাও সহজেই জুড়িয়া দেওয়া যাইবে। গরীবদিগকে জমি দেওয়া হইলে তাহাদিগকে সমবায়ের মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইবে না। প্রথম হইতেই যদি সমবায়ের সর্ত লাগানো যায়, তবে তাহা প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইবে এবং তাহার জন্য ম্যানেজারের আবশ্যক হইবে। এইজন্য জমির মালিক পরমেশ্বর—ইহা বুঝাইয়া দিয়া আমি আজ গরীবকে জমির উপর তাঁহার পূর্ণ অধিকার দিতে চাহিতেছি। হৃদয় জুড়িতে হইবে এবং জমির টুকরাগুলিও জুড়িতে হইবে। কোন্‌টি প্রথম জুড়িতে হইবে তাহা বুদ্ধির বিষয়। যেখানে হৃদয়ই ভগ্ন হইয়া আছে

সেখানে কি জমি জোড়া দেওয়া সম্ভব হইবে? এক ভাই আমাকে বলিয়াছেন, 'লোক যখন কো-অপারেশন করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে তখন আমি জমি দিব।' তাহাতে আমি তাঁহাকে বলি, 'আপনি লোককে এই জন্য বুঝান।' ইহাতে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা হইল। কারণ লোকে বলিতে লাগিল— 'আমরা সমবায়ের মধ্যে যাইব না।' আমরা নিজেরাই অন্যান্য কাজে সমবায় করি না। কিন্তু আমরা ঐ গরীব লোকের উপর সমবায়ের সর্ত আরোপ করিতে চাই ও বলি—'সমবায় কর'। তাহাতে উহাদের উপর প্রতিবন্ধকতা চাপানো হইবে। উপরন্তু উহারা আজ ভীত হইয়া আছে। তখন সেই ভাই আমার কথা বুঝিতে পারিলেন যে, প্রথমে হৃদয় জুড়িয়া দেওয়া আবশ্যক।"

॥ ৭০ ॥ বিখণ্ডীকৃত ভূমির উৎপাদন

এরূপ আপত্তি করা হয় যে, ভূদানযজ্ঞের ফলে জোত আরও বেশী খণ্ডিত হইলে, উৎপাদন কম হইবে। এই আপত্তির কোন ভিত্তি নাই। চীন ও জাপানে গড়ে জোত হইল মাত্র দুই একরের মত, কিন্তু উৎপাদন আমাদের দেশের তিনগুণ। উৎপাদনের হার জমি বড় কি ছোট তাহার উপর খুব বেশী নির্ভর করে না। বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া জমি আবাদ করা হয় কিনা তাহাই আসল কথা। যেখানে চাষ-আবাদে বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ করা হয় সেখানে বেশী ফসল জন্মে। শ্রীমন্নারায়ণ আগরওয়াল তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"পৃথিবীব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে ইহা পর্যাপ্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে জমির ক্ষেত্রফল বর্ধিত হইলে এবং যন্ত্র ব্যবহার করিলে ঐ জমির কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু একর প্রতিও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এমন কোন কথা নাই। বস্তুত ভারতবর্ষের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে আত্যন্তিক কৃষিই (ইন্টেন্সিভ্ কাল্টিভেশন্) অর্থনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। অবশ্য ইহা ঠিক যে, ছোট-ছোট জমির কৃষকদিগকে ভাল বীজ, সার, জল-সেচ এবং সমবায়-পদ্ধতিতে বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে হইবে।" জমিতে কমবেশী ফসল উৎপাদনের ব্যাপারে আরও একটি প্রধান কারণ আছে। যেখানে জমিতে

চাষীর পূর্ণ অধিকার থাকে সেখানে উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে। মজুর বা ভাগচাষীদ্বারা চাষ করিলে উৎপাদন কম হয়। ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতা। চাষীকে জমিতে পূর্ণ অধিকার না দেওয়া পর্যন্ত জমিতে উপযুক্ত সার বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগ করিবার বা জমিতে অধিক পরিশ্রম করিবার দিকে চাষীর প্রেরণা জাগানো সম্ভব নহে। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"ছোট টুকরায় উৎপাদনের হার অধিক অথবা বড় টুকরায় উৎপাদনের হার অধিক এই আলোচনা আর কি করিবেন? ইহা অর্থশাস্ত্রের এক মামুলী কথা যে, যে-প্রকার টুকরায় উৎপাদন বেশী হইবে সেরূপ টুকরা তৈয়ারী করা উচিত। আসল কথা, হৃদয় জুড়িয়া গেলে জমিতে অধিক ফসল হয়, ভূমির কেবল ছোট বা বড় টুকরা দ্বারা তাহা হয় না। পরিশ্রমের দ্বারা অধিক ফসল হয়—ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা। ছোট টুকরায় অধিক ফসল উৎপন্ন হয় ইহা জগতের কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে। মজুরকে যদি আমরা জমির মালিক করি, তবে সে আগ্রহ-পূর্বক জমি চাষ করিবে ও তাহাতে জমির উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যেখানে অধিক ফসল উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে অনুসন্ধান লইলে জানা যায় যে, ঐ জমির মালিক গরীব। আর যেখানে ফসল কম হইয়াছে সেখানে অনু-সন্ধানে জানা যায় যে, ঐ জমির মালিক ধনী। অ্যাবসেন্টী ল্যান্ডলর্ড-এর (অনুপস্থিত মালিক) কথা সকলেই জানেন। অতএব অর্থশাস্ত্রের এইসব ছোটখাট প্রশ্ন উঠাইবেন না। আমাদের কাজ ক্রান্তির কাজ—যাহাতে সমাজের আমূল পরিবর্তন হইবে।"

॥ ৭১ ॥ সিলিং-এর প্রশ্ন

ভূমি-সমস্যা সমাধানকল্পে ভূমি-বন্টনের কথা আজ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে জমির মালিকদের সর্বাপেক্ষা কতবেশী জমি রাখিতে দেওয়া হইবে তাহা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা হইতেছে। 'সিলিং' নামে এইকথা আজকাল সর্বত্র চালু হইয়াছে। অনেকে ভাবেন, সিলিং ধার্য করিয়া দিলে ভূমি-সমস্যার সমাধান হইবে। এই ধারণা ভ্রান্ত। যাঁহারা সিলিং-এর কথা উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহদের দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। বড়-বড় জমির

মালিকদের মালিকানা কতদূর রক্ষা করা যায় তাহাতেই তাঁহাদের আগ্রহ। ভূমিহীন দরিদ্ররা জমি পাইবে কি পাইবে না তাহাতে তাঁহাদের আগ্রহ নাই। অথচ ভূমিহীন দরিদ্রের জন্য ভূমির ব্যবস্থা করার সমস্যা আজ দেশের সর্বাপেক্ষা জরুরী ও বুনিয়াদী সমস্যা। প্রথমে ভূমিহীন দরিদ্রের জন্য ব্যবস্থা করা, পরে অন্যসব কথা—এরূপ হইলে সমাধান হইতে পারে। এই বুনিয়াদী সমস্যাকে অগ্রাধিকার দান করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি আমরা তাহা করি, তবে সিলিং-এর প্রশ্ন উঠে না। আর যদি উঠে তবে তাহা নিতান্ত গৌণ হইয়া পড়ে। অন্যদিকে যদি সিলিং-এর কথা অগ্রগণ্য করিয়া অগ্রসর হই, তবে বড়-বড় ভূমির মালিকেরা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে জমি হস্তান্তর করিয়া দিয়া নিজেদের হাতে সিলিং-এর অনতিরিক্ত জমি রাখিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। সিলিং ধার্য হইবে এই আশঙ্কায় জমির বড় মালিকেরা ঐভাবে বহু জমি হস্তান্তর করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অতএব ছোট সিলিং ধার্য করিলেও ভূমিহীনের জন্য বেশীকিছু অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। প্রথমে প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি দিয়া পরে উদ্বৃত্ত জমি লইয়া যাঁহারা সিলিং ধার্য করিতে চাহেন তাঁহারা তাহা পরে করিতে পারিতেন। এজন্য বিনোবাজী সিলিং ধার্য করার পক্ষপাতী নহেন। তিনি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, "সিলিং-এর কথা বিপজ্জনক। এই কথা আমাদের উঠানো ঠিক হইবে না। আজ ঐ কথা সকলে বলিতেছে। আমি বলিয়াছি, আমি সিলিং চাই না—আমি চাই 'ফ্লোরিং'। সকলে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লউক যে, প্রত্যেক পরিবারকে ৫ একর করিয়া জমি দিতে হইবে এবং উহার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা লইয়া যাহা হউক করা যাইতে পারে। কোন-কোন লোক বলেন—আপনার কথামত 'রুফিং' করিলে উহা এত নীচু হইবে যে, ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি বলিয়াছি—তাহতে কোন ক্ষতি নাই। আমার দিল্লীর 'সিলিং'-এর প্রয়োজন হইবে না—গ্রামের 'সিলিং' চাই। আমি রাঁচীতে দেখিয়াছি যে, ৩০ একরের 'সিলিং' হইলেও ভূমিহীনেরা কোন জমি পাইবে না। জমিওয়ালা লোকেরা নিজেদের পরিবারের লোক ও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ঐ জমি বন্টন করিয়া লইবে। তেলঙ্গানাতেও সিলিং-এর কথা চলিয়াছিল। সেখানে জমির

মালিকেরা ঐরূপই করিয়াছিল। সেখানে দুইশত একরের সিলিং করিবার কথা হইয়াছিল। যদি ৩০ একরের মত ছোট সিলিং ধার্য করা হয়, তবে অনেক ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বিনা ক্ষতিপূরণে আজ কোন জমি কাড়িয়া লওয়া চলে না। আর বড় সিলিং রাখিলে কোন জমিই পাওয়া যাইবে না। এইজন্য আমরা চাহিতেছি যে, গ্রামের জমি গ্রামের সব লোকেরই হউক। সর্বাপেক্ষা ছোট জোতের তিনগুণ পর্যন্ত জমি রাখিতে পারা যাইবে এরূপ কথা উঠিয়াছে। কিন্তু যদি সকলেই পেট ভরিয়া খাইতে না পায়, তবে কাহাকেও তিনগুণ করিয়া খাইবার অধিকার কেন দেওয়া হইবে? কোনব্যক্তি অন্য কোন লোকের চেয়ে তিনগুণ জমি চাষ করিতে পারে না। তবে তিনগুণ জমি রাখিবার অধিকার কেমন করিয়া তাহার হইবে? অতএব এই সমস্ত আলোচনায় কোন সার পদার্থ নাই। আমাদিগকে বুনিয়াদী বিষয় সম্পর্কে ভাবিতে হইবে। আমরা চাই যে, গ্রামের জমি গ্রামেরই হইবে। সরকার আইনের বলে ইহা করিতে পারিবেন কি? সিলিং ধার্য করিলে কী কাজ হইবে? আজ বড়-বড় লুণ্ঠনকারী রহিয়াছে। উহার স্থলে ছোট-ছোট লুণ্ঠনকারীর সৃষ্টি হইবে। তাহাতে লুণ্ঠকারীদের দল বৃদ্ধি হইবে মাত্র।" ঐ সম্পর্কে অন্য একস্থানে তিনি ঐ কথাই বলিয়াছেন—"ভূমি-সমস্যা সমাধানের জন্য সিলিং-এর কথা উঠিতেছে। কিন্তু সিলিং-এর দ্বারা কাজ হইবে না, ফ্লোরিং-এর প্রয়োজন। যদি আইন করিতে হয়, তবে এমন আইন করা দরকার যাহাতে প্রত্যেক কৃষক কমপক্ষে ৫ একর করিয়া ভূমি পায়।"

॥ ৭২ ॥ কৃষি সর্বোত্তম শরীর-শ্রম ও শ্রেষ্ঠ জীবিকা

বিনোবাজী সবরমতী-আশ্রমে থাককালীন রান্না করার কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া মেথরের কাজ পর্যন্ত আশ্রমের সর্বপ্রকার শরীর-শ্রমের কাজেই অংশগ্রহণ করিতেন। ওয়ার্ধা সত্যাগ্রহ-আশ্রমের পরিচালকরূপে তিনি আশ্রম-বাসীদের পক্ষে যে-একাদশ ব্রত পালন অত্যাবশ্যক বলিয়া স্থির করেন তাহার মধ্যে শরীর-শ্রম অন্যতম। সূতাকাটার সর্বপ্রকার প্রক্রিয়ায় তিনি বিশেষজ্ঞ। বয়নের কাজ, ছুতারের কাজ প্রভৃতি সর্বপ্রকার উৎপাদক শ্রমের কাজ তিনি

নিজহাতে বহুদিন যাবৎ করিয়াছেন। পওনার 'পরমধাম'-আশ্রমে 'কাঞ্চনমুক্তি'-সাধনায় তিনি কৃষির কাজ গভীরভাবে করিয়াছেন এবং উহার সূক্ষ্ম দর্শন লাভ করিয়াছেন। এরূপে এই শ্রমযোগী উৎপাদক-শ্রমমূলক কাজের সহিত কৃষিকার্যের তুলনামূলক বিচার করিয়া এই অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যতপ্রকার শরীর-শ্রমের কাজ আছে তন্মধ্যে ক্ষেতের কাজ সবচেয়ে উত্তম। কেন-যে কৃষির কাজ সর্বোত্তম শরীর-শ্রম তাহা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যেঃ—

(১) কৃষির কাজে স্বচ্ছ ও মুক্ত হাওয়ায় ব্যায়াম হয়।

(২) কৃষি কাজ করিতে করিতে আকাশ সেবন করা হইয়া থাকে।

(৩) কৃষিকার্যের দ্বারা মৌলিক উৎপাদন হয়। অর্থাৎ অন্য যাহা-কিছু উৎপন্ন হয় তাহা কৃষিজাত দ্রব্য হইতে বা কৃষিজাত দ্রব্যের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়।

(৪) কৃষির কাজ সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক কাজ।

(৫) কৃষিক্ষেত্রের বিরাট মূর্তি ঈশ্বরের সর্বোত্তম মূর্তি। এইজন্য কৃষির কাজ পরমেশ্বরের উপাসনা।

(৬) ক্ষেতে কাজ করিলে মানুষ দীর্ঘজীবী হইবে ও দেশে রোগ কম হইবে।

(৭) কৃষির কাজ করিলে ব্রহ্মচর্য-পালন সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

প্রাচীনকাল হইতে ঋষিগণ জীবিকা উপার্জনের কাজের মধ্যে কৃষিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া আসিয়াছেন। এইপ্রসঙ্গে মনু কি বলিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হইতে পারে। এজন্য মনুসংহিতা হইতে এতদ্-সম্পর্কীয় বচন নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ—

"ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাখ্যয়া বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥"

"ঋতবৃত্তি ও অমৃতবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা যাইতে পারে, অথবা মৃতবৃত্তি বা প্রমৃতবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা যায়, কিংবা সত্যানৃত-বৃত্তির দ্বারাও জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, কিন্তু জীবিকার জন্য কদাপি শ্ববৃত্তি (কুক্কুরবৃত্তি) অবলম্বন করিবে না।"

ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত ইত্যাদি বৃত্তি কাহাকে বলে? উহাদের অর্থ কি? মনুস্মৃতিতে উহাদের যে অর্থ আছে তাহা এইঃ—

"ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥"—

"ভূপতিত ধান্যাদির কণাসমূহ কুড়াইয়া লইয়া তাহার দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করার নাম উঞ্ছবৃত্তি। ধান্যাদির শিষ কুড়াইয়া লইয়া জীবিকা-নির্বাহের নাম শিলবৃত্তি। এই দুইটি বৃত্তিকে ঋতবৃত্তি বলে। অযাচিত-ভাবে যাহা উপস্থিত হয় তাহাতে জীবনধারণ করার নাম অমৃতবৃত্তি। যাচিতভাবে পাইয়া (ভৈক্ষ) তাহার দ্বারা জীবনধারণ করার নাম মৃতবৃত্তি।* কৃষিকে প্রমৃতবৃত্তি বলে।"

ইহার পরে বলিতেছেন—

"সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জয়েৎ।"—

"বাণিজ্যের নাম সত্যানৃত বৃত্তি। তাহার দ্বারাও জীবনযাপন করিতে পারে। কিন্তু সেবা বা চাকুরী যাহা শ্ববৃত্তি বা কুক্কুরবৃত্তি বলিয়া খ্যাত—তাহা সর্বতোভাবে পরিবর্জন করিবে।"

এরূপে মনুসংহিতায় জীবিকা উপার্জনের উপায় কৃষি, বাণিজ্য ও চাকরি—এই তিনটির মধ্যে কৃষিকেই শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আজ সমাজের দৃষ্টিকোণ উহার ঠিক বিপরীত। আজ চাকুরীকে সবচেয়ে সম্মানজনক জীবিকা বলিয়া গণ্য করা হইতেছে এবং কৃষি এই তিনের মধ্যে কার্যত নিকৃষ্টবৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহাই বর্তমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশার এক প্রধান কারণ।

পরশুরাম হিংসার আশ্রয় লইয়া ধরাকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিবার পর যখন তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি চিরতরে অস্ত্রত্যাগ করিয়া

* প্রাচীনকালে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণগণ নিষ্কাম লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করিতেন। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা কোন পারিশ্রমিক লইতেন না। তাঁহাদের জীবিকা উঞ্ছবৃত্তি, ঋতবৃত্তি বা অমৃতবৃত্তি ছিল।

কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ইহাতে দ্রোহরহিত বৃত্তিসরূপ কৃষির মহত্ত্ব সূচিত হইতেছে।

॥ ৭৩ ॥ সকলেই ভূমি পাইবার অধিকারী

যে ব্যক্তির জীবিকার জন্য অন্য কোন উপায় নাই, সেইব্যক্তি যদি জমি চাষ করিতে জানেন ও নিজহাতে জমি চাষ করিতে চাহেন, তবে তাঁহার জমি পাইবার অধিকার আছে—একথা বোঝা কঠিন নহে। কিন্তু বিনোবাজী দেশে তথা জগতের সম্মুখে আর এক দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। জীবিকার জন্য অন্য কাজ থাকুক বা না-ই থাকুক, যদি কোন ব্যক্তি নিজহাতে জমি চাষ করিতে চাহেন তবে চাষের জন্য কিছু-না-কিছু জমি পাওয়ার নৈতিক অধিকার তাঁহার আছে। আপাতদৃষ্টিতে এই দাবী অযৌক্তিক মনে হইতে পারে। কিন্তু এই অধিকারের ভিত্তি সম্পর্কে বিনোবাজী যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাঁহার এই দাবী দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেন এই নৈতিক অধিকার থাকা চাই সে সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন যেঃ

(১) কৃষির কাজ সর্বোত্তম শরীর-শ্রম ও শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ। উহা স্বাভাবিক ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকর ব্যায়াম। কৃষিকার্য কেন-যে সর্বোত্তম শ্রম ও শ্রেষ্ঠ উৎপাদক কার্য তাহা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। যে-যে কারণে কৃষিকার্য সর্বোত্তম শরীর-শ্রম বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই-সেই কারণেই যে ব্যক্তি নিজহাতে জমি চাষ করিতে চাহিবেন তাঁহার জন্য, যতই অল্প হউক না কেন, একটু জমির ব্যবস্থা না করা অনুচিত হইবে। মানুষ হিসাবে তাঁহার এই নৈতিক অধিকার থাকা উচিত।

(২) ভূমি অন্ন-উৎপাদনের একমাত্র আধার এবং উহা মৌলিক উৎপাদনেরও প্রধানতম ক্ষেত্র। সুতরাং জমি তথা কৃষির উন্নতির জন্য সকলের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। যদি সকলের হাত ভূমিতে পড়ে, তবে ভূমিতে সকলের বুদ্ধির প্রয়োগও হইবে।

(৩) জীবনবিকাশের পক্ষে কৃষি অপরিহার্য। এজন্য জীবিকা অর্জনের জন্য যিনি যে-কাজ করেন করুন, কিন্তু তাঁহার কিছু সময়ের জন্য প্রত্যহ

নিয়মিতভাবে জমিতে কাজ করা উচিত। বিনোবাজী বলেন, তিনি দৈনিক নিরন্তর ৮-ঘণ্টা বয়নকার্য করিতেন। তখন অবিরত ৮ ঘণ্টাকাল ঝুঁকিয়া বসিয়া থাকিতে-থাকিতে তাঁহার ঘাড়, মেরুদণ্ড ও কোমর বাঁকিয়া যাইত এবং উহা স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে তাঁহাকে বেশ কষ্ট পাইতে হইত। এজন্য তিনি বলেন যে, তন্তুবায়, কর্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি গৃহ-শিল্পিগণ সকলেই নিজ-নিজ জীবিকার কাজ করিবেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যেন প্রত্যহ ২।৪ ঘন্টা করিয়া চাষের কাজও করিবার সুযোগ পান। নচেৎ তাঁহাদের কাজ আনন্দদায়ক, তেজস্বী ও অধিকতর উৎপাদনশীল হইতে পারিবে না। চাষীর যেমন প্রত্যহ দুই-চার ঘন্টা জমিতে কাজ করা উচিত, তেমন জজ সাহেবেরও দৈনিক কিছু সময় নিয়মিতভাবে চাষের কাজ করা উচিত।

॥ ৭৪ ॥ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদন

ভারতে জনসংখ্যা খুবই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহার ফলে খাদ্য-সমস্যার স্থায়ী সমাধান সুদূর পরাহত হইতে পারে—এই আশঙ্কায় জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন ও অনেক সুধীব্যক্তি ফ্যামিলী প্ল্যানিং অর্থাৎ জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিয়া থাকেন। এই বিষয়টি গভীরভাবে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। ১৯৫১ সালের লোক-গণনার বিবরণে প্রকাশ যে, ভারতে প্রতি হাজার ব্যক্তির (পুরুষ ও স্ত্রীলোক) বৎসরে ৪০টি করিয়া সন্তান জন্মে। এই জন্মের হার জগতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী। এদেশে মৃত্যু-সংখ্যার হারও বেশী অর্থাৎ প্রতি হাজার ব্যক্তির মধ্যে বৎসরে ২৭ জনের মৃত্যু হয়।* এই অত্যধিক জন্ম ও মৃত্যু-হারের প্রকৃত কারণ কি? সাধারণত যে-অঞ্চলে ও যে-দেশ বা যে-শ্রেণী যত দরিদ্র তাহার জন্ম-সংখ্যার হারও তত বেশী। দারিদ্র্যজনিত পুষ্টির অভাবই অধিক জন্ম-হারের কারণ বলিয়া

* ১৯৬১ সালের লোক-গণনার বিবরণে দেখা যায় যে মৃত্যুর হার পূর্বাপেক্ষা বহু পরিমাণে কমিয়াছে এবং তজ্জন্য লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন। সাধারণভাবে ইহা যে সত্য সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের গুরুতর নৈতিক অপকারিতার কথা না ধরিয়াও যদি বিচার করা যায় তথাপি বুঝা যাইবে যে, বর্তমান অবস্থায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপদেশে বিশেষ কিছু ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। যেসব দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বেশী প্রয়োজন মনে করা হয় তাঁহাদের কানে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বাণী শীঘ্র পেঁীছিবে না এবং পেঁীছিলেও তাঁহাদের বর্তমান শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কার যেরূপ তাহাতে কখনও তাঁহাদের উপর উহার বিশেষ কিছু প্রভাব পড়িবে বলিয়া মনে হয় না। অন্যদিকে যাঁহাদের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রয়োজন নাই তাঁহারা এইরূপ আন্দোলনের ফলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া নৈতিক অবনতির গভীর গহ্বরে নামিয়া যাইতেছেন। সংযম জন্মহার কমাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহাই কি সম্ভব? সংযম পালন করিয়া যাঁহারা সুফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন এমন বিবাহিত নেতৃস্থানীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোক দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া যদি সংযম অভ্যাস করার জন্য উপদেশ দেন, তবেই তাহার সুফল হইতে পারে। একমাত্র সংযত জীবন দেখিয়া অন্যে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু সেরূপ আচারবান মানুষ কোথায়? জন্মহার হ্রাস করার অন্যতম উপায় হইতেছে অবিলম্বে দারিদ্র্য দূর করার ব্যবস্থা করা। ভূমির সম্যক বণ্টন ও পল্লীশিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। বর্তমান অবস্থায় মাত্র এই দুই উপায় একসঙ্গে অবলম্বন করিলে ভারতে দরিদ্রশ্রেণীর দারিদ্র্য ঘুচিবে। এইজন্য সর্বোদয় আন্দোলনের সাফল্যের জন্য আরও নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

সত্যই কি জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণে কখনও খাদ্যের অভাব হইবার আশঙ্কা আছে? এরূপ আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না। কথায় বলে—যাঁর সৃষ্টি তিনিই খাওয়াইবার ভার নেন। ইহাকে অন্ধসংস্কারজনিত ধারণা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। বাস্তবক্ষেত্রে ইহা সত্য বলিয়া দেখা গিয়াছে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন পশ্চিমে বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়ায় তথায় কৃত্রিম নীল উৎপাদিত হইতে লাগিল এবং ফলে ভারতের বিশাল ক্ষেত্রে নীলচাষ বন্ধ হইয়া গিয়া অধিক খাদ্যশস্যাদি

উৎপাদনে সুবিধা হইল। কে জানে, জনসংখ্যার চাপ যখন আবার বৃদ্ধি পাইবে তখন হয়ত পাট-উৎপাদনের আর কোন প্রয়োজনই থাকিবে না। তখন ভারতের কোটী-কোটী একর ভূমি হয়ত খাদ্য-উৎপাদনের জন্য মুক্ত হইবে। বর্তমানে কোন-কোন দেশে কাগজ ও কাপড়ের থলিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে। উপরন্তু সিনথেটিক ও প্লাস্টিক-এর থলিয়াও তৈয়ারী করা হইতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশালক্ষেত্রে রবার-চাষের সম্বন্ধেও ঐরূপ ভাবা যাইতে পারে। এক সময় আসিতে পারে যখন রবার-চাষের কোন প্রয়োজন হইবে না। অতএব খাদ্যের অভাবের আশংকায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য আগ্রহান্বিত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

বিনোবাজী জনসংখ্যার চাপের প্রতিকারের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবে বিচলিত হইয়া বলেন, "আপনারা ফ্যামিলি প্ল্যানিং বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করিয়াছেন, অর্থাৎ 'সন্তান জন্ম দেওয়া কম কর'—এই কথা বলিতেছেন। কিন্তু একথা আমাকে বলিবার আপনাদের কী অধিকার আছে? আপনারা কি আমার ভৃত্য, না প্রভু? জাপান বা ইংলণ্ডে জমির উপর যে চাপ রহিয়াছে ভারতের জমির উপর তাহা অপেক্ষা অনেক কম চাপ রহিয়াছে। কেন জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহা কি আপনারা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সিংহের খুব কম বাচ্চা হয়, আর ছাগের বেশী বাচ্চা হয়।

"ইহার প্রকৃত প্রতিকার জন্ম-নিয়ন্ত্রণে নহে। জীবনকে ঠিক পথে পরিচালনা করাই ইহার প্রতিকারের উৎকৃষ্ট পন্থা।"

॥ ৭৫ ॥ সনাতন ধর্ম

ভূমি-সমস্যার সমাধান হইলেই আমাদের কাজ শেষ হইবে না। অর্থাৎ আমরা যে-ক্রান্তি চাহিতেছি তাহা মাত্র ভূমি-ক্রান্তি নহে। উহা সামগ্রিক ক্রান্তি। উহা বিচার-ক্রান্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। বিনোবাজী এক ধর্ম-বিচার প্রবর্তন করিতে চাহিতেছেন। সে ধর্ম-বিচার সনাতন; কিন্তু তাহা বর্তমান হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি ধর্মের অর্থে 'ধর্ম' নহে। এই ধর্ম-বিচার প্রবর্তনকে তিনি 'ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন' আখ্যা দিয়াছেন।

ইহা কি, তাহা আমরা পূর্বে বুঝিয়াছি। কিন্তু এই ধর্ম-বিচারকে কী অর্থে 'সনাতন' বলা হইয়াছে তাহা একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝা প্রয়োজন। কারণ তাহাতে এই ধর্ম-বিচার সামাজিক ক্রান্তির কোন্ স্থান অধিকার করিবে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। এই সনাতন ধর্মের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—" 'সনাতন' শব্দের বহু ব্যবহার হয়। কিন্তু উহার ঠিক অর্থ কি তাহা সকলের জানা নাই। ধর্ম দুই প্রকার। এক, যাহার পরিবর্তন হয়। দুই, যাহার পরিবর্তন হয় না। যেমন সত্য-পালন। প্রাচীনকালে উহা ধর্মস্বরূপ ছিল এবং আজও তাহা আছে। ভারতভূমিতে উহা ধর্মস্বরূপ এবং অন্যদেশেও তাহাই। এজন্য উহাতে দেশ-কালের ভেদ লাগে নাই। অতএব উহা নিত্য ও সনাতন ধর্ম। সেরূপ প্রেম ও বাৎসল্য সনাতন ধর্ম। ঐ সনাতন ধর্ম পালনের জন্য পুরাকালে যে-আচারনিষ্ঠা ছিল, তাহা দেশ-কাল ও পাত্র অনুসারে বরাবর বদলাইয়া আসিতেছে। ভক্তিও সনাতন ধর্ম এবং সকলের পক্ষে উহা সমান, যদিও উপাসনার পদ্ধতি পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। অতএব যে সনাতন ধর্ম ধর্মের সার ও আত্মারূপ, সেই সনাতন ধর্মকে ধরিয়া থাকা ও নিয়ত উহার ধ্যান করা আমাদের কর্তব্য। ধর্মের পরিবর্তনশীল অংগের দিকে আমি মনোযোগ দিতেছি না। কিন্তু ধর্মের যাহা সার তাহা আমি লোককে দিতেছি। উহা সনাতন। উহা পরিবর্তনশীল নহে এবং উহা তিনকাল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সর্বত্র সমতা ও একতা স্থাপন করা চাই। তাহা সত্ত্বেও মানুষের বাহ্য জীবনে বৈষম্য ও বিভিন্নতা থাকিবে। কিন্তু সমতা স্থাপন করা আমাদের ধ্যেয় থাকিবে। সন্তানগণ যখন ছোট থাকে, তখন তাহা-দিগকে অনুশাসনে রাখা মাতাপিতার কর্তব্য। কিন্তু যখন উহারা যুবক হইয়া উঠে, তখন উহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া ও উপদেশ দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য। যখন মাতাপিতা বৃদ্ধ হন, তখন সন্তানদেরই অনুশাসনে থাকা তাঁহাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে। এইভাবে ধর্ম বদলাইতে থাকে। কিন্তু সন্তানদের সেবা করা মাতাপিতার তিনকালের সমান ধর্ম। অতএব সন্তানকে স্নেহ করা সনাতন ধর্ম। ঐরূপে সমাজের অবস্থার পরিবর্তন হইলে উহার ধর্মেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। যখন সমাজ বাল্যাবস্থায় ছিল তখন

রাজার আবশ্যকতা ছিল। ঐ সময়ে প্রজাগণকে অনুশাসনে রাখা রাজাদের ধর্ম ছিল এবং রাজার আজ্ঞা পালন করা প্রজার ধর্ম ছিল। কিন্তু এখন সমাজ আর বাল্যাবস্থায় নাই। এইজন্য এখন রাজাদের কাজ শেষ হইয়াছে এবং লোক-প্রতিনিধিদের হস্তে রাজ্য-পরিচালনার ক্ষমতা আসিয়াছে। এখন 'রাজা কালস্য কারণম্' নহে, এখন 'প্রজা কালস্য কারণম্' হইয়াছে। পুরা-কালে সম্রাট এবং বিদ্বানেরও যে-জ্ঞান ছিল না সেইজ্ঞান এখন বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে সাধারণ লোকের হইয়াছে। আকবর বাদশাহ জানিতেনই না আমেরিকা কি জিনিস অথবা মস্কো কোথায়? কিন্তু আজ স্কুলের ছেলেরাও ইহা জানে। কিন্তু সমগ্র সমাজকে একরূপ করিয়া তোলা ও সমাজে অধিক সমানতা আনয়ন করা—ইহা যে-মূলতত্ত্ব তাহা দুইকালেই সমান রহিয়াছে। সমানতার জন্য প্রাচীনকালে ভূমি-বণ্টনের প্রয়োজন ছিল না; কারণ ঐ সময়ে বহুজমি পতিত থাকিত এবং জনসংখ্যাও কম ছিল। কিন্তু এখন ভূমি-বণ্টনের প্রয়োজন হইয়াছে।"

॥ ৭৬ ॥ যুগধর্ম

ভূদানযজ্ঞ 'যুগধর্ম'। যুগধর্মের অর্থ কি এবং কেন-যে ভূদানযজ্ঞকে যুগধর্ম বলিয়া মান্য করা উচিত তাহা ভালভাবে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা বুঝিতে পারিলে লোকে ভূদানযজ্ঞ সম্পর্কে বিশেষ প্রেরণা লাভ করিবে। এমন এক সময় আসে যখন সমাজের তৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী এমন এক কার্যের জরুরী প্রয়োজন হয়, যাহা সাধিত হইলে দেশের অন্য বহুতর সমস্যা আপনা-আপনি মিটিয়া যায় এবং দেশের সর্ববিধ কল্যাণ ও প্রগতির পথ সুগম হয়। আর ঐ কাজ না হইলে দেশের সর্বপ্রকার কল্যাণ-প্রচেষ্টা পণ্ড হইয়া যায় এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান অসম্ভব হইয়া পড়ে। 'এক সাধে সব সাধ' (এক সাধিত হইলে সব সাধিত হয়) এরূপ মহান কর্তব্য-কর্মকে 'যুগধর্ম' বলা হয়। ইতিপূর্বে যে সব আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অবিলম্বে শান্তির পথে ভারতের ভূমি-সমস্যার সমাধান না হইলে দেশে 'জ্বালামুখী' প্রজ্জ্বলিত হইবে ও দেশের অন্যকোন বৃহৎ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হইবে

না। দেশে সরকারী বা বেসরকারীভাবে যে সব কল্যাণমূলক প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহা সবই বিগড়াইয়া যাইবে। অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত গঠনমূলক কার্যক্রমের অন্যতম। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন-দিকের অবস্থার এমন পরিণতি হইয়াছে, যাহাতে উহাকে এখন আর শুধু অন্যতম গঠনকর্ম হিসাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। পরন্তু উহাকে সর্ব-শ্রেষ্ঠ গণ্য করিয়া সমস্ত শক্তি উহাতে নিয়োজিত করিতে হইবে এবং সর্ব-প্রথমে ও অবিলম্বে উহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। নচেৎ অন্য যাহাকিছু গঠনকর্মের প্রচেষ্টা করা হইতেছে তাহা সবই নষ্ট হইয়া যাইবে, সবই বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং অন্যকোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব হইবে না। যদি শান্তির পথে ভূমি-সমস্যার সমাধান হয় ও সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠে, তবে সমস্ত রচনাত্মক কর্ম-প্রচেষ্টার সফলতার পথ উন্মুক্ত হইবে। এইজন্যই ভূদানযজ্ঞ এই যুগের 'যুগধর্ম'। বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আপনাদের সকলকে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, ভূদানযজ্ঞের কাজ একটি ভাল কাজ—কেবল ইহা মনে করিয়াই আপনারা যেন এই কাজ না করেন। পরন্তু ইহা যুগধর্ম, ইহা এমন এক কাজ যাহা সফল হইলে অন্যসব কাজও সফল হইবে এবং বিফল হইলে অন্যসবই বিগড়াইয়া যাইবে—এরূপ অনন্য ও অব্যভিচারীভাব আপনাদের মনে যদি উদয় হয়, তবেই প্রত্যেকের সর্বোত্তম শক্তি ইহাতে নিয়োগ করিবার প্রশ্ন আসে।"

॥ ৭৭ ॥ স্বধর্ম, নিত্যধর্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম

ভূদানযজ্ঞের সংকল্প সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে গভীর, জরুরী ও একাগ্রভাবে এইকাজে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। ভূদানযজ্ঞের কর্মিগণ এইকাজকে 'স্বধর্ম' বলিয়া গণ্য করিয়া ইহাতে অনন্যভাবে আত্মনিয়োগ করুন—ইহাই বিনোবাজী চাহেন। এইজন্য 'স্বধর্ম' কী তাহা সকলের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক, যাহাতে প্রত্যেকে নিজের অন্তর্দৃষ্টিতে উহা তাঁহার স্বধর্ম কি-না তাহা বুঝিয়া লইতে পারেন।* এই প্রসঙ্গে 'নিত্যধর্ম' ও 'নৈমিত্তিক

* বিনোবাজীর 'গীতা-প্রবচন'-এর ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ধর্মে'র পার্থক্যও হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। 'স্বধর্ম' 'নিত্যধর্ম' ও 'নৈমিত্তিক ধর্মে'র ব্যাখ্যা করিয়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"কখন-কখন আমাদিগকে ঘর-সংসারের চিন্তায় থাকিতে হয় এবং সেইজন্য আমরা ভূদানযজ্ঞের কাজের জন্য বেশী সময় বাঁচাইতে পারি না। উহা আমাদের নিজেদের সামর্থ্যের সীমা মনে করিয়া এই বিষয়ের নিষ্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ঘরের কাজ ছাড়া যদি কোন সর্বজনিক কাজ আমাদের করিতে হয় এবং তাহার জন্য যদি আমরা এই নূতন সর্বজনিক কাজ করিতে না পারি, তবে পুরাতন কাজের সহিত এই নূতন কাজের ওজন তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য। কিন্তু নূতন কাজের ওজন যদি অপেক্ষাকৃত বেশী হয়, তবে পুরাতন কাজ-যে পরিত্যাগ করিতে হইবে এমন কথা নহে। ধর্মের ব্যাপারে যে-ধর্ম শ্রেষ্ঠ তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে এবং যাহা লঘিষ্ঠ তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে—এমন কথাও নহে। পরন্তু ইহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যে-কাজ আমাদের হাতে রহিয়াছে তাহা বড় হউক আর ছোটই হউক, তাহা আমাদের কাছে 'স্বধর্ম' কি-না। যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমরা যে-কাজ করিতেছি তাহা আমাদের স্বধর্ম, তবে আমাদের সেইকাজ করিয়া যাওয়া উচিত। যাঁহার স্বধর্ম পৃথক আমাদের কাজে তাঁহার যোগ দেওয়া কর্তব্য নহে। তাহাতে তাঁহার দুঃখিত হওয়াও উচিত নহে। তিনি যে আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতে-ছেন তাহাতেই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট—এইরূপ মানিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু যদি আত্মনিরীক্ষণের দ্বারা ইহা স্থির হয় যে, আমাদের বুদ্ধি এই নূতন কাজকেই বুনিয়াদী কাজ বলিয়া গণ্য করিতেছে, তাহা হইলে অন্যকোন কাজের বোঝা আমাদের মাথার উপর থাকিলেও তাহা বিবেচনাপূর্বক সরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং এই নূতন কাজে লাফাইয়া পড়িতে হইবে। সেক্ষেত্রে ইহা চিন্তা করা ঠিক হইবে না—আমাদের হাতে যে কাজ ছিল তাহার কি হইবে? যে-অবস্থায় মনে ইহা নিশ্চয় হইয়া যায় যে, এইকাজই বুনিয়াদী কাজ—সেইসময়ের সেইকাজই 'যুগধর্ম' হইয়া পড়ে। 'যুগধর্ম' হইতেছে 'নৈমিত্তিক'। উহা চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চলে না। কিন্তু যে-সময়ের জন্য উহা হয় সেই সময় 'নিত্যধর্ম' উহার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। তখন

ঐ কাজের ওজন সব চেয়ে বেশী হয়। আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি। উহা নিত্যধর্ম। কিন্তু সেইসময় যদি কোথাও আগুন লাগিয়া যায় তাহা হইলে প্রার্থনা অসমাপ্ত রাখিয়াই আমাদিগকে আগুন নিভাইবার জন্য যাইতে হয়। উহা নৈমিত্তিক ধর্ম। নৈমিত্তিক ধর্ম বলবান। যে-নৈমিত্তিক ধর্মসম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হইয়া গিয়াছি উহার জন্য যদি আমাদিগকে নিত্যধর্ম ত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহা করিতেই হইবে।" তিনি পরে অন্য একস্থানে এই সম্পর্কে বলিয়াছেন—"রুশ ও চীনে যে-কার্য হিংসার দ্বারা সাধিত হইয়াছে আমি এখানে তাহা অহিংসার পথে করিতেছি। শুধু তাহাই নহে, এই কার্যের দ্বারা গান্ধী-বিচার প্রসারলাভ করিতেছে। ইহা অহিংসার দ্বারা সমাজের গঠন বদলাইবার মহান কার্য। ইহার ন্যায় আজ আর অন্য-কোন কার্য নাই। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবাকার্য প্রভৃতি অন্য যেসব কার্য আছে তাহা নিত্য কার্য, কিন্তু এইকার্য যুগধর্মের মহান্ নৈমিত্তিক কার্য। মনে করুন, আমি সন্ধ্যা-উপাসনা করিতেছি, এমন সময় গ্রামের মধ্যে কোথাও আগুন লাগিয়াছে, আমি প্রার্থনা বন্ধ করিয়া সেখানে তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া যাইব। ভজনের মহত্ব কম নহে। কিন্তু উহা প্রতিদিনের কার্য এবং অগ্নি নির্বাপণের ঐ কার্য নৈমিত্তিক কার্য। কারণ বিশেষ পরিস্থিতি হইতে উহার উদ্ভব হইয়াছে। এরূপ অন্য বড়-বড় বহু কাজ আছে। কিন্তু তুলনা করিলে এইকাজের মহত্ব সবচেয়ে বেশী। যদি ইহা বুঝিয়া সকলে এইকার্যে লাগিয়া যায়, তবে সারা পৃথিবীতে আমরা ক্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারিব। আমি গণিতজ্ঞ। ওজন করিয়া প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করিতেছি।"

॥ ৭৮ ॥ পরমধর্ম

ভূদানযজ্ঞের কাজে জীবনদানের জন্য আহবান করা হইতেছে। কর্মী-দের সমস্ত সময় ও শক্তি এইকাজে নিয়োগ করিবার জন্য বলা হইতেছে। এমন কিছু কর্মী আছেন যাঁহারা কয়েক বৎসর যাবৎ গঠনমূলক কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা যেসব কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া-ছেন তাহা পুণ্যকার্য। যেকাজ তাঁহারা অনেক বৎসর যাবৎ করিয়া আসিতেছেন উহা করিয়া যাওয়া তাঁহাদের ধর্ম। এরূপ বলা হয় যে, ভূদানের

কার্য শ্রেষ্ঠকার্য। কিন্তু তাঁহারা যে-সেবাকার্য করিয়া আসিতেছেন তাহা গীতার শিক্ষা অনুসারে তাঁহাদের পক্ষে ‘স্বধর্ম’। স্বধর্ম গৌণকার্য হইলেও উহা পরিত্যাজ্য নহে। উপরন্তু পরধর্ম শ্রেষ্ঠ হইলেও গ্রহণ করা উচিত নহে। এইজন্য শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠের বিচার এখানে উঠিতে পারে না। যেকার্য তাঁহারা করিয়া আসিতেছেন এবং যাহা তাঁহাদের কর্তব্য উহা তাঁহাদের করিয়া যাওয়া উচিত।—যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য বিনোবাজী বলেন—“ধর্ম-বিচারেরও একটি সীমা আছে। শ্রীকৃষ্ণ সারাজীবন অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক সময় আসিল যখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে, তিনি আর অস্ত্রধারণ করিবেন না, নিঃশস্ত্র থাকিবেন। এইরূপে যিনি সতত অস্ত্র ব্যবহার করিতেন তিনি আর কখনও অস্ত্রধারণ করিবেন না—এই ঘোষণা করিলেও তাঁহার পক্ষে ধর্ম ত্যাগ করা হয় না। বরং তিনি ঐ কার্যের দ্বারা ধর্মকে এক স্তর উপরে উঠাইয়াছিলেন। যাহাকে আমরা পুণ্যকার্য বা ধর্মকার্য বলিয়া থাকি তাহা কতক দূর পর্যন্ত আত্মবিকাশের সহায়ক হয়, কিন্তু তাহার পরে উহা আত্মোন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছে—“ধর্মোঽপি মুমুক্ষুণাং পাপমুচ্যতে”।—মুমুক্ষুর পক্ষে ধর্মও পাপে পরিণত হয়।

কর্তব্যের ভাবনাও অনেক সময় বিঘ্নকারক হইয়া উঠিতে পারে। এইজন্য বিনোবাজী বলেন—“তুলসীদাস রামায়ণে লিখিয়াছেন যে, লক্ষ্মণের সম্মুখে এরূপ এক সমস্যা আসিয়াছিল। রাম বনগমন করিবার সময় লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন যে, পিতামাতার সেবা করা তাহার কর্তব্য। **লক্ষ্মণ যদি রাম**-চন্দ্রের এই কথা মানিয়া লইতেন এবং বাল্মিকী এইরূপ লিখিতেন যে, লক্ষ্মণ পিতামাতার সেবা করিবার জন্য ঘরে থাকিয়া গিয়াছিলেন, তবে এমন কে আছে যে উহাতে দোষ দেখিত? আমরা তো এইরূপ বলিতাম যে, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করার লোভ সংবরণ করিয়াছিলেন এবং মাতা-পিতার সেবায় মগ্ন হইয়াছিলেন। এখানে স্বধর্মের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। স্বধর্মের প্রশ্ন লক্ষ্মণের সম্মুখে ছিল, কিন্তু তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন—‘আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক। কিন্তু এত বড়-বড় কথা আমি বুঝি না। আমি সামান্য বালক এবং আপনার স্নেহে লালিত-পালিত। এইজন্য

আপনি যেরূপ বলিতেছেন আমার দ্বারা সেরূপ স্বধর্মাচরণ হইতে পারে না।' এই বলিয়া তিনি রামচন্দ্রের সহিত বনে গমন করিলেন। ছোট ধর্ম বহু হইতে পারে, কিন্তু পরমধর্ম একই হইয়া থাকে। যেখানে উভয়ই সাধারণ ও ক্ষুদ্র ধর্ম সেখানে সেই উভয়ের মধ্যে তুলনা হইতে পারে। কিন্তু যেখানে একটি ক্ষুদ্রধর্ম এবং আর একটি পরমধর্ম সেখানে তুলনা হইতেই পারে না। যেখানে উভয়ই সাধারণ ধর্ম সেখানে স্বধর্মের প্রশ্ন আসে এবং সেই ক্ষেত্রে স্বধর্ম গৌণ এবং পরধর্ম শ্রেষ্ঠ হইলেও স্বধর্মকেই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যেখানে পরমধর্ম ও স্বধর্ম এই দুই ধর্মই উপস্থিত হয় সেখানে ঐরূপ স্বধর্মের অনুকূলে নির্ণয় করা যায় না। সেখানে পরমধর্মকে মানিয়া লইতে হয়।" রামের সহিত বনে গমন করাকে লক্ষণ তাঁহার পরমধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

পরমধর্মের বিষয় আরও পরিষ্কার করিবার জন্য বিনোবাজী বলেন,—"পরমধর্মের আচরণের জন্য নিজের স্বধর্মকে পরমধর্মের ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। যদি উহাকে ঢালিয়া সাজানো সম্ভবপর না হয়, তবে স্বধর্মকে ত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চধর্ম অর্থাৎ পরমধর্মের সম্মুখীন হইলে স্বধর্মকে ত্যাগ করিতেই হয়। সেই সময় স্বধর্মে লাগিয়া থাকা ঠিক নহে। অতএব আচরণের নিমিত্ত স্বধর্মকে পরমধর্মের ছাঁচে ঢালিয়া লও অথবা স্বধর্ম পরিত্যাগ কর—ইহাই ধর্ম-রহস্য।"

ভারতে আজ যে কেহ সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে যেকোনো সেবা কার্যে ব্যাপৃত থাকুন না কেন, তিনি যদি তটস্থ হইয়া বিচার করেন, তবে তাঁহার নিকট ইহা প্রতিভাত হইবে যে, ভূদানযজ্ঞ পরমধর্ম। এইজন্য তাঁহার কাজকে ভূদান-যজ্ঞের ছাঁচে ঢালিলে অর্থাৎ তাহাকে ভূদানযজ্ঞমূলক করিলে অথবা তাহা ত্যাগ করিয়া ভূদানযজ্ঞের কাজ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে তবেই তাঁহার পরম-ধর্ম পালন করা হইবে।

॥ ৭৯ ॥ পূর্বজন্মের সহিত দারিদ্র্যের সম্পর্ক

কেহ-কেহ বলেন যে, মানুষ তাহার পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলে ধনী বা দরিদ্র হইয়া থাকে। অতএব দরিদ্রের দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করা এবং

সেজন্য ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়াইবার চেষ্টা করা বৃথা; কারণ পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্যের ফল এড়ানো সম্ভব নহে। তাহাকে তাহার ভাগ্যের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। বিকৃত ধর্মবোধ হইতেই এরূপ মনে করা হয়। ধনী তাঁহার ধন-সংরক্ষণের জন্য যেসব মিথ্যা যুক্তি-তর্ক ও অপকৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে ইহা অন্যতম। সমাজের অর্থনৈতিক অপব্যবস্থা হইতেই যে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব পূর্বজন্মকৃত কোন কুকার্যের ফলে মানুষ দরিদ্র হইয়াছে—ইহা কল্পনা করা অন্যায় ও বিবেকবুদ্ধিবিরোধী। শাস্ত্র বলে, যে পাপকর্ম করে তাহার আসুর-যোনিতে জন্ম হয়। আসুর যোনির অর্থ মনুষ্যেতর জীব-যোনি অর্থাৎ ব্যাঘ্র-সর্পাদি-যোনি। "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥"—অর্থাৎ নীচ, দ্বেষপরায়ণ, ক্রূর, অমঙ্গলকারী নরাধমদিগকে এই সংসারে অত্যন্ত আসুরী যোনিতে বার-বার নিক্ষেপ করিয়া থাকি। শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যেই সৎ লোকও আছে, অসৎ লোকও আছে। বিনোবাজী বলেন, "পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্যের ফলে এইজন্মে গরীব বা ধনী হয়--এই ধারণা ভুল। পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে সুবুদ্ধি ও নিরহঙ্কারিতা লাভ হয় এবং পূর্বজন্মের পাপের ফলে দুষ্টবুদ্ধি ও অসৎ কাজ করিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। যদি আমাদের সুবুদ্ধি থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে, পূর্বজন্মে আমরা পুণ্যকার্য করিয়াছিলাম। আর যদি অসৎ কাজ করিবার ইচ্ছা হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, আমরা পূর্বজন্মে পাপকার্য করিয়াছিলাম।" তিনি আরও বলেন, "খারাপ কাজের ফল দারিদ্র্য আর ভাল কাজের ফল ধনিকত্ব এরূপ কোন কথাই নাই। শঙ্করাচার্যের গরীবকুলে জন্ম হইয়াছিল। তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে তিনি পূর্ব-জন্মে পাপ করিয়াছিলেন? পাপ ও পুণ্যের পরিণাম দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতা নহে।

পূর্বজন্মের পাপের ফল কুবুদ্ধি এবং পুণ্যের ফল সুবুদ্ধি। শাস্ত্র বলে যে, যিনি ভাল কাজ করেন তিনি পরজন্মে পবিত্রকুলে জন্মলাভ করেন এবং যিনি বহু পুণ্যবান তাঁহার যোগীদের কুলে জন্ম হয়। আর

যোগীরা গরীবই হইয়া থাকেন।* অতএব আমরা পূর্বজন্মে পাপ করিয়াছি না পুণ্য করিয়াছি, তাহা আমাদের কুবুদ্ধি বা সুবুদ্ধি হইতে চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের বহু ভ্রান্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে। একজন সন্ন্যাসী তো আমাকে এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, রোগীর সেবা করা ভুল—কারণ রোগগ্রস্তব্যক্তি তো নিজের প্রারব্ধ ভোগ করিতেছে এবং সেবা করিয়া আমরা তাহার প্রারব্ধে ক্ষতিসাধন করিতেছি। ইহা শুনিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। উত্তরে আমি বলিলাম যে,

* 'প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিতা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টেঽভিজায়তে॥'—গীতা ৬।৪১
—'যোগভ্রষ্টব্যক্তি পুণ্যাত্মাদিগের লোকে গমন করিয়া তথায় বহু বৎসর বাস করিবার পর পবিত্র ও ধনবান ব্যক্তিদিগের গৃহে জন্মলাভ করেন।'

যাঁহারা বিপরীত তর্ক করেন তাঁহারা এই শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। ভাল কথা। কিন্তু পরবর্তী শ্লোক দেখুন।

'অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥'—৪২

এই শ্লোকের শঙ্করভাষ্য হইতেছেঃ—"অথেতি। অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কুলে ভবতি জায়তে ধীমতাং বুদ্ধিমতাম্। এতদ্ধি জন্ম যদ্ দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং দুঃখলভ্যতরং পূর্বমপেক্ষ্য লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কুলে।"

ইহার অনুবাদ—ধনীদিগের কুল ছাড়া দরিদ্র অথচ বুদ্ধিমান যোগীদিগের কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই-যে দরিদ্র যোগীদিগের কুলে জন্ম, ইহা ধনবানদিগের কুলে জন্ম অপেক্ষা দুর্লভতর; যথোক্ত বিশেষণযুক্ত দরিদ্র যোগিগণের কুলে (জন্মই অধিকতর স্পৃহনীয়—ইহাই তাৎপর্য)।

এই দুই শ্লোকের সরল তাৎপর্য এই যে, যিনি পূর্বজন্মে পুণ্যকার্য করিয়াছেন তিনি যোগীর কুলে জন্ম পাইয়া থাকেন। আর যোগীকুল তো সাধারণত দরিদ্র কুলই হইয়া থাকে। পুণ্যবান ব্যক্তি ধনীর ঘরেও জন্ম পাইতে পারেন। কিন্তু দরিদ্র যোগীর কুলে জন্মই দুর্লভ ও স্পৃহনীয়। মোট কথা ধনীর ঘরে জন্ম হউক অথবা গরীবের ঘরে জন্ম হউক জাতকের সুবুদ্ধি ও সুমতি প্রাপ্ত হওয়াই আসল কথা। নচেৎ বুঝিতে হইবে যে, তিনি পূর্বজন্মে পুণ্যকার্য করেন নাই।

সকলকেই নিজ-নিজ প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয়। আমার সেবার দ্বারা তাহার প্রারব্ধের উপর কোন প্রভাব পড়িবে না। প্রারব্ধ এত শক্তিশালী যে, উহা নিজবলে চলিতে থাকে। কিন্তু আমার ধর্ম সেবা করা। এইজন্য আমি সেবা করিতেই থাকিব। ভগবান যদি আমাকে গরীব বা ধনবান করিয়া থাকেন, তবে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই তাহা করিয়াছেন। জীবন এক পরীক্ষা। এইজন্য পূর্বজন্মের কথা তুলিয়া গরীবের সেবা না করা নিতান্ত ভুল।"

॥ ৮০ ॥ কলিযুগে কি ইহা সম্ভব

লোকে বলে—এখন কলিযুগ। এসব কি এখন হওয়া সম্ভব? ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলিয়াছেন, "কিন্তু যে-শ্রাবস্তীপুরে বুদ্ধ ভগবানের বাসের জন্য জমির প্রয়োজন হওয়ায় মোহর বিছাইয়া জমি লইতে হইয়াছিল, সেই শ্রাবস্তীপুরে আমার মত অপদার্থ, ভগবান বুদ্ধের তুলনায় যাহার কোন অস্তিত্বই নাই—এই কলিযুগেই একশত একর ভূমি পাইয়াছে। তাহা হইলে বুঝুন, ইহা কলিযুগ অথবা সত্যযুগ?" এইপ্রসঙ্গে অন্য একস্থানে তিনি বলেন যে, ত্রেতাযুগে রাবণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দ্বাপরযুগে দুঃশাসনের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু এই কলিযুগেই শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"যুগ আমাদের স্বরূপ দান করে না। আমরাই যুগের স্বরূপ-দানকারী 'কাল-পুরুষ'। আমরা চেতন। এইজন্য এই সমগ্র জড়-সৃষ্টি আমাদের হাতে। আমরা মাটির যে-আকারই দেই না কেন, উহা তাহাতে কোন আপত্তি করে না। আজ এমন সমুন্নত সময় আসিয়াছে যে, আমরা ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব ঘটনা এইসময়ে নিজেদের চোখে দেখিতে পাইলাম। ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কখনও স্বাধীনতা-যুদ্ধ অহিংস পন্থায় পরিচালিত হইয়াছে কি? অতএব, ভুল পথে চিন্তা করিবেন না। আজ আমাদের চোখের সামনে সত্যযুগ আসিতেছে এবং অত্যন্ত তীব্রবেগেই উহা আসিতেছে। লোকে বলে, মহাযুদ্ধ আসিতেছে। আমি বলি— 'আসুক'। যতবার মহাযুদ্ধ আসিবে ততবার পৃথিবী শিক্ষালাভ করিবে যে, মহাযুদ্ধের

দ্বারা পৃথিবীর কোন সমস্যার সমাধান হয় না। আমি মহাযুদ্ধকে অভ্যর্থনা করি। কেননা, উহার পরিণামসরূপ সমগ্র পৃথিবীকে সোজা আমার নিকট আসিতে হইবে এবং আমার কাছে বলিতে হইবে—'আমরা হারিয়া গিয়াছি, আমাদিগকে অহিংসার রাস্তা দেখাইয়া দিন'।" তিনি এইপ্রসঙ্গে অন্য এক-স্থানে বলিয়াছেন—"দান দিতে স্বীকৃত হন নাই এমন কোন লোকের সহিত আমার এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি ইহার অর্থ এই বুঝিয়াছি যে, সত্যযুগ আসিতেছে। পুরাণসমূহে চারিযুগের কথা আলোচনা করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক যুগের স্থিতিকালের সীমা নির্ধারিত আছে, ইহাও বলা হইয়াছে। পরন্তু উক্ত চারিযুগের অন্তর্বর্তী কালেও অন্যান্য যুগ আসিয়া থাকে। যেমন দিনে আলো ও রাত্রিতে অন্ধকার হইয়া থাকে, যেমন দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রতিনিয়ত বহিয়া থাকে, যেমন চন্দ্রের ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধিও হয়, তেমনি এক-এক যুগের মধ্যে অন্যান্য যুগও যাওয়া-আসা করিয়া থাকে। এখন কলিযুগ চলে চলুক, কিন্তু এই কলিযুগের মধ্যেই সত্যযুগ আসিতে পারে। আর যদি এখন সত্যযুগ চলিতে থাকে, তবে ইহার মধ্যে কলিযুগও আসিতে হারে। পুরাণে আমরা দেখিয়াছি যে শ্রীরামের যুগে রাবণের ন্যায় রাক্ষস ছিল। আর এই কলিযুগেও অসংখ্য সৎ-পুরুষের জন্ম হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যুগ কেবল নামের জন্য। জ্যোতিষের নিয়ম অনুসারে উহা চলিয়া থাকে। কিন্তু ভাবানুসারে একই যুগের মধ্যে চারি-যুগই আসিয়া যায় এবং মোটের উপর সত্যযুগই সবচেয়ে দীর্ঘ হইয়া থাকে। কলির অর্থ—এক। উহার দ্বিগুণ—দ্বাপর যুগ; উহার তিনগুণ ত্রেতাযুগ এবং উহার চারগুণ সত্যযুগ হইয়া থাকে। সংস্কৃতে কলির অর্থ—'এক', দ্বাপরের অর্থ—'দুই', ত্রেতার অর্থ—'তিন' এবং সত্য-এর অর্থ—'চার'। ইহার মানে এই যে, কলিযুগ অপেক্ষা সত্যযুগের শক্তি চারগুণ অধিক। মধ্যে-মধ্যে কলির জোর চলিয়া থাকে। কিন্তু সত্য অধিক বলবান।"

॥ ৮১ ॥ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমস্যার সমাধান

বিনোবাজী যখন বিহারের মানভূম জেলায় ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন একব্যক্তি তাঁহাকে বলেন যে, তিনি গরীবদের সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা

করিতেছেন, কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকদের অবস্থাও খারাপ। সুতরাং তিনি যেন তাঁহাদের জন্যও কিছু করেন। ঐ ব্যক্তি আরও বলেন যে, গরীব-দের অবস্থা বরং কিছু ঠিক আছে; কারণ তাহারা হাতের কাজ ও শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিয়া থাকে এবং দরিদ্রের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মধ্যমশ্রেণীর লোকের অবস্থা খুব খারাপ। কারণ উহারা যে কিছু উৎপাদন করিবে এমন কোন উপায় তাহা-দের হাতে নাই। অন্যদিকে ধনীর হাতে যেরূপ অর্থ আছে সেরূপ অর্থও তাহাদের নাই। এইজন্য তাহারা নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত ও অসহায়। ইহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন—"আমরা ভূমিহীনকে ভূমি দিব। যদি মধ্যমশ্রেণীদের মধ্য হইতে কেহ জমি চাহেন, তবে আমরা তাঁহাকেও জমি দিব। কিন্তু তাহাতে এই মুশকিল হইবে যে, তিনি নিজে ঐ জমি চাষ করিবেন না। আর তিনি যদি নিজে পরিশ্রম না করেন, তবে তাঁহাকে জমি দিয়া কোন লাভ নাই। আপনাদের মধ্যমশ্রেণীর লোকের যে এরূপ দুর্দশা তাহার কারণ এই যে তাঁহারা উৎপাদনের কোন কাজ জানেন না। ইহার প্রতিকারের উপায় হইতেছে আজ যে-শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহার পরিবর্তন করা। মধ্যমশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত। কিন্তু যে-বিদ্যালয়ে তাঁহারা পড়েন তাহাতে কোন হাতের কাজ বা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ শিক্ষা দেওয়া হয় না। অবস্থা এতদূর গড়াইয়াছে যে, কৃষকের ছেলেও যদি স্কুলে পড়িয়া শিক্ষিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে, তবে সে আর ক্ষেতের কাজ করিতে চাহে না। সে চাকরি করিতে চাহিবে। কিন্তু চাকরি বেশী নাই। আমি শুনিয়াছি যে, পশ্চিমবাংলায় এ বৎসর কয়েক সহস্র মেয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিতেছে। যখন মেয়েদের সংখ্যাই এত তখন ছেলেদের সংখ্যা তো আরও অনেক বেশী হইবে। এতসব বি. এ. লোকদের আমরা কোথায় বপন করিব এবং তাহা হইতে কি-বা ফসল পাওয়া যাইবে? উহার ফল এই দাঁড়ায় যে, উহারা সকলেই বেকার হইয়া থাকে। উহাদের অভিমান বেশী। এজন্য তাহারা অসন্তুষ্ট থাকে। তাহাদের খরচ করিবার অভ্যাস হয়, কিন্তু উপার্জন কিছুই হয় না। আর যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বিদ্বান হয়, তবে দুই বিদ্বানের ঘরকন্না হয় এবং তাহাতে ঘর-সংসার নষ্ট হইয়া

যায়! যদি দুইজনের একজন মূর্খ হয়, তবে ঘরকন্না ভাল চলিতে থাকে। কিন্তু আজকাল দুইজনেই বি. এ. পাশ করিতে চাহে। ইহাই আপনাদের অবস্থা। মধ্যমশ্রেণীর দুরবস্থা দূর করিবার উপায় শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই অন্বেষণ করিতে হইবে। এইজন্য গান্ধীজী এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, যে-শিক্ষাই দেওয়া হউক না কেন উহাতে কোনও-না-কোন হাতের কাজে শিক্ষা দেওয়া চাই; উপরন্তু হস্তশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া চাই। এরূপ হওয়া চাই যে, অমুকে বি. এ. পাশ করিয়াছে বটে, কিন্তু বয়নের কাজ করিতেছে। অমুকে এম. এ., সে ক্ষেতের কাজ করিতেছে। অমুকে বি. এস-সি., কিন্তু সে নাপিতের কাজ করিতেছে। নিজের নিজের বিদ্যার প্রয়োগ তাহারা সেই-সেই কাজে করিতেছে। এইভাবে বিদ্যা ও কাজ যদি যুক্ত করা হয়, তবে শিক্ষিতদের বেকারত্ব থাকিবে না এবং ভারতেরও উন্নতি সাধিত হইবে। তখন যদি তাঁহারা আমাদের নিকট হইতে জমি চাহেন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই জমি দিব। তাঁহারা ঐ জমিতে আবাদ করিবেন এবং সুখী হইবেন। আপনার যেরূপ অবস্থা সেরূপ অবস্থায় যদি মধ্যমশ্রেণীর কেহ জমি চাহেন এবং তিনি নিজে জমি চাষ করিতে চাহেন, তবে আমরা তাঁহাকেও জমি দিব।

"কাশীতে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আমার নিকট জমি চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম---আপনারা নিজেরা চাষ করিবেন অথবা অন্যের দ্বারা জমি চাষ করাইবেন? তাঁহারা বলিলেন—'আমরা নিজেরাই জমি চাষ করিব। চাষ করা বৈদিক ঋষিদের ধর্ম ছিল।' ইহা শুনিয়া আমার আনন্দ হইল। আমি বলিলাম—"আপনাদিগকে ৫ একর করিয়া জমি দিব। আমি ঐ জমি দেওয়াইবার ব্যবস্থাও করিয়াছি। কিন্তু শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্য হইতে এখনও বেশী লোক চাষের কাজ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন না। যাঁহাদের অন্য জীবিকা আছে তাঁহাদিগকে জমি দেওয়া হইবে না। কিন্তু যাঁহার অন্য জীবিকা নাই এবং যিনি ক্ষেতের কাজ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকেই জমি দেওয়া হইবে--তিনি মধ্যমশ্রেণীর হউন বা অন্য শ্রেণীর।"

॥ ৮২ ॥ সর্বোদয় সমাজের একক

গ্রামকে ভিত্তি করিয়া এবং উহাকে সর্বোদয়-সমাজের 'ইউনিট' (একক) ধরিয়া সর্বোদয়ের প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। গ্রামকে কেন ভিত্তি ধরা হইল অর্থাৎ, বিনোবাজীর ভাষায় গ্রাম-রাজ প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা কেন করা হইল তাহা ভালভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। তাহা হইলে সর্বোদয়ের স্বরূপ এবং উহার সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে। কারণগুলি এই ঃ—

(১) সর্বোদয় সমাজব্যবস্থা সর্বাত্মক ব্যবস্থা। জীবন অবিভাজ্য। জীবনের কোনদিক বাদ দিয়া সর্বোদয়ের কল্পনা করা সম্ভব নহে। নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই সাম্য-প্রতিষ্ঠা সর্বোদয়ের কাম্য। এই সাম্যের উৎস হইতেছে আত্মার একত্ব—ইহা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। পরিবারের মধ্যে সাম্যের এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিবারে মা ও সন্তানের, পিতা ও পুত্রের, স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে একাত্মবোধ বিদ্যমান। সেখানে যাহার যেরূপ যোগ্যতা থাকুক না কেন সকলের জীবন-যাত্রার মান একরূপ। মানুষ পরিবারের মধ্যে একত্ব ও সাম্যের যে-শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহাকে সারা সমাজে প্রসারিত করা সর্বোদয়ের উদ্দেশ্য। পরিবারকে বাদ দিলে সমাজের মধ্যে গ্রামই মানুষের সর্বাপেক্ষা নিকটের। এইজন্য একাত্মবোধকে পরিবার হইতে প্রতিবেশীতে অর্থাৎ গ্রামে সম্প্রসারণ করা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে সহজসাধ্য হইবে এবং সর্বোদয়-আরোহনে উহা প্রথম সোপানস্বরূপ হইবে।

(২) শাসনমুক্ত সমাজব্যবস্থার অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য শাসন-ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রের সমস্ত রকম প্রশ্নই গ্রামে উদ্ভব হইতে পারে এবং উদ্ভব হইয়াও থাকে। উপরন্তু সামূহিক জীবনের ক্ষেত্রে গ্রামই সকলের নিম্নস্তরে অবস্থিত। এইজন্য বিকেন্দ্রীকরণের অন্তিম সীমাস্বরূপ গ্রামকে গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৩) আর্থিক ব্যবস্থার যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। যে সমস্ত শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করা যাইতে পারে তৎসমস্তকেই স্বয়ংসম্পূর্ণতার

দৃষ্টিতে গৃহশিল্পস্বরূপ চালানো সম্ভব নহে। বহুশিল্পকে পল্লীশিল্প-স্বরূপ চালাইতে হইবে। যেমন, বস্ত্র-স্বাবলম্বনের দৃষ্টিতে সুতাকাটা ও বস্ত্র-বয়নকে গৃহশিল্প করিতে হইবে। কিন্তু কাগজ প্রভৃতি প্রতি গৃহে উৎপাদন করা সুবিধাজনক হইবে না। ঐ সমস্ত শিল্প পল্লীশিল্পস্বরূপ অর্থাৎ গ্রাম-স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে চলিবে। এজন্য আর্থিক ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রী-করণের জন্য গ্রামকে অবলম্বন করা হইয়াছে।

(৪) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় কোন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে তাহার দ্বারা সমগ্র সমাজ বা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি পরিকল্পনার ক্ষেত্র যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করা হয়, তবে উহার ব্যর্থতায় সমাজ বা দেশের অন্য অংশ ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে পারে না। সেই দৃষ্টিতে প্রতি গ্রাম নিজের পরিকল্পনা করিয়া লইলে যে-গ্রামের যোজনা অভিজ্ঞতায় ব্যর্থ বা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইবে কেবল-মাত্র সেইগ্রামই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহাতে অন্যান্য গ্রামের কোন অনিষ্ট হইবে না, বরং তাহা হইতে অন্য গ্রাম শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

(৫) প্রাচীনকালে গ্রামই আর্থিক ও শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল। গ্রাম-পঞ্চায়েতের দ্বারা শাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা পরিচালিত হইত। জনমানসে তাহার স্মৃতি রহিয়াছে। সুতরাং ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে গ্রামকে গ্রহণ করা সমীচীন ও জনমানসের অনুকূল হইয়াছে।

(৬) স্বাধীনতালাভের পূর্বে নূতন সমাজরচনার জন্য যে-কর্মপ্রচেষ্টা (গঠনমূলক কর্ম) চলিতেছিল তাহা স্বাধীনতা-আন্দোলনের মাধ্যমে করা হইত। তখন স্বাধীনতা অর্জনই যুগের দাবী ছিল। স্বাধীনতা-আন্দোলন তখন যুগধর্ম ছিল। এজন্য নূতন সমাজরচনার প্রচেষ্টা তাহার মাধ্যমে করা ব্যতীত অন্য কিছুর অবলম্বনে তাহা করিলে চলিত না। যুগের পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমান যুগের দাবী ভূমির সমবণ্টন তথা সাম্য-প্রতিষ্ঠা। এজন্য ভূদানযজ্ঞ-আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বোদয়-প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টা অগ্রসর করিয়া দিবার সুযোগ আসিয়াছে। আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ অভিমুখে কোনরূপ সংশয় না রাখিয়া অগ্রসর হইবার জন্য আমরা এই নূতন মাধ্যম পাইয়াছি।

॥ ৮৩ ॥ সর্বোদয়-সূত্র

বুদ্ধগয়া সর্বোদয়-সম্মেলনে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ জীবনদানের জন্য আহবান করায় বিনোবাজী তাহার উত্তরে নিজের জীবন-সমর্পণ ঘোষণা করিয়া এক পত্র লেখেন। কিসের জন্য তিনি জীবন সমর্পণ করিতেছেন তাহা তিনি চারিটি শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করেন। তাহা হইতেছে—'ভূদানযজ্ঞমূলক, গ্রামোদ্যোগপ্রধান অহিংস ক্রান্তি'। ইহা হইতেছে চারিটি শব্দের দ্বারা রচিত এক মহান সূত্র। সূত্রাকারে ইহাতে সর্বোদয়ের অর্থাৎ নূতন সমাজরচনার ভিত্তি, স্বরূপ, উপায় ও লক্ষ্য বর্ণিত হইয়াছে। বিনোবাজী এই সূত্রের স্পষ্টীকরণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম শব্দ 'ভূদানযজ্ঞ' ইহার আধার, শেষ শব্দ 'ক্রান্তি' ইহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, দ্বিতীয় শব্দ 'গ্রামোদ্যোগপ্রধান' ইহার স্বরূপ ও তৃতীয় শব্দ 'অহিংসা' ইহার সাধনোপায়। 'ক্রান্তি' শব্দের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। অন্য তিনটি শব্দ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি তাহা অনুধাবন করা প্রয়োজন। তাহাতে সর্বোদয়ের ভিত্তি, স্বরূপ ও সাধনোপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে।

(ক) 'ভূদানযজ্ঞমূলক'ঃ—(১) বর্তমান সমাজ-বিকৃতির মূল কারণ হইতেছে শোষণ। কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারাই সমাজে শোষণ চলিতেছে। ভূমি সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা চলিতেছে। ভূমিতে যে-উৎপাদন হয় তাহা হইতেছে মৌলিক উৎপাদন। অর্থাৎ অন্য যাহাকিছু উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় সবই ভূমিজাত দ্রব্যাদি হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শোষণ বন্ধ করিতে হইলে মূল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রথমে বিকেন্দ্রীকরণ করা আবশ্যক। এজন্য ভূদানযজ্ঞের দ্বারা প্রথমে নব-সমাজরচনার ভিত্তিস্বরূপে ঘরে-ঘরে ভূমিবণ্টনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। (২) বর্তমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে ভূমিসমস্যা সবচেয়ে জরুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভূমির পুনর্বণ্টন হইতেছে এই যুগের দাবী। কিন্তু ভূমিদান-প্রাপ্তি ও ভূমি-বিতরণে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে না। ভূমির সঙ্গে-সঙ্গে পল্লীশিল্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভূমির পুনর্বণ্টন হইলে পল্লীশিল্পের ব্যবস্থা করার কাজ সহজ হইবে এবং উহার জন্য অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে।

(খ) 'গ্রামোদ্যোগপ্রধান'ঃ—ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান কেবল ভূমির দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। পরিপূরক বৃত্তি অথবা বহুক্ষেত্রে প্রধান বৃত্তিসরূপ কুটীর-শিল্প চাই। কর্তৃত্ব-বিভাজন না হইলে আর্থিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত আর্থিকক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বিভাজন করা যাইবে না। উপরন্তু সর্বোদয়-আদর্শে যে প্রকারের কাজই করা হউক না কেন উহার আর্থিক মূল্য সমান হওয়া চাই এবং সকলের কাজও পাওয়া চাই। বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদন বা শিল্প ব্যবস্থায়—(১) প্রত্যেকের কাজ পাওয়া সম্ভব হইতে পারে; (২) উহাতে কাজের প্রকার ও প্রকৃতি-নির্বিশেষে আর্থিক মূল্যও নিজ হইতে সমান হইয়া যাইতে থাকে। আর্থিকক্ষেত্রে সাম্য-প্রতিষ্ঠিত না হইলে সমাজে সাম্য-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। এইজন্য সর্বোদয় সমাজরচনার পক্ষে কুটীর-শিল্পকে প্রধানস্থান দেওয়া আবশ্যক। এই সম্পর্কে বিনোবাজী অননুকরণীয় ভংগীতে বলিয়াছেন—"রামনাম লইবার সময় আমি কেবলমাত্র 'রাম' উচ্চারণ করি না, 'সীতারাম'ও বলিয়া থাকি। তাহার অর্থ এই যে, ভূমি পুনর্বণ্টনের সংগে-সংগে আমি গ্রাম-শিল্পও চাই। লোকে অনেক সময় বলে, কুটীরশিল্পজাত জিনিসের দাম বেশী। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষের জীবিকা হরণ করিয়া তাহাকে বেকার করিয়া, অভুক্ত রাখিয়া কল যে-পণ্য উৎপাদন করে তাহা সস্তা নহে, বরং অত্যন্ত দুর্মূল্য। যদি কল সেই বেকারকে খাওয়াইতে বাধ্য হয়, তবে মিলজাত দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত মহার্ঘ হইবে। কলের উৎপাদন সৌকার্যার্থে যে-ব্যয় করা হয় তাহার হিসাব করিয়া বলুন যে, কলজাত দ্রব্য সস্তা, না দুর্মূল্য। কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা যে-দ্রব্য উৎপাদন করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা যে-জিনিস চুরি করিয়া আনিয়া বিক্রয় করা হইতেছে তাহা সস্তা হইবে। বিষ সস্তা এবং অমৃতের মূল্য বেশী। এইজন্য কি এই বিষ খরিদ করিবেন?"

এখন প্রশ্ন হইতেছে, সমাজের বর্তমান অবস্থায় বৃহৎ যন্ত্রকে অর্থাৎ কেন্দ্রীত শিল্পকে একেবারে বর্জন করা কি সম্ভব? না, তাহা সম্ভব নহে। তবে কোন্-কোন্ কেন্দ্রীত শিল্প গ্রহণীয় হইবে এবং কোন্ নীতিতে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে? এ সম্পর্কে বিনোবাজী তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক

ভাষণে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাকে সর্বোদয়ের শিল্পপরিকল্পনা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—"যন্ত্র তিন প্রকার—সময়সাধক, সংহারক এবং উৎপাদক। (১) আমি সময়সাধক যন্ত্রের বিরোধিতা করি না। ট্রেন ও এরোপ্লেনের ন্যায় যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু সময় বাঁচিয়া যায়। দশ হাজার ঘোড়াও একযোগে একটি এরোপ্লেনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সেজন্য আমরা এরূপ সময়সাধক যন্ত্র চাহি। (২) অহিংস ব্যবস্থায় কামান, বন্দুক, বোমা প্রভৃতির ন্যায় সংহারক-যন্ত্রের স্থান নাই। এইজন্য ঐরূপ যন্ত্র আমরা চাহি না। (৩) উৎপাদক-যন্ত্র দুই প্রকার—পূরক ও মারক। যেখানে লোকসংখ্যা অধিক ও কাজ কম সেখানে যে যন্ত্র লোককে বেকার করে তাহাকে তৎস্থানের মারক-যন্ত্র বলা হয়। কিন্তু যেখানে মনুষ্যশক্তি কম এবং কাজ অধিক, সেখানে সেই যন্ত্র মারক নহে, বরং তাহা পূরক বলিয়া বিবেচিত হইবে। একদেশে এক যন্ত্র পূরক হয়, আবার অন্যদেশে সেইযন্ত্রই মারক হয়। ভারতবর্ষে ট্রাক্টরের মত যন্ত্র আসিলে উহার ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আমেরিকা-রাশিয়ার মত দেশসমূহে ট্রাক্টরের মত যন্ত্র মারক নহে, সেখানে উহা উৎপাদক বলিয়া গণ্য হইবে। ঐরূপে এককালে এক যন্ত্র পূরক থাকে এবং অন্যকালে তাহা মারক হইয়া যাইতে পারে। দেশ, কাল ও পরিস্থিতি অনুসারে যন্ত্র পূরক বা মারক বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং যন্ত্র বলিয়াই যন্ত্রের প্রতি আসক্তি রাখা বা যন্ত্রের বিরোধিতা করা উচিত নহে। যন্ত্রের উপযোগিতা বিবেচনা করিয়াই আমরা উহা গ্রহণ করিব। কিন্তু আমরা যদি যন্ত্রের প্রতি আসক্তি রাখি এবং বলিতে থাকি যে, মিলের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার মত উপযোগী যন্ত্র গ্রাম্যশিল্পে নাই, অতএব আমরা উহার ব্যবহার করিব না, তবে তাহাতে দেশের জন্য যেরূপ চিন্তা করা উচিত আমাদের সেরূপ চিন্তা করা হইল না। পাশ্চাত্যদেশে এক ব্যাপার চলিতেছে বলিয়াই আমরা উহার চক্রে ও ধোঁকায় পড়িয়া সেই একই কথা বলিতেছি। ইহাসত্ত্বেও গান্ধীজী আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমরা ভুল করিতেছি। আমি দেখিয়াছি যে, যেখানে আমরা সাম্যের কথা বলিয়া থাকি সেখানে সম্মুখস্থ কেহ উহার বিরোধিতা করিয়া বৈষম্যের কথা বলিতে পারেন না। কিন্তু

তাঁহারা 'এফিসিয়েন্সি' বা দক্ষতার কথা উঠাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, 'আপনি সমতাবাদী কিন্তু আমরা দক্ষতাবাদী।' এইরূপে তাঁহারা এক গুণের বিরুদ্ধে অন্য গুণ খাড়া করিয়া দেন। ইহার ফলে বিরোধ চলিতে থাকে। আজকাল পুঁজিবাদীরা দক্ষতার ধ্বনি উঠাইয়াছেন। আমিও দক্ষতা চাহি। কিন্তু পরিবারের কয়েকজনের আহার মিলিবে আর অন্য কয়েকজন উপবাসী থাকিবে, ইহা আমি চাহি না। আমি চাহি যে, সকলেই যেন খাইতে পায়। যদি বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রাম্যশিল্পের যন্ত্র সকলের আহারের সংস্থান করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য। কিছুলোকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবশিষ্ট লোককে বেকার করিয়া রাখিয়া আমরা কখনও 'সক্ষম' হইয়া উঠিবার দাবী করিতে পারিব না।

"ভারতে আজ উৎপাদন অত্যন্ত কম এবং বেকারত্ব অত্যন্ত বেশী। এই কারণেই অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা কোন-না-কোন সুযোগে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য কিছু করিতেই হইবে। অসন্তোষ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা চাই। গান্ধীজীর এই কার্যসূচী ছিল যে, যাহার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক তাহাকে তিনি সহায়তা করিতেন। কবি দুখায়েল শুনাইয়াছেন যে, সাহায্য দান করিবার ক্রম এইরূপ—প্রথমে ক্ষুধার্ত, পরে দুঃখী এবং শেষে সুখী। কিন্তু আজ ইহার বিপরীত ক্রম চলিতেছে। এইজন্য গান্ধীজী সর্বদা এই চিন্তা করিতেন যে, যাহার প্রয়োজন সবচেয়ে অধিক তাহাকে প্রথমে সাহায্য দান করিবার উপায় অন্বেষণ করা চাই। এই অন্বেষণের ফলে চরকার আবিষ্কার হইয়াছিল। ইহা তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা। ইহা তাঁহার কাব্যশক্তি। কেবলমাত্র কয়েক ছত্র কবিতা লিখিলেই কবি হওয়া যায় না। ব্যাসকাচার্য বলিয়াছেন, 'কবিঃ ক্রান্তিদর্শী'। বৈপ্লবিক দৃষ্টি যাঁহার আছে, যাঁহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, যিনি সূক্ষ্মদর্শী, তিনিই কবি। এই অর্থে গান্ধীজীও কবি ছিলেন। তিনি বহুদিন পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের জন্য গ্রাম্যশিল্পের জরুরী প্রয়োজন। তিনি নয়ী-তালিম, রাষ্ট্রভাষা, জমির পুনর্বণ্টন প্রভৃতির কথা কয়েক বৎসর পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিরূপ মহোপকার তিনি করিয়াছেন, কিরূপ মহান বুদ্ধিমত্তা তাঁহার ছিল, কতই না প্রতিভা এবং কতই না বাৎসল্য তাঁহার

হৃদয়ে ছিল! তিনি আমাদের জন্য এতই করিয়াছেন! আমরা তাঁহার নিকট হইতে আলো পাইয়াছি। তথাপি আজ আমরা টল্‌মল্‌ করিতেছি। আমরা এমন অভাগা।"

স্বাবলম্বনের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য খাদ্য ও বস্ত্র গৃহে সম্ভব না হইলে গ্রামেই উৎপাদন করিতে হইবে। উপরন্তু যেসব দ্রব্যের কাঁচামাল গ্রামে উৎপন্ন হয় এবং গ্রামে যাহা পাকামাল করিয়া প্রস্তুত করা সম্ভব, তাহা গ্রামেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পাকামালই গ্রামের বাহিরে পাঠাইতে হইবে। যেমন সৌরজগতে সূর্য কেন্দ্রস্বরূপ ও প্রধান, তেমনি পল্লীশিল্পসরূপ সৌর-জগতে খাদি সূর্যসরূপ। উহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্য সব পল্লীশিল্প গড়িয়া উঠিবে। এইজন্য মহাত্মা গান্ধী সারাজীবন লোককে বুঝাইয়া গিয়াছেন —নিজের কাপড়ের জন্য সূতা কাটুন এবং যিনি সূতা কাটিতে পারিবেন না, তিনি খদ্দর খরিদ করিয়া ব্যবহার করুন। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর অনেকে বলিতেছেন, 'স্বাধীনতালাভের জন্যই খাদির প্রয়োজন ছিল। এখন খাদির আর কি প্রয়োজন?' তাঁহাদের সম্বন্ধে বিনোবাজী মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁহারা বুদ্ধিভ্রষ্ট। স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করিবার জন্য ও তাহা সংরক্ষণের জন্য খাদি তথা পল্লীশিল্প অপরিহার্য। যদি খাদি গড়িয়া না উঠে, তবে অন্য কোন পল্লীশিল্পই গড়িয়া উঠা সম্ভব নহে। তাহা হইলে গ্রামের দারিদ্র্য দূর করাও সুদূর পরাহত হইবে। সেক্ষেত্রে গ্রাম ধনী ও মিল-মালিকদের কবলস্ত হইয়া পড়িবে ও স্বাধীন জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। এক কথায় গ্রামের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে এবং পরিণামসরূপ দেশের স্বাধীনতা হারাইবার পথও পরিষ্কার হইবে। এজন্য যাঁহারা খদ্দর পরিধান করেন না তাঁহাদিগকে বিনোবাজী অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন খদ্দর খরিদ করেন এবং মিলের বস্ত্র অপেক্ষা খদ্দরের মূল্য যাহা বেশী হইবে তাহা দরিদ্রকে গুপ্তদান দিলেন বলিয়া ধরিয়া লন। তিনি বলিয়া-ছেন—"চারি টাকা মূল্যের খাদি পরিধান করুন। দুই টাকা কলের কাপড়েও খরচ হয় আর বাকী দুই টাকা দান-ধর্মে খরচ হইল বলিয়া ধরিয়া লউন। যদি হিসাবের খাতা রাখেন, তবে তাহাতে লিখিবেন কাপড় দুই টাকা ও

দান-ধর্ম দুই টাকা। যদি দেশের মা-বোনদের বাঁচাইতে চান, তবে কিছু ধর্ম করিতেই হইবে। যদি এইরূপ দান-ধর্ম করেন, তবে গরীবেরা বেকার হইবে না। পিতামহ ভীষ্ম বলিয়াছেন,—'দরিদ্রান্ ভর, কৌন্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরং ধনম্'—অর্থাৎ দরিদ্রকে ধন দাও, ধনবানকে দিও না।"

সকলেই উৎপাদক শ্রম করিবে। সকলকেই উত্তপাদক শ্রম করিবার সুযোগ দিতে হইবে। ইহা হইল পল্লী-শিল্পের মূল কথা। কিন্তু কেবল 'উৎপাদক শ্রম' বলিলে সঠিক বলা হয় না। কারণ যে সব বৃহৎ যন্ত্রশিল্প কোটী-কোটী মানুষকে বেকার করিয়া দেয় তাহাতে যে সব শ্রমিক কাজ করে তাহারাও উৎপাদক শ্রমই করে। কাপড়ের কল এবং চাউল কলের শ্রমিকেরা যে শ্রম করে তাহাও উৎপাদক শ্রম। এজন্য বিনোবাজী কুটীরশিল্পে প্রযুক্ত উৎপাদক শ্রমকে 'দ্রোহরহিত' বিশেষণ দিয়াছেন। বেকারত্ব সৃষ্টিকারী যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সহিত পল্লীশিল্পে উৎপাদনকারী শ্রমিকের এই পার্থক্য। একজনের শ্রম দ্রোহরহিত অর্থাৎ অন্যের অনিষ্ট সাধন করে না এবং অন্য জনের শ্রম 'দ্রোহকারী'।

আমাদের সমাজরচনা পল্লীশিল্প-প্রধান হইবে। বিনোবাজী ইহার স্পষ্টীকরণ করিয়া বলিয়াছেন—" 'প্রধান' বলিবার কারণ এই যে, গৌণরূপে আরও বিষয় ইহাতে থাকিবে।" তাহা হইতেছে—নয়ী-তালিম, রাষ্ট্রভাষা, সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। মহাত্মা গান্ধীনির্দেশিত আঠার দফা গঠনমূলক কার্যের মধ্যে এইসব গৌণ বিষয় রহিয়াছে। তাহা ছাড়া অবস্থার প্রয়োজনে নূতন বিষয়ও যুক্ত হইতে পারে।

(গ) 'অহিংস'—বিনোবাজী 'অহিংস' শব্দের স্পষ্টীকরণ করিয়া বলিয়াছেন—"আমাদের ক্রান্তির সাধন 'অহিংসা' হইবে। ইহাকে আমরা সত্যাগ্রহও বলিয়া থাকি। ইহার চারিটি অঙ্গঃ—(১) দুঃখকষ্ট বরণ করা অর্থাৎ তপস্যা, (২) বিচার প্রচার, (৩) নয়ী-তালিম এবং (৪) পাপ অর্থাৎ অন্যায়ের সহিত অসহযোগ।"

নূতন সমাজরচনায় অহিংসা তিনটি প্রক্রিয়ায় কাজ করিবে—(১) স্বতন্ত্র লোকশক্তি, (২) কর্তৃত্ব-বিভাজন, ও (৩) বিচার-শাসন। এই সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য না লইয়া বা উহা প্রয়োগ না

করিয়া বা উহার অপেক্ষায় না থাকিয়া জনগণ নিজ প্রেরণায় নিজেদের বিধায়ক শক্তি জাগ্রত করিয়া কার্য করিবে। উহা হিংসার বিরোধী।—যেমন আইন প্রণয়নের অপেক্ষায় না থাকিয়া ভূমি প্রাপ্তি ও বিতরণের কার্য। পল্লীশিল্পের ক্ষেত্রেও জনশক্তি সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হওয়া চাই। আইনের সাহায্যে বা সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা পল্লীশিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য অপেক্ষা করা অনুচিত। কর্তৃত্ব-বিভাজন হইতেছে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ও আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ ক্ষমতা কেন্দ্র হইতে হস্তান্তর করিয়া গ্রামের হাতে অর্পণ করা; উহা কেবলমাত্র মফঃস্বলে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অথরিটি সৃষ্টি করা নহে। বিচার-শাসন হইতেছে বাহ্যিক শক্তির চাপে অথবা আইনের ভয় না করিয়া অন্তরে বিচার করিয়া ও বুঝিয়া অন্তরের প্রেরণায় সার্বজনিক ক্ষেত্রে নিজেকে পরিচালনা করা।

॥ ৮৪ ॥ অহিংস ক্রান্তি সাধনের দুই দিক

ভারতের বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা তীব্র বৈষম্যমূলক। একদিকে কতিপয় ব্যক্তির হাতে কোটী কোটী টাকার ভূমি, সম্পত্তি ও ধনদৌলত পুঞ্জীভূত; অন্যদিকে কোটী কোটী লোক নিদারুন দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত। প্রেমের পথে, অহিংসার পথে এই বৈষম্য দূর করিতে হইবে। সাম্যের সমাজ বা সর্বোদয়-সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কিরূপে ইহার বুনিয়াদ প্রস্তুত করা যায়? যাঁহার হাতে বেশী জমি আছে তিনি তাঁহার অতিরিক্ত ভূমি সমবিভাজন বা সমবণ্টনের জন্য সমাজের হাতে অর্পণ করুন। জমি কাহারও নহে। জমি ভগবানের, জমি সমাজের। এজন্য জমিতে ব্যক্তি-মালিকানা থাকিতে পারে না। সুতরাং যাঁহার অল্প জমি তিনিও ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জনের মনোভাব লইয়া উহার প্রতীকস্বরূপ যৎকিঞ্চিত ভূমি 'কৃষ্ণার্পণ' করিবেন। যাঁহার জমি নাই কিন্তু উপার্জন করেন, তিনি তাঁহার আয়ের একাংশ সমাজের হস্তে অর্পণ করিবেন। কারণ ভূমি ব্যতীত অন্য ধনও ভগবানের। উপরন্তু সমাজের সাহায্য বা সহযোগিতা ব্যতীত কেহ কিছুই উপার্জন করিতে সক্ষম নহে। এইজন্য ধনেও কাহারো বক্তিগত মালিকানা থাকিতে পারে না। ধনী ব্যক্তি মালিকানা বিসর্জনের জন্য ও সমবণ্টনের

জন্য তাঁহার আয়ের একাংশ সম্পত্তিদানস্বরূপ অর্পণ করিবেন। যাঁহার আয় কম তিনিও সমাজের ঋণ পরিশোধের জন্য ও ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জনের প্রতীকস্বরূপ আয়ের অল্পাংশ যজ্ঞাহুতিরূপে অর্পণ করিবেন। উপরন্তু শরীরও নিজের নহে, উহাও ভগবানের দান। এজন্য শরীরের যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার কাহারও নাই। মানুষের শক্তি, বুদ্ধি, সময় ও প্রেম নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের জন্য নিঃশেষে ব্যয় করা নিষিদ্ধ। নিজের জন্য ও নিজ পরিবারের জন্য শক্তি, সময়, বুদ্ধি ও প্রেম যথাসম্ভব কম ব্যয় করিয়া উহা সমাজ-সেবার জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে। সমাজে ক্রান্তি আনয়ন করিবার অর্থাৎ সর্বোদয় প্রতিষ্ঠা করিবার এই যে প্রক্রিয়া ইহা হইতেছে নিষেধাত্মক (নেগেটিভ)। কারণ উহা এইরূপ—'তোমার কাছে অধিক রাখিও না। সুতরাং ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, দান কর, দান কর। ত্যাগ করিয়া, দান করিয়া উহাকে কমাও। তুমি সবই নিজের জন্য রাখিতেছ। ইহা ঠিক নহে। সুতরাং উহার কিছু ত্যাগ কর, দান কর।' এই প্রক্রিয়া হইতেছে রোগাক্রান্ত হইবার পর রোগ উপশমের জন্য চিকিৎসা করার অনুরূপ। সুতরাং উহা প্রতিকারাত্মক উপায় বা 'কিউরেটিভ মেথড'। কেবলমাত্র এই নিষেধাত্মক প্রক্রিয়ার দ্বারা সমাজের অভিপ্রেত পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নহে। যাহাতে সমাজ বৈষম্য-রোগে আক্রান্ত না হইতে পারে তাহার উপায় কি? অর্থাৎ উহার 'প্রিভেন্টিভ' বা প্রতিষেধক উপায় কি? যাহাতে সমাজে কাহারও হাতে অধিকতর ভূমি, ধন বা সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হইতে না পারে তাহার উপায় কি? ঐ উপায় হইবে ক্রান্তি—সাধনার বিধায়ক বা 'পজিটিভ' দিক। এই বিধায়ক প্রক্রিয়া হইতেছে পঞ্চবিধ সাম্যের আদর্শ গ্রহণ ও জীবনে উহার প্রয়োগ। এইসব সাম্যের বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। তথাপি এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে উহার উল্লেখ করা আবশ্যক। এই পঞ্চবিধ সাম্য হইতেছে নিম্নরূপঃ—

(১) সকল মনুষ্য সমান। কারণ সকলের মধ্যে একই আত্মা বাস করেন। আত্মার একত্ব সাম্যের মূল। পরমতত্ত্ব পূর্ণ। পূর্ণ হইতে যাহা উদ্ভূত হয় তাহাও পূর্ণ। আর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও পূর্ণ। সবই পূর্ণ, সবই সমান। তাই সকল মনুষ্য সমান। এই বুনিয়াদী সাম্যের আদর্শ

গ্রহণ করিলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহা প্রতিফলিত হয় ও সাম্যের বিকাশ হয়। এজন্য এই বুনিয়াদী সাম্য হইতেছে অন্য চতুর্বিধ সাম্যের মূল।

(২) যদিও সকল মানুষ সমান তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে একই জীবনে সকলের সমান বিকাশ হয় না। অথবা একই দিকে সকলের বিকাশ হয় না। কাহারও বিকাশ একদিকে, কাহারও বিকাশ অন্যদিকে, আবার কাহারও বিকাশ তৃতীয়দিকে—এইরূপ হইয়া থাকে। কাহারও বিকাশ হইয়াছে কৃষকরূপে, কাহারও বিকাশ হইয়াছে উকিলরূপে, ডাক্তাররূপে, জজ-রূপে। নিজ নিজ বিকাশ অনুসারে যদি সকলে নিজ নিজ ভূমিকায় সততার সহিত ও অক্লান্তভাবে সমাজের সেবা অর্থাৎ সমাজের পক্ষে হিত-কারী কাজ করিয়া যান তবে সেই সকল সেবার নৈতিকমূল্য সমান বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা জীবণের নৈতিক ক্ষেত্রের সাম্য।

(৩) উপরোক্তভাবে সততার সহিত ও অক্লান্তভাবে কৃত সকল প্রকার সেবার নৈতিক মূল্য যেরূপ সমান সেরূপ যাঁহারা সমাজকে ঐভাবে সেবা করিয়া থাকেন তাঁহাদের সামাজিক মর্যাদাও সমান হইবে। এইরূপে সামাজিক জীবনে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৪) নিষ্ঠা ও সততার সহিত কৃত সকল প্রকার কাজের আর্থিক মূল্যও সমান হওয়া উচিত। নচেৎ আর্থিক ক্ষেত্রে স্থায়ী সাম্য আনয়ন করা কিছুতেই সম্ভব নহে। শারীরিক ও বৌদ্ধিক সকল প্রকার কাজের পারি-শ্রমিকের মধ্যে সমানতা আনয়ন করিতে হইবে। অবস্থাভেদে মানুষের প্রয়ো-জনের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিতে পারে। তবে সেই পার্থক্য মনুষ্যের হস্তের পঞ্চাঙ্গুলীর মত। উহারা সমানও নহে, অসমানও নহে। এই-জন্য পারিশ্রমিক প্রায় সমান হওয়া আবশ্যক। এইজন্য মহাত্মা গান্ধী বলিতেন যে নাপিতের ৮ ঘণ্টার কাজের মজুরী যদি আট আনা হয় তবে উকিলের ৮ ঘণ্টা কাজের মজুরী আট আনা হওয়া উচিত। ইহাই হইতেছে আর্থিক জীবনের ক্ষেত্রে সাম্যের আদর্শ। আর্থিক ক্ষেত্রে এই সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৫) সকল মানুষকে সমান বলিয়া গণ্য করা হইলে সকলের মতকে সমান মূল্য ও মর্যাদা দিতে হইবে। যদি তাহা হয় তবে অধিকাংশের ভোটের

জোরে কাজ চালানো ঠিক নহে। সার্বজনীন ভোট-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই একটি করিয়া ভোট। প্রত্যেকের ভোটের মূল্য সমান। কিন্তু যখনই ১০০ জনের মধ্যে ৫১ জনের মত একদিকে হইয়া যায় তখনই অবশিষ্ট ৪৯ জনের মতের আর কোন মূল্য থাকে না। ইহা সাম্যের পরিপন্থী। এজন্য সামূহিক জীবনের সকল সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া আবশ্যক। তবেই সকলের মতকে সমান মূল্য ও সমান মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হইবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ও অন্য সব ক্ষেত্রে এরূপ সর্বসম্মতিক্রমে চলিবার ব্যবস্থা হইলে তবেই প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই পঞ্চবিধ সাম্য হইতেছে ক্রান্তি-সাধনার বিধায়ক দিক। নিষেধাত্মক ও বিধায়ক উভয় পথে যুগপৎ অগ্রসর হইলে তবেই পরিপূর্ণ ক্রান্তি সাধন করা সম্ভব হইবে।

॥ ৮৫ ॥ শাসনমুক্ত সমাজ

সর্বোদয় সমাজ-প্রতিষ্ঠার কল্পনায় সমাজের চরম পরিণতি হইতেছে --শাসনমুক্ত অবস্থা। ইহা মাত্র ষ্টেট্‌লেস্ সোসাইটী অর্থাৎ রাষ্ট্র-শাসনবিহীন সমাজ নহে। ইহাতে সামাজিক শাসনও থাকিবে না। প্রত্যেক মানুষ নিজ-নিজ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবে। প্রত্যেকের বিবেক-বুদ্ধি এরূপ বিকশিত হইবে যে, কাহারও সহিত কাহারও স্বার্থ-সংঘর্ষ হইবে না; সুতরাং কোন সংঘর্ষ বা বিবাদের উদ্ভবই হইবে না। বাস্তব-ক্ষেত্রে কখনও হয়তো এই অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। সম্পূর্ণভাবে শাসনমুক্ত সমাজ একটি আদর্শ। আদর্শে পৌঁছিবার জন্য চিরদিন প্রচেষ্টা চলিবে, চিরদিন তদভিমুখে উত্তরোত্তর অধিক অগ্রসর হওয়া যাইবে, কিন্তু হয়তো আদর্শে কখনও পৌঁছানো যাইবে না। কিন্তু আদর্শে একদিন-না-একদিন পৌঁছাইতে হইবে ও পৌঁছানো যাইবে—ইহা মনে করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। এইজন্য এই আদর্শকে অবহেলা করা চলিবে না। কারণ তাহা হইলে অন্যসব ব্যবস্থার মূল শিথিল হইয়া যাইবে। আদর্শ জ্যামিতির বিন্দুর মত। উহার কল্পনা করা যায়, কিন্তু চোখে দেখা যায় না। তথাপি উহাকে বাদ দিয়া কোন বৈজ্ঞানিক বাস্তবক্ষেত্রে অগ্রসর

হইতে পারেন না। কারণ তাহাতে জ্যামিতির পরবর্তী সব সিদ্ধান্ত অচল হইয়া পড়িবে। এই কল্পনাকে বাদ দিলে কোন ইঞ্জিনিয়ার কোন দালানের নক্সা তৈয়ারী করিতে পারিবেন না। সেরূপ শাসনমুক্ত সমাজের আদর্শ সম্মুখে না থাকিলে সর্বোদয়-পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের কোনপ্রকার গঠনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সাধন করা সম্ভব হইবে না। অতএব পূর্ণ শাসনমুক্ত অবস্থা আদর্শস্বরূপ থাকিবে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উহার প্রত্যক্ষ রূপ হইবে শাসননিরপেক্ষ সমাজ। শাসনের অবলম্বন দণ্ডশক্তি। এজন্য শাসনমুক্ত সমাজকে দণ্ডনিরপেক্ষ সমাজও বলা যায়।

সর্বোদয়ের চরম লক্ষ্য 'শাসনমুক্ত সমাজ' কেন? সর্বোদয়ের অর্থ হইতেছে অহিংস-সমাজরচনা। অর্থাৎ হিংসা-মুক্তি। সামাজিকক্ষেত্রে শাসন ও শোষণ এই দুই-এর মাধ্যমে হিংসা আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। আর্থিকক্ষেত্রে হিংসা শোষণের রূপ পরিগ্রহ করে। শোষণের ফলে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় সমাজে নানাবিধ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ঐ সব বিশৃঙ্খলার প্রতিকারের জন্য শাসনের প্রয়োজন। এই কারণে শাসনব্যবস্থার আবিষ্কার হইয়াছে। সমাজে শোষণের মূল হইতেছে কেন্দ্রীভূত উৎপাদনব্যবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদ। কিন্তু আজকাল উৎপাদনের কলকাঠি কেবলমাত্র পুঁজিপতিদের হাতে নহে, উপরন্তু উত্তরোত্তর উহা রাষ্ট্রের হাতে পুঞ্জীভূত হইতেছে। ব্যক্তিগত বা বেসরকারী পুঁজিবাদের দিন চলিয়া যাইতেছে এবং সেইস্থলে রাষ্ট্র-পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আজকাল জগতের প্রায় সর্বপ্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থাই সর্বাধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। ওয়েলফেয়ার ষ্টেট্ বা কল্যাণ-রাষ্ট্রের অন্তরালে থাকিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ সর্বাধিকারী (টোটালিটারিয়্যান) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিরাটতম রাষ্ট্রযন্ত্রকে খাওয়াইতে জনগণের অধিকাংশ উৎপাদনই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য সমাজের এক বিরাট অংশ অনুৎপাদক গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছে। অনুৎপাদক হইলেও তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিবার দাবী সর্বাগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এইভাবে আজ রাষ্ট্র সমাজের এক বিরাটতম শোষক ও হিংসক সংস্থায় পরিণত হইয়াছে। এজন্য সমাজকে হিংসামুক্ত করিতে হইলে তাহাকে শাসনমুক্তও

করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া অনুসরণ করিলে ইহা সহজেই সম্ভব হইতে পারে? শাসন-সংস্থার উপর প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করিলে উহার বিলোপসাধন করা সম্ভব নহে। ইহা সত্য যে, যতদিন শাসনের প্রয়োজন থাকিবে ততদিন শাসন-ব্যবস্থা একেবারে বিলুপ্ত করা সম্ভব হইবে না। শোষণ বন্ধ করিতে হইলে যাহাতে শোষণের অবকাশ না থাকে প্রথমে তাহাই করিতে হইবে। কাজেই শ্রমমূলক স্বাবলম্বন এবং সহযোগী ও সহকারী-বৃত্তির বিকাশ হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকৃত ও শ্রমমূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে। উহা হইতে জনশক্তির বিকাশ হইবে। জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে যাহা ঘরেই উৎপাদন করিয়া লওয়া সম্ভব তাহার জন্য গৃহশিল্প গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা পরিবারের মধ্যে করিতে পারা যাইবে না অথচ গ্রামে পারা যাইবে তাহা গ্রামশিল্পের মাধ্যমে করিতে হইবে। সেইরূপ যাহা গ্রামে উৎপাদন করা সম্ভব নহে তাহা যথাক্রমে জেলা, রাজ্যে ও রাষ্ট্রে উৎপন্ন করিতে হইবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী আর্থিকব্যবস্থার স্থলে স্বাবলম্বী ও সমবায়ী আর্থিক-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই নূতন ব্যবস্থায় যন্ত্রের স্থান কতদূর থাকিবে তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কেবলমাত্র শিল্প নহে, কৃষি-ব্যবস্থারও বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন এবং উহাকে স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এজন্য ভূমি গৃহে-গৃহে বণ্টিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে সকলেই ভূমি নিজহাতে চাষ করিবার সুযোগ পায় এবং কেহ ভূমিকে পুঁজিস্বরূপ ব্যবহার করিতে না পারে। সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ইহারই এবং সর্বপ্রথমেই ইহা হওয়া আবশ্যক। কারণ ভূমিতে যাহা উৎপাদন করা হয় তাহাই হইতেছে মৌলিক উৎপাদন। অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই কৃষিজাত দ্রব্য হইতে বা কৃষিজাত দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এইজন্য কৃষিই হইতেছে শিল্পের ভিত্তি। এই দৃষ্টিতে ভূদানযজ্ঞ অহিংস সমাজরচনার ভিত্তি।

ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কমিউনিষ্টগণ মনে করেন যে অন্তিমে রাষ্ট্র থাকিবে না। তাঁহারা বলেন যে, ঐ অবস্থা আনিতে হইলে প্রথমে রাষ্ট্রকে খুব পাকা ও মজবুত হওয়া প্রয়োজন। আগে সর্বহারাদের এক-

নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পরে রাষ্ট্র ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু রাষ্ট্রকে অন্তিমে লুপ্ত করিতে হইলে প্রথম হইতেই তাহাকে ক্ষীণ করার কাজ আরম্ভ করা উচিত। পশ্চিমে যাইবার জন্য পূর্বদিকে মুখ করিয়া চলিলে লক্ষ্যস্থলে পেঁাছানো যাইবে না। এজন্য ভূমি-বণ্টন ও গৃহ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাও ক্রমে-ক্রমে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। উহাতে ক্ষমতার সত্যিকারের বিকেন্দ্রীকরণ হওয়া চাই। গ্রাম-পঞ্চায়েতে উহা রূপ পরিগ্রহ করিবে। গ্রামের ব্যাপারে উহার সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে। যেমন, যদি কোন গ্রাম মনে করে-যে গ্রামে কলের তৈল আমদানী করা হইবে না, তবে দেশের অন্যত্র অন্যরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলেও তাহার নিজের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করিবার ক্ষমতা সেই গ্রাম-বিশেষের থাকিবে। গ্রাম-পঞ্চায়েৎ যে কিরূপ তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে। সত্যিকারের গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গ্রামবাসীদিগের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত ভোটাভুটির দ্বারা করা হইবে না। তাহাতে সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের নীতি সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—"গ্রাম-পঞ্চায়েতের নীতি এই যে, ভগবান পঞ্চজনের মাধ্যমে কথা বলেন অর্থাৎ পঞ্চায়েতের সর্বসম্মত অভিমতই ভগবানের বিচার বলিয়া মান্য করা উচিত। যেক্ষেত্রে পাঁচজনের মধ্যে তিনজন বা চারজন একরকম বলেন এবং বাকী অন্য রূপ বলেন সেক্ষেত্রে তাহা ভগবানের বিচার হইল না।" এইরূপে ক্রমশ গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

গ্রামই স্থির করিবে যে, ব্যবস্থা ও উৎপাদনের কতটা দায়িত্ব গ্রাম সম্পন্ন করিতে পারিবে। যতটা দায়িত্ব গ্রাম লইতে পারে ততটা দায়িত্ব গ্রাম নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট দায়িত্বের বিশেষ-বিশেষ অংশ আবশ্যকতা অনুসারে ক্রমশ জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রের উপর সঁপিয়া দিবে। উহার জন্য তৎ-তৎ স্থানে অর্থাৎ গ্রাম হইতে জেলা, জেলা হইতে রাজ্য এবং রাজ্য হইতে কেন্দ্রে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার পদ্ধতিও গ্রামই স্থির করিয়া দিবে। এরূপে শাসনক্ষমতা ও শাসনব্যবস্থার মূল গ্রামে থাকিবে এবং উহা যত ঊর্ধ্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই ক্ষমতা ক্ষীণ হইতে হইতে কেন্দ্রে গিয়া

ক্ষীণতম হইয়া যাইবে। বর্তমান ব্যবস্থা উহার ঠিক বিপরীত। এখন কেন্দ্রেই ক্ষমতার মূল এবং গ্রামে ক্ষমতা ক্ষীণতম। গ্রাম হইতে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রত্যেক সংস্থার প্রতিনিধি-নির্বাচন ও সমস্ত কার্য-ব্যবস্থা দলরহিতভাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে করা হইবে। দলগত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নির্বাচনে সর্বসম্মতি হওয়া কঠিন হইবে না। রাষ্ট্রব্যবস্থা বিলোপ করার প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার আভাসমাত্র এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে। সমাজ যতই ঐদিকে অগ্রসর হইবে ততই পরবর্তী স্তরের রূপরেখা স্বভাবতই স্পষ্ট হইতে থাকিবে।

ভূদানযজ্ঞের দ্বারা ভূমি-সমস্যার সমাধান হইতে থাকিলে এবং কুটীরশিল্প ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিল্পব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ হইতে থাকিলে জনগণের মধ্যে আত্মশক্তি জাগ্রত হইবে। এই আত্মশক্তিকে সামুদায়িক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র লোকশক্তি বলা হয়। সরকারের সহায়তার অপেক্ষা না রাখিয়া এবং আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া জনশক্তিবলে অগ্রসর হইতে হইবে। জাহাজের সঙ্গে তুলনা করিলে নূতন সমাজরচনার পূর্ণ শাসনমুক্ত সমাজ হইতেছে দিকনির্ণয়-যন্ত্র এবং স্বতন্ত্র জনশক্তি হইতেছে গতি উৎপাদক শক্তি (মোটর ফোর্স)।

সমাজ-ব্যবস্থার এই আমূল পরিবর্তন সহজসাধ্য করিবার জন্য শিক্ষাব্যবস্থারও তদনুরূপ আমূল পরিবর্তন হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং মানুষের প্রতিটি কর্মপ্রচেষ্টার সহিত শিক্ষার অনুবন্ধ থাকা চাই। এজন্য মহাত্মা গান্ধী নয়ী-তালিম শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। সমাজে বুনিয়াদী মূল্য পরিবর্তনের কাজ যতই অগ্রসর হইবে ততই বুনিয়াদী শিক্ষার কাজও প্রসারলাভ করিবে।

যদি শাসনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাই চরম লক্ষ্য হয় তবে এই ব্যাপারে সরকারের সাহায্য লওয়া হয় কেন? তাহাতে কি ঐ প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে না? এরূপ আশঙ্কার অপনোদন করিতে গিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন যে, (১) মোক্ষ বা দেহমুক্তি সাধন করিতে হইলে দেহের সহায়তায় এবং দেহের মাধ্যমেই করিতে হয়; (২) কুড়াল (কুঠার) দিয়া কাঠ কাটা হয়, কিন্তু

উহার দাণ্ডি কাঠেরই হইয়া থাকে। ভাল সরকার ইহাই চাহিবে যে উত্তম পদ্ধতিতে ক্রমশ শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত হউক এবং জনতা স্বতন্ত্র জনশক্তি-বলে আপন পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখুক। পিতামাতা চাহেন যে, সন্তান তাঁহাদের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখুক। এজন্য সরকার যদি সর্বোদয়ের কাজে সাহায্য করেন, তবে তাহা গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই। কারণ হাতে সম্পূর্ণ কুড়ালই রহিয়াছে। যদি হাতে কেবল কাঠের দাণ্ডিটা থাকিত, তবে আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারিত।

মহাভারতে নৈরাজ্যের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত একটি দেশের বর্ণনা আছে—

"ন তত্র রাজাসীৎ ন দণ্ডো ন চ দাণ্ডিকঃ।
স্বধর্মেন ধর্মজ্ঞাঃ তে রক্ষন্তি পরস্পরাম্।"

"সেইদেশে কোন রাজা ছিল না। শাস্তি দিবার দণ্ড ছিল না। দণ্ডধারীও ছিল না। সেইদেশের জনগণ ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন ছিল। তাহারা ধর্মবুদ্ধিবলে পরস্পরকে রক্ষা করিত।"

॥ ৮৬ ॥ শরীর-শ্রমের গুরুত্ব

নূতন সমাজরচনা বা সর্বোদয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকের উৎপাদক শারীরিক শ্রম করার প্রয়োজনীয়তার উপর কেন-যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাহা ভালভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। এই সাধনপদ্ধতির পশ্চাতে যে-গভীর বিচারধারা রহিয়াছে তাহা বুঝিলে সর্বোদয়ের পথে অগ্রসর হইবার জন্য সকলে প্রেরণা লাভ করিবে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আর্থিক ক্ষেত্র জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র। আর্থিক ক্ষেত্রে সর্বোদয়ের রূপ প্রকাশ পাইলে তাহা সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। সর্বোদয়ের প্রতিষ্ঠায় আর্থিক সাম্যের প্রয়োজনীয়তাও সবচেয়ে বেশী। আর্থিক ক্ষেত্রে সাম্য-প্রতিষ্ঠার অর্থ এই যে—(১) সমাজের উপকারে আসে এমন যে কোন প্রকারের কাজই হউক না কেন, তাহা শরীর-শ্রম হউক বা বৌদ্ধিক শ্রম হউক, সকল কাজের আর্থিক মূল্য সমান হওয়া চাই। এক-দিকে যেমন কৃষি-শ্রমিকের একঘণ্টার কাজ ও কর্মকার বা নাপিতের এক-ঘণ্টার কাজের পারিশ্রমিক সমান হইবে, অন্যদিকে সেরূপ কৃষি-শ্রমিকের

একঘণ্টা কাজের জন্য যে-মজুরী দেওয়া হইবে, উকিলের একঘণ্টা কাজের পারিশ্রমিকও তদপেক্ষা বেশী হইবে না। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর শারীরিক শ্রমের কাজের মূল্য যেমন সমান হওয়া চাই, তেমনি শারীরিক ও বৌদ্ধিক কাজের মূল্যের মধ্যেও পার্থক্য না থাকা উচিত। (২) নৈতিক সাম্য ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে আর্থিক সমানতা প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য। সমাজের পক্ষে চাষের কাজের যেমন প্রয়োজন অধ্যাপকের অধ্যাপনার কাজও তেমনি প্রয়োজন। নৈতিক দৃষ্টিতে এই দুই সমান হওয়া উচিত। উপরন্তু শ্রমিক ও অধ্যাপকের সামাজিক মর্যাদাও সমান হওয়া উচিত। অধ্যাপককে কৃষি-শ্রমিক অপেক্ষা উচ্চ ভাবা উচিত নহে। সমাজের চক্ষে এই দুই-কাজের প্রয়োজনীয়তা যদি সমান হয় এবং উহাদের মর্যাদাও যদি সমান হয়, তবে আর্থিক ক্ষেত্রেও তাঁহাদের পারিশ্রমিক ক্রমশ সমানতার দিকে আসিবে।

আজ সমাজে বৌদ্ধিক কাজের ও শারীরিক শ্রমের পারিশ্রমিকের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। সামাজিক ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীর তুলনায় শ্রমজীবীকে নিতান্ত কম মর্যাদা দেওয়া হয়। ইহা কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিণাম। কারণ কেন্দ্রীকৃত উৎপাদন-ব্যবস্থায় অর্থাৎ বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পে ম্যানেজারাদি বিভিন্ন স্তরের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক এবং যন্ত্র-পরিচালক ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির উচ্চস্তরের বৌদ্ধিক কার্য অপরিহার্য। অন্যদিকে সেখানে শ্রমিকের কাজে বুদ্ধিচালনার একেবারে কোন প্রয়োজনই থাকে না। এই-জন্য নৈতিক ও আর্থিক সমানতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই অবস্থা আদৌ অনুকূল নহে। সাম্য-প্রতিষ্ঠাকল্পে উৎপাদন-ববস্থা এমন হওয়া চাই যেখানে একই ব্যক্তির পক্ষে শারীরিক ও বৌদ্ধিক উভয়বিধ কাজ করিবার প্রয়োজন হয়। উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। পল্লী-শিল্পে শ্রমিক ও ইঞ্জিনীয়ার একই ব্যক্তি অর্থাৎ তাহাতে যে-বুদ্ধির কাজের প্রয়োজন হয় তাহা শ্রমিকই করিয়া লয় ও সহজেই করিতে পারে। ইহাতে জটিল বুদ্ধির আবশ্যকতা নাই। ইহাতে বুদ্ধির মনোপলি (একচেটিয়া) ও একনায়কত্ব থাকে না। উপরন্তু বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় পৃথক পরিচালক বা ব্যবস্থাপকের আবশ্যকতা নাই। যৎসামান্য পুঁজি যাহা লাগে তাহা শ্রমিকই

দিতে পারে। এরূপ কুটীরশিল্পে শিল্পের মালিক নিজেই একযোগে পুঁজি-পতি, শ্রমিক, পরিচালক ও ইঞ্জিনীয়ার। এজন্য তাহাতে সাম্য-প্রতিষ্ঠা আপনা-আপনিই হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীত উৎপাদন-ব্যবস্থার তুলনায় পল্লীশিল্পে বহুগুণ অধিক লোকের শারীরিক শ্রম করিবার প্রয়োজন হয়। আজ শারীরিক শ্রমের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার ভাব বিদ্যমান। সাম্য-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাহা সর্বাপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধক। এজন্য যদি আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে তাহার ভিত্তিস্বরূপ সমাজে শারীরিক শ্রম সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আনিতে হইবে। যাঁহাদের আজ জীবিকা উপার্জনের জন্য শারীরিক শ্রম করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না, যাঁহারা উচ্চস্তরের ও জটিল বুদ্ধির কাজে কুশল ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা যদি দৈনিক কিছু সময় উৎপাদক শ্রম করেন, তবে জনমানসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিবে। দ্রোহরহিত উৎপাদক শ্রমকে জীবন-নিষ্ঠাসরূপ সকলের গ্রহণ করা উচিত। কারণ 'পৃথিবীতে বর্তমান সময়ের বহুতর বৈষম্য, বহুতর দুঃখকষ্ট ও বহুতর পাপের হেতু হইতেছে শ্রম না করিবার অভিলাষ। শরীর-শ্রম হইতে বিরত থাকা যাহার সংকল্প সেব্যক্তির গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে চুরি করিতে হয়।' এইজন্য ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু পরিশ্রম করা উচিত, উৎপাদন করা উচিত। পরিশ্রমরূপী যজ্ঞের দ্বারা সমস্ত দেবতাই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে এরূপে পরিশ্রমরূপী উৎপাদক যজ্ঞ না করিবে সে চোর, সে পাপী হইবে। বিনোবাজী বলেন, "ভগবান এই-যে শাপ দিয়াছেন তাহা আর্য-সংস্কৃতির কথা।

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পাত্র স জীবতি॥"

বিনোবাজী আরও বলেন, "কিছুলোক অধিক মানসিক পরিশ্রম করিবে এবং কিছুলোক অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিবে—একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সকলকে শ্রমনিষ্ঠ হইতে হইবে। কিছুলোক কেবলমাত্র মানসিক কাজ করিবে আর কিছুলোক কেবলমাত্র শারীরিক কাজ করিবে—এরূপ বিভাগ আমরা কখনও চাহি না। সকলকেই উভয় প্রকারের কাজ

করিতে হইবে। ভগবান প্রত্যেককে হাত-পা দিয়াছেন এবং বুদ্ধিও দিয়াছেন। এইজন্য প্রত্যেককে উভয়বিধ কাজ করিতে হইবে। কিন্তু আজ পশ্চিম হইতে এক ভাবধারা আমদানী করা হইয়াছে তাহাতে কিছুলোক কেবল শ্রমজীবী (হ্যান্ডস্) হইয়াই থাকে আর কিছুলোক শুধু বুদ্ধিজীবীই (হেডস্) থাকিয়া যায়। এইরূপ বিভাগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরূপ সমাজরচনা যেন এক মুহূর্তের জন্যও স্থায়ী না হয়।"

॥ ৮৭ ॥ অপরিগ্রহী সমাজের অর্থ

সর্বোদয়-সমাজের পরিকল্পনায় ব্যক্তিগতভাবে কাহারও সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা উচিত নহে। কাজেই সর্বোদয়-সমাজ হইবে অসংগ্রহী বা অপরিগ্রহী সমাজ। ইহাতে কাহারও-কাহারও মনে এরূপ ধারণা আছে যে, ঐ সমাজে কেহ দরিদ্র থাকিবে না বটে, কিন্তু সমাজের অবস্থা খুব স্বচ্ছলও হইবে না। এরূপ ধারণা ভুল। বিনোবাজী তাঁহার এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে অপরিগ্রহী সমাজের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "এখন এদেশে যে-পরিমাণ দুধ হয় তাহা জনসংখ্যার মাথাপিছু আড়াই ছটাক করিয়া পড়ে। কিন্তু আমরা যে-অসংগ্রহী সমাজ গঠন করিতে চাহিতেছি, তাহাতে মাথাপিছু এক সের করিয়া দুধ থাকিবে। বর্তমান সংগ্রহী সমাজের অবস্থা এই যে, দেশে এক বৎসরের পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য থাকে কি-না সন্দেহ। কিন্তু অসংগ্রহী সমাজে কমপক্ষে দুই বৎসরের মত খাদ্যশস্য মজুত থাকিবে। তখন প্রতিটি ঘরে খাদ্যশস্য থাকিবে। বর্তমানে যেমন কাহারও পিপাসা পাইলে সে যে-কোন বাড়ীতে গিয়া জল চাহিতে পারে, অসংগ্রহী সমাজে সেইরূপ কেহ ক্ষুধার্ত হইলে যে-কোন বাড়ীতে গিয়া তাহার আহার্য চাহিবার অধিকার থাকিবে। পানীয় জলের জন্য যেমন কেহ পয়সা চাহে না, সেইরূপ অসংগ্রহী সমাজে ক্ষুধার্তকে খাদ্যদ্রব্য দিবার জন্যও কেহ পয়সা চাহিবে না। ক্ষুধার্তকে খাওয়াইবার মত পর্যাপ্ত শস্য যেন প্রতিঘরেই মজুত থাকে ইহা অসংগ্রহী সমাজের লক্ষ্য। ইহা নূতন কথা নহে। উপনিষদ মন্ত্র দিয়াছেন যে অন্নের উৎপাদন খুব বৃদ্ধি করিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা সকলকে এই শিক্ষা

দিতেছেন যে, জগত মিথ্যা। অতএব আসক্তি রাখিও না। ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা এই—'অন্নং বহু কুর্বীত তদ্ ব্রহ্ম'—অন্ন খুব বৃদ্ধি কর। আমরা অন্ন খুব বৃদ্ধি করিব। তাহাতে গৃহে গৃহে এত অন্ন থাকিবে যে, কেহ তাহার জন্য মূল্য ধরিবে না, কেহ উহা বিক্রয় করিবে না। বরং ঐরূপ করাকে লোকে মিথ্যাচার বলিয়াই গণ্য করিবে। অসংগ্রহী সমাজে খাঁটি ঘি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। কিন্তু 'দালদা' পাওয়া যাইবে না। তরকারীও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। যেকোন বাড়ীতে যাইলে আপনি খাইতে পাইবেন। তবে গৃহস্বামী আপনাকে বলিবেন, 'চলুন ভাই, ২-ঘণ্টা ক্ষেতে কাজ করা যাক। এখন তো ৯টা বাজিয়াছে। ১১টার সময় খাওয়া যাইবে।' সেই সমাজে লোক মাছ-মাংস খাওয়া ত্যাগ করিবে। উহার পরিবর্তে গরুর দুধ প্রচুর পরিমাণে খাইবে। অপরিগ্রহী সমাজে মধুর মহানদী প্রবাহিত হইবে। যেমন মহানদী জঙ্গল হইতে বাহির হয়, সেইরূপ মধুও জঙ্গল হইতে আসিবে। এরূপ অপরিগ্রহী সমাজে আমরা এত পরিগ্রহ বাড়াইতে চাই যে, লোকে তাহা কল্পনাই করিতে পারে না। কিন্তু আমরা চাই যে, সেই পরিগ্রহ, সেই সঞ্চয় প্রতিগৃহে বণ্টন করা হইবে। 'অপরিগ্রহী'র অর্থ হইতেছে—খুব বড় সঞ্চয়, কিন্তু তাহা ঘরে-ঘরে বণ্টিত হইয়া থাকিবে।

"তৃতীয় কথা হইল যে, সঞ্চয়ের মধ্যে কোন অকেজো জিনিস থাকিবে না। আমরা সিগারেটের মত অকেজো জিনিসের বোঝা বাড়াইতে চাহি না। আমরা তাহা অসংগ্রহের দৃষ্টিতে হোলীর দিন জ্বালাইয়া দিতে চাই। অতএব অসংগ্রহের তৃতীয় অর্থ এই যে, সমাজে বাজে জিনিস সংগ্রহ করা হইবে না। উহার অর্থ এই যে, সমাজে লক্ষ্মী খুবই বৃদ্ধি হওয়া চাই, কিন্তু বাজে জিনিস রাখা হইবে না। মদের বোতল ও সিগারেটের বাণ্ডিল লক্ষ্মী নহে।

"চতুর্থ কথা এই যে, অসংগ্রহ বা অপরিগ্রহে ভাল জিনিস হইলেও তাহার ক্রম নির্ণয় করা হইবে। আজ ক্রম সম্বন্ধে ধারণাই নাই। ফলে বাজে জিনিস বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু অসংগ্রহী সমাজে ১নং ক্রমে উত্তম খাদ্য চাই। ২নং ক্রমে বস্ত্র পাওয়া চাই। ৩নং ক্রমে ভাল বাসগৃহ পাওয়া চাই। ৪নং ক্রমে উত্তম যন্ত্রপাতি পাওয়া চাই। ৫নং ক্রমে জ্ঞানলাভের জন্য

উত্তম গ্রন্থাদি পাওয়া চাই। ৬নং ক্রমে মনোরঞ্জনের জন্য সংগীত প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা চাই। এইভাবে প্রয়োজনের গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক জিনিসের ক্রমিক নং থাকিবে এবং তদনুসারে সেই-সেই জিনিসের উৎপাদনও বৃদ্ধি করিতে হইবে। এক ভাই বলিতেছিলেন যে, লোকে ভাল-ভাল কাপড় পরিয়া সভায় আসে। অতএব দারিদ্র্য নাই। আমি বলিব, দারিদ্র্য নিশ্চয় আছে, কিন্তু লোকের বুদ্ধি কম হইয়াছে। শহরে ভাল খাইতে পায় না তথাপি ভাল-ভাল পোষাক পরে। খাঁটি ঘি পাওয়া যায় না, 'দালদা' খাইয়া থাকে। কোন-কোন ঘরে ভাল খাদ্যের জোগাড় নাই, অথবা উহা প্রস্তুতই করা হয় না, কিন্তু বস্ত্র খুব আছে। টুথব্রাশ, পেষ্ট, লিপ-ষ্টিক ইত্যাদি আছে। হারমোনিয়ামও আছে। আরে ভাই, বাদ্য-যন্ত্র তো বাজাইবেই। কিন্তু প্রথমে খাও, তারপরে বাজাইবে। এইভাবে কোন্ জিনিস আগে চাই এবং কোন্ জিনিস পরে তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। ধরুন, আমাদের ঘরে পর্যাপ্ত দুধ নাই, পর্যাপ্ত ঘি নাই। তাহা আমরা প্রথমে আনিব। সুতরাং অসংগ্রহের চতুর্থ অর্থ হইল—ক্রমানুসারে সংগ্রহ।

"পঞ্চম অর্থ হইল—অপরিগ্রহী সমাজে পয়সা যতদূর সম্ভব কম থাকিবে। পয়সা লক্ষ্মী নহে, উহা রাক্ষসী। কলা আম, তরকারী, শস্য—ইহারা লক্ষ্মী। কিন্তু এই-যে পয়সা ইহা নাসিকের কারখানায় তৈয়ারী হয়। সেখানে কাগজ হইতে উহা তৈয়ারী করা হয়। যেমন কাহারও নিকট হইতে কলা কাড়িয়া লইতে হইলে রিভলবার দেখাইয়া যদি তাহাকে বলা হয়—কলা দিবে কি-না বল, পয়সা দিয়া কলা খরিদ করাও সেইরূপ। উহাতে রিভলভারের মত নোট দেখাইয়া বলা হয়, 'কলা দিবে কি-না বল'। রিভল-ভার দেখাইয়া কলা কাড়িয়া লওয়া যেমন চুরি, যেমন ডাকাতি, টাকার নোট দেখাইয়া ঘি লইয়া যাওয়াও সেইরূপ ডাকাতি। পয়সা রাক্ষসের যন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্মী হইলেন দেবতা। লক্ষ্মী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকেন। 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ'—উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মীলাভ করেন। 'করাগ্রে বসতে লক্ষ্মীঃ'—লক্ষ্মীর বাস আমাদের হাতে, আমাদের আঙ্গুলে। হাতে এই পাঁচ আর পাঁচ মোট দশ আঙ্গুল ভগবান আমাদের

দিয়াছেন, তাহার দ্বারা পরিশ্রম করিলে লক্ষ্মীলাভ হয়। এইজন্য অপরিগ্রহী সমাজে যে জিনিস সর্বাপেক্ষা কম থাকিবে তাহা হইল পয়সা। পয়সা লোককে এরূপ ভ্রমে ফেলিয়া দেয় যে, বস্তুতপক্ষে যে ব্যক্তি দরিদ্র তাহাকেই লক্ষ্মীবান বলিয়া মনে করা হয়, আর যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীবান তাহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করা হয়। যাহার দধি, দুধ, তরকারী ও শস্যাদি আছে তাহাকেই দরিদ্র বলা হয়, আর যাহার নিকট এগুলির কিছুই নাই, কিন্তু কেবলমাত্র পয়সা আছে, তাহাকে বলা হয় ধনবান।"

॥ ৮৮ ॥ গ্রামরাজ ও রামরাজ

সর্বোদয়ের আদর্শে সংগঠিত গ্রামকে বিনোবাজী 'গ্রামরাজ' আখ্যা দিয়াছেন। গান্ধীজী 'রামরাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেন। এই দুইটি কি একই জিনিস? মনে করুন, ভূমিদানযজ্ঞ ও সম্পত্তিদানযজ্ঞ সফল হইয়া ভূমির মালিকানাবোধ দূর হইল। যিনি জমি চাষ করিতে চাহেন তিনি জমি পাইয়াছেন। প্রতিটি গ্রাম জনশক্তির বলে জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গ্রামে উৎপন্ন করিয়া লইতেছে। প্রতিটি গ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে। কোন্ জিনিস গ্রামে উৎপন্ন হইবে তাহা নির্ণয় করিবার ও সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার অধিকার গ্রামবাসী অর্জন করিয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি গ্রামে-গ্রামে বিকেন্দ্রীকৃত করা হইয়াছে। সমাজে কোথাও উচ্চ-নীচ ভেদভাব নাই। সকল মানুষ জীবনযাত্রার সমান সুযোগ লাভ করিয়াছে। কাজের প্রকৃতি বা প্রকারভেদে আয়ের ইতর-বিশেষ আর নাই। সকল কাজেরই সমান মূল্য। —ইহাই হইতেছে 'গ্রামরাজ'। 'গ্রামরাজে' যাহা কিছু সিদ্ধান্ত বা নির্ণয় করা হইবে তাহা সর্বসম্মতিক্রমেই করা হইবে। 'গ্রামরাজে'র অবস্থায় মতভেদ বা বিবাদের উদ্ভব হইতে পারে, কিন্তু গ্রামেই সর্বসম্মতিক্রমে তাহার মীমাংসা করিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু 'রামরাজে' বিবাদ-বিসংবাদ বা মতভেদের উদ্ভবই হইবে না। তাহা হইবে সম্পূর্ণরূপে শাসনমুক্ত অবস্থা। সেখানে প্রত্যেক মানুষ নিজের বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইবে। সুতরাং বিনোবাজীর 'গ্রামরাজ' মহাত্মা গান্ধীর 'রামরাজে'র পূর্ব-সূচনা। এ সম্পর্কে বিনোবাজী একদা মন্তব্য করিয়াছিলেন, "যেক্ষেত্রে গ্রামের মত-

ভেদ গ্রামেই সর্বসম্মতিক্রমে মীমাংসিত হয় তাহাই হইবে 'গ্রামরাজ'। যে অবস্থায় মতভেদ বা বিবাদের উদ্ভবই হইবে না তাহা হইবে 'রামরাজ'।"

॥ ৮৯ ॥ ভূদানযজ্ঞের সপ্তবিধ উদ্দেশ্য

এযাবৎ ভূদানযজ্ঞের বহুমুখী উদ্দেশ্যের কথা আলোচিত হইয়াছে। বিনোবাজী ভূদানযজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উহার সপ্তবিধ উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছেন। তাহা হইতেছেঃ—

(১) দারিদ্র্যমোচন।

(২) জমির মালিকগণের হৃদয়ে প্রেমভাবের বিকাশসাধন এবং তাহার ফলে দেশের নৈতিক আবহাওয়ার উন্নতিসাধন।

(৩) একদিকে বৃহৎ ভূস্বামী এবং অন্যদিকে সর্বহারা ভূমিহীন দরিদ্র —এই উভয়ের মধ্যে অন্যত্র যে শ্রেণী-বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভূদানযজ্ঞের দ্বারা নিবারিত হইবে, উভয়ের মধ্যে প্রেম ও সদ্ভাবনার বন্ধন দৃঢ় হইবে এবং উহার পরিণামসরূপ সমাজও শক্তিশালী হইবে।

(৪) যজ্ঞ, দান ও তপঃ—এই তিনের অপূর্ব দর্শনের ভিত্তিতে যে-ভারতীয় সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার পুনরুত্থান ও উন্নতি সাধিত হইবে। মানুষের ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় হইবে।

(৫) দেশের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৬) দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ সহায়ক হইবে।

(৭) ভূদানযজ্ঞের দ্বারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিয়া একই মঞ্চে মিলিত হইবার ও মিলিতভাবে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। ইহাতে দেশ সকল দিক হইতে শক্তিলাভ করিবে।

॥ ৯০ ॥ ভূদানযজ্ঞের তিন দিক

বিনোবাজী বলেন যে ভূদানযজ্ঞের কাজকে তিন দৃষ্টিতে দেখা যায়ঃ (১) অনুকম্পা (ভূতদয়া), (২) সমাজ-রচনার পরিবর্তন ও (৩) নৈতিক উপায় অবলম্বন বা অহিংসার প্রয়োগ।

লোকে দুঃখে পড়িলে তাহার দুঃখ-কষ্টের প্রতিকারের জন্য তাহাকে সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন এবং সাহায্য দেওয়াও হয়। ইহাকে ভূতদয়ার কাজ বা অনুকম্পার কাজ বলা হয়। একদিক হইতে ভূদানযজ্ঞের কাজ ঐরূপ দয়ার কাজ। ইহাতে ভূমিহীন গরীবকে তাড়াতাড়ি ও নিশ্চিতরূপে কিছু জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া তাহার দুঃখ-কষ্টের কিছু লাঘব করা হইয়া থাকে। আজকাল দয়ার কাজকে বা সাহায্যদানের কাজকে (রিলিফের কাজকে) গুরুত্ব দেওয়া হয় না। উহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাবও প্রদর্শন করা হয় না। কিন্তু যে দেশে কোটী কোটী লোক নিরতিশয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছে, সেই দেশে দুঃখার্তের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার কাজ মামুলী ব্যাপার মাত্র এবং একমাত্র সমাজ-রচনা পরিবর্তনের কাজের গুরুত্ব আছে—এরূপ মনে করা ঠিক নহে। এজন্য বিনোবাজী বলেন—"ভারতবর্ষে এই কাজের নিজেরই এক স্বতন্ত্র মূল্য আছে। সুতরাং দুঃখীর দুঃখ দূর করার কাজ গৌণ বা উপেক্ষণীয় নহে। উহার স্থায়ী মূল্য আছে। ঐ কাজের স্থায়ী মূল্য আছে বলিয়া ঐ কাজের প্রতি আকর্ষণ কম হয়। আমরা নিরন্তর বাতাস গ্রহণ করিয়া থাকি। এজন্য উহা আমাদের পক্ষে স্থায়ী বস্তু। এই কারণেই যদি হাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা হয় তবে অধিক শ্রোতা জুটিবে না। কিন্তু রুটি সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে চাহিলে তাহা শুনিবার জন্য বহুলোক আসিবে। তাহা সত্ত্বেও হাওয়ার গুরুত্ব হ্রাস পায় না।" এইজন্য অনুকম্পা বা ভূতদয়ার দৃষ্টিতে ভূদানযজ্ঞে কাজ গ্রহণ করিলে তাহারও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

ভূদানযজ্ঞের দ্বিতীয় দিক হইতেছে এই যে ইহার দ্বারা সমাজ-রচনার পরিবর্তন সাধন করা যাইবে। বিনোবাজী বলেন যে উহা এক বুনিয়াদী বিচারধারা। ভূদানযজ্ঞের কাজের দ্বারা জীবন পরিবর্তন ও সমাজ-রচনার পরিবর্তন সাধনের ভিত্তি স্থাপন করা হইতেছে।

ইহার তৃতীয় দৃষ্টি এই যে ইহাতে কেবলমাত্র নৈতিক উপায় অর্থাৎ অহিংস উপায়ের প্রয়োগ করা হইতেছে। বিনোবাজী বলেন যে জনগণের মধ্যে অহিংসার শাব্দিক প্রতিষ্ঠা আছে বটে, কিন্তু অহিংসার দ্বারা যে বর্তমান সমস্যার সমাধান করা যাইবে তেমন শ্রদ্ধা এখনও জনগণের মধ্যে

জন্মে নাই। এজন্য সিদ্ধান্তের দিক হইতে অহিংসা মানিয়া লওয়া হইলেও কোন বিশেষ সমস্যা যখন উপস্থিত হয় তখন অহিংসায় বিশ্বাসী লোকও কার্যক্ষেত্রে অহিংসাকে গৌণ স্থান দিয়া হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তিও দেখান। তাঁহারা আজও বলেন, অহিংসার হিতের জন্য এইটুকু হিংসা করা উচিত! জগৎ প্রবাহ ও গান্ধীজীর শিক্ষা এই দুই কারণে অনেকের অহিংসার প্রতি নিষ্ঠা জন্মিয়াছে। কিন্তু সেই নিষ্ঠা এখনও ব্যক্তিগত আত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আত্মিক উন্নতির পক্ষে অহিংসা খুবই ফলপ্রদ, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে অহিংসা এখনও পরিপূর্ণভাবে কার্য-করী হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য তাঁহারা মনে করেন যে সেই ক্ষেত্রে এদিক-ওদিক কিছু কমবেশী করিবার (অ্যাডজাস্টমেণ্ট) প্রয়োজন হইবে। অবশ্য তাঁহারা মনে করেন যে ভবিষ্যতের কোন সময়ে সমাজের অবস্থা এমন হইতে পারে যখন সামাজিক ক্ষেত্রেও অহিংসা কার্যকরী হইবে। সুতরাং তাঁহাদের মতে অহিংসা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এখন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কার্যকরী। সমাজে হিংসার প্রতিকারের জন্য প্রতিহিংসা করিতে হইবে, বাধ্য হইয়া করিতে হইলেও করিতে হইবে—এরূপ মনে করা হয়। মোট কথা অহিংসার প্রতি যতই শ্রদ্ধা থাকুক না কেন সামাজিক ক্ষেত্রে এখনও অহিংসার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ভূদানযজ্ঞের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে একমাত্র নৈতিক পদ্ধতি অর্থাৎ অহিংসার উপরে শ্রদ্ধা রাখা হইয়াছে এবং কঠিনতম সমস্যার সমাধানও অহিংস পন্থায় করা যাইবে এই শ্রদ্ধা রাখিয়া সেইভাবে কার্য করা হইতেছে। সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অহিংসা যে কার্যকরী হইতে পারে ভূদানযজ্ঞের দ্বারা তাহার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইতেছে।

॥ ৯১ ॥ যুগপৎ উভয় পদ্ধতির অনুসরণ

এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দুইটি সাধন-প্রক্রিয়া একই সঙ্গে অনুসরণ করা হইতেছে। এক হইতেছে আধ্যাত্মিকতা বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা এবং অন্যটি হইতেছে জন-জাগৃতি। ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। ধন-অর্থ শুধু ব্যক্তিগত ভোগের জন্য নহে। উহা সমাজের।

মানুষ সমাজের পক্ষ হইতে উহার ন্যাসরক্ষক মাত্র। এই বোধ জনগণের মধ্যে জাগ্রত হইলে উহার ফলসরূপ যাঁহার অধিক আছে তিনি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি কেবলমাত্র এইরূপ জাগৃতি হয় এবং আর কিছু না করা হয়, তবে তাহার পরিণামস্বরূপ হিংসার দিকে প্রবণতা সৃষ্টি করিবে। এইজন্য সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হওয়া চাই। সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান। এজন্য মানুষ নিজেকে যেমন ভাবে ও দেখে অন্যকে তাহার সেইরূপে ভাবা ও দেখা উচিত। সকলের আত্মা সমানভাবে জাগ্রত ও বিকশিত হইতে পারে। তাহাতে ধনীরও হৃদয়-পরিবর্তিত হইবে। উপরন্তু উহা জনগণকে সত্য ও অহিংসার পথ অনুসরণ করিবার দীক্ষা দান করিবে। এইজন্য এই দুই প্রকারের প্রচেষ্টা যুগপৎ অগ্রসর হওয়া চাই। নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এজন্য বিনোবাজী যুগপৎ এই উভয় দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "প্রথম হইতেছে এই যে, অন্তরস্থিত ভগবান আমাদের ভরসা। শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, সেই ভগবান জাগ্রত হইবেনই এবং মানুষকে সৎপথে চলিবার প্রেরণা দান করিবেন। দ্বিতীয়ত আমরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টা করিতেছি যাহাতে জন-জাগৃতি আসিবে এবং লোকে দান না দিয়া থাকিতে পারিবে না। এরূপে আমরা উভয়বিধ জাগৃতি আনিবার চেষ্টা করিতেছি—(১) নৈতিক জাগৃতি, তাহাতে হৃদয়-পরিবর্তন সাধিত হইবে এবং (২) জনমানসে চেতনার সঞ্চার। যদি কেবলমাত্র জনগণের মধ্যে চেতনা আসে এবং নৈতিক জাগৃতি না আসে, তবে তাহা হিংসাশক্তিকে জাগ্রত করিতে পারে। অন্যদিকে যদি কেবল নৈতিক জাগৃতি হয়, তবে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বহুদিন লাগিবে। যেমন উড়িবার জন্য পক্ষীর উভয় পক্ষেরই প্রয়োজন হয়, তেমনি কোন সৎ সংকল্পের সিদ্ধির জন্য অন্তর্জাগৃতি ও বাহ্য-পরিবর্তন উভয়েরই আবশ্যক।"

॥ ৯২ ॥ বুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা

বুদ্ধি দিক্ প্রদর্শন করে এবং হৃদয় কর্মে প্রেরণাদান করে। নৌকার হাল (কর্ণ) নৌকা কোন্‌দিকে যাইবে তাহা দেখাইয়া দেয়, আর দাঁড়

(ক্ষেপনী) তাহার শক্তির দ্বারা নৌকাকে চালনা করে। বুদ্ধি হইতেছে হাল আর হৃদয় বা শ্রদ্ধা হইতেছে দাঁড়। শ্রদ্ধা মোটর ফোর্স এবং বুদ্ধি স্টিয়ারিং। জীবনের কোন মৌলিক সিদ্ধান্ত যখন সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মানুষ বুদ্ধির দ্বারা সেই বিচার বুঝিয়া লয়। তখন সেই সিদ্ধান্ত কোনদিকে লইয়া যাইবে তাহা সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তাহা সত্ত্বেও সেই বিচার যদি তাহার হৃদয়কে স্পর্শ না করে, তবে সে কর্মে প্রেরণালাভ করিতে পারে না। অন্যদিকে এমনও হইতে পারে, একজনের বুদ্ধি তেমন প্রখর নহে, বুদ্ধির দ্বারা বিচার সে ভালভাবে বুঝিতে পারে না, অথচ সিদ্ধান্ত তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্তের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ঐ সিদ্ধান্তের বিচারধারা ভালভাবে না বুঝিলেও শ্রদ্ধার বলে সে আন্তরিকভাবে কাজ করিয়া যাইবে। শ্রদ্ধা থাকিলে বিশ্বাস আসিবেই।

সার্বজনীন ক্ষেত্রে অহিংসার ব্যাপারে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কারণ এখানে নজীর বা প্রমাণ বিশেষ নাই। যদি বিনোবাজী তেলঙ্গানার পচমপল্লী গ্রাম হইতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লইয়া জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর না হইতেন, তবে কি আর এই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছানো সম্ভব হইত? এইজন্য সর্বোদয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে শ্রদ্ধা লইয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের আজ আর সেই অবস্থা নাই। বিনোবাজী বলেন--"পৃথিবীতে কোন-কোন কাজ বুদ্ধির দ্বারা করিতে হয়, আবার কোন-কোন কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা করিতে হয়। দুই-ই পরস্পরের পূরক। দুই-এরই আবশ্যকতা আছে। বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে আমি এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি—বুদ্ধি হইতেছে তাহা, যাহা প্রমাণ ব্যতীত কোন বিষয়কে স্বীকার করে না। আর শ্রদ্ধা হইতেছে তাহা, যাহা কোন বিশিষ্ট বিষয় মানিবার জন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।" যেমন শিশু মাতার স্তন্য পান করিবার পূর্বে তাহার ইহা প্রমাণ করাইয়া লইবার প্রয়োজন হয় না যে, স্তন্যে সার পদার্থ আছে এবং তাহাতে তাহার পোষণ হইবে। শ্রদ্ধাবশত বিনা প্রমাণেই সে স্তন্য পান করে। বিনোবাজী বলেন—"এইজন্য কোন-কোন বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা থাকা চাই।"

শ্রদ্ধার সহিত কর্ম সম্পাদন করিতে থাকিলে যতই ফলোদয় হইতে থাকে, ততই নিষ্ঠাও জন্মিতে থাকে। কাজে যতই অভিজ্ঞতা হয়, ততই নিষ্ঠাও দৃঢ় হইতে থাকে। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধা এক দৃঢ় দেওয়ালের মত। হয় ইহা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে, না হয় ইহা ভূ-শায়িত হইয়া থাকিবে। হয় ইহা পরিপূর্ণ, না হয়, ইহা একেবারেই নাই। যেমন কোন মানুষ, হয় সম্পূর্ণ জীবিত, না হয় সম্পূর্ণ মৃত। যেমন কেহ শতকরা ৪০, ৫০ বা ৬০ ভাগ জীবিত আর ৬০, ৫০ বা ৪০ ভাগ মৃত হইতে পারে না, সেরূপ শ্রদ্ধা কখনও আংশিক হইতে পারে না। শ্রদ্ধা ব্যতীত কোন মহৎ কার্য কখনও সাধিত হয় না। কর্ম শ্রদ্ধাকে অনুসরণ করে এবং কর্মের পশ্চাতে নিষ্ঠা আসিয়া থাকে। নিষ্ঠা জন্মিবার পূর্বে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে কাজ করিয়া যায়। অভিজ্ঞতায় সফলতা-প্রাপ্ত হইলে নিষ্ঠার উদয় হয়। মানুষ কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে উহাতে তাহার শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। আমরা নৈতিকশক্তির দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিতে চাই। সুতরাং সাধনোপায়ে আমাদের দৃঢ়শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন।"

॥ ৯৩ ॥ জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞান শক্তি ও গতি দান করে, আর জ্ঞান পথ প্রদর্শন করে। যেখানে আত্মজ্ঞান সেখানে ভূমার দিকে পথ প্রদর্শিত হয়। আর অহিংসা পরম কল্যাণের দিকে পথ দেখায়। যেমন আত্মজ্ঞান ও অহিংসা পথ দেখায়, তেমনি হিংসা ও অজ্ঞানও পথ দেখায়। তবে অজ্ঞান বা হিংসা যে-পথ দেখায় তাহা হইতেছে বিনাশের পথ, অকল্যাণের পথ। বিজ্ঞান 'মোটর ফোর্স' এবং আত্মজ্ঞান, অহিংসা, অজ্ঞান ও হিংসা (স্টিয়ারিং) পথ প্রদর্শক। বিজ্ঞান নৌকার ক্ষেপনী (দাঁড়) এবং আত্মজ্ঞান বা অহিংসা অথবা অজ্ঞান বা হিংসা নৌকার মাঝি (কর্ণধার)। এজন্য বিজ্ঞান হিংসার সহায়তা করিলে অশেষ অনিষ্টসাধন করে। পুরাকালে বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই। এজন্য যুদ্ধ বাধিলে হাতাহাতি যুদ্ধ হইত। যাহারা যুদ্ধে যোগদান করিত, ক্ষতি-বৃদ্ধি কেবলমাত্র তাহাদেরই হইত। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হওয়ায় এখন যুদ্ধ বাধিলে সমগ্র পৃথিবী তাহার কবলস্থ

হইয়া পড়ে এবং অনিষ্টসাধনের অবধি থাকে না। হিংসার সহিত বিজ্ঞান যুক্ত হওয়ায় আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সেরূপ বিজ্ঞানের সহায়তায় অহিংসা বা আত্মজ্ঞানের বিচারধারা দেশ-বিদেশে প্রসারিত এবং প্রচারিত হইবার সুযোগ হইয়াছে। বিজ্ঞানকে যদি কল্যাণদায়িণীশক্তিরূপে পাইতে হয়, তবে তাহার সঙ্গে আত্মজ্ঞান বা অহিংসার মিলনসাধন করিতে হইবে এবং অজ্ঞান বা হিংসার সঙ্গে বিজ্ঞানের চিরবিচ্ছেদ ঘটাইতে হইবে। নচেৎ পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য।

॥ ৯৪ ॥ গান্ধী-দর্শনে ত্রয়ী নীতি

গান্ধী-দর্শনের লক্ষ্য হইতেছে অহিংস সমাজরচনা বা সর্বোদয়-সমাজ প্রতিষ্ঠা। উহার মধ্যে তিনটি নীতি নিহিত আছে। গান্ধীজীর বিচারধারাকে নব সমাজরচনায় রূপায়িত করিতে হইলে ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে ঐ তিন নীতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ভূদানযজ্ঞ তথা সর্বোদয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ঐ তিন নীতি রহিয়াছে। ঐ তিন নীতি হইতেছে—(১) বর্ণ-ব্যবস্থা, (২) ট্রাস্টীশিপ ও (৩) বিকেন্দ্রীকরণ।

(১) বর্ণ-ব্যবস্থা—বর্ণ-ব্যবস্থার কথা শুনিয়া অনেকে চমকাইয়া উঠিতে পারেন। উহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। কারণ বর্ণ-ব্যবস্থার মূলে পবিত্র কল্পনা থাকিলেও সমাজ উহাকে বিকৃত করিয়া জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, উচ্চ-নীচভেদ ও ধনবৈষম্য ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া নিজেকে অধঃপতিত করিয়াছে। এজন্য বর্ণ-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিলে ঐসব গুরুতর সামাজিক গ্লানির কথা লোকের মনে আসিয়া যায়। কিন্তু গান্ধীজী অহিংস সমাজ-রচনার ক্ষেত্রে যে-অর্থে উহা প্রয়োগ করিতে চান তাহার সহিত বিকৃত বর্ণ-ব্যবস্থার ঐসমস্ত গ্লানির কোনরূপ সংস্রব নাই। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সমাজে যেসব মহান্ শব্দ পরম্পরাগত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে সে-সকল শব্দ পরিত্যাগ না করিয়া সমাজের নূতন প্রয়োজন অনুসারে উহাতে নূতন অর্থ ভরিয়া দিয়া ঐ শব্দগুলির প্রচলন করা এক অহিংস প্রক্রিয়া। এই অহিংস প্রক্রিয়া অনুসারেই বর্ণ-ব্যবস্থাকে অহিংস সমাজরচনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ গণ্য হইবার উপযোগী করিয়া গান্ধীজী উহার প্রয়োগ

করিয়াছেন। অতএব 'বর্ণ-ব্যবস্থা' শব্দের ব্যবহারে আপত্তি করিবার কিছু নাই। শব্দের বিশেষ কিছু মূল্য নাই। কোন্ অর্থে উহার প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাই আসল কথা।

অহিংস সমাজরচনার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বর্ণ-ব্যবস্থার সার হইতেছেঃ—(ক) সকল প্রকার কাজের সমান পারিশ্রমিক ও সমান মর্যাদা, (খ) প্রতিযোগিতার অভাব, ও (গ) শিক্ষা-ব্যবস্থায় বংশ-পরম্পরাগত সংস্কৃতিকে কাজে লাগানো। অহিংস সমাজরচনায় এই তিন জিনিসেরই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। যদি গান্ধীজী অন্যদেশে অন্য সংস্কৃতির মধ্যে জন্মিতেন, তবে হয়তো এ সম্পর্কে বর্ণ-ব্যবস্থা শব্দ তাঁহার মনে আসিত না। উপরোক্ত তিনটি ভাবের দ্যোতক অন্য কোন উপযোগী শব্দ তিনি প্রয়োগ করিতেন।

শ্রীকিশোরলাল মশ্রুওয়ালা বর্ণ-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন —"সাধারণত লোকে পিতার জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাতে সমাজ-জীবনে স্থিরতা আসে, সন্তানকে ব্যবস্থিত শিক্ষাদান করিবার পক্ষে সুবিধা হয় এবং উহা সেইকাজের বৈজ্ঞানিক উন্নতির পক্ষেও বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকে। যদি সকল কাজের পারিশ্রমিক এক বা প্রায় সমান হয় এবং মর্যাদাও সমান হয়, তবে বিশেষ অবস্থা ব্যতীত অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিবার জন্য লোকের আগ্রহ হইবে না। সাধারণত এরূপ মনে করা হইয়া থাকে যে, পিতামাতার বৃত্তির প্রতি রুচি ও উহার কুশলতা সন্তানের রক্তেও সংক্রমিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, জীবনব্যাপী ও পুরুষানুক্রমে একই বৃত্তি অনুসরণ করিলে শরীর-গঠনে স্থায়ী পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং ঐ পরিবর্তন সন্তানে বর্তিবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু সন্তান শৈশব হইতেই পিতামাতার বৃত্তির আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হইয়া থাকে। এই দুই কারণে সন্তানের পক্ষে অন্য পেশা অপেক্ষা পিতার পেশা শিক্ষা ও গ্রহণ করা বিশেষভাবে সহজসাধ্য হইয়া থাকে। এইজন্য জীবনের সাধারণ নিয়ম এই হওয়া উচিত যে, প্রত্যেকে জীবিকা উপার্জনের জন্য তাহার পিতার পেশা অথবা ঐ পেশার কোন শাখা অথবা ঐ পেশার বিকাশসরূপ সৃষ্ট কোন পেশাকে অবলম্বন করা ধর্ম বলিয়া মনে করিবে। সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন পেশা

অবলম্বন করা অবাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য করা উচিত। যদি ইহা একবার নিশ্চিতভাবে স্থির হইয়া যায় যে, প্রত্যেকে জীবিকা অর্জনের জন্য তাহার পিতামাতার পেশা অবলম্বন করিবে, তবে আজ যেরূপ লোকে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করিয়াও কোন্ পেশা গ্রহণ করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না, সেরূপ বেদনাদায়ক দৃশ্য আর দেখিতে হইবে না। কারণ তাহা হইলে এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া গোড়া হইতেই প্রত্যেকের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে।"

নিম্নলিখিত বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে পেশা অবলম্বনের নিয়ম লঙ্ঘন করা যাইতে পারেঃ—

(ক) যদি পিতার বৃত্তি মূলনীতির বিরোধী হয়, তবে ঐ বৃত্তি পরিবর্তন করা যাইতে পারে এবং তাহা করাও বাঞ্ছনীয়।

(খ) যদি কাহারও মধ্যে অন্যকোন পেশার উপযোগী গুণের বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তিনি জীবিকার জন্য পৈতৃক পেশাই অবলম্বন করিবেন বটে, কিন্তু সেবার জন্য পারিশ্রমিক না লইয়া সেই অন্য কাজ করিতে পারিবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি কোন কৃষকের পুত্রের মধ্যে চিকিৎসকের গুণের বিকাশ হয়, তবে জীবিকার জন্য তিনি কৃষিকার্য করিবেন, কিন্তু জনসেবার জন্য তিনি বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসার কাজ করিতে পারিবেন।

(গ) সমাজের পরম্পরাগত কোন ব্যবসায়ে আমূল বা হিতকারী কোন পরিবর্তন সাধন করিবার উদ্দেশ্যে যদি নূতন দৃষ্টিসম্পন্ন কর্মী সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হয়, তবে অন্য বৃত্তিধারী মানুষও সেবার্থে সেইকাজ গ্রহণ করিতে পারেন। যেমন আজ নূতন সমাজরচনার জন্য বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর মধ্য হইতে কৃষি, গো-পালন ইত্যাদির কাজে লাগিবার জন্য কর্মী আহ্বান করা হইতেছে।

এদেশে জমি কম। এইজন্য সকল কৃষককে জীবিকা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত জমি দেওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং পরিপূরক বৃত্তিসরূপ কৃষককে অন্যান্য গৃহশিল্প চালাইতে হইবে। নব সমাজরচনায় মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কৃষক যদি কেবলমাত্র

চাষই করে, তবে তাহার ব্যক্তিত্বের বিশেষ বিকাশ হইবে না। সেই কারণে এরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছে যে, কৃষকের গৃহে একাধিক শিল্পও চলিবে। ব্যক্তিত্বের সম্যক্ বিকাশের জন্য বহু-শিল্পী পরিবার (মাল্টিক্র্যাফ্‌ট্) সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। ইহা বর্ণ-ব্যবস্থার পরিপন্থী নহে কি? না, উহা বর্ণ-ব্যবস্থার পরিপন্থী নহে। যদি আজ সমাজে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থার জন্য বা ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য পিতাকে একাধিক কাজ করিতে হয়, তবে পুত্রও জীবিকা অর্জনের জন্য ঠিক সেই-সেই কাজ করিবেন। মুখ্যত যিনি যে কাজই করুন না কেন, বিনোবাজী সকলকেই কিছু সময়ের জন্য নিয়মিত কৃষিকার্য করিতে বলেন। কারণ কৃষি সর্বোত্তম শরীর-শ্রম ও শ্রেষ্ঠ শিল্প। এইভাবে কৃষির কাজ যিনি করিবেন, তিনি উহা তাঁহার জীবিকা উপার্জনের অংগস্বরূপ করিবেন কি সেবার্থ করিবেন তাহা তাঁহার মুখ্যবৃত্তির আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। যদি মুখ্যবৃত্তির আয় তাঁহার পক্ষে পর্যাপ্ত হয়, তবে তিনি সেবার্থ কৃষির কাজ করিবেন। যেমন, জজ সাহেব সেবার্থে কৃষির কাজ করিবেন। নতুবা তাঁহার মাহিনা এতটা কম হওয়া আবশ্যক যাহাতে কৃষির আয় সমেত উহা তাঁহার জীবিকার পক্ষে পর্যাপ্ত হয়। যদি তাঁতের কাজে তাঁতীর আয় অপ্রচুর হয়, তবে কৃষি-ই তাঁহার পরিপূরক বৃত্তি হইবে।

বর্ণ-ব্যবস্থা অনুসারে সকল কাজের আর্থিক মূল্য যদি সমান হয় এবং উহার মর্যাদাও সমান হয়, তবে বুদ্ধিজীবীরাও স্বাস্থ্যলাভ ও জীবন-বিকাশের জন্য ক্রমশ কৃষির কাজ বা শরীর-শ্রমসাধ্য অন্য কোন কাজ করিতে আকৃষ্ট হইবেন।

(২) ট্রাস্টীশিপ—বর্ণ-ব্যবস্থার ন্যায় ট্রাস্টীশিপ কথাটিও অনেকের কাছে ভাল লাগে না। ইহার কারণ এই যে, আইনানুসারে নিযুক্ত ট্রাষ্টিগণের মধ্যে বহুক্ষেত্রে সততার অভাব দেখা গিয়াছে এবং তাঁহারা তাঁহাদের ক্ষমতা ও অধিকারের অপব্যবহার করিয়া জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছেন। তজ্জন্য অনেকে সন্দেহ করিতেন যে, গান্ধীজী রাজা, জমিদার, পুঁজিপতি ও অন্যান্য কায়েমী-স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রক্ষার জন্য ট্রাষ্টীশিপের প্রবর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে আর একটি রক্ষাকবচ প্রদান করিয়াছেন। এই

আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাছে একটুও সম্পত্তি থাকুক ইহা গান্ধীজী চাহেন নাই। যাহা হউক, আইনে 'ট্রাষ্টী'-শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য অতি পবিত্র। সত্যাগ্রহী গান্ধীজী সেই পবিত্র অর্থেই উহা গ্রহণ করেন। অপরিগ্রহ, সমভাব ইত্যাদি গীতোক্ত ভাবধারা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। ব্যবহারিক জীবনে কিরূপে উহা আচরণ করা যাইবে তাহার চিন্তা করিতে গিয়াই 'ট্রাষ্টী' শব্দটিকে তিনি উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করেন। আইনে ট্রাণ্টী-শব্দের যে-অর্থ তৎসমুদয় অর্থ গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, উপরন্তু নৈতিক দৃষ্টিতে আর যে-যে অর্থ অনিবার্যভাবে আসিতে পারে তৎসমুদয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিনোবাজী ট্রাষ্টীশিপের পরিবর্তে 'বিশ্বস্তবৃত্তি'-শব্দ ব্যবহার করেন। এক্ষণে গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপ সিদ্ধান্তের ভাবধারা বুঝিয়া দেখা যাউক।

জগতে যাহাকিছু আছে—স্থাবর-জঙ্গম, চেতন-অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম, বাহ্য-অন্তর, দৃশ্য-অনুভবযোগ্য প্রভৃতি সমস্তকিছুরই মালিক ভগবান। মনুষ্য কোনকিছুরই মালিক নহে। শরীর, মন, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও কুশলতার মালিকও মনুষ্য নহে; সব মালিকানা ভগবানের। উদাহরণস্বরূপ—কল-কারখানার মালিক ম্যানেজার, ডিরেক্টর, অংশীদার বা শ্রমিকগণ নহেন; উহার মালিক ঈশ্বর। জমি যাঁহার হাতে আছে তিনি জমির মালিক নহেন। জমির মালিক হইতেছেন ভগবান। শুধু তাহাই নহে, শ্রমিকের শ্রমশক্তির মালিক শ্রমিক নহেন, উকিলের বুদ্ধিশক্তির মালিক উকিল নহেন, রাজ্যকর্তার রাজশক্তির মালিক তিনি নহেন, পুলিশমুখ্যের ক্ষমতার মালিক তিনি নহেন। সবকিছুরই মালিক ঈশ্বর। ট্রাষ্টীশিপ সম্পর্কীয় আইনানুসারে ট্রাষ্ট-সম্পত্তির মালিক থাকা চাই ও ট্রাণ্ট-সম্পত্তির আয় ভোগ করিবার জন্য হিতাধিকারী (বেনিফিসিয়ারী) থাকা চাই। গান্ধীজীর পরিকল্পিত ট্রাণ্টীশিপে ট্রাষ্ট-সম্পত্তির মালিক হইতেছেন ভগবান এবং উহার হিতাধিকারী হইতেছে সমগ্র সৃষ্টি। যেমন, কলকারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, ম্যানেজার, পুঁজিপতি প্রভৃতি যাঁহারা আছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই কারখানার আয় ভোগ করিবার অধিকারী নহেন—সকলেই উহা ভোগ করিবার অধিকারী, এমন কি মনুষ্যেতর জীবও। তবে এ বিষয়ে মনুষ্যের অগ্রাধিকার থাকিবে

মাত্র। গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপ নীতি অনুসারে যাঁহার কাছে যাহা আছে—তিনি তাহার সম্পর্কে নিজেকে ট্রাষ্টী বলিয়া গণ্য করিবেন। তিনি সযত্নে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং মিতব্যয়ীর মত উহার ফল ভোগ করিবেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে তিনি উহা হইতে কিছু গ্রহণ করিবেন এবং অবশিষ্ট সমস্তই সেবার্থে সমর্পণ করিবেন। নিজের শরীরকেও যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া নষ্ট করিবার অধিকার তাঁহার নাই। শরীর সমগ্র সৃষ্টির সেবার জন্য। এজন্য সযত্নে, সতর্কতার সহিত শরীরকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে উহাকে বিসর্জন দিতেও হইবে। মানুষের শক্তি, বুদ্ধি, কুশলতা, ক্ষমতা, অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সবই সমগ্র সৃষ্টির সেবার জন্য।

গান্ধীজী এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিয়া দিতে চান কি? না তাহা নহে। যতদিন সম্পত্তি-পরিগ্রহের প্রথা নিবারণ করা না যাইতেছে ততদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাঁহার কাছে রহিয়াছে বা থাকিবে তিনি নিজে কোন্ দৃষ্টিতে উহা দেখিবেন এবং ততদিন ঐ ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাঁহার কাছে কি-ভাবে থাকিবে তাহাই হইতেছে 'ট্রাষ্টীশিপ' নীতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার মূলকথা। তিনি উহা কেবল ট্রাষ্টীস্বরূপ দখল করিতেছেন এই মনোবৃত্তি তাঁহার আসা চাই এবং তাঁহার তদনুরূপ আচরণও করা চাই।

আরও একটি কথা। ধরিয়া লওয়া যাউক, ব্যক্তিগত সম্পত্তি চলিয়া গেল, অথবা উহা এতই কম হইল যে, উহার গুরুত্ব আর বিশেষ কিছু থাকিল না। সমাজে তখন ট্রাষ্টীশিপ-নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন আর থাকিবে কি? কোন না কোন প্রকারে ঐ প্রয়োজন চিরদিন থাকিবে। শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দৈহিক, মানসিক এবং বৌদ্ধিক শক্তি ও যোগ্যতার বৈষম্য কম করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কিছু-না-কিছু বৈষম্য চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। সুতরাং মানুষ যেন চিরদিনই নিজেকে নিজের শরীর, মন ও বুদ্ধির ট্রাষ্টী বলিয়া গণ্য করিয়া তদ্রূপ আচরণ করিয়া চলেন এবং তৎসমুদয় সেবার্থ নিয়োজিত করেন।

আইনে নাবালকের সম্পত্তি ট্রাষ্টীর হাতে গেলে যখন উক্ত নাবালক প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন ট্রাষ্টীর কর্তব্য হইতেছে তাহাকে তাহার সম্পত্তি প্রত্যর্পণ

করা। যতদিন দেশে জনসংখ্যা কম ছিল এবং ভূমি বেশী ছিল ততদিন ভূমি-সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। অনন্তর উত্তরোত্তর দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার চাপে দেশে কোটী-কোটী ভূমিহীন দরিদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এতদিন তাহারা অসাড় অবস্থায় ছিল, তাহারা নিদ্রিত ছিল। এখন তাহারা জাগরিত হইয়াছে। কোটী-কোটী ভূমিহীন নাবালক আজ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য এখন ভূমিবান ট্রাষ্টীগণের কর্তব্য হিতাধিকারী (বেনিফিসিয়ারী) ভূমিহীন দরিদ্রগণকে তাহাদের ভূমি প্রত্যর্পণ করা। ইহাই ভূদানযজ্ঞের আহ্বান।

কেহ-কেহ গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপের ভুল অর্থ করিয়া থাকেন। এই কথা বলিতে গিয়া বিনোবাজী সম্প্রতি ট্রাষ্টীশিপ-সিদ্ধান্তের অর্থের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "আমি ইহা বলিতে চাই যে, কেহ-কেহ গান্ধীজীর ট্রাষ্টীশিপ-সিদ্ধান্তের ভুল অর্থ করিতেছেন।

"ট্রাষ্টীশিপের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, ট্রাষ্টী নিজেকে পিতৃস্থানীয় বলিয়া গণ্য করিবেন। পিতা পুত্রকে নিজের অপেক্ষা অধিক বেশী ভালভাবে লালন-পালন করিয়া থাকেন। কোনও পিতা এই কথা বলেন না, 'আমি নিজেকে যতটা যত্ন করি, পুত্রকেও ঠিক ততটা যত্ন করিয়া থাকি।' বরং পিতা এই কথা বলেন, 'আমি পুত্রকে নিজের অপেক্ষা অধিক যত্ন করিয়া থাকি।' এরূপে ট্রাষ্টী নিজেকে পিতার মতই মনে করিবেন। কিন্তু শুধু ইহাতে ট্রাষ্টীশিপের উদ্দেশ্য সফল হয় না। ট্রাষ্টীশিপের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, পিতা চাহেন পুত্র খুব তাড়াতাড়ি তাঁহার সমান হইয়া উঠুক, তাঁহার সমান যোগ্যতা অর্জন করুক এবং নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখুক। এরূপে গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গভীর।" সুতরাং সমাজে একটু-আধটু পরিবর্তন আসিলে, বা কিছু সংস্কার হইলে ট্রাষ্টীশিপের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে না। শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করা হইল, কিন্তু মালিক-শ্রমিকশ্রেণীকে স্থায়ী করিয়া রাখিবার জনাই মালিককে মালিক আর শ্রমিককে শ্রমিক রাখা হইল। ইহাতে ট্রাষ্টীশিপও হইল না, সর্বোদয়ও হইল না।

(৩) বিকেন্দ্রীকরণ—বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করা

হইয়াছে। এখানে কেবলমাত্র দুই-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(ক) যন্ত্রযুগের আবির্ভাবের পূর্বে দেশের অর্থব্যবস্থা তথা শিল্প-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত ছিল। এখন এই-যে বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হইতেছে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কি আর থাকিতে পারে? এই আশঙ্কার নিরশন হওয়া প্রয়োজন। যন্ত্রযুগের পূর্বে সবই বিকেন্দ্রীত ছিল বটে, কিন্তু সেই বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থিত ছিল না। তখন গ্রামে-গ্রামে শিল্পগুলি ছড়াইয়া ছিল মাত্র। তাহার পশ্চাতে কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না, কোন সংগঠনও ছিল না। এইজন্য যন্ত্রশিল্পের প্রথম আঘাতেই পল্লীশিল্পগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নূতন সমাজরচনায় যে বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা চলিবে তাহাতে যন্ত্রযুগের ও বিজ্ঞানের সমস্ত অবদানকেই কাজে লাগানো হইবে এবং শক্তি সঞ্চয় করিবার মত তাহাতে যাহাকিছু আছে তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিয়া উত্তরোত্তর অধিক শক্তি সঞ্চয় করা হইবে। লক্ষ্য থাকিবে যে যন্ত্রযুগ বা বিজ্ঞানের কোন অবদান গ্রহণ করিবার ফলে যেন কোনরূপ বেকারত্ব, আলস্য ও বুদ্ধির জড়তার সৃষ্টি না হয়। এইভাবে যন্ত্রযুগের যাহাকিছু গ্রহণযোগ্য বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিবে। পূর্বে যে-বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প ছিল তাহাতে এরূপ শক্তি ছিল না। সমগ্র দৃষ্টি লইয়া তাহার পশ্চাতে কোন ব্যাপক পরিকল্পনাও ছিল না। বর্তমানের বিকেন্দ্রীকরণ-ব্যবস্থা যন্ত্রযুগের যাহাকিছু ভাল তৎসমস্তই হজম করিয়া লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না, উহা অবশেষে যন্ত্রযুগকেই বিলীন করিয়া দিবে। পূর্বের বিকেন্দ্রীকৃত শিল্প ও বর্তমানের বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনার মধ্যে এই বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে।

(খ) বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ কেবলমাত্র শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ নহে, রাজ্যশক্তির বিকেন্দ্রীকরণও ইহার অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু সমাজের যে-কোন ক্ষেত্রে, যেখানেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে তাহারও বিকেন্দ্রীকরণ করা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

॥ ৯৫ ॥ সূতাঞ্জলি

মহাত্মা গান্ধীর প্রথম শ্রাদ্ধ দিবস (১৯৪৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী) দেশের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্তিত গঠনকার্যসমূহ যাহাতে

সুষ্ঠুভাবে চালানো যায় তৎসম্পর্কে ব্যবস্থার জন্য ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সেবাগ্রামে সমগ্র দেশের গঠনমূলক কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গান্ধীজীর বিচারধারা যাঁহারা মান্য করেন তাঁহাদের এক ভ্রাতৃ-সমাজ (ব্রাদারহুড্) প্রতিষ্ঠা করা হয়। উহার নাম সর্বোদয়-সমাজ। সর্বোদয়-কল্পনার ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রতি বৎসর (১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে) সর্বোদয়-মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। গান্ধীজীর শ্রাদ্ধ-বার্ষিকী দিবসে দেশের স্থানে স্থানে সূতাঞ্জলি সমর্পণ করা উক্ত মেলার এক প্রধান কার্যক্রম। গান্ধীজীর পুণ্যস্মৃতিকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন এবং যাঁহারা শরীর-শ্রমের আদর্শ মান্য করেন তাঁহাদের প্রত্যেকে নিজের হাতে কাটা এক গুণ্ডী সূতা (৮৫২ গজ) সর্বোদয়ের কাজের জন্য অর্পণ করেন। যাঁহারা সূতাকাটা জানেন ও গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেন তাঁহারা সকলেই সূতাঞ্জলি অর্পণ করিবেন এরূপ প্রত্যাশা করা হয়।

সূতাঞ্জলির কার্যক্রম স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামরাজ রচনা তথা শাসনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য কার্যক্রম। কারণ, (১) সূতাঞ্জলি প্রচলিত থাকিলে সারাদেশে এক কর্মময় উপাসনা চলিতে থাকিবে। তাহাতে জনগণ এক প্রকৃত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাভ করিবে। (২) সর্বোদয়-প্রতিষ্ঠার পক্ষে শরীর-শ্রমের আদর্শ অনুসরণ করা অপরিহার্য। সূতাকাটা দ্রোহরহিত উৎপাদক শ্রমের প্রতীক। এজন্য উহা শ্রম-যজ্ঞের যোগ্য আহুতি। (৩) নিজের হাতে কাটা সূতা সমর্পণ করার অর্থ হইতেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামরাজ তথা সর্বোদয়ের পক্ষে ভোট দেওয়া। এক গুণ্ডীই দিতে হইবে, উহার অধিক নহে। কারণ তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, যত গুণ্ডী পাওয়া গিয়াছে সর্বোদয়ের পক্ষে তত লোকের সমর্থন বা ভোট পাওয়া গিয়াছে। সূতাঞ্জলির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করা যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হইত তবে একজনের একাধিক গুণ্ডী দেওয়াতে কোন নিষেধ থাকিত না। (৪) সূতাঞ্জলি সমর্পণের মধ্যে যে কি বিরাট শক্তি নিহিত আছে সে সম্পর্কে এখনও লোকে সচেতন হয় নাই। প্রতি মেলায় পর্বতপ্রমাণ সূতা জমা হইয়াছে কল্পনা করা যাউক। তাহা হইলে কি চিত্র মনে আসে? বিনোবাজী বলেন, ইহাতে মনে হইবে হনুমান যেন 'চিত্রকূট'-পর্বত লইয়া আসিয়াছেন।

সর্বোদয়ের রূপ হইবে পল্লীশিল্পপ্রধান। খাদি পল্লীশিল্পের কেন্দ্রস্বরূপ। মহাত্মা গান্ধী খাদিকে পল্লীশিল্পরূপ সৌরজগতের সূর্য আখ্যা দিয়াছিলেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় খাদিকে স্বাধীনতার পরিচ্ছদ (লিভেরী অফ্ ফ্রিডম্) বলা হইত। বিনোবাজী বলেন, এখন খাদি 'সাম্যযোগের সংকেত-চিহ্ন' হইতে পারে। তজ্জন্য সূতাঞ্জলি সর্বোদয়-সাধনার কার্যক্রমে ক্রমশ প্রধানস্থান গ্রহণ করিতে থাকিবে সন্দেহ নাই। যেসব ভূমিহীন দরিদ্রগণকে ভূমি-বিতরণ করা হইতেছে ও হইবে তাঁহারা যখন বিচার বুঝিয়া শ্রদ্ধার সহিত নিয়মিতভাবে সূতাঞ্জলি অর্পণ করিতে থাকিবেন, তখনই ভূমি-বিতরণের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

॥ ৯৬ ॥ সমন্বয়

বুদ্ধগয়া সর্বোদয়-সম্মেলনের এক বড় অবদান বিনোবাজী কর্তৃক বুদ্ধ-গয়ায় 'সমন্বয়-আশ্রমে'র প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধগয়া সর্বোদয়-সম্মেলনের সময় বিনোবাজী বুদ্ধগয়ায় 'সমন্বয়-আশ্রম' নামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। তাহার লক্ষ্য—বেদান্তের সত্য এবং বৌদ্ধের অহিংসার সমন্বয়। বিনোবাজী বুদ্ধগয়ার জগদ্বিখ্যাত বৌদ্ধ-মন্দিরের কাছাকাছি আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। কিন্তু স্থানীয় শংকর-সম্প্রদায়ের মঠের পক্ষ হইতে ঐ আশ্রম নির্মাণের জন্য তাঁহাকে ৫/০ বিঘা ভূমি দান করা হয়। জমিটি বুদ্ধগয়া-মন্দিরের নিকটে। উপরন্তু সেখান হইতে শংকর-মঠের সহিত যোগাযোগ করাও সহজ। সম্মেলনের প্রারম্ভে কাকা কালেলকার সমন্বয়ের ব্যাখ্যা করিয়া এক সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। বিনোবাজীর অনুরোধক্রমে সম্মেলনে যোগদানকারী সদস্য ও কর্মিগণ ২০শে এপ্রিল (১৯৫৪) দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ঐ ভূমির উপর একটি কুয়া খনন করিয়া দেন। উক্ত সম্মেলনের গৃহাদি ভাঙিয়া উহার বাঁশ, খড় ইত্যাদি সরঞ্জাম লইয়া গিয়া ২২শে এপ্রিলের মধ্যে ঐ জমির উপর বিনোবাজীর জন্য একটি কুটীর নির্মাণ করা হয়। ২৩শে এপ্রিল প্রত্যূষে বিনোবাজী সম্মেলনের স্থান হইতে সেখানে যান এবং উক্ত কুটীরে তিনদিন বাস করিয়া আশ্রম-প্রতিষ্ঠার শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। কেন এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা হইল?

ইহার মূল কোথায়? উপরন্তু বিনোবাজীর বর্তমান কার্যক্রমের সহিত (ভূদানযজ্ঞ) ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি? বিনোবাজী যখন সিওনী জেলে ছিলেন তখন তথায় তিনি গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ' সম্পর্কীয় শ্লোক-গুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দেন এবং উহা 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন' নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধের 'নির্বাণ' এবং বেদান্তের 'ব্রহ্ম-নির্বাণ' শব্দের সমন্বয় করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন এবং ঐ ব্যাখ্যাতে তিনি ঐ সমন্বয়ও করেন। ঐ সমন্বয় সম্পর্কে 'স্থিতপ্রজ্ঞ-দর্শন' পুস্তিকায় এরূপ লিখিত আছে—"ঐ দুই-ই বস্তুত এক। বৌদ্ধধর্মের 'নির্বাণ' নিষেধক শব্দ (নেগেটিভ্) এবং গীতার 'ব্রহ্ম-নির্বাণ' বিধায়ক ভাষা (পজিটিভ্)। যদি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায়, তবে 'ব্রহ্ম-নির্বাণ' শব্দ কেবল বিধায়ক নহে; উভয় অর্থেরই সংগ্রাহকরূপে গীতা ঐ শব্দের অবতারণা করিয়াছেন। 'ব্রহ্ম-নির্বাণ' বলিলে 'আমি' চলিয়া যায়। কিন্তু 'ব্রহ্ম' থাকিয়া যায়। ইহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। যেখানে 'শব্দ' সমাপ্ত হইয়া গেল সেখানে শব্দ লইয়া ঝগড়া কেন? গীতার ভাষায় আমি বলিব 'একং ব্রহ্ম চ শূন্যং চ, যঃ পশ্যতি স পশ্যতি'—যিনি ব্রহ্ম ও শূন্যকে এক দেখেন তিনি সত্যই দেখেন। এইজন্য ব্রহ্ম-নির্বাণ শব্দের দ্বারা সারা বাদ মিটিয়া যায়।"

বিহারে ভূদানযজ্ঞের সাফল্যের মূলে বহুলোকের শ্রদ্ধা, তপশ্চর্যা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বিনোবাজী মনে করেন যে, সকলের মূলে রহিয়াছে ভগবান বুদ্ধের পুণ্যস্মৃতির প্রেরণা। সেই কারণে তিনি বুদ্ধগয়ায় "সমন্বয়-আশ্রম" স্থাপনের প্রেরণা পান বলিয়া মনে হয়। সর্বো-পরি ভূদানযজ্ঞের কার্যক্রম যে-পরম লক্ষ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে তাহা হইতে এক সমন্বয়-আশ্রম স্থাপন করিবার প্রেরণা তিনি পান। উহা নিম্নের আলোচনা হইতে ক্রমশ স্পষ্ট হইবে।

বেদান্ত এই পরম সত্য প্রতিপালন করেন যে, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, আর কিছুই নাই। সবই ঈশ্বরময়। এই সত্য উপলব্ধি করিলে জীবনে অহিংসার প্রতিষ্ঠা না হইয়া পারে না। কারণ যদি হিংসা করা হয়, তবে সে-হিংসা নিজেকেই নাশ করিবে। সবই তো একই আত্মা ও একই ঈশ্বর।

সমন্বয়ের কথা বুঝাইতে গিয়া বিনোবাজী ইহা অনুপমভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—"বেদান্ত ও অহিংসা এই দুই জিনিস পরস্পর অবিরুদ্ধ। ইহারা পরস্পরের কার্যকারণ। বেদান্ত হইতে সরাসরি অহিংসা প্রতিফলিত হইয়া থাকে এবং অহিংসা গ্রহণ করা ব্যতীত বেদান্তের কোন পাকা মজবুত বুনিয়াদ থাকে না। অন্যদিকে বেদান্তের আধার ছাড়া অহিংসা দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারে না। এই সমগ্র প্রক্রিয়া গীতার একটি শ্লোকে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—

'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো পরাং গতিম্॥'

"যে মনুষ্য সর্বত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সমানরূপে দেখিয়া থাকেন—ইহা হইল বেদান্ত। আর উহার পরিণামস্বরূপ তিনি কোনরূপ হিংসাই করিতে পারেন না। কারণ হিংসার কার্য করিবার জন্য যিনি তরবারি উঠাইবেন, তিনি নিজেকেই আঘাত করিবার জন্য উহা উঠাইতেছেন এরূপ তাঁহার মনে হইবে। এইজন্য যিনি ঐরূপ আত্মহিংসা করেন না, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন। মূল বুনিয়াদ হইতেছে—সর্বত্র সমানভাবে পরমেশ্বরের দর্শন অর্থাৎ বেদান্ত। উহা হইতেই জীবননিষ্ঠাস্বরূপ অহিংসা এবং উহার অন্তিম পরিণাম পরম গতি। এইরূপে গীতার এক অদ্ভূত শ্লোকে সমগ্রবিশ্বের পক্ষে জরুরী সমন্বয়, আদি হইতে অন্ত, বুনিয়াদ হইতে শিখরদেশ পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে।" এই সমন্বয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী আরও বলেন, "সর্বাঙ্গীন সমগ্র সত্য-দর্শন এবং উহার সঙ্গে অহিংসা, ইহাকে বেদান্ত বলে। আমাদের জীবনে ও দর্শনে আমাদিগকে এই দুই তত্ত্বের সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। এযাবৎ সমন্বয়ের জন্য যে-প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহার দ্বারা একদিক মাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পরিপূর্ণতা আসে নাই।

"পরিপূর্ণতায় হয়তো কোনদিনই পেঁছানো যাইবে না। যাহা হউক, ভগবান আজ আমাদের জন্য এক বিরাট কার্যক্রম রচনা করিয়াছেন। ভূদানযজ্ঞ-যে আমাদিগকে কোন্ সুদূরে লইয়া যাইবে তাহার অনুমান আজ করা সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদিগকে একের পর একপদ অগ্রসর হইতে

হইবে। এই সম্পর্কে এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের কল্পনা মনে আসে। তাহার নাম 'সমন্বয় আশ্রম বা মন্দির' যাহাই দেওয়া হয় হউক।

"এক ঈশ্বরই আছেন আর সবই শূন্য, আমরা সবই শূন্য। তাঁহারই অভ্যন্তরে তাঁহার লীলায় আমরা এইসব রূপ পাইয়াছি। শূন্যেরও একটি রূপ থাকে। উহারও এক আকার দেখা যায়। উহা নিরাকার নহে। ঐরূপে আমাদেরও আকার মিলিয়াছে। এইজন্য আমাদিগকে শূন্য হইয়া যাইতে হইবে।"

আমাদিগকে 'সর্বোদয়'-রচনার মাধ্যমে সামুদায়িক অহিংসার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সামুদায়িক অহিংসার মূল হইতেছে—আত্মার একত্ব দর্শন। সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজমান—এই অনুভূতি। উহাই সামুদায়িক অহিংসার উৎস। উহাই বেদান্ত। উহাই আত্মজ্ঞানের পরম-বিকাশ। এই অনুভূতি থাকিলে তবেই সামুদায়িকক্ষেত্রে সাম্য-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা আসে। এজন্য সত্য বা বেদান্তের সহিত অহিংসার সমন্বয়ের প্রয়োজন আজ অত্যন্ত জরুরী। বেদান্ত বা আত্মজ্ঞান দিক্ নির্দেশ করিবে। কিন্তু কর্মে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা ও শক্তিদান করিবে অহিংসা। এইজন্য সামুদায়িক সাম্য-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সত্য বা আত্মজ্ঞান ও অহিংসা পরস্পরের পূরক। এই কারণে আজ এই সমন্বয়ের এত প্রয়োজন। সমন্বয়-আশ্রম স্থাপনের উহাই মূল কথা। যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করা যায় তবে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আজ সর্বক্ষেত্রে সমন্বয়ের প্রয়োজন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইতেছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে, বিভিন্ন অদার্শবাদের মধ্যে, জগতের বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মধ্যে সমন্বয়সাধন আজ জরুরী হইয়া দাঁড়াইতেছে। সর্বপ্রকার সমন্বয়ের উৎস-- সত্য ও অহিংসার সমন্বয়। এজন্য বিনোবাজী প্রতিষ্ঠিত 'সমন্বয়-আশ্রমে'র ভবিষ্যৎ অপরিমেয় সম্ভাবনায় পূর্ণ। উহা এইযুগের আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে পরিণত ও পরিগণিত হইবে---এই আশা পোষণ করা দুরাশা নহে।

সমন্বয়-আশ্রম প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে-মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা বিনোবাজীর শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী হইতে ক্রমশ আরও সুস্পষ্ট হইতেছে। সমন্বয়-আশ্রম প্রতিষ্ঠার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য

হইতেছে ধ্যানযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়সাধন। বিনোবাজী সমন্বয় ও সমন্বয়-আশ্রম সম্পর্কীয় এক আলোচনা প্রসঙ্গে (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫) বলিয়াছেন—"সমন্বয়ের অর্থ ইহা নহে যে, সংসারে কোন-কোন ধর্ম অপূর্ণ আছে এবং সেইসব অপূর্ণধর্মের সমন্বয় করিতে হইবে। সকল ধর্মই পূর্ণ। তবে উহাদের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে তাহাদেরই সমন্বয়সাধন করিতে হইবে।

"আমার ঐ আশ্রম হইতে কিছু পাইবার আশা আছে। এক এই যে, ধ্যানযোগ ও কর্মযোগের অভিন্নতা কিরূপে সাধন করা যায় তাহার প্রয়োগ সেখানে চলিবে। ভারতে ধ্যানযোগের যেরূপ বিকাশ হইয়াছে সেরূপ আর কোথাও হয় নাই। সম্ভবত সূফিগণের মধ্যে ঐরূপ বিকাশ হইয়াছিল। কিন্তু এই ধ্যানযোগের সাধনায় একটু ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছিল। শ্রমবিমুখ ও কর্মবিমুখ হইয়া একান্তে ঐ সাধনা করা হইত। ইহার তাৎপর্য ইহা নহে যে, ঐসব সাধক অলস ছিলেন। তাঁহারা শ্রম করিতেন। তাঁহাদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠোর ছিল। কিন্তু তাঁহারা উৎপাদক শ্রম করিতেন না। এরূপ বিশ্বাস করা হইত যে, ধ্যানযোগের জন্য কর্ম ত্যাগ করা আবশ্যক। এজন্য সাধকশ্রেণী শ্রমবিমুখ হইয়া গেলেন। সমাজে উৎপাদক শ্রমের প্রতিষ্ঠা কম হইয়া গেল। সমাজ সেইসব সাধকের ভরণ-পোষণের ভার লইতেন। এক্ষণে আমি চাই যে, এরূপ সাধকের সৃষ্টি হউক, যাঁহারা নিজেদের ভরণ-পোষণের ভার সমাজের উপর চাপাইবেন না। নিজেরা উৎপাদক শ্রম করিবেন।

"এই উৎপাদক পরিশ্রমকে আমি 'ব্রহ্মকর্ম' বলিয়া থাকি। বাহ্য দৃষ্টিতে সাধক পরিশ্রম করিতেছেন এরূপ দেখা যাইবে, কিন্তু উহার কোন ভার সাধকের মনের উপর পড়িবে না। আমরা শ্বাস গ্রহণ করিতেছি দেখা যায়; কিন্তু শ্বাস লইতে আমাদের কোনরূপ কষ্ট হয় না। সেইরূপ সাধক 'ব্রহ্মকর্ম' করিতে থাকিবেন বটে, কিন্তু তিনি অন্তরে অখণ্ডভাবে ধ্যানমগ্ন থাকিবেন। শ্বাস লওয়া হইতেছে এই বোধই আমাদের যেরূপ থাকে না, সেরূপ অবিরত কর্ম করিলেও সাধকের উহার বোধই থাকিবে না। কর্মের দ্বারা তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইবে না।

"পরিব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অখণ্ডভাবে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন এরূপ জ্ঞান-প্রসারক সেবকের প্রয়োজন সমাজে নিরন্তর রহিয়াছে। হিন্দু সন্ন্যাসিগণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ, জৈন মুনিগণ তথা অন্য সাধু-সন্তগণ ভারতে এই পরিব্রজ্যার পরম্পরাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ঐ পরিব্রাজকগণের তপস্যার কারণেই আমাদের সংস্কৃতি এরূপ বিবিধতাযুক্ত হইয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে, প্রাণবান হইয়া রহিয়াছে। উহাকে কতই না আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। তথাপি উহা জীবন্ত রহিয়াছে। অনাসক্তবৃত্তিতে গ্রামে-গ্রামে জ্ঞান প্রচার করিয়া বেড়াইবেন এরূপ সেবকগণের খুবই প্রয়োজন রহিয়াছে। এই বিষয়ে সমন্বয়-আশ্রম সহায়তা করিতে পারিবে। আজ পর্যন্ত এই পরিব্রাজক-শ্রেণী ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির আরম্ভ করাইয়াছিলেন তাঁহারা নিজেরা উচ্চকোটির সাধক ছিলেন।

"ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবনযাপন করিলে সাধকের প্রভূত উন্নতি হয়। জন-সম্পর্ক এবং জনতা-জনার্দনের দর্শনলাভের উহা নিঃসংশয় এক সুন্দর উপায়। আমি ঐ ভিক্ষাবৃত্তির সহিত শরীর-শ্রমের ব্রতকে জুড়িয়া দিতে চাই। পরিব্রাজক যেখানেই থাকিবেন সেখানেই তিনি কোন-না-কোন উৎপাদক পরিশ্রম অবশ্য করিবেন।

"ঐ শ্রমের দ্বারা যাহা উৎপন্ন হইবে তাহাতে তাঁহার নিজের অধিকার আছে—ইহা তিনি মনে করিবেন না। ঐ উৎপাদনও তিনি সমাজে অর্পণ করিয়া জীবনধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নম্রভাবে গ্রহণ করিবেন। যদি এইভাবে ভিক্ষাবৃত্তির সহিত ব্রহ্মকর্ম জুড়িয়া দেওয়া যায় এবং ধ্যানযোগ ও কর্মযোগের অভিন্নতা সাধন করিবার জন্য প্রচেষ্টা করা হয় তবে জীবনে এক নূতন আলো আসিবে।

"সেক্ষেত্রে সাধকের সাধনা সামূহিক সাধনায় পরিণত হইবে। সাধক জানিবেন যে, সমাজের সঙ্গে তাঁহার অভেদ্য সম্বন্ধ আছে এবং তিনি সমাজ-রূপী 'লিভিং অর্গানিজম্'-এর এক অবিভাজ্য অঙ্গ। যেরূপ সিন্ধুর সহিত একরূপ হইলে তবেই বারিবিন্দুর জীবন সম্ভব হয়, সেরূপ মানুষের জীবনও সমাজের মধ্যে থাকিয়াই সম্ভব। দুই অবস্থায় মানুষের জীবন

সমাজ হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারে। এক অবস্থা মৃত্যু, অন্য অবস্থা মুক্তি। সমাজ হইতে পৃথক হইয়া জীবিত থাকা সম্ভব নহে।”

॥ ৯৭ ॥ বিনোবাজী মৌলিক

ভূদানযজ্ঞের মূলে গান্ধীজীর বিচারধারায়—একথা একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বিনোবাজী উহা যেভাবে দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা মৌলিক। তাঁহার অনুপম প্রকাশভঙ্গী তাঁহার নিজস্ব। যে-গভীরতম আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ হইতে ভূদানযজ্ঞের বিভিন্ন দিকের বিচারধারা তিনি নানাভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব। এইজন্য বিনোবাজী গান্ধীজীর অসমাপ্ত কার্য সম্পাদন করিতেছেন বটে, কিন্তু উহার প্রতি অঙ্গে তাঁহার মৌলিক ছাপ রহিয়াছে। তিনি গান্ধীজীর অনুকরণ নহেন, তিনি মৌলিক। গান্ধী-বিচারকে তিনি এক নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিনোবাজীকে বুঝিতে হইলে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। তিনি যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহাই তাঁহার নিজের করিয়া লইয়াছেন। উহা যখন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয়, তখন মনে হয় কোন এক নূতন জিনিস শুনা হইতেছে। ইহাই বিনোবাজীর বৈশিষ্ট্য। বিনোবাজী গান্ধীজীর নিকট হইতে কতটা পাইয়াছেন আর অন্যের নিকট হইতে কতটা পাইয়াছেন—এরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি ১৯৪৮ সালে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিনোবাজীর উক্ত মৌলিকত্বের কথা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—“গান্ধীজীর নিকট হইতে আমি পরিপূর্ণভাবে পাইয়াছি। কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্যের নিকট হইতেও পাইয়াছি। যাঁহার নিকট হইতে যাহা যাহা পাইয়াছি তাহা আমি নিজের করিয়া লইয়াছি। এখন সমগ্র পুঁজি আমারই হইয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে গন্ধীজীর দেওয়া কত আর অন্যের দেওয়া কত, তাহার পৃথক হিসাব আমার কাছে নাই। যে-বিচার আমি শুনিয়াছি তাহা যদি আমার কাছে উচিত বলিয়া মনে হইয়া থাকে এবং আমি উহা হজম করিয়া থাকি, তবে তাহা আমারই হইয়া গিয়াছে। উহা আর পৃথক কেমন করিয়া থাকিবে? আমি কলা খাইয়াছি ও তাহা হজম করিয়া

ফেলিয়াছি, উহার মাংস আমার শরীরের উপর বসিয়া গিয়াছে, এখন ঐ কলা কোথায় পাওয়া যাইবে? উহা তো আমার রক্ত-মাংসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এইভাবে যে-বিচার গ্রহণ করিয়াছি উহা আমারই হইয়া গিয়াছে।"

॥ ৯৮ ॥ সত্যাগ্রহী লোকসেবকের পঞ্চবিধ নিষ্ঠা

ভূদানযজ্ঞ (তথা গ্রামদান) আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠানের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া 'জনতাত্মা'র উপর নির্ভর করানো হয় বটে, কিন্তু আন্দোলনের ভিত্তি যাহাতে দৃঢ়তর হয় ও আন্দোলন যাহাতে ব্যাপক হইয়া ঠিক পথে লক্ষ্যাভি-মুখে অগ্রসর হইতে পারে সেইজন্য প্রতি জেলায় নিরন্তর সেবারত অনন্যনিষ্ঠ আদর্শপরায়ণ একদল নিষ্কাম সেবক সৃষ্টি করিবার জন্য সত্যাগ্রহী লোক-সেবকের কল্পনা করা হয়। সত্যাগ্রহী লোকসেবকের নিম্নবর্ণিত পঞ্চবিধ নিষ্ঠা থাকা চাইঃ---

(১) সত্য, অহিংসা ও অপরিগ্রহের প্রতি তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা থাকিবে এবং তদনুসারে তিনি জীবনযাপনের চেষ্টা করিবেন।

(২) স্বতন্ত্র জনশক্তির দ্বারাই (যাহাকে লোকনীতি বলা হয়) জগতে সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—এরূপ বিশ্বাস তাঁহার থাকিবে। এজন্য তিনি কোনও দলীয় রাজনীতিতে বা ক্ষমতা অধিকারের রাজনীতিতে যোগদান করিবেন না এবং সমান সম্প্রীতিতে সকলের সহিত সমভাবাপন্ন হইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট হইতে সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিবেন। সুতরাং তাঁহার কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া চলিবে না! এ বিষয়ে তাঁহাকে কিরূপ হইতে হইবে তাহা বিনোবাজী একটি সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন যে সত্যাগ্রহী লোকসেবক সমাজবৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থান করিবেন। তিনি যেন বৃত্তের পরিধিতে না থাকেন। বৃত্তের কেন্দ্র পরিধির যে কোন বিন্দু হইতে সমান দূরে অবস্থিত। কিন্তু পরিধির কোন বিন্দু অন্যান্য বিন্দু হইতে বিভিন্ন দূরত্ববিশিষ্ট। তিনি যেন কাহারও নিকটবর্তী আবার কাহারও কাছ হইতে দূরবর্তী হইয়া না থাকেন।

(৩) কোনরূপ কামনা না রাখিয়া, সমর্পণ বুদ্ধির সহিত তিনি লোক-সেবা করিবেন। অনেকে মনে করেন যে নির্দলীয় হইয়া বা নিষ্পক্ষ মনোভাব

রাখিয়া সেবা করা সবচেয়ে শক্ত। কিন্তু বিনোবাজী বলেন যে নিষ্পক্ষ হইয়া সেবা করা খুব শক্ত নহে। নিষ্কামতা সাধন করা শক্ত। নিষ্কামতা এতই কঠিন যে ইহার জন্য দিবারাত্র 'গীতা'র পরিবেশে থাকার প্রয়োজন হয়।

(৪) তিনি জাতি ও বর্ণের কোন ভেদ মানিবেন না। তিনি সকল ধর্ম গ্রন্থ ও সম্প্রদায়ের প্রতি সমান সম্প্রীতির ভাব পোষণ করিবেন।

(৫) তিনি নিজের সম্পূর্ণ সময় ভূদানযজ্ঞমূলক পল্লীশিল্পপ্রধান অহিংস ক্রান্তির কাজে নিয়োগ করিবেন। ঐ কাজ তাঁহার একমাত্র চিন্তনের বিষয় হইবে। বিনোবাজী তাঁহাকে 'চিন্তন-সর্বস্ব' বলেন। অন্য বিষয়ে তাঁহার রস বা তৃপ্তি যেন না থাকে। কিভাবে 'চিন্তন-সর্বস্ব' হওয়া যায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বিনোবাজী বলেন যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহার অর্থ বিধায়ক (পজিটিভ্) অপেক্ষা নিষেধাত্মক (নেগেটিভ্) ভাবে ব্যাখ্যা করিলে অধিকতর স্পষ্ট হয়। 'চিন্তন-সর্বস্ব' তদ্রূপ বিষয়। নিষেধাত্মকভাবে চিন্তন-সর্বস্বের অর্থ এইঃ—(১) তাঁহার যেন বিষয় চিন্তা না থাকে, (২) ব্যর্থ রাজনীতির চিন্তা না থাকে (দলগত রাজনীতি হইতেছে ব্যর্থ রাজনীতি আর লোকনীতি হইতেছে সার্থক রাজনীতি) ও (৩) যেন পরনিন্দা করা না হয়।

॥ ৯৯ ॥ ভূদান-আন্দোলনে নেতৃত্ব ও সেবকত্ব

মধ্যপ্রদেশে আশানুরূপভাবে ভূদানযজ্ঞের অগ্রগতি হইতেছিল না। এই-জন্য সেখানকার কর্মিগণ ১৯৫৫ সালে ঐ প্রদেশে সঘন সামূহিক পদযাত্রার কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

সঘন সামূহিক পদযাত্রার প্রণালী এইঃ—কতিপয় কর্মী লইয়া একটি পদযাত্রীদল গঠন করা হয়। এরূপ কতিপয় দল পরস্পরের কাছাকাছি একই এলাকায় পদযাত্রা করিয়া প্রচারকার্য ও ভূদানাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন। ঐ পদযাত্রা চলিবার সময় সাধারণের মধ্যে উৎসাহ জাগ্রত হয় ও তাহাতে স্থানীয় নূতন নূতন কর্মী আসিয়া তাঁহাদের দলে যোগদান করিতে থাকেন। কর্মীরা একসঙ্গে ভূমিদান প্রভৃতির জন্য জনগণের নিকট যাইতেন ও সমবেতভাবে আবেদন জানাইতেন। ইহার ফলে সেখানে আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠে

এবং প্রচুর ভূমিদান পাওয়া যায়। এক এলাকার কাজ এইভাবে শেষ হইবার পর তাঁহারা অন্য এক এলাকায় অগ্রসর হইতেন। ইহাতে তাঁহাদের পক্ষে একা একা যাহা করা সম্ভব হয় না সমবেত প্রচেষ্টায় তাহা সাধিত হয়।

কাঞ্চীপুরম্ সর্বোদয়-সম্মেলনে বিনোবাজী এই সামূহিক পদযাত্রার সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন ও সর্বত্র ঐভাবে কাজ করিবার উপদেশ দেন। তিনি ঐরূপ সামূহিক পদযাত্রার মাধ্যমে কাজ করাকে গণসেবকত্ব আখ্যা দেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভূদানযজ্ঞ আন্দোলন পদযাত্রার মাধ্যমে অগ্রসর হইতেছে। তাহাতে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতেছে না বটে, কিন্তু তাহাই ভূদান-আন্দোলনের এক বিশেষ মহত্ত্ব। কারণ জন-ক্রান্তির কাজ স্থানীয়ভাবে সফল হওয়া চাই। স্থানীয়ভাবে সফল হইলে উহা হাওয়ায় বিশ্বের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তিনি এ-সম্পর্কে বুদ্ধ ভগবানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন যে বুদ্ধ ভগবান অখিল ভারতীয় নেতা হইতে পারেন নাই। কারণ তিনি কেবলমাত্র পালি ভাষায় কথা বলিতেন। তিনি প্রয়াগ হইতে গয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিচার সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কারণ সেই বিচারধারা বিশ্বব্যাপক হইবার যোগ্য ছিল এবং তাঁহার জীবনও তাঁর ঐ বিচারধারার অনুরূপ ছিল। বিনোবাজী বলেন যে, তিনি পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিতেছেন। তাহাতে স্থানীয় নেতৃত্বের উদ্ভব হইতেছে।

কিন্তু স্থানীয় নেতৃত্বে তেমন কাজ হইতেছে না। কাজ হইবে স্থানীয় সেবকত্বে। তিনি বলেন—"যদি আমরা সেবকস্বরূপ জনগণের নিকট যাই তবে আমরা জমি পাইব। নেতাস্বরূপ তাঁহাদের নিকট যাইলে জমি পাওয়া যাইবে না। আজই সকালে আমি বলিতেছিলাম যে আমরা আমাদের মালিকের সেবক। ইহাতেই আমাদের শক্তি। রঘুনাথজীকে জাগাইবার জন্য তুলসীদাসজী কি করিতেন জানেন? তিনি গাহিতেন—'জাগো হে রঘুকুমার' (জাগিয়ে রঘুনাথ কুঙর)। তামিল ভক্তগণও এইভাবে গাহিতেন। এইভাবে প্রভুকে জাগাইতে হয়। লোকহৃদয়ে যে প্রভু বিরাজমান আছেন তাঁহাকে জাগাইবার জন্য আমাদিগকে ভক্ত হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। তবেই তিনি জাগিয়া উঠিবেন।" অতঃপর তিনি মধ্যপ্রদেশের সামূহিক পদযাত্রার কার্যক্রমের কথা

উল্লেখ করিয়া বলেন—"এই বৎসর যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা এই যে ব্যক্তি-সেবকত্বের পরিবর্তে যদি গণ-সেবকত্ব গ্রহণ করা যায় তবে কাজ হইতে পারে। ব্যক্তির নেতৃত্বের অভাবে গণ-সেবকত্ব সফল হইতে পারে। গত বৎসর উহা সফল হইয়াছে।" তিনি ঐ সময় রুশিয়ায় যাহা ঘটিতেছিল তাহার সহিত গণ-সেবকত্বের তুলনা করেন। তিনি বলেন যে, রুশিয়া ব্যক্তি-পূজা (পারসোন্যালিটি কাল্ট) তথা ব্যক্তি-নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া গণ-নেতৃত্বের দিকে ঝুঁকিতেছে। রুশিয়া বলিতেছে যে ব্যক্তিবিশেষের নেতৃত্ব চলিবে না, গণনেতৃত্ব চাই। এই-জন্য তিনি বলেন যে, ভূদানযজ্ঞেও গণ-সেবকত্বের প্রয়োগ হওয়া উচিত।

উক্ত সামূহিক পদযাত্রা ও কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করিয়া বিনোবাজী আরও বলেন—"আমি উহাতে উৎসাহদান করিতে চাহি। আমাদের কাজে নেতৃত্ব নাই, প্রভুত্বও নাই। আমাদের কাজে সেবকত্ব আছে। পরন্তু ঐ সেবকত্ব গণ-সেবকত্ব হওয়া উচিত। এক এক জনসমুদয় সমাজ-সেবার জন্য বাহির হইয়া পড়ুক।" উহার পর দেশের বিভিন্ন প্রদেশে সঘন সামূহিক পদযাত্রা চলে ও তাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

॥ ১০০ ॥ করুণা ক্রান্তি-দেবতা

বিনোবাজী করুণাকে 'ক্রান্তি-দেবতা' আখ্যা দিয়াছেন। ক্রান্তি বা বিপ্লব অহিংসক হউক বা হিংসাত্মক হউক, তাহার মূলে করুণা থাকে। এই কারণে বিনোবাজী কমিউনিস্টদিগকে করুণাপ্রেরিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই করুণা সার্বভৌম নহে। অর্থাৎ তাহা সংকীর্ণ বস্তু। একমাত্র অহিংস ক্রান্তিতে সার্বভৌম করুণার বিকাশ হয়। তাহাতে দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে সমভাবে করুণাপ্রেরিত হইয়া চলা ও আচরণ করা হয়। এইজন্য সর্বক্ষেত্রে করুণামূলক না হইলে তাহা প্রকৃত সাম্যযোগ হইতে পারে না। সে ক্ষেত্রে উহা কেবলমাত্র সাম্য হইয়া থাকে।

সর্বোদয় শ্রেণী-সংঘর্ষ চাহে না, শ্রেণীভেদ ঘুচাইতে চাহে (শ্রেণী নিরাকরণ চাহে)। তথাপি উহাতে এইটুকু মনে করা হইত যে ধনীর নিকট হইতে লইয়া দরিদ্রকে, ভূমিবানের নিকট হইতে লইয়া ভূমিহীনকে দিতে হইবে। দরিদ্র বা ভূমিহীন ব্যক্তির দিবার মত কিছু নাই—এই ভেদটুকু মানা

হইত। হ্যাভ্‌স্‌ (সম্পন্ন) ও হ্যাভ্‌নট্‌স্‌-এর (সর্বহারা) বিচার প্রচলিত আছে। ভূদানযজ্ঞের প্রথম অবস্থায় এরূপ বলা হইত যে ভূমিবান ভূমিহীন দরিদ্রকে দিবে। ভূমিহীন দরিদ্রদেরও যে কিছু দিবার আছে ইহা মনে করা হইত না। ইহার মূলে হ্যাভ্‌স্‌ ও হ্যাভ্‌নট্‌স্‌-এর বিচারবোধ রহিয়াছে। কিন্তু এই ভেদ বিনোবাজীকে পীড়া দিত। অতঃপর বিনোবাজীর অন্তরে এই সত্য প্রতিভাত হইল যে কেবলমাত্র একজনের নিকট হইতে অন্যকে দিলে চলিবে না। পরন্তু সমাজের হস্তে সমস্ত লোকের সর্বস্ব সমর্পণ করা চাই। এ সম্পর্কে বিচার করিতে করিতে একদিন তিনি কল্পনা করিলেন যে এক রুগ্ন দরিদ্র হাসপাতালে শায়িত রহিয়াছে। তাহার একটুও ধন-সম্পত্তি নাই। তাহার দেহে যে শারীরিক শক্তিটুকু ছিল তাহাও আর এখন নাই। সুতরাং তাহার আর কি দিবার আছে? এমন সময় তাঁহার কল্পনায় উদিত হইল—তাহার পুত্র তাহাকে দেখিবার জন্য তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত। পুত্রকে দেখিয়া পিতার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ইহাতে বিনোবাজীর মনে হইল—এই তো তাহার এক সম্পদ রহিয়াছে—এই অশ্রু! এই প্রেম! এই প্রেম কতই না মূল্যবান সম্পত্তি। প্রেমকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সমগ্র সমাজের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া চাই। তাহার যদি গ্রামদানের বিচার ভাল লাগে তবে সে গ্রামকে এই প্রেম সমর্পণ করিতে পারে। বিনোবাজী বলেন যে তিনি এই কল্পনা হইতে প্রকৃত আলোক পাইলেন। তিনি এতদিন করুণার আভাসমাত্র অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন। এখন তিনি পরিপূর্ণ করুণার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। হ্যাভ্‌স্‌ (সম্পন্ন) ও হ্যাভ্‌নট্‌স্‌-এর (সর্বহারা) বিচার যে সম্পূর্ণ ভুল ইহা তিনি বুঝিলেন। একজনের নিকট হইতে লইয়া অন্যকে দিবার জন্য যে পূর্বে বলা হইত তাহা সম্পূর্ণ ভুল বিচার নহে। তবে তাহা একাঙ্গী। এখন হইতে তাঁহার হৃদয় খুলিয়া গেল। তিনি শক্তি ও শান্তি পাইলেন। যখন সকলের করুণা দেখাইবার মত কিছু-না-কিছু আছে তখন সকলেই অন্যের নিকট হইতে করুণা পাইবারও অধিকারী। এই করুণা সীমিত হওয়া উচিত নহে। উহা সার্বভৌম হওয়া চাই। বিনোবাজী বলেন যে, এই সার্বভৌম করুণা অহিংস ক্রান্তির জনক।

এখানে একটি বিষয় বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। করুণার সহিত অহিংসার কি সম্পর্ক? অহিংসাকে ক্রান্তি-দেবতা না বলিয়া করুণাকে 'ক্রান্তি-দেবতা' বলা হইল কেন? প্রেমের সহিতই বা করুণার কি সম্পর্ক? অহিংসা নিষেধাত্মক (নেগেটিভ্)। অহিংসার বিধায়ক (পজিটিভ্) রূপ হইতেছে প্রেম। অহিংসা বা প্রেম অপেক্ষা করুণা গভীরতর গুণ। অহিংসার মূলে করুণা। কাহারও প্রতি করুণা থাকিলে তবেই তাহার প্রতি অহিংস বা প্রেম-পূর্ণ আচরণ করিবার প্রেরণা আসে। অন্তরে করুণা থাকিলে তবেই তাহা অহিংস ভাবকে জাগ্রত করে। করুণা না থাকিলেও অহিংস আচরণ হওয়া সম্ভব বলিয়া কল্পনা করা যায়। তবে তাহা হইবে বাহ্যিক আচরণ বা কার্য মাত্র। তাহা অন্তরকে স্পর্শ করিবে না। সুতরাং অহিংস ক্রান্তির উৎস হইতেছে করুণা।

॥ ১০১ ॥ সমতা সৃষ্টির দুই পথ

সমতা এ যুগের দাবী। সমাজে দুই প্রকারে সমতা আনয়ন করা যায়ঃ—(১) উপরের লোককে নীচে নামানো যায়, ও (২) নীচের লোককে প্রেমের সহিত উপরে উঠাইবার প্রচেষ্টা করা যায়। মানুষ যেখানে থাকে সেখান হইতে সে উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে আবার নীচের দিকেও তাকাইতে পারে। লক্ষ টাকার মালিক কোটিপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে অথবা তাহার দৃষ্টি হাজার টাকার মালিকের দিকেও যাইতে পারে। মানুষ যখন তাহার উপরের মানুষের দিকে তাকায় তখন তাহার মনে ঈর্ষার উদয় হয়। কিন্তু তাহার নীচের মানুষের দিকে যখন দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তখন তাহার অন্তরে করুণার সঞ্চার হইয়া থাকে। হাজার টাকার মালিক লক্ষপতির দিকে যখন তাকান তখন তাঁহার মনে ঈর্ষার উদয় হয়, কিন্তু ধনী যখন গরীবের দিকে তাকান তখন তাঁহার অন্তরে প্রেম ও করুণার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। এই দৃষ্টিতে সমাজে সমতা সৃষ্টি করিবার দুই বিপরীত পথের উদ্ভব হইয়াছে,—(১) ঈর্ষামূলক প্রক্রিয়া ও (২) প্রেম ও করুণামূলক প্রক্রিয়া। ঈর্ষার প্রক্রিয়ায় উপরের লোককে নীচে নামানো হয় বা ধ্বংস করা হয়; করুণার প্রক্রিয়ায় নীচের লোককে উপরে উঠানো হয়।

রুশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশে সমতা সৃষ্টির জন্য ঈর্ষামূলক প্রক্রিয়ার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। প্রেম ও করুণার পথে সমতা সৃষ্টির জন্য যিনি উপরে আছেন তাঁহাকে নীচের দিকে তাকাইতে হইবে এবং তাহাতে তাঁহার হৃদয় হইতে করুণার ধারা প্রবাহিত হইবে। করুণার প্রক্রিয়া হইতেছে জলের প্রক্রিয়া। বিনোবাজী বলেন যে, জলকে জীবন বলা হয়। জীবনের প্রক্রিয়া জলের প্রক্রিয়ার মত হইয়া থাকে। জল ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয়। জলের প্রবাহ প্রথমে সর্বনিম্নস্তরে নামে। উহা পূর্ণ হইলে তৎপরে তাহা উহার অব্যবহিত উপরের স্তরকে প্লাবিত করে। এরূপে জলের স্তর সমতার দিকে আসিয়া থাকে। করুণার প্রবাহও সেইরূপ। উহা সর্বনিম্ন-শ্রেণীর উত্থান সাধন করিয়া উত্তরোত্তর উপরের দিকে অগ্রসর হইয়া সমতা সাধন করে। ভূদানের প্রক্রিয়া করুণার প্রক্রিয়া। উহা জলের প্রক্রিয়ার মত ক্রিয়া করিয়া থাকে।

বিনোবাজী সম্প্রতি (মার্চ ১৯৬০) ভূদানযজ্ঞের প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সমতা সৃষ্টির উপরোক্ত দুই পথের বিষয় ব্যাখ্যা করেন। এইভাবে তিনি ভূদানযজ্ঞের প্রক্রিয়ার উপর এক নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"যেমন রামনাম নানাসুরে, নানাভাবে গাওয়া যায় ও গাওয়া হইয়া থাকে, সেরূপ আমি আজ দশ বৎসরকাল নিরন্তর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভূদানের কথা নানাভাবে নানাদিক হইতে ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছি। তাহাতে আমার ক্লান্তি নাই।'

॥ ১০২ ॥ দানে তিন পক্ষই ধন্য

দানে সাধারণত দুই পক্ষ থাকে—যিনি দান দেন (দাতা) ও যিনি দান পান (দান গ্রহীতা)। দানের দ্বারা উভয়পক্ষই উপকৃত হন। যিনি দান গ্রহণ করেন তিনি যে উপকৃত হন তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। যিনি দান দেন তাঁহার পুণ্য লাভ হয়। আমাদের দেশের পরম্পরায় এই কথা চলিয়া আসিতেছে। সেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভিনিস্' নাটকের নায়িকা পোর্শিয়া দানের মহিমা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন (যিনি দান দেন ও যিনি দান পান উভয়েই ধন্য) তাহা শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু বহুক্ষেত্রে দান-ক্রিয়ায় যে আর এক পক্ষ থাকেন তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণত কোন খেয়াল রাখা হয় না। বিনোবাজী দান-ক্রিয়ার সেই তৃতীয় পক্ষকে গুরুত্বদান করিয়াছেন। সেই তৃতীয় পক্ষ হইতেছেন যিনি দান দেওয়ান। ভূদানযজ্ঞে সেই তৃতীয় পক্ষ হইতেছেন সর্বোদয়-সেবকবর্গ। আসাম যাওয়ার পথে উত্তরবঙ্গে পদযাত্রার সময় ফালাকাটায় বিনোবাজী দানের সুফল সম্পর্কে ঐ নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, দানে তিন পক্ষই ধন্য (ব্লেজ্‌ড্‌) হন। যিনি দান দেন তাঁহার আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। যিনি দান পান তিনি উপকৃত হন। আর যিনি দান দেওয়ান (ভূদানযজ্ঞে সর্বোদয়-সেবক) তাঁহার তদ্দ্বারা তপশ্চর্যা বা সাধনা করা হয়। দানে দাতার কেন ও কিভাবে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তাহা বিনোবাজী ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—"মানুষ জন্মাবধি সমাজ হইতে অনেক কিছু লইয়া আসিতেছে। দানের দ্বারা সমাজের সেই ঋণ কিছুটা পরিশোধ করা হয়।" এই ভাবনা হইতে দান দেওয়া কর্তব্য ও এই ভাবনা হইতেই দাতার আত্মপ্রসাদ লাভ হইবে। এই দৃষ্টিতে দান যজ্ঞস্বরূপ। বিনোবাজী তাঁহার গীতা-প্রবচনে বলিয়াছেন যে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনটি সংস্থার সহিত আমাদের সম্পর্ক হইয়া যায়, যথা—(১) আমাদের দেহ, (২) চারিদিকে প্রসারিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড (সৃষ্টি), যাহার এক অংশ আমরা, ও (৩) পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পাড়া-প্রতিবেশী। আমরা প্রতিদিন এই তিন সংস্থা ব্যবহার করিয়া থাকি ও তদ্দ্বারা উহাদের কিছু-না-কিছু ক্ষয় সাধন করি। এইসব ক্ষয়কে পূরণ করা অর্থাৎ এই তিন সংস্থা হইতে যাহা আমরা লইয়া থাকি তাহা ফিরাইয়া দেওয়ার নাম 'যজ্ঞ'। সুতরাং যিনি দান দেন তাঁহার যজ্ঞ করা হয়। আর যিনি দান দেওয়ান তাঁহার তপশ্চর্যা করা হয়। যজ্ঞ, দান ও তপঃ—এই তিন একযোগে এক পরিপূর্ণ পরমার্থিক যোজনা। ভূদানযজ্ঞের দানের দ্বারা এই পরমার্থিক যোজনা কার্যান্বিত করা হইতেছে।

॥ ১০৩ ॥ ব্যক্তিগত মালিকানা বিসর্জনের তাৎপর্য

ভূদানযজ্ঞে বিশেষত গ্রামদানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন করা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার ভাবনা লোকের মন

হইতে দূর হয় না। গ্রামদান হইলে কোন কোন বিষয়ে গ্রামের লোকের পক্ষে সুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রধানত সেই কারণে গ্রামদান করা হয়। সেইসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা ত্যাগের মনোভাব প্রাধান্যলাভ করে না। অবশ্য গ্রামদান অনুসারে ভূমিবন্টন ইত্যাদি হইলে গ্রামের ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানা কার্যত বিলুপ্ত হয়। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে গ্রামের লোকের মনে ব্যক্তিগত মালিকানার আসক্তি থাকিয়া যায়। গীতায় বিষয়-বাসনার নিবৃত্তি সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। 'বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ'—অর্থাৎ নিরাহারী থাকিলে বাহ্য বিষয় নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার বিষয়াসক্তি একেবারে যায় না। উপরন্তু ভূমি ছাড়া মানুষের আরও বহুরকমের সম্পত্তি থাকে। সেইগুলির উপর হইতেও ব্যক্তিগত মালিকানা চলিয়া যাওয়ার প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। এইসব কারণে বিনোবাজী ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাবনা ত্যাগের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। এই বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য তিনি শরীরের উদাহরণ দিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, শরীর সম্বন্ধে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে এই শরীর কেবল আমার জন্য। অন্তর হইতে এই ভাবনা পোষণ করা উচিত যে, এই শরীর সমগ্র সমাজের জন্য, কিন্তু উহার যত্ন লওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর। কেবল বলিবার জন্য বলা হয় যে, এই শরীর আমার, কিন্তু এই শরীর আমার ভোগের জন্য নহে। অতএব জনগণের মধ্যে এই ভাবনা জাগ্রত করা প্রয়োজন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি আমার নিজের জন্য নহে, আমাদের সকলের জন্য।

বিনোবাজী বলেন যে বাইবেলে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি দরিদ্র তিনি ধন্য। উহার এক স্থানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, সেই ব্যক্তি ধন্য যিনি ভাবনায় দরিদ্র। 'দরিদ্র ও ভাবনায় দরিদ্র' এই দুই-এর পার্থক্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এইরূপে বাহ্যত 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ' ও 'মন হইতে ব্যক্তিগত মালি-কানার আসক্তি ত্যাগ'—এই দুই-এর পার্থক্য করা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে এরূপ প্রশ্ন উঠে যে কেহ নিজের জন্য মোটর গাড়ী রাখিতে পারে কিনা। উহার উত্তরে বিনোবাজী বলেন যে, মোটর গাড়ী রাখা যাইতে পারে, কিন্তু উহা সমাজের প্রয়োজনের জন্য রাখিতে হইবে। আমি ভোজন

করিতে পারি, কিন্তু আমি সকলের সেবার জন্য জীবনধারণ করিতেছি—এই ভাবনা থাকা চাই।

॥ ১০৪ ॥ গ্রামদানে অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়

বেদান্ত তথা আত্মজ্ঞান বলে—'আমি ও আমার' ভাবনা ত্যাগ কর। আমার সম্পত্তি, আমার ঘর, আমার জমি, আমার শরীর ইত্যাদি ভাবনা ত্যাগ কর। তাহা হইলে তোমার হৃদয় প্রসন্ন হইবে।' লোকে এই কথা শুনিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে খুব কম লোক সেই শিক্ষা অনুসারে আচরণ করিয়া থাকে। আর যদি বা আচরণ করা হয় তবে তাহা আত্মোন্নতির জন্য, নিজের মুক্তির জন্য করা হইয়া থাকে। ভারতে প্রাচীনকাল হইতে এই বিচার চলিয়া আসিয়াছে। অধ্যাত্ম হইতে অহিংসার শিক্ষাও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই অহিংসার প্রয়োগ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ইংরেজ আসিলেন। ইংরেজের সঙ্গে বিজ্ঞানও আসিল। বিজ্ঞান ব্যাপকতা আনিয়া দিয়াছে। বিজ্ঞান সামূহিক ও সামাজিকতার শিক্ষাদান করিয়াছে। অধ্যাত্মের অহিংসা ও বিজ্ঞানের ব্যাপকতার সংযোগে ভারতে এক নূতন বস্তুর উদ্ভব হইল। ভারতের পক্ষে উহার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহা হইতেছে সামূহিক অহিংসা। মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে সামূহিক অহিংসার উদ্ভব ও প্রয়োগ হইল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানের সংযোগপ্রসূত আর এক মহান মন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। সেই মন্ত্র মহাত্মা গান্ধী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহা হইতেছে সর্বোদয়। ভূদান ও গ্রামদানের মাধ্যমে সর্বোদয়ের প্রয়োগ চলিতেছে। অধ্যাত্ম বলিতেছে—"আমি' ও 'আমার' ঘুচাইয়া দাও।" 'আমি' ও 'আমার' ঘুচিয়া গেলে শূন্য হইয়া যায়। উহা অভাবাত্মক। সমাজে থাকিতে গেলে শুধু এই অভাবাত্মকভাব লইয়াও থাকা যায় না। এই অবস্থায় সেই শূন্যকে পূর্ণ করিবার জন্য বিজ্ঞান বলিতেছে—"ব্যাপক হও, সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিও না।' 'আমি' নয় 'আমরা' বল। 'আমার' নয় 'আমাদের' বল।" এই দুই-এর সংমিশ্রণে গ্রাম-দানের মন্ত্র মিলিয়াছে। জমি আমার নয় আমাদের। সম্পত্তি আমার নয় আমাদের, যা কিছু আছে তাহা আমার নয় আমাদের। জমি, সম্পত্তি, আর

যাহা কিছু আছে তাহা আমার নহে, আমাদের গ্রামের। আমি খাইব না, আমরা খাইব। ইহাতে স্বার্থ ও পরমার্থ সাধিত হইবে। ইহাতে গ্রামবাসীদের দুঃখ ঘুচিবে। আর পরমেশ্বরের কাছেও পেঁছানো যাইবে। এক পুল সৃষ্টি হইয়াছে। উহা ভূদান-গ্রামদানের পুল। পুলের একদিক এপারে, অন্যদিক ওপারে। উহার একদিক ইহলোক ও অন্যদিক পরমার্থ স্পর্শ করিয়াছে। উহা ইহলোকে সকলের দুঃখ ঘুচাইবে ও পরলোকে সকলকে পরমার্থ দান করিবে—শুধু আমাকে নহে, আমাদের সকলকে।

ভারত ও পশ্চিমের সংস্কৃতির মিশ্রণে এই লাভ হইয়াছে। ইংরেজ তথা পশ্চিমের সহিত সংঘর্ষে ভারতে অনেক দুঃখকষ্টের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয় সংস্কৃতির মিশ্রণে ভারত সামূহিক অহিংসার বিচার ও সর্বোদয়-বিচার লাভ করিয়াছে। ইংরেজ রাজত্বে ভারত যে দুঃখকষ্ট পাইয়াছে তাহাকে বিনোবাজী প্রসববেদনার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রসূতিকে বেদনায় কষ্ট ভোগ করিতে হয় বটে, কিন্তু প্রসবান্তে জাত সন্তানকে দেখিয়া সে সবই ভুলিয়া যায় ও তাহার হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে।

॥ ১০৫ ॥ ভূদানকর্মী ও গঠনকর্মীর আধার

বিনোবাজী সম্প্রতি (মার্চ, ১৯৬১) এক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, আধ্যাত্মিকতা ভূদানকর্মীর আধার ও বিপ্লব গঠনকর্মীর আধার (বুনিয়াদ) হওয়া উচিত। তিনি কেন দুই শ্রেণীর কর্মীর আধার (বুনিয়াদ) দুই রকম হওয়ার কথা বলিলেন তাহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। গাছ মাটির উপর দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু যদি মাটির নীচে গাছের মূল ও শিকড় রূপে উহার আধার (বুনিয়াদ) না থাকে, তবে গাছ খাড়া হইয়া থাকিতে পারে না। উহা খাদ্য পাইতে পারে না, পুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেও পারে না এবং বাঁচিয়াও থাকিতে পারে না। সেরূপ কর্মী যে সেবাকাজ করেন সেই কাজকে সতেজ রাখিবার জন্য, উহাকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য, উহাকে আদর্শানুরূপ পথে চালাইবার জন্য এবং সর্বোপরি নিজেকে আদর্শনিষ্ঠ ও আচারবান করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার এক সুদৃঢ় আধার (বুনিয়াদ) থাকা চাই। ঐ বুনিয়াদ

কি প্রকারের হওয়া উচিত তাহা বিচার্য। গঠনমূলক কর্মী যে কাজ করেন তাহা সমাজ-বিপ্লবাত্মক হওয়া চাই। নচেৎ গঠনকার্যের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। অন্যথায় তাহা রিলিফ বা সাহায্যদানের কার্যমাত্র হইয়া থাকিবে। যেমন সূতাকাটার কাজ। উহা সাধারণভাবে রিলিফের কাজ মাত্র। যে দরিদ্র ব্যক্তি পূরা সময় কাজ পাইতেছে না তাহাকে সূতাকাটার কাজ দিলে তাহাকে সাহায্যদান করা হইবে অর্থাৎ তাহাকে রিলিফ দেওয়া হইবে। কিন্তু ঐ একই অবস্থায় ঐ কাজ আবার সমাজ-বিপ্লবের কাজ হইতে পারে। ঐ দরিদ্র ব্যক্তি সূতাকাটার কাজ পাইবে বটে, কিন্তু প্রধানত তাহার ও তাহার পরিবারের বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই সূতা কাটিবে। কারণ অহিংস সমাজ-বিপ্লব সাধনের জন্য সমাজকে পল্লীশিল্পপ্রধান করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইভাবে ঐ সূতাকাটার কাজ বিপ্লবাত্মক হইতে পারে। এই কারণে গঠনকর্মীর আধার (বুনিয়াদ) বিপ্লব হওয়া চাই। তবেই তাঁহার কাজ বিপ্লবমুখী হওয়া সম্ভব। একথা তো বুঝা গেল। কিন্তু ভূদানকর্মীর আধারও তাহা হইলে বিপ্লব হইবে না কেন? উহার কারণ হইতেছে এই যে যাহা বুনিয়াদ হইবে তাহা উপরের গঠন অপেক্ষা দৃঢ়তর হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ উহা উপরের গঠনের ধারক হইতে পারে না। ভূদানকর্মী যে কাজ করেন তাহা স্বতঃই বিপ্লবাত্মক। উহার জন্য ভূদানকর্মীর নিজের পক্ষে বিশেষ করিয়া কিছু করিতে হয় না। যেমন ভূমিদান, সম্পত্তিদান ও গ্রামদান প্রভৃতি কাজের দ্বারা আপনা-আপনি ব্যক্তিগত মালিকত্বের ভাবনা শিথিল হইতে থাকে। এজন্য উহার এমন এক বুনিয়াদ থাকা প্রয়োজন যাহা উহা অপেক্ষা দৃঢ়তর। উপরন্তু অহিংস সমাজ-বিপ্লবের উৎস হইতেছে আধ্যাত্মিকতা (আত্মার একত্ব)। সুতরাং ভূদানকর্মীর বুনিয়াদ যদি আধ্যাত্মিকতা হয় তবে সেই কর্মী টিকিয়া থাকিতে পারিবেন এবং তাঁহার কার্যাদি সমুচিত দৃষ্টিতে পরিচালিত হইবে।

॥ ১০৬ ॥ লোকনীতি কি

'সর্বোদয়ে'র প্রক্রিয়াকে, বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সর্বোদয়ের প্রক্রিয়াকে 'লোকনীতি' বলা হইয়া থাকে। উহা যে রাজনীতি হইতে ভিন্ন

তাহা বুঝাইবার জন্য 'লোকনীতি' নাম দেওয়া হইয়াছে। রাজনীতির মূলে এই বিশ্বাস থাকে যে রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে লোকের সর্বপ্রকার হিত সাধন করা যাইবে এবং রাষ্ট্রের শাসন থাকিলে তবেই শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাইবে। অর্থাৎ উহাতে 'দণ্ডশক্তি'র উপর বিশ্বাস রাখা ও নির্ভর করা মূল জিনিস। 'দণ্ডশক্তি'র বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং রাজনীতিতে রাজশক্তি অধিকারের কাজ বা রাষ্ট্রশক্তির উপর প্রভাব বিস্তারের কাজকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। অন্যদিকে সর্বোদয়ের প্রক্রিয়ায় এই বিশ্বাস রাখা হয় যে রাষ্ট্রশক্তির বিনা সহায়তায় জনগণ নিজেরা পরস্পরের প্রেমপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে তাহাদের সমস্ত হিত সাধন করিতে পারিবে। উহার প্রক্রিয়া অহিংস এবং পারস্পরিক সহযোগিতামূলক। সুতরাং লোকনীতি প্রয়োগের দ্বারা এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাইবে যাহাতে গ্রামের যে-কোন ব্যবস্থা বা যে-কোন কল্যাণকর বা উন্নয়নমূলক কাজ গ্রামের সকলের যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য পুরুষার্থ প্রয়োগের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। গ্রামে ঝগড়া-বিবাদ হইল। তাহা মিটাইবার জন্য বাহিরের আদালতে যাইতে হইল। গ্রামের অশান্তি, গ্রামের ঝগড়া-বিবাদ থামাইবার জন্য বাহির হইতে পুলিশ ডাকিতে হইল। গ্রামের অন্যান্য ব্যাপারেও বাহির হইতে ব্যবস্থা করিতে হইল ও তাহা বাহিরের লোকের কর্তৃত্বে হইল। তাহা লোকনীতি হইল না। গ্রামের বিবাদ-বিসম্বাদ গ্রামের লোকে নিজেরাই মিটাইবে। গ্রামের লোকের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইলে গ্রামের লোকেরা নিজেরা তাহার মীমাংসা করিবে। মোটকথা গ্রামের সমস্ত ব্যাপারের ব্যবস্থা গ্রামের লোকেরা নিজেরা সর্বসমর্থনক্রমে করিয়া লইবে। ইহাই হইবে লোকনীতি। সমাজের কল্যাণপ্রদ বা উন্নয়নমূলক কাজ হইল, কিন্তু তাহাতে সমাজের সকল লোকের পুরুষার্থ-প্রয়োগের সুযোগ থাকিল না। এরূপ কাজের দ্বারা বাহ্যিকভাবে সমাজে হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু এইরূপ হইলে তাহা লোকনীতি প্রয়োগের দ্বারা করা হইল না। তাহা সর্বোদয়ের কাজ হইল না। উদাহরণ স্বরূপ এক গ্রামে সরকার বা অন্য কোন সংস্থা একটি ভাল রাস্তা নির্মাণ করিয়া দিলেন। গ্রামের লোককে এই ব্যাপারে কিছুই করিতে হইল না। অথচ গ্রামের লোক উদ্যোগী হইলে

নিজেরা উহা নির্মাণ করিয়া লইতে পারিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ রাস্তার দ্বারা গ্রামের লোকের উপকার হইল বটে, কিন্তু উহা লোকনীতি বা সর্বোদয়ের কাজ হইল না। যদি গ্রামের লোক নিজেদের অভিক্রমে (ইনিসিয়েটিভ্) ঐ রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়া নিজেরাই শ্রমদান করিয়া উহা নির্মাণ করিয়া লইতেন তবেই তাহা সর্বোদয়াত্মক অর্থাৎ লোকনীতি অনুযায়ী উন্নয়নের কাজ হইত। উপরন্তু সর্বোদয়ের নীতি হইতেছে ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য। তাহাতে মানুষের উপর বাহিরের কোন শাসন বা অনুশাসন থাকিবে না। সকল মানুষ নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইবে। অর্থাৎ একদিকে নিজেদের কাজ ও নিজেদের কল্যাণের ব্যবস্থা নিজেরা করিয়া লইবে, তৎপক্ষে যেন কাহারও জড়তা, আলস্য, তামসিকতা না থাকে এবং ক্রিয়াশীলতা, অভিক্রম, উদ্যম ও পুরষার্থ থাকে; আর অন্যদিকে তাহাদের পুরুষার্থকে শুভপথে পরিচালনার জন্য নির্ণায়ক বুদ্ধি যেন তাহাদেরই থাকে। বাহিরের কোন পরিচালক যেন না থাকে বা পরিচালনার আবশ্যকতা না থাকে। সমুদ্রে জাহাজ চলার উপমা এখানে খাটে। একটি হইতেছে গতি উৎপাদক শক্তি এবং অন্যটি হইতেছে দিক নির্ণায়ক যন্ত্র। এইজন্য একদিকে নিরলস, নিরন্তর তেজস্বী পুরুষার্থ এবং অন্যদিকে পরিপূর্ণ জাগ্রত শুভবুদ্ধি—এই উভয়ই চাই। এজন্য লোকনীতির কল্পনায় সমাজের পরিণতি হইতেছে শাসনমুক্ত সমাজ। এই সব বিষয় পূর্বে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। 'লোকনীতি' শব্দের পরিচয় করাইবার জন্যই তাহার পুনরুল্লেখ মাত্র করা হইল।

॥ ১০৭ ॥ উপসংহার

প্রেমের শক্তি নীরবে ও অদৃশ্যভাবে ক্রিয়া করিয়া যাইতে থাকে। একদিন কোন শুভ সুযোগে তাহা বিরাট্ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। তখন লোকে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী ভারতের মাটিতে সামুদায়িক প্রেমের বীজ বপন করিয়াছিলেন। উহা অংকুরিত হইবার জন্য মাটির নীচে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। উহার অংকুরোদ্গম হইয়াছিল। আজ আর এক মহাপুরুষের শীতল শান্তিবারি সিঞ্চনে তাহা তরুণ

পাদপরূপে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। লোকে ইহার বর্ধনশীলতার গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছে। এইকাজ মহাত্মা গান্ধীর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলিয়াছেন—"আজ যে কাজ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি তাহা আপনারা অন্তরের সহিত মানিয়া লইয়াছেন এবং আমি দেখিয়াছি যে, উহা বুঝাইতে আমার বিশেষকিছু কষ্ট করিতে হয় নাই। ইহার অর্থ কি? মহাপুরুষের শক্তি যখন তাঁহার দেহে আবদ্ধ থাকে, তখন তাহা সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া যান, তখন সেইশক্তি অধিক তেজের সহিত কাজ করিতে থাকে। যদি আমাদের মনের ভূমিকা ঠিকমত গঠিত হইয়া থাকে, তবে আমরা অন্তর হইতে অনুভব করিতে পারিব যে, গান্ধীজী বিদ্যমান আছেন, তাঁহার তিরোভাব হয় নাই। আর আজ যাহা বহুলোককে প্রেরণাদান করিতেছে তাহা তাঁহারই শক্তি। পরমেশ্বর তাঁহার কার্য অনেক প্রকারে সাধন করাইয়া লন। সমুদ্রে অনেক লহরী উত্থিত হয়। পরমেশ্বররূপী সমুদ্রে সৎপুরুষরূপী লহরী উত্থিত হইয়া থাকে। আমরা যদি সেই লহরী স্পর্শ করি, তবে আমাদের তাহা হইতে প্রেরণা ও নবজীবন লাভ হয়। যে-কার্যক্রম আজ আমি দেশের সম্মুখে রাখিয়াছি উহা গান্ধীজীরই আদর্শ কার্যক্রম। আপনাদের এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, আমরা এক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।"

এখন এই কাজ ঈশ্বরের প্রেরণায় ও ইঙ্গিতে সাধিত হইতেছে। নচেৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির পরিচালনায় এতটা সম্ভব হইত না। এই আন্দোলনের আশাতীত অগ্রগতি লক্ষ্য করিলে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। ইহার কারণ কি? কারণ ভূদানযজ্ঞ কোন এক সাধারণ আন্দোলন নহে। ভূমি লইয়া ইহার আরম্ভ বটে, কিন্তু ইহার মূল গভীরতম প্রদেশে। ইহা এক ধর্ম-আন্দোলন। ইহা যুগের দাবী। ইহা যুগধর্ম। ধর্ম-প্রবাহের আরম্ভ হয় অত্যন্ত সংকীর্ণ আকারে। ক্রমশ উহার বিস্তার হইতে থাকে এবং অবশেষে উহা সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করিয়া ফেলে। উহা প্রথমে বৃক্ষের ক্ষুদ্রতম বীজের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু উহা ক্রমশ বর্ধিত হইয়া মহান মহীরুহে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে বিনোবাজী বলেন—

"সাধারণত বটবৃক্ষের সহিত ধর্মের তুলনা করা হয়। যাহা চৈতন্যময় জীবন্ত ধর্ম, তাহা বটবৃক্ষের মত বিস্তারলাভ করে। উহা হইতে যে সব শাখা নির্গত হয় তাহা হইতে শিকড় বহির্গত হয়, ক্রমে তাহা মূলে পরিণত হয় এবং নূতন-নূতন বৃক্ষ জন্মিতে থাকে। ধর্ম-বিচারের ক্ষেত্রেও এই-রূপ হয়। বটবৃক্ষের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এইজন্য বটবৃক্ষের উপমা দেওয়া হইয়াছে। আম গাছ বড় বটে, কিন্তু উহার আঁটি ছোট নহে। কিন্তু বটের বীজ খুবই ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্রতম বীজের ভিতরই সমগ্রশক্তি নিহিত থাকে। সেইরূপ ভূদানযজ্ঞের নামে যে-আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে উহার বীজও এত সূক্ষ্ম ছিল যে, যিনি উহা বপন করিয়াছিলেন তিনিও ভাবিতে পারেন নাই উহা এরূপ ব্যাপক হইবে, উহার শাখাদি হইতেও নূতন-নূতন বৃক্ষের উদ্ভব হইবে।" ইহার মধ্যে নব সমাজ-রচনার বীজ নিহিত রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। বিশ্বের আজ সব চেয়ে যাহা জরুরী সমস্যা তাহার সমাধানের বীজও ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যদি ভারত এই আন্দোলনকে পূর্ণ সফলতায় লইয়া যাইতে পারে, তবে কেবলমাত্র সর্বোদয় সমাজ-প্রতিষ্ঠায় উহার পরিণতি হইবে না, উহা সমগ্র বিশ্বকেও শান্তির পথ দেখাইবে। উহা সমগ্র বিশ্বকে অভয়মন্ত্র দান করিতে সক্ষম হইবে।

মহাকবি সেক্সপীয়রের কথায় বলা যায়, 'দেয়ার ইজ্ এ টাইড্ ইন দি অ্যাফেয়ার্স অফ্ ম্যান'—মনুষ্যের জীবনে উন্নতির এক শুভক্ষণ আসিয়া থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতি ও দেশের জীবনেও তেমন। যদি আমরা সেই শুভক্ষণ চিনিয়া লইতে পারি এবং সময় থাকিতে অনন্যকর্মা হইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তবে অবিলম্বে ও অনায়াসে দেশ অভীষ্টলাভ করিবে। আমাদের দেশ ও জাতির পক্ষে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত।

এই গম্ভীর প্রসঙ্গে গীতার শেষ শ্লোক স্মৃতিপথে উদিত হয়।—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

—"যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ আছেন, যেখানে ধনুর্ধারী পার্থ আছেন সেইখানেই শ্রী আছে, বিজয় আছে, বৈভব আছে ও অবিচল নীতি আছে—ইহাই আমার মত।"

মহাত্মা গান্ধী ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—“এখানে শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। এজন্য উহার অর্থ হইতেছে অনুভব-সিদ্ধ শুদ্ধজ্ঞান। ‘ধনুর্ধারী পার্থ’ বলায় অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানের অনুসারিণী ক্রিয়া সূচিত করা হইয়াছে।” যেখানে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান এবং তদনুসারিণী ক্রিয়া—এই দুই-এর সংযোগ, সেখানে শ্রী, বিজয়, বৈভব সবই মিলিবে।

আজ ভারতে পূর্ণবিকশিত আত্মজ্ঞান ও তদনুসারিণী ক্রিয়া—এই উভয়ের প্রয়োজন। যদি এই উভয়ই একযোগে আমরা লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের শ্রী, বিজয়, বৈভব ইত্যাদি সবই মিলিবে। ভগবান আমাদিগকে সেইশক্তি দান করুন।

পরিশিষ্ট—

পশ্চিমবঙ্গের জেলাওয়ারী

(১৯৫১ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হইয়াছে

সংখ্যা—

জেলা	মোট ভৌগোলিক আয়তন সেটেলমেণ্ট জরিপ অনুসারে	জল আয়তন	ভূমি আয়তন	আবাদের অনুপযোগী (জল আয়তন সমেত)
	১	২	৩	৪
বীরভূম	১১১৫৩০০	১১২৪০০	১০০২৯০০	১৯৬৮০০
বর্ধমান	১৭৩১৪০০	১৫৩৪০০	১৫৭৮০০০	৩৪৬২০০
বাঁকুড়া	১৬৯৪০০০	১৫০৬০০	১৫৪৩৪০০	৩০০০০০
হুগলী	৭৭৩৪০০	৭৩৯০০	৬৯৯৫০০	১৩৮০০০
হাওড়া	৩৫৮১০০	৩৫৮০০	৩২২৩০০	৭৮০০০
মেদিনীপুর	৩৩৬১৪০০	২০৪৩০০	৩১৫৭৫০০	৬৭৩৫০০
২৪ পরগণা	৩৩৬৬৬০০	২১৭১০০	৩১৪৯৫০০	৫০৬২০০
নদীয়া	৯৬৫৭০০	৪৯৮০০	৯১৫৯০০	৮৮৪০০
মুর্শিদাবাদ	১৩২১৩০০	৯৪১০০	১২২৭২০০	১৭২৯০০
মালদহ	৮৯০৯০০	৫৬৫০০	৮৩৪৪০০	৮৫৫০০
পঃ দিনাজপুর	৯৩১৫০০	৫২৪০০	৮৭৯১০০	১৫৪০০০
জলপাইগুড়ি	১৫১৯৬০০	৬৫৫০০	১৪৫৪১০০	২১০২০০
দার্জিলিং	৭৬৭৮০০	৬৪০০	৭৬১৪০০	১৭৭২০০
কোচবিহার	৮৪৩৭০০*	পাওয়া যায় নাই	পাওয়া যায় নাই	৮৬৯০০
পঃ বঙ্গ মোট	১৯৬৪১১০০	—	—	৩২১৩৭০০

* ইহার মধ্যে ২৩,১০০ একর পাকিস্তান পরিবেষ্টিত অংশ। ঐ অংশের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমির কোন অংক প্রস্তুত করানো যায় নাই।

'ক'

ভূমির বিবরণ

সেই বৎসর। সরকারী হিসাব অনুযায়ী)

একরে।

আবাদযোগ্য পতিত (হাল পতিত বাদে)	হাল পতিত	নীট আবাদী জমি	যে জমিতে একাধিক ফসল হয়	মোট আবাদী ও আবাদযোগ্য জমি
৫	৬	৭	৮	৯
৮৬৮০০	২৫০০০	৮০৬৭০০	৬০৯০০	৯১৮৫০০
১৬২৬০০	৬০০০০	১১৬২৬০০	৪২২০০	১৩৮৫২০০
২৪৮০০০	২২১৪০০	৯২৪৬০০	৪১৫০০	১৩৯৪০০০
২৯৮০০	৮৮০০	৫৯৬৮০০	৪৮৭০০	৬৩৫৪০০
১৫৬০০	১১১০০	২৫৩৪০০	৩৩৩০০	২৮০১০০
২৪৭৭০০	১০২৯০০	২৩৩৭৭০০	১০৮৭০০	২৬৮৮৩০০
৩০৯৬০০	৮৮৬০০	১৪১৯৪০০	১৮৫০০০	১৮১৭৬০০
৯৩৩০০	২০৫৫০০	৫৭৮৫০০	২২৮০০০	৮৭৭৩০০
১০৯১০০	৩০৬০০	১০০৮৭০০	৪০২১০০	১১৪৮৪০০
৫৯৬০০	৮৩৪০০	৬৬২৪০০	১৩৭৮০০	৮০৫৪০০
৬৩০০০	৬৮৪০০	৬৪৬১০০	৮৫৩০০	৭৭৭৫০০
২৩০০০০	১০১৩০০	৬১৪২০০	৩৬৯০০	৯৪৫৫০০
৪৯৮০০	৩২৯০০	২১৮২০০	২১৮০০	৩০০৯০০
১২৪৯০০	৯২৯০০	৫০০৭০০	৭২০০০	৭১৮৫০০
১৮২৯৮০০	১১৩২৮০০	১১৭৩০০০০	১৫০৪২০০	১৪৬৯২৬০০

পরিশিষ্ট—

পশ্চিমবঙ্গে জীবিকা হিসাবে শ্রেণীবিভাগ ও

(১৯৫১

জেলা	মোটসংখ্যা	Agricultural livelihood categories কৃষির উপর নির্ভরশীল মোট জনসংখ্যা	Non-agricultural livelihood categories কৃষির উপর নির্ভরশীল নহে এমন মোট জনসংখ্যা
	১	২	৩
বীরভূম	১০,৬৬,৮৮৯	৮,৬৮,২৮২	১,৯৮,৬০৭
বর্ধমান	২১,৯১,৬৬৭	১৩,৭২,৩৩৫	৮,১৯,৩৩২
বাঁকুড়া	১৩,১৯,২৫৯	১০,৭৮,৩৭৫	২,৪০,৮৮৪
হুগলী	১৫,৫৪,৩২০	৯,১০,৯২১	৬,৪৩,৩৯৯
হাওড়া	১৬,১১,৩৭৩	৫,০৫,৮৯৪	১১,০৫,৪৭৯
মেদিনীপুর	৩৩,৫৯,০২২	২৭,৪৬,২০৩	৬,১২,৮১৯
২৪ পরগণা	৪৬,০৯,৩০৯	২৪,৬১,৭৮৫	২১,৪৭,৫২৪
কলিকাতা	২৫,৪৮,৬৭৭	২২,৬৯৬	২৫,২৫,৯৮১
নদীয়া	১১,৪৪,৯২৪	৬,১১,৭৮৮	৫,৩৩,১৩৬
মুর্শিদাবাদ	১৭,১৫,৭৫৯	১১,৮৬,৪৭৩	৫,২৯,২৮৬
মালদহ	৯,৩৭,৫৮০	৬,৬৭,৮৫৭	২,৬৯,৭২৩
পঃ দিনাজপুর	৭,২০,৫৭৩	৬,১৩,৭৪৬	১,০৬,৮২৭
জলপাইগুড়ি	৯,১৪,৫৩৮	৪,৪৫,৪৯৪	৪,৬৯,০৪৪
দার্জিলিং	৪,৪৫,২৬০	১,৪২,৮৩৬	৩,০২,৪২৪
কোচবিহার	৬,৭১,১৫৮	৫,৬০,৪৭৬	১,১০,৬৮২
পঃ বঙ্গ মোট	২,৪৮,১০,৩০৮	১,৪১,৯৫,১৬১	১,০৬,১৫,১৪০

ক্বষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ
লোকগণনা)

কৃষির উপর নির্ভরশীল জনগণের শ্রেণীবিভাগ

কৃষিজীবী যাঁহাদের নিজেদের জমি (প্রধানত বা সম্পূর্ণভাবে) পোষ্যবর্গ সমেত	কৃষিজীবী যাঁহাদের নিজের জমি নাই পোষ্যবর্গ সমেত	কৃষি শ্রমিক পোষ্যবর্গ সমেত	কৃষির উপর নির্ভরশীল নহেন এমন জমির মালিক ভূমির খাজনা প্রাপক ও তাঁহাদের পোষ্যবর্গ
৪	৫	৬	৭
৪,৫১,৫৬৫	১,৩২,২২০	২,৭৮,১০৯	৬,৩৮৮
৬,৮৮,৫১০	৩,২৩,৩৬৫	৩,৪৩,৪০১	১৭,০৫৯
৬,৮১,৩৩০	১,৩২,১৫৯	২,৫৬,৮৭১	৮,০১৫
৪,৯৭,০৮৯	১,৮৯,৪০৭	২,১২,৩৩৩	১২,০৯২
২,৩৮,৫২৫	৯০,৯৩৬	১,৬৭,৩৩৫	৯,০৯৮
১৭,২০,২২৩	৫,৫১,১৩৫	৪,৫৪,১৭৩	২০,৬৭২
১২,৯৯,২৭৮	৪,৭৩,৫৯৮	৬,৬২,৩৫৭	২৬,৫৫২
৪,৬৯৭	৩০৯	২৮৫	১৭,৪০৫
৩,৬৭,০০৮	১,০৮,৬০১	১,২৭,৮৯৫	৮,২৮৪
৭,১১,৪৫৯	১,৮২,৩৪০	২,৮৩,৩৪৯	৯,৩২৫
৩,৯৫,৪২১	১,৫৪,১৬৭	১,১৫,৬৮৭	২,৫৮২
৩,৪৫,৫৯৫	১,৯০,৭১৩	৭৪,২৯৮	৩,১৪০
১,৯০,৯৫২	২,৩৮,৯৩৫	১১,০০২	৪,৬০৫
৯৪,০৭৯	৪০,২৩০	৭,৯২৯	৫৯৮
৩,৩৮,০২৬	১,৭২,২৮৭	৪৬,৮৫৭	৩,৩০৬
৮০,২৩,৭৫৭	২৯,৮০,৪০২	৩০,৪১,৮৮১	১,৪৯,১২১

পরিশিষ্ট—'গ'

ফসল উৎপাদন অনুসারে জেলাওয়ারী ভূমি-বিভাগের বিবরণ

(বর্তমান লোকগণনার রিপোর্ট হইতে গৃহীত) **সংখ্যা—একরে**

জেলা	ভাদোই ফসল	হৈমন্তিক ফসল	রবি ফসল	অন্যান্য যথা—আম, চা, পান, কলা ইত্যাদি	আউশ ধান
	১	২	৩	৪	৫
বীরভূম	১২,০২১	৫,৩৯,৯৬১	৪৬,৯২৪	৭,৮২২	১৫,৭৫৩
বর্ধমান	৫৩,৮১৫	৭,৯৭,৬০৪	৯২,৬৩০	১,০৮,৭০৬	১৪,৪০০
বাঁকুড়া	১৭,৯০০	৬,৪৬,২০০	৩০,২০০	২,৭৭,৩৫২	১,৭১,১০০
হুগলী	৯,১০০	৩,৯৪,৯০০	১৯,২০০	৩১,৮৮৬	২৫,৬০০
হাওড়া	৭,৮০০	২,২০,০০০	১৭,৫৫০	৬,২৩০	১,৬০০
মেদিনীপুর	২,২৪,১০০	১৮,৯৯,০০০	২,২৩,২০০	১৬,০০০	১,৪২,৭০০
২৪ পরগণা	১,৬৬,২৮৮	১০,১৫,১৩১	১,৪৩,৪০১	৮০,৩৮৮	৪৪,০১৬
নদীয়া	৩,৪০,৮১৬	২,১০,৭৬৫	২,৬৫,৩৪৬	৪৩,২৮৯	১,৯৩,৯৭৬
মুর্শিদাবাদ	৩,৬৫,৮৩৯	৩,৬৩,০৩২	৪,৯৩,১৯৩	৪৯,১২৫	১,৯১,৩৬৫
মালদহ	১,৯০,১০০	২,৮৫,৬০০	২,৯৮,৫০০	২৯,৬০০	১,১০,৩৩৬
পঃ দিনাজপুর	১,১০,৫৯৯	৪,৮৭,৩১৮	১,০১,২৪০	১৫,৮৮৯	৬৭,৭৪০
জলপাইগুড়ি	৯৭,০০০	৪,০৭,৫০০	১২,৯৪৭	২,০৭,১০৪	৩৫,৪০০
দার্জিলিং	৮৪,১২১	৮৩,১১৪	১৫,৭৭১	১,৮২,৪৭৫	৩৪৯
কোচবিহার	৬৬,৪৯৮	২,২০,৭০৪	৪৪,৮৩৯	৩৬৬	৬৩,২১১
পঃ বংগ মোট	১৭,৪৬,২৯৭	৭৫,৭১,৩২৯	১৮,০৪,৯৪১	১০,৮৬,২৯২	১০,৭৭,৫৪৬

পরিশিষ্ট—'গ'

ফসল উৎপাদন অনুসারে জেলাওয়ারী ভূমি-বিভাগের বিবরণ

(বর্তমান লোকগণনার রিপোর্ট হইতে গৃহীত) সংখ্যা—একরে

জেলা	আমন ধান	বোরো ধান	গম	যব	ছোলা ইত্যাদি	অন্যান্য খাদ্যশস্য
	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বীরভূম	৫০৭১৬৯	৩৮	৮৮৫৮	২২২	৮২২১	২২৯৫৭
বর্ধমান	৭৫০০০০	×	৬১০০	২৩০০	৩৩৬০০	৬২০০
বাঁকুড়া	৬৪৬২০০	২০০	১০৪০০	১৪০০	৫৪০০	২৫৩০০
হুগলী	৩৯৪৯০০	৪৫০০	২০০০	২৫০	৬২০০	৩৫৭০০
হাওড়া	২২০৩০০	৩০০০	×	২০০	১৬০০	২১৩০০
মেদিনীপুর	১৮৯৯৩০০	৬৯৩৯	৩৭৫০	৩০০	৭১০০	১৭৮০০
২৪ পরগণা	১০১৫১৩১	২১৯	১৪০৮	১০০	৯৩০০	১১৬৫৪২
নদীয়া	২১০৭৬৫	৮৫১	২৪৮০০	৬১০০	৮৬৫০০	১০২৫৯৪
মুর্শিদাবাদ	৩৬৩০৩২	২০৯৬	৪৬৫১৫	২৭০৪৪	১৪০৬৯৮	২০২২১৮
মালদহ	১৩৫০৫৭	১১৯৪০	১২০১০	২৬৯১৭	২৫৪৭২	৯৯৫৭২
পঃ দিনাজপুর	৪৪৭৫৪৩	৮৬	৩৭২১	৫৯৭৭	৬৫৫৪	৮৭৩৮
জলপাইগুড়ি	৪০৭৫০০	৫	১৬০	৩৯০	১	৯২২১৩
দার্জিলিং	৬১৭৮৯	×	৫৬৫	৪০০	২	২৪২৩৯
কোচবিহার	২২০৭০৪	×	৩২৬৬	১০৫	৩০০	৯৮৫০
পঃ বঙ্গ মোট	৭২৭৯৩৯০	৩৭৮৭৪	১২৩৫৫৩	৭১৭০৫	৩৩১০৪৮	৭৮৫২২৩

পরিশিষ্ট—'গ'

ফসল উৎপাদন অনুসারে জেলাওয়ারী ভূমি-বিভাগের বিবরণ

(বর্তমান লোকগণনার রিপোর্ট হইতে গৃহীত) **সংখ্যা—একরে**

জেলা	তিসি	তিল	সরিষা	আখ	জোয়ার ইত্যাদি	গোল আলু	ফলের বাগান
	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বীরভূম	৪১৯	৬১১	৬৪৬	৪৫৪২	১৮১	৫৯১১	১৪৩৯০
বর্ধমান	৪০০	৩০০	৩৭০০	৯০০০	×	১৮৪০০	৩২৫৩৪
বাঁকুড়া	২২০০	৬৫০০	৩৫০০	৩১০০	৩০০	৪১০০	২৭৭৩৫২
হুগলী	১০০	৩০০	২০০০	৩০০০	১৩০০০	২১৪০০	৩৩৭৯৯
হাওড়া	৪৫০	×	৭০০	২৫০০	২০০০	২১০০	১২৩১১
মেদিনীপুর	৩০০	৩১০০	৭৫০০	৪৪০০	৪০০	১২৯৫০	১৫৮৫০
২৪ পরগণা	×	×	৪৯০০	২৪৯৩	১০০	৬০৪৬	৭০৮১২
নদীয়া	১৫০০০	৬০৫	৮০০০	৫৭৩৩	১৬৭০	১৬৫০	৪৩২৯২
মুর্শিদাবাদ	২৫০০০	১৪৭৭	১৫০০০	১১৭৭৫	৩৮০	৭৩৩৩	৪৯১২৫
মালদহ	৫৯৮	৪৩০	১৮০০০	৩০০০	১৪৫৮০০	২৪০০	২৯৬০০
পঃ দিনাজপুর	১৬২	৪২৫	২৬৪৪৯	১৫৫৫	১৫৭৯	৩২১৮	১১০৩৩
জলপাইগুড়ি	৪৩	৫	২৯২৬৩	৪০০	২৫৬২	৫৫১৬	৪১০১২
দার্জিলিং	×	×	২৫৭৬	২৬৬	১৫৬৩	৪৪৩৪	৪৯৪৮
কোচবিহার	×	×	১৪৪৯৪	১০০	×	৫৭০২	×
পঃ বঙ্গ মোট	৪৪৬৭২	১৩৭৫৩	১৩৬৭২৮	৫১৮২৪	১৬৯৫৩৫	১০১১৬০	৬৩৯০৫৮

পরিশিষ্ট—'ঘ'

পশ্চিমবঙ্গের বন

বন-সম্পদ এক বৃহৎ জাতীয় সম্পদ। জ্বালানী-কাষ্ঠ ও টিম্বার-কাষ্ঠ ছাড়া কাগজ, দেশালাই-এর বাক্স প্রভৃতি ছোট-বড় বহুবিধ শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় কাঁচামাল বন হইতে উৎপন্ন হয়। বনে বহুবিধ ঔষধের গাছ-গাছড়া উৎপন্ন হয়। বন গবাদি পশুর চারণভূমি। বহুবিধ খাদ্যসামগ্রীও বন হইতে উৎপন্ন হয়। বন কেবল সম্পদ নহে, উহা দেশের পক্ষে এক অপরিহার্য অংগস্বরূপ। কারণ, বন আবহাওয়ার আর্দ্রতা রক্ষণ ও বৃদ্ধি করে এবং বারিপাতের প্রাচুর্য রক্ষা করিয়া কৃষির সৌকর্য বিধান করে। পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে উপরের মাটির স্তর খুব পাত্‌লা সেখানে বৃষ্টির জল সবেগে গড়াইতে গড়াইতে মাটি ক্ষয় হইয়া গিয়া উহা উষর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। একমাত্র বনই উহা নিবারণ করিতে পারে। সমতল অঞ্চলে বাতাসের বেগে ধূলা উড়িয়া মাটি ক্ষয় হয়। বনের দ্বারা তাহা নিবারিত হয়।

তাই বৈজ্ঞানিক মতে ভারতবর্ষের ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ বনাবৃত রাখা একান্ত প্রয়োজন বিবেচিত হইয়াছে। পার্বত্য অঞ্চলে শতকরা ৬০ ভাগ এবং সমতল অঞ্চলে শতকরা ২০ ভাগ বনাবৃত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৪৯-'৫০ সালের হিসাবানুসারে ভারতবর্ষের ভূভাগের পরিমাণ ৮১,০৮,০৯,০০০ একর এবং বনের পরিমাণ ১৪,৭৭,০৫,০০০ একর (২,৩০,৭৮৯ বর্গমাইল) অর্থাৎ শতকরা ১৮·২২ ভাগ। এই হিসাবের মধ্যে বাগান ও রাস্তার ধারে যেসব গাছ আছে তাহার হিসাব ধরা হয় নাই। উহা ধরিলে বন মোট ভূভাগের শতকরা ২০ ভাগ দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গে ঐ সালের হিসাবানুসারে ভূভাগের পরিমাণ ১,৯৬,৯৬,০০০ একর এবং বনের পরিমাণ ২৫,৬৯.২৬১ একর (৪০১৪ বর্গমাইল) অর্থাৎ শতকরা ১৮ ভাগ ছিল। কিন্তু ঐ বন দেশের সর্বত্র সুসমভাবে অবস্থিত নহে। এমন কোন কোন জেলা আছে যেখানে একবিঘাও বন নাই। সম্প্রতি সরকারের দৃষ্টি এইদিকেই আকৃষ্ট হইয়াছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন বন সৃষ্টির জন্য জমি অধিকার করিয়া নূতন বন সৃষ্টির (এফোরেস্টেশন) প্রয়াস করা হইতেছে। বেসরকারী বনসম্পর্কীয় আইনের বলেও বন-সংরক্ষণের চেষ্টা

করা হইতেছে। পতিত ভূমি আবাদযোগ্য করিয়া ভূমিহীনের জন্য ভূমিব্যবস্থা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা করিতে যাইয়া যাহাতে দেশের হিতের পক্ষে যতটা নূতন বন এখনও সৃষ্টি করা প্রয়োজন তাহার জন্য আবশ্যকীয় ভূমির অভাব না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাই পশ্চিমবঙ্গের জেলাওয়ারী বনের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহার মধ্যে প্রথম হিসাব ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কনসারভেটর জেনারেল কর্তৃক এবং দ্বিতীয় হিসাব ১৯৫৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত। পার্থক্যের কারণ খুব সম্ভব এই যে, একটির মধ্যে নূতন বন সৃষ্টির জন্য অধিকৃত ভূমি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং অন্যটির মধ্যে তাহা হয় নাই।

প্রথম হিসাব—১৯৫১		[সংখ্যা—একরে]		**দ্বিতীয় হিসাব—১৯৫৪**
জেলা	সরকারী বন	বেসরকারী বন	মোট বন	মোট বন
বীরভূম	×	৩২০৭০	৩২০৭০	৩২৩৭৬
বর্ধমান	×	৭৪৬২৪	৭৪৬২৪	৬৭১৫০
বাঁকুড়া	×	২৮৬৬১১	২৮৬৬১১	৩২৩০০৯
হুগলী	×	২৫৬০	২৫৬০	×
মেদিনীপুর	৩৫২০	৩২১৯৭৭	৩২৫৪৯৭	৩৫০৮৯৪
২৪ পরগণা	১৮১৬৬৪০	৭০৪০	১৮২৩৬৮০	১০৪২৮১৫
নদীয়া	৬৪০	১৬৬	৮০৬	১৯৩৪
মুর্শিদাবাদ	×	৬৫৩	৬৫৩	৩৫৭
মালদহ	×	১২১৯২	১২১৯২	১০৬২৪
পঃ দিনাজপুর	×	১২৮০	১২৮০	১২৬৫
জলপাইগুড়ি	৩৬৯২৮০	৫৪৪০০	৪২৩৬৮০	৪৪২১০১
দার্জিলিং	২৮৯২৮০	২২৪০০	৩১১৬৮০	২৮১৩১৩
কোচবিহার	১৫৩৬০	×	১৫৩৬০	১৫৩৬০
পঃ বঙ্গ মোট	২৪৯৪৭২০	৮১৫৯৭৩	৩৩১০৬৯৩	২৫৬১২৬১

ভূদানযজ্ঞে প্রাপ্ত, বিতরিত, অযোগ্যভূমি ও গ্রামদানের সংখ্যা

(১৯৬১ সালের মার্চ পর্যন্ত প্রাপ্ত বিবরণ অনুসারে)

রাজ্য	জেলা সংখ্যা	ভূমি প্রাপ্তি (একরে)	দাতা সংখ্যা
	১	২	৩
অন্ধ্র	২০	২,৪১,৯৫২·০০	১৬,৬২৯
আসাম	১৯	২৩,১৯৬·০০	২,৬৭০
উড়িষ্যা	১৩	১,৫৩,০৪৫·৬৬	৮৩,৬১৩
উত্তর প্রদেশ	৫৪	৪,৩৬,০৯৫·০০	১,০৭,২৩৭
কেরল	৯	২৯,০০২·০০	×
তামিলনাদ	১৩	৭০,৮২৩·০০	×
দিল্লী	১	৩০০·০০	২১৮
পঞ্জাব-পেপ্সু	১৮	১২,৮৯৭·০০	২,৪৪৭
গুজরাট	১৮	৭৮,২৩৮·১৬	×
মহারাষ্ট্র	২৫	১,৪৮,০৯২·২৪	×
মধ্যপ্রদেশ	৪৩	৪,০৬,১৫২·৭৪	×
মহীশূর	১৯	১৯,৯৭৩·০০	×
বাংলা	১৭	১২,৩৫৪·৬৯	৮,২১০
বিহার	১৭	২১.৩০,৬২২·০০	২,৯৮,৫৮২
রাজস্থান	২৬	৪,৩৩,৩২৩·০০	৮,৬৪০
হিমাচল প্রদেশ	৬	১,৫৬,৮০০·০০	×
জম্মু-কাশ্মীর	১৫	×	×
মোট	৩৩৩	৪৩,৫২,৮৬৬·৪৯	

ভূমি বিতরণ (একরে)	প্রাপক সংখ্যা	বিতরণের অযোগ্য ভূমি	গ্রামদান সংখ্যা
৪	৫	৬	৭
৯৬,৯৪৭·০০	২৬,৯৮৮	৫৮,৩৩৩·০০	৫৮৭
২২৫·০০	×	×	১৫৭
১২,৯৩৯·৯৫	৬,৯৭৬	২,২৮১·৪৫	১,৯২৯
১,২৪,৬৪০·০০	৫০,০৭৫	৯০,৮৫৭·০০	৬৩
২,৫৫৪·০০	×	৪,০০০·০০	৫৪৩
১৫৭·০০	×	×	২৫২
১৮০·০০	৩০	×	×
২,৭০৬·০০	৬৪৯	৩,৭৭৬·০০	৬
৪৫,৫০৫·৩৯	×	×	১৪৪
৮৮,৯২৩·৫৭	×	৫,০৮২·৬৮	৫৮৪
১,০৬,১৪১·৭২	×	১৭,৪৬০·৪৫	৭৪
২,৫২৭·০০	×	×	৬৬
৩,১৮৭·১১	৩,১০৪	৬১৭·৯৪	২৬
২,৪৭,৭৬৭·০০	১,৪৫,২৩৭	১০,৫১,০৬১·০০	৮২
৯৭,০৭৩·০০	১১,৪৯৫	৩৭,১৯৭·০০	২৩৫
২,১০০·০০	×	×	৪
×	×	×	×
৮,৩৩,৪৬৬·৮২		১২,৭০,৬৬৬·৫২	৪,৭৫২